# রেখাচিত্র

আবুল ফজল

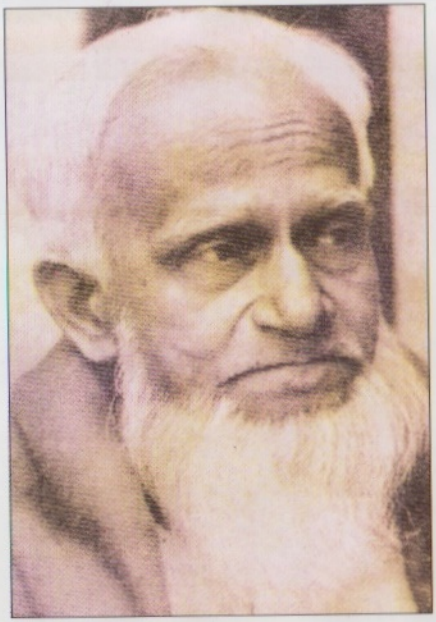

মননশীল চিন্তাবিদ, শিক্ষাব্রতী, মানবদরদি আবুল ফজলের জন্ম ১৯০৩ সালের পহেলা জুলাই। বাবা মৌলানা ফজলুর রহমান ছিলেন বিজ্ঞ আলেম। ১৯২৩ সালে নিউস্কিম মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা ও ১৯২৫তে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯২৮-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং ১৯২৯-এ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিটি পাস করেন। এগার বছর পর ১৯৪০-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস করেন। স্কুল-কলেজে চাকরি করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছেন।

মুক্তবুদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী আবুল ফজল জাতির সংকট মুহূর্তে নির্ভীক ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য ভূষিত হয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার, রাষ্ট্রিয় সাহিত্য পুরস্কার ও সমকাল পুরস্কারে। ১৯৭৫-এ পেয়েছেন সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি।

১৯৮৩, ৪ মে, রাত ১১টা ১৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

রচনায় শৈল্পিক সম্পূর্ণতা আর পরিণতির জন্য মনের যে সৌম্য-নিরাসক্তি, পরিমিতি-বোধ আর অবিচ্ছিন্ন প্রশান্তি অত্যাবশ্যক, চারদিকের মানুষ আর সমাজকে দেখে তা বজায় রাখা আমাদের কারো কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। সবিনয়ে আমার নিজের রচনার এ ত্রুটি মেনে নিতে আমার দ্বিধা নেই। তবে তার সামাজিক পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিতটুকু মনে রাখলে পাঠকের পক্ষে আমাদের যৎসামান্য সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রতি সহিষ্ণু হওয়া হয়তো অসম্ভব নাও হতে পারে।

এ রচনা পুরোপুরি আত্মজীবনী নয়– বড় জোর একে স্মৃতিকথা বলা যায়। মন থেকে যা আজো হারিয়ে যায়নি তাই শুধু ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে এখানে। চিঠিপত্র যা এখনো হাতের কাছে আছে যথাস্থানে তার উদ্ধৃতি দিয়েছি। নিজের সম্বন্ধেও সেই সব কথা বলতে পারি না। প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব এলাকা আছে, ইংরেজিতে যাকে Private life বলা হয়। সেখানে ছাপার অক্ষর কেন, দেবতারও প্রবেশ নিষেধ। কোন লেখককেই, সামাজিক দিক থেকে খুব আদর্শ-চরিত্র মনে করা ঠিক নয়– তাঁদের পেশাই তাঁদের এ পথের অন্তরায়। গল্প-উপন্যাস লিখতে গেলে লেখকের ব্যক্তিত্ব শতধা হতে বাধ্য, সৎ-অসৎ সব রকম চরিত্রে চরিত্রে মানসবিহার তাঁর পক্ষে অনিবার্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেহের ব্যাপারেও এ বিহার যে প্রশ্রয় পায় না তা নয়, এমন কি 'মহৎ' আখ্যায়িতরাও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নন। সবাই জানে প্রেমের ব্যাপারে কবি-শিল্পীরা তেমন নির্ভরযোগ্য নয়! তাই সাধারণত বুদ্ধিমতীরা কবি-সাহিত্যিকদের প্রেমে পড়েন না, বিয়েতে তো আরো বেশি গররাজি। তারা লাভ-লোকসান হিসাব করেই পা বাড়ান আর রানী হতে চান সব জায়গায় অথচ কবি-সাহিত্যিকরা কোন রাজা কি রানীর প্রজা হতে অনিচ্ছুক। তাই সাহিত্যিক-শিল্পীর বেলায় আদর্শ-চরিত্র কথাটার তেমন কোন সামাজিক মূল্য নেই। ইংরেজিতে সার্বিক অর্থে যে character শব্দটি ব্যবহার হয় সাহিত্যিক-শিল্পীদেরও বিচার সে অর্থেই করা উচিত। তাই লেখক হিসেবে আমার কোন 'ক্যারেক্টার' আমার রচনায় ফুটে উঠেছে কি না সেটাই বিচার্য। সামাজিক মানুষ হিসেবে 'আদর্শ' ও 'মহৎ' হওয়া নিঃসন্দেহে গৌরবের– আমি কিন্তু জীবনে ও সাহিত্যে 'সত্য' হতে চেয়েছি।

রেখাচিত্রের ভূমিকা থেকে
আবুল ফজল

www.pathagar.com

# রেখাচিত্র

আকুল ফজল

গতিধারা

www.pathagar.com

**গতিধারা প্রথম প্রকাশ**
**ফেব্রুয়ারি ২০০৬**
ফাল্গুন ১৪১২
**দ্বিতীয় প্রকাশ**
আগস্ট ২০১৫
ভাদ্র ১৪২২
**প্রকাশক**
সিকদার আবুল বাশার
গতিধারা
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : (+৮৮০২) ৭১১৭৫১৫, ৭১১৮২৭৩
e-mail : gatidhara@gmail.com
fax : (+88 02) 9533028
website : www. gatidhara.com
**পরিবেশক**
বইপত্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
**প্রচ্ছদ**
সিকদার আবুল বাশার
**কম্পিউটার কম্পোজ**
গতিধারা কম্পিউটার
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
**মুদ্রণ**
জি. জি. অফসেট প্রেস
৩১/এ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০
**মূল্য : ৩০০ টাকা**
ISBN : 978-984-8947-61-6

www.pathagar.com

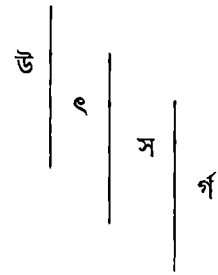


উমু, জীবন যে আমার কাছে কিছুটা অর্থময় হয়ে উঠেছে
তার পেছনে তোমার নিবেদন অনেকখানি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# স্ব | গ | ত

লেখকরাও পরিবেশের সন্তান। তাঁদেরও লিখতে হয় দেশ সমাজ আর যুগের পরিপ্রেক্ষিতে। এ সবের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া খুব কম লেখকের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে তাঁরাও দেশ কাল আর চলমান ইতিহাসের অঙ্গ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত তরুণ ইংরেজ কবি এল্যান লুইস এ দেশের সমাজ জীবন দেশে মন্তব্য করেছিলেন : 'এ দেশে পরিণতি তথা মানসিক পরিপূর্ণতা অর্জন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মানুষের পরিবেশ দেখে ক্রুদ্ধ হওয়ার মতো এতো বস্তু এখানে রয়েছে যে সংযত-মনা হওয়া সম্ভবই নয়। সমাজের চেহারার দিশেহারা হওয়ার মতো বস্তু অনেক...।'

অবিভক্ত ভারতে চারদিকে মানুষ আর সমাজের হতশ্রী চেহারা দেখেই লুইসের এ মন্তব্য। সমাজ হিসেবে তখন বাঙালি মুসলমান ছিলো আরো দীন আরো হতশ্রী, ভুগছিল জীবনের নানা ক্লেদ আর গ্লানিতে। তাই আমাদের পক্ষে, বিশেষ করে শিল্পী-সত্ত্বায় কোথাও স্বস্তি পাওয়ার উপায় ছিল না। সব কিছুই যেন আমাদের খোঁচা দিত, করত provoke–না চটে মনকে শান্ত রাখার উপায়ই ছিল না।

শ্লেষ আর ব্যঙ্গবিদ্রূপের একটা বাঁকা হাসি যেন প্রকাশের জন্য আকুলি ব্যাকুলি করত সব সময়। দাহ্য বস্তুর অভাব ছিল না বলে মনে মনে মুগ্ধ হত অনেকেই। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে নজরুলকেও— এ কারণে তাঁর মতো প্রতিভারও হাতের কলম হয়েছে বারে বারে অসংযত আর দিশেহারা।

আমরা যারা তাঁর পেছনে পেছনে এসেছি— সমাজ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা যাদের ছিল, শুধু 'অতীত গৌরবের সোনালি স্বপ্নে' যারা সন্তুষ্ট থাকতে পারি নি, তাদের পক্ষেও কলমের সংযম রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। অনেক সময় আমরা কলম চালিয়েছি অস্থির আর ক্রুদ্ধ মনে। আমাদের অনেক রচনায় মনের সে প্রতিফলন অনিবার্য। একদা কাজী আবদুল ওদুদ আমাকে তীরন্দাজ বলে অভিহিত করেছিলেন। কথাটা হয়তো একেবারে নিরর্থক নয়।

রচনায় শৈল্পিক সম্পূর্ণতা আর পরিণতির জন্যে মনের যে সৌম্য-নিরাসক্তি, পরিমিত-বোধ আর অবিচ্ছিন্ন প্রশান্তি অত্যাবশ্যক, চারদিকের মানুষ আর সমাজকে দেখে তা বজায় রাখা আমাদের কারো কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি। সবিনয়ে আমার নিজের রচনার এ ত্রুটি মেনে নিতে আমার

www.pathagar.com

দ্বিধা নেই। তবে তার সামাজিক পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিতটুকু মনে রাখলে পাঠকের পক্ষে আমাদের যৎসামান্য সাহিত্য প্রচেষ্ঠার প্রতি সহিষ্ণু হওয়া হয়তো অসম্ভব নাও হতে পারে।

*  *  *  *

এ রচনা পুরোপুরি আত্মজীবনী নয়— বড় জোর একে স্মৃতিকথা বলা যায়। মন থেকে যা আজো হারিয়ে যায়নি তাই শুধু ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে এখানে। চিঠিপত্র যা এখনো হাতের কাছে আছে যথাস্থানে তার উদ্ধৃতি দিয়েছি। নিজের সম্বন্ধেও কেউ সব কথা বলতে পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব এলাকা আছে, ইংরেজিতে যাকে Private life বলা হয়। সেখানে ছাপার অক্ষর কেন, দেবতারও প্রবেশ নিষেধ।

কোন লেখককেই, সামাজিক দিক থেকে খুব আদর্শ-চরিত্র মনে করা ঠিক নয়— তাঁদের পেশাই তাঁদের এ পথের অন্তরায়। গল্প-উপন্যাস লিখতে গেলে লেখকের ব্যক্তিত্ব শতধা হতে বাধ্য, সৎ-অসৎ সব রকম চরিত্রে চরিত্রে মানসবিহার তাঁর পক্ষে অনিবার্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেহের ব্যাপারেও এ বিহার যে প্রশ্রয় পায় না তা নয়, এমন কি 'মহৎ' আখ্যায়িতরাও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নন্। সবাই জানে প্রেমের ব্যাপারে কবি-শিল্পীরা তেমন নির্ভরযোগ্য নয়! তাই সাধারণত বুদ্ধিমতীরা কবি-সাহিত্যিকদের প্রেমে পড়েন না, বিয়েতে তো আরো বেশি গররাজি। তাঁরা লাভ লোকসান হিসেব করেই পা বাড়ান আর রানী হতে চান সব জায়গায় অথচ কবি-সাহিত্যিকরা কোন রাজা কি রাণীর প্রজা হতে অনিচ্ছুক। তাই সাহিত্যিক-শিল্পীর বেলায় আদর্শ-চরিত্র কথাটার তেমন কোন সামাজিক মূল্য নেই। ইংরেজিতে সার্বিক অর্থে যে character শব্দটি ব্যবহার হয় সাহিত্যিক-শিল্পীদেরও বিচার সে অর্থেই করা উচিত। তাই লেখক হিসেবে আমার কোন ক্যারেক্টার আমার রচনায় ফুটে উঠেছে কিনা সেটা বিচার্য। সামাজিক মানুষ হিসেবে আমি আদর্শ কিনা আমার সাহিত্য-কর্মের বিচারে তা গৌণ। 'আদর্শ' ও 'মহৎ' হওয়া নিঃসন্দেহে গৌরবের— আমি কিন্তু জীবনে ও সাহিত্যে 'সত্য' হতে চেয়েছি।

*  *  *  *

লেখক হিসেবে আমার ত্রুটি অনেক। প্রতি লেখকেরই জীবনে 'প্রস্তুতিপর্ব' থাকে, আমার বেলায় তেমন কোন পর্ব নেই। আমি অনেকটা নিঃসঙ্গ স্বভাবের মানুষ, সহজে মিশে যেতে পারি না সকলের সাথে। এতে অন্য কোন ক্ষতি না হলেও সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটে। শৈশব থেকে আমি মোটেই কষ্টসহিষ্ণু নই, পরিশ্রমী হওয়া লেখকের আর একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। তার উপর আমি আবার কিছুটা লাজুক-প্রকৃতির। এ জন্যে অনেক সময় আমার নিকটতম প্রতিবেশীর সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা ঘটে না, আমার বন্ধুসংখ্যাও তাই সীমিত। জীবনের অনেক সুযোগ-সুবিধাও

www.pathagar.com

এ কারণে ফস্‌কে গেছে আমার হাত থেকে। মানুষকে নিয়েই আমার লেখা, সে মানুষের সঙ্গে যদি আমি মন খুলে মিশতে না পারি তা হলে লেখক হিসেবে এটা ত্রুটি বই কি!

রেল-স্টিমারে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি পাশের সহযাত্রীর সঙ্গে কোন রকম আলাপ-পরিচয় না করেই। প্রথম কথা বলার সংকোচ আজও আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি। মৌনতায় আমার অসীম আনন্দ— অন্ধকারে মৌন হয়ে বসে থাকা তো আমার রীতিমতো হবি।

রাস্তার ধারে আমার বাড়ি, তবুও আমাকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দেয় কোলাহল আর হট্টগোল। রেডিয়োর আওয়াজ আমার কানে রীতিমতো যন্ত্রণা। দীর্ঘকাল আমার কোন প্রতিবেশী ছিল না— এখন শুধু যে প্রতিবেশী হয়েছে তা নয়, অনেক দোকান-পাট, হোটেল-রেস্তোরাঁও হয়েছে, রেডিয়ো বাজানো যাঁদের কারো কারো নিত্যকর্ম। প্রসিদ্ধ চীনা লেখক লিন টুয়াং লিখেছেন : বত্রিশ বছর পরে তিনি তাঁর বাসা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ সম্প্রতি তাঁর এক প্রতিবেশী একটি রোডিয়ো কিনেছেন! বাসা বদলাবার তৌফিক আমার নেই, তাই ক্রমবর্ধমান যন্ত্র-সভ্যতার নির্যাতন থেকে নেই রেহাইও।

আশ্চর্য, নিস্তব্ধতার অনির্বচনীয় শান্তি আজ কারো অভিপ্রেত নয়। নিজের রেডিয়ো নিজে শুনেও কেউ নয় সন্তুষ্ট— প্রতিবেশীকেও চায় শোনাতে, প্রতিবেশীর যত অনিচ্ছাই থাক্! আমার বাড়িতেও রেডিয়ো কেনার তাগাদা যে আসে না তা নয়, এতকাল আমার অসুস্থতার দোহাই দিয়ে তা ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু দিন দিন তাগাদাটা যেভাবে জোরদার হয়ে উঠছে মনে হয় না তা আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে! গ্রামোফোনের যুগে গ্রামোফোনও ছিল আমার অসহ্য। কোন কোন বন্ধু আমাকে চটাবার জন্যে ইচ্ছা করেই নিজের গ্রামোফোনটা ছেড়ে দিত আমি যাওয়া মাত্রই। সিনেমার প্রতিও আমি কোন আকর্ষণ বোধ করি না। তাই অনেক সময় বিনা পয়সায় দেখার আহ্বানেও দিই না সাড়া। দলে পড়ে কদাচিৎ দেখতে গেলেও, অতিমাত্রায় যান্ত্রিক বলেই বোধ করি আমার ভেতরের রসবোধ তাতে পায় না মোটেই তৃপ্তি। ফলে মাঝে মাঝে নিজেকে আমার বড্ড বেশি 'অনাধুনিক' মনে হয়। আমার বিশ্বাস ললিতকলা অতিবেশি যান্ত্রিক হয়ে পড়লে তার সাংস্কৃতিক মান ও মূল্য দুই-ই নেমে যেতে বাধ্য। তখন শিল্পীর কাছেও শিল্প দশটা নিত্য-কর্মের বেশি আর কোন তৃতীয় অনুভূতি জাগায় না। শিল্পের অর্থকরী দিকের কাছে ভাবগত দিকের এ পরাজয় আজ শিল্পরসিকদের এক মহা বেদনার কারণ।

*　　*　　*　　*

ভাষা হচ্ছে সব লেখকের প্রধান হাতিয়ার। লেখক হতে চেয়েছি অথচ ভালো করে ভাষা শেখার সুযোগ পাই নি কখনো। বাপ-দাদা আরবি-ফারসি

www.pathagar.com

চর্চা করতেন, বাড়ির আবহাওয়াও ছিল তাই। শিক্ষা জীবনের সূচনায়, গোটা মাধ্যমিক আর ইন্টারমিডিয়েট কালটা কেটেছে মাদ্রাসায়। মাদ্রাসা আর ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বাংলাটা যে রাখা হয়েছিল সে শুধু নেহাৎ বাংলাদেশ বলেই। ম্যাট্রিকের সময় আমাদের বাংলায় পরীক্ষা দিতে হয়েছিল সর্বমোট ত্রিশ নম্বরের। ঐ পরীক্ষায় আমি আচমকায় পেয়ে গিয়েছিলাম। য মানে ভার্নেকুলার অর্থাৎ ত্রিশের মধ্যে বাংলায় আমি শতকরা আশি পেয়েছিলাম। জীবনে যত পরীক্ষা দিয়েছি এ একটি ছাড়া দাবী করার মতো আর কোন কৃতিত্ব আমার নেই। যদিও বাংলাটা ভালো করে শেখার সুযোগ পাই নি কখনো তবুও সারা জীবন আমাকে পড়াতে হয়েছে বাংলা— স্কুল থেকে কলেজ সর্বত্র। ভাষার যে মূল ভিৎ ব্যাকরণ— তাও শিক্ষকের কাছে পড়বার সুযোগ ঘটে নি কোনদিন। ফলে কেউ যদি আমাকে হঠাৎ কোন ব্যাকরণের প্রশ্ন করে বসে আমি ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। অথচ ব্যাকরণ যে আমি শুধু ক্লাসে পড়িয়েছি তা নয় ব্যাকরণের বইও লিখেছি!

*　　*　　*　　*

এ রচনায় যে সব লেখক বন্ধুদের নাম উল্লেখিত হয়েছে তাঁরা ছাড়া আরো অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল, আছেও— কিন্তু সকলের সম্বন্ধে লেখা সম্ভব হয় নি। আমার জীবনের ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে যাঁদের নাম এসে গেছে শুধু তাঁরাই উল্লেখিত হয়েছেন। না হয় এ যুগের তরুণ-প্রবীণ প্রায় সব লেখকের সঙ্গেই আমার অল্প-বিস্তর পরিচয় রয়েছে।

এ লেখা সম্পর্কে প্রথম উৎসাহ বাণীটা আসে সদা প্রফুল্ল-মনা, চট্টগ্রামের ইতিহাসের লেখক সৈয়দ মর্তজা আলী থেকে, তাঁর অগ্রজ সৈয়দ মোস্তফা আলীও আমাকে বার বার উৎসাহিত করে চিঠি দিয়েছেন সিলেট, মৌলবী বাজার থেকে। কবি হাবীবুর রহমান আমাকে শুধু নয় আমার প্রকাশককেও বইটি প্রকাশের জন্যে জানিয়েছেন তাগাদা। কবি আবদুল কাদির দিয়েছেন বহু বিষয়ে পরামর্শ। এক চিঠিতে এ কথা কয়টিও তিনি লিখেছিলেন : 'তোমার 'রেখা চিত্র' আরো হৃদয়গ্রাহী ও মূল্যবান হবে যদি সমসাময়িক লেখকদের লেখার মূল্যমান সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য করো। তা হলে তৎকালীন সাহিত্য প্রচেষ্টার একটা প্রামাণ্য বিবরণী হিসাবেও তার দাম হবে একালে।' ৫.১.৬৫.

এ লেখাটি প্রথমে দু'বছর ধরে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে মাসিক সওগাতে। আমার লেখক-জীবনের সূচনা থেকেই সওগাত আর সওগাত-সম্পাদকের সঙ্গে আমার যে সম্পর্কের সূত্রপাত, সৌভাগ্যের বিষয় আজো তা অটুট। আমার নিজের বেলায় সওগাতের দান অসীম।

জীবন একটা অভিজ্ঞতা বই তো নয়। আমাদের জীবনের বেশির ভাগ

www.pathagar.com

ভিন্ন পরিবেশে কেটেছে। তাই আমাদের অভিজ্ঞতার রূপও ভিন্নতর। হয়তো আজকের সঙ্গে তার মিলের চেয়ে গরমিলটাই বেশি চোখে পড়বে। ক্ষুদ্র হলেও আমাদেরও একটি ভূমিকা ছিল, হয়তো আজো আছে। খুব সচেতনভাবে যে এ ভূমিকা আমি পালন করেছি তা নয়— তবুও এর অংশীদার আমি হয়ে পড়েছি। মিশরীয় তরুণ লেখক য়ূসুফ ইদ্রিসের মতে : Art is a State. It must be defended as other States are defended. শিল্পের সীমান্ত রক্ষা লেখকের এক বড় দায়িত্ব। এখনে লেখককে প্রায় সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমার যে ক্ষুদ্র ভূমিকা তার প্রতি আমার সহ-যাত্রীদের কেউ কেউ যে স্বীকৃতি জানিয়েছেন তার পরিচয় এ বইর অভ্যন্তরেই রয়েছে। কিন্তু নেহাৎ অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র থেকেও আমি স্বীকৃতি পেয়েছি। ১৯৬৩'র ২৫ শে ডিসেম্বর, ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক দরবারে ঐ বছরের খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে মেডেল ইত্যাদি বিতরণ করেন প্রেসিডেন্ট। দরবার শেষে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ কেউ বা এগিয়ে যাচ্ছিলেন চায়ের টেবিলের দিকে। সাময়িক ভাবে সেদিন আমিও ভি. আই. পি। হঠাৎ আমার অচেনা এক সাধারণ পোশাক পরিহিত ভদ্রলোক আমাকে এক সালাম টুকে মুচকে হেসে বলে উঠলেন : 'আপনার কাজ আপনি করে যান, আগুন জ্বলতেই থাকবে...।' ভংগী দেখে মুহূর্তে বুঝে নিলাম সাহিত্যের অগ্নি-শিখা যে অনির্বাণ থাকবে এ তিনি বলতে চাচ্ছেন।

বল্লাম : আপনি? আপনাকে তো...?

: আমি চট্টগ্রাম ডি. আই. বি'তে কাজ করি। ডিউটিতে এসেছি।

সুযোগ পেয়ে বলে ফেল্লাম : আপনাদের খাতায়ও তো নাকি আমার নাম উঠেছে?

: উঠুক, ঐ আমাদের পেশা কিন্তু পেশার বাইরে আমরাও মানুষ— সেখানে আমরা আপনাদের— দেশের সাহিত্যিক-শিল্পীদের শ্রদ্ধা করি।

অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। সাহিত্যের নীরব ফল্গুধারা পাষাণ বিদীর্ণ করেও কি প্রবাহিত হতে সক্ষম?

মাঝখানে মাত্র দু'মাসও গত হয় নি।

১৯৬৪-এর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে লাল দীঘির ময়দানে বিরাট জনসভা। সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে সামনে তাকিয়ে দেখি— মাঠের পূর্ব ধারে আমাদের কথা টুকে নেয়ার জন্যে চেয়ার টেবিল পেতে ডি. আই বি'র লোকেরা বসে গেছেন। আশ্চর্য, দেখলাম তার মাঝে উক্ত ভদ্রলোকও বসে আছেন খাতা-পেন্সিল হাতে। বুঝলাম পেশাগত কর্তব্যনিষ্ঠাই তাঁকে ঐখানে একাজে নিয়োজিত করেছে। না হয় তাঁর ভিতরও এমন একটি মন আছে যে মনে দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে রয়েছে দরদ, হয়তো কিঞ্চিৎ গৌরব-বোধও।

শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম এর কয়েক মাস পরে কর্মরত অবস্থায় তিনি

www.pathagar.com

হঠাৎ মারা গেছেন। সেবারও নাকি প্রেসিডেন্টের সফর উপলক্ষে ডিউটি বাজাতেই গিয়েছিলেন অন্যত্র। পেশা আর বিবেকের দ্বন্দ্বে কেউ কেউ বিবেককে ঘুম পাড়াতে সক্ষম— মরহুম আবদুস সালাম এ দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন কিনা জানার উপায় নেই।

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের ফলে যে সব ছাত্রকর্মী জেলে গিয়েছিল তার অন্যতম হারুন চট্টগ্রাম জেল থেকে আমাকে লিখেছিল : 'আপনার সৃষ্টিগুলো আমাকে শিখায় জীবনকে ভালোবাসতে। জীবনকে ভালোবাসাতে গিয়ে ভালোবাসি তার শৈল্পিক প্রতিফলনকে অর্থাৎ সাহিত্যকে।' হারুন স্বল্পকালের জন্য চট্টগ্রাম কলেজে আমার ছাত্র ছিল।

রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল থেকে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত শ্রীশ্যামেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য নামক অপর এক রাজবন্দী ১৮.২.৬২ তারিখে আমাকে লিখেছিলেন— 'হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা' হাতে এসেছিল স্বল্পসময়ের জন্য, তাই দ্রুত চোখ বুলিয়েই মনকে সান্ত্বনা দিতে হয়েছে। আপনার 'রাঙ্গাপ্রভাত' পড়বার সুযোগ হয়েছিল।... এতকাল মরহুম আগা খাঁ সম্বন্ধে বিরূপ ধারণাই পোষণ করে আসছিলাম। আপনার লেখা আমার মনে তাঁর জীবনী পড়ার তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।' ইত্যাদি।

সাহিত্যের গতি আর আবেদন যে কত বিচিত্রগামী এসব তারই নজির।

* * * *

এমার্সনের একটি উক্তি : 'Each age, it is found, must write its own books, or rather, each generation for the next succeeding. The books of an older period will not fit this.'

অত্যন্ত সীমিত শক্তি আর সীমিত প্রস্তুতি নিয়ে আমরা সাধ্যানুসারে আমাদের যুগের কথা বলতে চেয়েছি— শুধু এখানে নয়, অন্যত্রও। এ সবে পরবর্তী প্রজনন নিজেদের মনের কোন খোরাক বা ইতিহাসের কোন উপাদান খুঁজে পাবে কিনা জানি না— না পায় দুঃখ নেই। আমাদের আশা, তাঁরা নিজেরাই ভাষা দেবেন তাঁদের যুগকে। নিশ্চয়ই তা অভিনন্দিত হবে যদি তা হয় সাহিত্য। মনে কোন দুঃখ বা অভিযোগ না রেখে আমরা সরে যাব পর্দার আড়ালে। সাধারণ-অসাধারণ আমাদের সকলেরই এ নিয়তি। নবাগতদেরও একদিন এর মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে— স্রেফ হাতের ফসলটুকু হাতে নিয়েই। ফসলের প্রাচুর্যে তাঁদের অঞ্জলি উপচে পড়ুক।

ডিসেম্বর, ১৯৬৫
সাহিত্যে-নিকেতন
চট্টগ্রাম

আবুল ফজল

www.pathagar.com

## এক

সন তারিখ মনে নেই। বোধ করি তখন বিএ পড়ছি। ছুটিতে বেড়াতে এসেছি নিজের দেশ চাটগাঁয়। এর মধ্যে আমার কিছু কিছু লেখা সওগাতে ছাপা হয়েছে। বন্ধুমণ্ডলী আর গুটি কয়েক সাহিত্যানুরাগী ছাড়া এ খবর অন্য কেউ জানে না। অভিভাবকদের জানার কথা নয়— তাঁরা ছিলেন ভিন্ন জগতের মানুষ।

অবশ্য অভিভাবক মানে আমার বাবা— অন্য কোন ভাই বা চাচা-জেঠা না থাকায় বাবাই ছিলেন একমাত্র অভিভাবক। তিনি ছিলেন আলেম; শুধু তিনি নন, তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার পিতামহও ছিলেন তাই। তাঁরা ইংরেজি বাংলার ধার ধারতেন না। চর্চা করতেন আরবি-ফারসি-উর্দুর— ঐ ছিল তাঁদের পেশা আর ছিল মনের খোরাক। বাংলা মাতৃভাষা হলেও বাংলা ভাষাকে তাঁরা খুব সুনজরে দেখতেন না। সামান্য ঘরোয়া চিঠিপত্র আর দলিল দস্তাবিজের বাইরে বাংলাকে তাঁরা হয়তো যোগ্যই মনে করতেন না চর্চার। বলা বাহুল্য, সে যুগের অধিকাংশ মুসলিম পরিবারের এ ছিল আবহাওয়া ও পরিবেশ আর ভাষার ব্যাপারে এ ছিল তাঁদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

আমি বাংলা লিখতে শুরু করি ছাত্রাবস্থায়— ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশ থেকেই কিন্তু অত্যন্ত গোপনে। যাতে জানাজানি না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে আমি কসুর করি নি। তবুও একবার অঘটন ঘটে গেল। তখন কি একটা লেখা আমার সওগাতে বের হওয়ার পর বাবার পরিচিত স্থানীয় হাইস্কুলের জনৈক শিক্ষক লেখাটি পড়ে খুব খুশি হন, খুশির চোটে, হয়তো শুনে বাবাও খুশি হবেন মনে করে, তিনি খবরটি বাবাকেও জানান। কিন্তু ফল হল হিতে বিপরীত। শুনে বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। হয়তো মনে করলেন এবার গোমরাহির আর এক নতুন পথে বাড়াচ্ছি আমি পা। আরবি-ফার্সি বিদ্যায় আমার অনাগ্রহ ও অনগ্রসরতায় বাবা এর মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং এ কারণে আমার উপর ছিলেন অত্যন্ত নাখোশ। বাপ-দাদার পদাংক অনুসরণ করে আমিও ভালো আলেম হই গোড়া থেকে এ ছিল তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্প। কিন্তু ছাত্র জীবনের শুরু থেকে আমার অনুকূলে এমন সব অপ্রত্যাশিত কার্য কারণের যোগসাজশ ঘটল যে, আমার বিশেষ তদবির ছাড়াই বাবার ইচ্ছা আর সংকল্প সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে গেল। ফলে আমি না হলাম ভালো আলেম, না হলাম পাকাপোক্ত বা চোস্ত ইংরেজি দাঁ।

সম্ভবত তখন বাবার এ সন্দেহ ছিল যে, তাঁর সামনে থেকে দূরে গেলে আমি কখনো পাঁচওয়াক্ত নামাজও নিয়মিত আদায় করি না। এমনকি তাঁর মৃত্যুর দিনও তিনি আমার চিবুকে হাত বুলিয়ে দেখেছিলেন আমি দাড়ি রেখেছি কি-না! এসব কারণে আমার সম্বন্ধে তাঁর মনে বেশ কিছুটা অসন্তোষ যে জমা ছিল তা আমার অজানা ছিল না। ধর্মের ব্যাপারে



www.pathagar.com

পান থেকে চুন খসাও তিনি পছন্দ করতেন না। বাবা তখন চট্টগ্রাম জুমা মসজিদের ইমাম। সারা শহরে ইমাম সাহেব নামে পরিচিত— আপামর জনসাধারণের সামনে সাধুতা ও পরহেজগারির এক উজ্জ্বল প্রতীক। এ হেন ইমাম সাহেবের ছেলে বাংলা মাসিকে বাংলা লেখা ছাপাবে এ শুধু অকল্পনীয় নয়— বাবার কাছে প্রায় ধর্মদ্রোহীতারই কাছাকাছি। উক্ত ভদ্রলোক আমার লেখা সম্বন্ধে খবর দিয়ে চলে যাওয়ার পর দুর্ভাগ্যবশত কি একটা জরুরি ব্যাপারে আমাকে বাবার সামনে যেতে হল। আমাকে দেখেই আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন তিনি। দেখলাম তাঁর গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল। ভিতরের উত্তেজনায় চোখমুখ প্রদীপ্ত। হঠাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে ফেটে পড়লেন—

: তুমি নাকি মাসিকপত্রে কি লিখেছ?

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে, আমি প্রায় হতভম্ব। তাঁর রক্তচক্ষু তখনো আমার মুখের উপর।

অগত্যা কাঁচুমাচু মুখে আমতা আমতা করলাম : না তো।

: এই মাত্র কবির সাহেব বলে গেলেন সওগাত না কি এক মাসিক কাগজে তোমার কি এক বাংলা লেখা ছাপা হয়েছে?

আমি প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মুখ করে বল্লাম : আমার লেখা? কাগজে ছাপা হয়েছে! মাস্টার সাহেব হয়তো ভুল করেছেন। এক এক কথার পর এক একবার ঢোক গিল্লাম।

: তিনি তো পরিষ্কার বলে গেলেন— আপনার ছেলে আবুল ফজলের লেখা। এবার তাঁর গলায় রাগের সঙ্গে বিস্ময়েরও যোগ ঘটল। হঠাৎ আমার বুদ্ধির গোড়ায় যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মুহূর্তে দেখতে পেলাম পলায়নের ফাঁক। ফিরে পেলাম আত্মবিশ্বাস আর মনের জোর। কিছুটা জোর গলায় বল্লাম : আমার নাম তো মোহাম্মদ আবুল ফজল। ও অন্য কোন আবুল ফজল হতে পারে।

উত্তরটা এতই যুক্তিসঙ্গত যে বাবার কাছেও তা অবিশ্বাস্য বা অসমীচীন মনে হলো না।

স্কুল কলেজের খাতায় বইপত্রে মালিক হিসেবে ইংরেজিতে This book belongs to'র পর যে নাম লেখা হয়, লেখা শেখার পর থেকে ইংরেজি বাংলা আরবিতে যে নাম আমি লিখে এসেছি তা হচ্ছে মোহাম্মদ আবুল ফজল। কাজেই শুধু আবুল ফজল নিশ্চয়ই অন্য কোন মানুষ। পিতা নিজেই আমার এ নাম রেখেছেন— রাখার পর আমার জন্মের তারিখের নিচে তাঁর এক কেতাবের শেষ পাতায় এ নামই রেখেছেন টুকে। অতএব অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এভাবে সেদিন বাংলা ভাষায় সাহিত্য করার জন্য অবধারিত শাস্তির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। এর আগে ঢাকার 'প্রাচী' পত্রিকায় আমার যে দু'একটি লেখা ছাপা হয়েছে তাতে আমার নামের আগে মোহাম্মদ ছিল। সৌভাগ্যবশত সে কাগজ বাবা বা বাবার পরিচিত কারো চোখে পড়ে নি কোনদিন। এখন থেকে আমি আর আমার কোন রচনায়, আমার নামের আগে 'মোহাম্মদ' লিখি নি। যদিও সব রকম অফিসিয়াল কাগজপত্রে, সার্টিফিকেটে, পেনশনের বইতে সর্বত্র আজো আমার



www.pathagar.com

নাম মোহাম্মদ যুক্ত হয়েই লেখা হয়। যাই হোক, শুধু আবুল ফজল যে তাঁর পুত্র মোহাম্মদ আবুল ফজল নয়, বাবাকে এটুকু বিশ্বাস করানো সেদিন আমার পক্ষে তেমন কঠিন হয় নি। বলেছি, বাবা সখ করে নাম রেখেছিলেন মোহাম্মদ আবুল ফজল। কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে আমি স্রেফ আবুল ফজল। আদি শব্দটা আমি নিজেই বাদ দিয়েছি। একটা কারণ বলেছি— আমি যে বাংলা লিখি বাবাকে তা জানতে না দেয়া। এছাড়া আমার মনে আরো দুটো কারণ ছিল। এক. আমি 'মোহাম্মদ' শব্দটি নবীর জন্যই খাস রাখতে চাই। দ্বিতীয়ত. আমি সংক্ষিপ্ত নামের পক্ষপাতী। আমি আমার ছেলেমেয়েদের কারো দীর্ঘ নাম রাখি নি এবং যুক্ত করি নি কোন ছেলের নামের আগে মোহাম্মদ। কিন্তু খোদার উপরও খোদকারি করার লোকের অভাব নেই। আমার বড় ছেলের ম্যাট্রিকুলেশন ফরম পূরণের সময় ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নাকি বলেছিলেন— তোমার নামটা বড্ড নেড়া নেড়া দেখায় তাই আমি মোহাম্মদ জুড়ে দিলাম। মুসলমান নামের আগে 'মোহাম্মদ' না থাকাটা বেজায় বেখাপ্পা। এর ফলে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট থেকে আমার বা তার ইচ্ছা ছাড়াই তার নামের সাথে 'মোহাম্মদ' কায়েম হয়ে গেছে। রাগ পড়ে যাওয়ার পর বাবা সেদিন আমাকে শুধু এ উপদেশটুকু দিয়েই রেহাই দিয়েছিলেন : লিখতেই যদি চাও, আরবি-ফারসিতে না পারো, উর্দুতে লিখতে চেষ্টা কর।

বলা বাহুল্য, বহু সদুপদেশের মতো এ উপদেশও আমার জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, এরপর থেকে আমি বরং আরো সতর্ক হয়ে পড়ি। আমার কোন লেখা শুধু যে বাবার চোখে পড়ে নি তা নয়, সে সম্পর্কে কোন খবরও বোধ করি তাঁর কানে কেউ আর তোলার সুযোগ পায়নি কোনদিন। কারণ, লেখা সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে আর কোন অভিযোগ আমাকে শুনতে হয় নি। আমার লেখা বই আকারে বের হওয়ার বহু আগেই তিনি এন্তেকাল করেছেন।

## দুই

এক রকম গোঁড়ামির মধ্যেই আমার জন্ম এবং শৈশবও কেটেছে সে পরিবেশে। অবশ্য এ গোঁড়ামি ছিল একান্তভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে তথা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত। অন্য সব ব্যাপারে আমাদের পারিবারিক দৃষ্টিভংগি ছিল উদার ও দেশমুখীন। বাবা সব সময় দেশী কাপড় পরতেন। মাও তাই, আমাদেরও ছোটকালে পরতে দিতেন জোলার তৈরি মোটা কাপড়। সাধারণত গায়ের আলোয়ানটা গাব-সিদ্ধ গরম জলে বাবা নিজেই ডুবিয়ে নিতেন— এতে কাপড়টায় যে একরকম রং ধরত শুধু তা নয়, কাপড়টা নাকি মজবুতও হত। পরিচিত ও প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে বাবার আন্তরিকতা ও সম্প্রীতির কথা আজো দেশের বুড়োদের মুখে শোনা যায়। ছোটকালে দেশের বাড়িতে আমরা মাটির বাসনেই খেতাম— ভাত তরকারির পেয়ালাও ছিল মাটির। ব্যবহারের আগে বিছালির ধুঁয়া দিয়ে ঐগুলোকে বেশ কালো চকচকে করে নেয়া হত। ভাতের সঙ্গে সঙ্গে বাসনেরও একটা আলাদা স্বাদ ও গন্ধ যেন পেতাম।

কিন্তু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের গোঁড়ামি ও তার বাড়াবাড়ি শৈশব থেকেই আমার মনে


www.pathagar.com

একটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল। এ প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত সহজাত ও স্বাভাবিক। বাইরে থেকে ধার করা বা কারো প্রভাবের ফল নয়। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের উদার জীবন-দর্শনের যেটুকু প্রভাব আমার উপর পড়েছিল তা আরো পরের ঘটনা। কিন্তু তার অনেক আগে থেকে যখন আমি চাটগাঁর বাইরে পা দিই নি, তখন থেকেই সব রকম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ যেন আমার ভিতর ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। যার প্রথম অগ্ন্যুদ্গার আমার 'চৌচির' নামক উপন্যাস, যা আমার প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য ও দীর্ঘতর রচনা। সমসাময়িক গল্প প্রবন্ধেও এ প্রতিবাদের নজির সুস্পষ্ট। তখন সওগাতই ছিল আমাদের একমাত্র বাহন ও মুখপত্র। কাজেই চৌচির এবং এ ধরনের আমার সব গল্প সেদিনের সওগাতেই হয়েছিল ছাপা।

শহরে আসার পর আমাকে প্রথমে বাবার বাসার কাছাকাছি নন্দন কাননে এক হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। আজ হাই বা প্রাইমারি কোন স্কুলই সেখানে নেই। সমস্ত জায়গাটা ঘন বসতিতে ভরে উঠেছে। বোধ করি মাদ্রাসা সেসন শুরু হতে দেরি ছিল বলেই নেহাত সাময়িকভাবে আমাকে ওখানে ভর্তি করানো হয়। কারণ, মাস কয়েক পরেই আমাকে ঐ স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হয় মাদ্রাসায়..... চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসায়। নর্মাল স্কুল তথা বর্তমান জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, কাজেম আলী হাই স্কুল, সামান্য দূরে দারুল উলুম মাদ্রাসা, দক্ষিণ দিকে খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়-এর মাঝখানে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে মাদ্রাসাটির অবস্থান। পূর্ব আর দক্ষিণ দিকে তাকালেই দেখা যায় কর্ণফুলি এঁকে বেঁকে তর তর করে বয়ে চলেছে। পশ্চিম আর উত্তর দিকে যতদূর নজর যায় শুধু দেখা যায় পাহাড়ের পর পাহাড় যা সবুজে সবুজে একাকার হয়ে দূর আকাশের সঙ্গে গেছে মিশে। প্রকৃতির এ ঐশ্বর্যের স্মৃতি আমি কখনো ভুলতে পারি নি। বহুকাল পরে লেখা আমার 'রাঙ্গাপ্রভাত' নামক উপন্যাসে এ প্রকৃতি কি ভাবে ছায়া ফেলেছে তা কৌতূহলী পাঠকের নজর এড়াবার কথা নয়। সূচনায় পাঠশালায় অ, আ-র সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় ঘটলেও আমার নিয়মিত ও ধারাবাহিক লেখাপড়া শুরু হয় মাদ্রাসায়। শুরু হয়েছিল সাবেকি মাদ্রাসায় কিন্তু বছর পার না হতেই এক সরকারি নির্দেশে আমাদের এত যুগের সাবেকী মাদ্রাসা রাতারাতি খোল বদলিয়ে হয়ে গেল নিউ স্কীম মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসারই বর্তমান নাম চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। পাঠ্যতালিকায় ঘটল আমূল পরিবর্তন— ফার্সী সম্পূর্ণ বাদ পড়লো, শরিয়াৎ বা দীনিয়াৎ অংশও হলো ছাঁটাই। সে জায়গায় আসন পেলো কিছু কিছু ইংরেজি, বাংলা, অংক আর হাল আমলের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের ছিটে ফোঁটা, অর্থাৎ মাদ্রাসার সাবেকী পাঠ্যতালিকার সঙ্গে এ যুগের হাই স্কুলের পাঠ্যতালিকার একটা আপোষরফা করে উদ্ভাবিত হলো নতুন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসা শিক্ষার বহুকালের পর্দাটাকে একটুখানি ফাঁক করে তাতে আধুনিক শিক্ষার কিছুটা আলো-হাওয়া ঢোকার পথ করে দেয়াই ছিল এ নতুন শিক্ষা রীতির উদ্দেশ্য। সাবেক মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের এ যাবৎ কোন সম্পর্কই ছিল না। এমনকি আরবি-ফারসি আধুনিক রূপ বা সাহিত্যের সঙ্গেও ছিল না কোন যোগাযোগ। তাই তখনকার মুসলিম শিক্ষাবিদ ও সরকার চেয়েছিল মাদ্রাসা শিক্ষার



www.pathagar.com

কাঠামোটাকে একেবারে ভেঙ্গে না ফেলে তার অচলায়তনে কিছুটা সচলতা সঞ্চার করতে এবং তা করার জন্যেই ইংরেজি, বাংলার আমদানি। তখন ঢাকা মাদ্রাসার (বর্তমান ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ) অধ্যক্ষ ছিলেন শামসুল উলেমা আবু নছর ওয়াহিদ সাহেব (অবসর গ্রহণের পর তিনি একবার অবিভক্ত আসামের শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন স্বল্পকালের জন্যে)। এ স্কিম প্রবর্তনের আগে সরকার তাঁকে মিসর তথা কায়রো পাঠিয়েছিলেন— আরবি ভাষার বর্তমান রূপ ও তার পঠনপাঠন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে আসার জন্য। তিনি ফিরে এসে যে স্কিম দেন— তারই নাম নিউ স্কিম এবং সরকার তা যে শুধু অগৌণে অনুমোদন করে নিলেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম দুই সরকারি মাদ্রাসাকে নিউ স্কিমে রূপান্তরিত করতেও কিছু মাত্র দেরি করলেন না। খুব সম্ভব এ করা হয় ১৯১৩ কি ১৪ ইংরেজিতে। আমি যে ইংরেজি-বাংলার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি তা এ রদবদলেরই ফলশ্রুতি।

বাবা প্রথমে গোঁ ধরেছিলেন আমাকে স্কিম ছাড়িয়ে সাবেকি মাদ্রাসায় নিয়ে যেতে। কিন্তু আমার কয়েকজন শিক্ষক এবং হিতৈষী বাবাকে বুঝালেন— আজকাল কিছু ইংরেজি-বাংলা না জানলে একটা চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখা যায় না, যায় না একটা টেলিগ্রাম কি মানি অর্ডার করাও। আগে ওকে হাই মাদ্রাসাটা পাস করতে দিন, পরে গিয়ে সাবেকি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে সহজেই উলাটা পাস করে নিতে পারবে। দু'দিকের পাস থাকলে চাকরি পাওয়াও হবে সহজ। ইংরেজের আমলে ইংরেজিটা না জানলে কোন দিকে পা বাড়ানোই যায় না।

বাবা কি ভাবলেন জানি না। মুখে কিছুই বল্লেন না, চুপ করে রইলেন। বুঝলাম, তাঁর চুপ থাকাটাই আমার জন্যে সম্মতি। এভাবে তাঁর নিমরাজির ফলে আমার নিউ স্কিমে থেকে যাওয়া সম্ভব হলো।

প্রাইমারি স্কুলে তখনকার দিনের ইংরেজি প্রথম ভাগ King's Primer আমার পড়া ছিল। ফলে A B C D-টা জানতাম। মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে একটাও বার্ষিক পরীক্ষা না দিতেই পাঠ্যতালিকার চেহারা গেল পাল্টে; হলো নতুন স্কিম চালু। তখন আমি ছিলাম ইংরেজি হিসেবে ক্লাস টু বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে। নিউ স্কিমে কাকে কোন ক্লাসে দেয়া হবে তার মাপকাঠি ঠিক হলো A B C D-র বিদ্যা অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা A B C D জানে আর পড়তে পারে তাদেরকে সরাসরি তুলে দেয়া হলো ক্লাস থ্রি বা তৃতীয় শ্রেণীতে। বাদ বাকি রয়ে গেল ক্লাস টুতে। কেউ কেউ অবশ্য এ মাদ্রাসা ছেড়ে অন্য সাবেকি মাদ্রাসায় গিয়ে কেঁচে গন্ডূষ যে না করলেন তা নয়। তখন আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন শামসুল উলেমা কামালউদ্দীন সাহেব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ আর উদার প্রকৃতির মানুষ। তাঁর চেহারা ও চাল-চলনে ছিল একটা আভিজাত্য ও বিশিষ্টতার ছাপ— প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাওলানা জুলফুকর আলীর ছেলে আর স্বনামখ্যাত নবাব আবদুল লতিফের জামাতা। নতুন স্কিম চালু হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যে সরকার তাকেও বিলাত পাঠিয়ে দিলেন— বোধ করি সেখানে আরবি ইত্যাদি প্রাচ্য ভাষাগুলি কিভাবে পড়ানো হয় তা দেখে আসার জন্য। যতদূর মনে পড়ে তিনি যখন যাত্রা করেন তখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু তাতেও তিনি দমেন নি— হিতৈষী ও আত্মীয়দের সব রকম বাধা অগ্রাহ্য


www.pathagar.com

করে সে দুর্যোগের সময় পাড়ি দিয়েছিলেন ইউরোপের পথে। বলা বাহুল্য, তখন ইউরোপ যাতায়াতের একমাত্র উপায় জলপথ। আর সেদিন সে পথ জার্মান টর্পেডোর উপদ্রবে নিরাপদ ছিল না মোটেও।

কামালউদ্দীন সাহেব ছিলেন আরবির লোক— সাবেক মাদ্রাসা পাস আর আরবির এম.এ। কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে এসে আরবির ক্লাস কোনদিন নেন নি, নিতেন ইংরেজি কবিতার ক্লাস— কি করে ইংরেজি কবিতা পড়তে হয় মাঝে মাঝে এসে তাই শেখাতেন আমাদের। শুনেছি পরে যখন তিনি চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ হন সেখানেও যে কয়টা ক্লাস নিতেন তাতে ইংরেজি কবিতাই পড়াতেন, যদিও ইংরেজি কবিতার প্রতি সুবিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। চট্টগ্রাম কলেজে তিনিই প্রথম সহশিক্ষা প্রবর্তন করেন। চট্টগ্রামের আদি সংগীত প্রতিষ্ঠান আর্য সংগীত সমিতির তিনিই বোধ করি প্রথম মুসলমান সভাপতি। তিনি নিজেও খুব সংগীত প্রিয় ছিলেন। বিনা দ্বিধায় হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতী পূজায়ও দিতেন মোটা চাঁদা। দিয়ে অবশ্য বলতেন আমার টাকাটা তোমরা খাওয়া দাওয়ায় খরচ করো। এটা অবশ্য তাঁর মনকে নয় সমাজকেই চোখ ঠারানো।

ইসলামে সুদ দেয়া নেয়া হারাম। তাই দীর্ঘকাল এদেশের মুসলমানরা কোন রকম ব্যাংকই করে নি। চট্টগ্রামের ইসলামাবাদ টাউন ব্যাংকই নাকি বাঙালি মুসলমান প্রতিষ্ঠিত প্রথম ও আদি ব্যাংক। সমাজের গোঁড়া অংশের প্রবল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সেদিন যাঁরা এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন তার প্রধানদের অন্যতম ছিলেন শামসুল উলেমা কামালউদ্দীন।

এর অনেক পরের একটি ঘটনা। তিনি তখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর। টাকি গভর্নমেন্ট স্কুলের এক তরুণ শিক্ষক স্থানীয় একটি তরুণী ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াতেন। পড়াতে পড়াতে আর পড়তে পড়তে উভয়ের মধ্যে হয় প্রেমের সঞ্চার— ঐ রকম প্রেম আর প্রেমের খবর পাঠ-কক্ষের সীমায় বেশি দিন আবদ্ধ হয়ে থাকার কথা নয়। টাকি ছোট্ট জায়গা, কথাটা কানাকানি থেকে জানাজানি হয়ে প্রায় হৈ চৈ-এ গিয়ে গড়ায়। হেডমাস্টার চটে আগুন। অমন শিক্ষককে তাঁর স্কুলে তিনি কিছুতেই রাখবেন না। তক্ষুণি উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরাসরি ইন্সপেক্টরের কাছে নালিশ জানালেন। কামালউদ্দীন সাহেব রসিক লোক। নিজেই তদন্ত করতে এলেন সরেজমিনে। সব শুনে রায় দিলেন একজন যুবক আর একজন যুবতী প্রেমে পড়া এদের জন্য মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এতে আমি কোন দোষ দেখি না।

ইন্সপেক্টরের রায় পড়ে হেডমাস্টারের তো চক্ষু চড়ক গাছ। বিদায় হওয়ার সময় কামালউদ্দীন সাহেব নাকি হেডমাস্টারকে বলেছিলেন, 'আপনার উচিত ছিল উভয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দুপক্ষ থেকে দুটা ভালো ভোজ আদায় করা।' বলেই গাড়িতে চেপে বসেন।

এ হেন কামালউদ্দীন সাহেবকেও একবার এক মহিলার হাতে বেশ জব্দ হতে হয়েছিল। তখন তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর। একবার সহকারী ইন্সপেক্টরেসকে সঙ্গে নিয়ে পটিয়া থানার কোন এক দূর গ্রামে এক স্কুল দেখতে এসেছিলেন।


www.pathagar.com

ইন্সপেক্টরেসের নাম বোধ করি মিস তেজোময়ী সরকার। কিন্তু মিস্ শালপ্রাংশু সরকার হলেই মানাতো ভালো তাঁর দৈহিক অবয়বের সঙ্গেও থাকতো সংগতি। এ নিকষ কালো দীর্ঘদেহা ও বিরাটকায়া দেশী খ্রিস্টান মহিলাটিকে দেখলে আমাদেরই রীতিমতো হৃদ্‌কম্প হত।

ঐ অজ পাড়াগাঁয়ে গাড়ি ঘোড়া বা টেক্সি মোটর কোথায় মিলবে? অগত্যা স্কুল কর্তৃপক্ষ একখানি তাঞ্জাম আর একখানি পাল্কি যোগাড় করে। চট্টগ্রামে সাধারণত বর চড়ে তাঞ্জামে আর কনে পাল্কিতে। বর-কনে না হলেও ইন্সপেক্টর আর ইন্সপেক্টরেসের—পুরুষ আর মেয়ে। স্কুল কর্তৃপক্ষ সে ভাবে ইন্সপেক্টরের জন্য তাঞ্জাম আর ইন্সপেক্টরেসের জন্য পাল্কির ব্যবস্থা করেছেন। দূরদর্শিনী মিস্ সরকার দেখেই তা আঁচ করে নিয়েছেন। আর বোধ করি এটুকু আঁচ করতেও বেগ পেতে হয় নি— তাঁর ঐ বিপুল বপু কিছুতেই পাল্কিতে ঢোকানো যাবে না, ঢুকলেও তা যে অভিমন্যুর ব্যূহ হয়ে দাঁড়াবে না তা কে জানে! কামালউদ্দীন সাহেব মজলিসী মানুষ, কাজ সেরে নানান খোশ গল্পে মশগুল। বেরিয়ে দেখেন তাঞ্জামে বিপুল দেহা মিস্ সরকার গেঁট হয়ে বসে আর শূন্য পাল্কি হা করে আছে তাঁর প্রতীক্ষায়। বিলাত ফেরৎ মানুষ মেয়েদের সম্মান আর অগ্রাধিকারের পাঠ শিখে এসেছেন। অগত্যা উপস্থিত-বুদ্ধি খাটিয়ে পারিষদবর্গকে বল্লেন : অনেকক্ষণ বসে থেকে পায়ে খিল ধরে গেছে, চলুন স্টেশন পর্যন্ত হেঁটেই যাওয়া যাক। বলে নিজেই হাঁটা শুরু করলেন সকলের আগে আগে। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে এভাবেই ফাঁড়া কাটালেন তিনি সেদিন।

এ সময় একবার আমরা কয়েকজন তাঁর সদরঘাটের বাসায় বসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। তখন একটা হিন্দু ছেলে এসে তাঁর হাতে একটি চিরকুট দিয়ে বল্লে : মা দিয়েছেন।

ছেলেটাকে—আচ্ছা এসে নিয়ে যেয়ো, বলে বিদায় করে দিলেন। পরে আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন : এর মা-বোন কোথায় বেড়াতে যাবে তাই আমার গাড়িটা চেয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন : দেখ পয়সা দিয়ে যে জিনিস পাওয়া যায় তা চাওয়া আর পয়সা চাওয়া তো একই কথা। পয়সা দিলেই টেক্সি পাওয়া যায়। আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকেরাও পয়সা চাইতে সঙ্কোচ বোধ করে কিন্তু অনেকে এটা ওটার অজুহাতে সাহায্য চাইতে বা টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় এমন জিনিস চাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। আসলে এওতো ভিক্ষা—শব্দের রকমফের মাত্র। সাহায্য আর ভিক্ষায় বেশকম যা তা তো শুধু শব্দগত, অর্থের দিক দিয়ে দুই-ই তো এক। মনে পড়ে তাঁর এ কথাগুলি সেদিন আমার মনে বেশ দাগ কেটেছিল।

চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় আমার অন্যতম সহপাঠি ও অন্তরঙ্গ বন্ধু দিদারুল আলম ছিল তখনকার দিনের সেরা ছাত্র আর কামালউদ্দীন সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়। আমরা যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন অসহযোগ খেলাফৎ আন্দোলনের ভরা জোয়ার। সে জোয়ারে অনেক ছাত্র, বহু মেধাবী ছাত্রও ভেসে গিয়েছিল। তখন দিদারুল পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমিও স্ট্রাইক করেছিলাম— মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আমরা যখন মিছিল করে আন্দরকিল্লার রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি তখন হঠাৎ দেখি আমার


www.pathagar.com

বাবা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। আমি ছুটে পালাবার আগেই আমার পিঠে বসিয়ে দিলেন এক ঘা। তারপর হিড্ হিড্ করে টেনে নিয়ে তুল্লেন তাঁর মসজিদের বারান্দায়— শুরু হলো কিল চাপড়ের শিলাবৃষ্টি। কাজেই পরদিনই আমাকে মাদ্রাসায় ফিরে যেতে হলো। তখনকার পরিভাষায় আমরা সরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাকে বলতাম গোলামখানা। দিদারুল নিজের সংকল্পে এত দৃঢ় ছিল যে, সে আর এ গোলামখানায় ফিরে আসে নি। কামালউদ্দীন সাহেব তাকে সাধাসাধি করে ফিরিয়ে আনার জন্য জনৈক সিনিয়র শিক্ষককে তার বাড়ি পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। তখন বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে— শিক্ষকের অনুরোধ এড়াতে না পেরে দিদারুল দিন কয়েকের জন্য এসে পরীক্ষা দিয়েছিল। দিয়ে সে যে বাড়ি গেল জীবনে আর মাদ্রাসামুখো হয় নি। ফল বের হলে দেখা গেল এবারও সে-ই প্রথম হয়েছে। কিন্তু প্রথম স্থানও তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারে নি। মাদ্রাসা বা স্কুল কলেজের দরজা সে আর মাড়ায় নি। তবে ঘরে বসে তার পড়াশোনার বিরাম ছিল না। সে পড়াশোনা যে কতখানি গভীর ও ব্যাপক ছিল তার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। সে তো অষ্টম শ্রেণী থেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, তাও মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণী। এর অনেককাল পরে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পড়ছি তখন দিদারুল একবার আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল। তখন টিউটোরিয়াল ক্লাসে ইউরোপীয় ইতিহাসের কি একটি বিষয়ে আমাদের প্রবন্ধ লিখতে হোম টাস্ক্ দেয়া হয়েছিল। বাসায় এসে দিদারুলকে বল্লাম— আমার লিখতে ইচ্ছা হচ্ছে না তুমিই Essay-টা লিখে দাও। সে লিখে দিয়েছিল এবং তা সাবমিট করে আমি সেবার টিউটোরিয়াল ক্লাসে বেশ ভালো নম্বরই পেয়েছিলাম। পরবর্তী জীবনে দিদারুল আলম কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে আর মাসিক 'যুগের আলো' ও সাপ্তাহিক 'সম্মিলনী' সম্পাদনা করে বাংলা ও ব্রহ্মদেশে যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছিল। মাসিক ও সাপ্তাহিক সওগাতে তার বহু লেখাই ছাপা হয়েছে। সেসব লেখায় তার শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে স্বয়ং নজরুল ইসলামও মুগ্ধ হয়েছিলেন। দিদারুলের আমন্ত্রণে নজরুল একবার তাদের বাড়ি গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়েও ছিলেন। সে কথা পরে বলব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ না হতেই নেহাত তরুণ বয়সে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে, ১৯২৯ ইংরেজিতে দিদারুল মারা যায়। তার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে তার স্বগ্রাম ফতেয়াবাদে শামসুল ওলেমা কামালউদ্দীন সাহেব উপস্থিত ছিলেন এবং স্মৃতি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। সে অনুষ্ঠানের মুদ্রিত কর্মসূচিতে লেখা ছিল দিদারুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে জেয়ারতের সময় আমিই নেতৃত্ব করব কিন্তু জেয়ারত করতে দাঁড়িয়ে দেখি কামাল উদ্দীন সাহেব আমাকে ডিঙিয়ে সকলের আগে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন— আমার আগেই হাত তুলে শুরু করে দিয়েছেন মুনাজাৎ। তিনি আমার শিক্ষক আর হেড বা প্রধান হিসেবে ছাড়া জীবনে কখনো চাকরি করেন নি,—এ হেন তাঁর সামনে, যে কোন ব্যাপারে তাঁর এক ক্ষুদে ছাত্র গিয়ে নেতৃত্ব করবে, এ বোধ করি তিনি মনে মনেও মেনে নেন নি। আমি কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কারণ, এসব ব্যাপার সব সময় আমার কাছে অস্বস্তিকর। তার উপর জেয়ারতের সব দোয়া দরুদ যে আমার ভালো করে জানা ছিল, তাও নয়। এসব নীরবে পড়তে হয় বলে অনেক সময়ে উপস্থিত ফাঁড়া— যা তা বিড়বিড় করে অবশ্য কাটিয়ে দেয়া যায়।



www.pathagar.com

এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এ অভিনয়ের হাত থেকে যে বেঁচে গেলাম এও তো কম স্বস্তির কথা নয়।

মৃত্যুর বৎসর খানেক আগে দিদারুল একবার কলকাতা গিয়েছিল–উদ্দেশ্য, পরিচিত ও পুরোনো বন্ধুদের আর লেখার ভেতর দিয়ে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাদের একবার দেখে আসা। কামাল উদ্দীন সাহেব তখন কলকাতায়— সম্ভবত তখনো প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর। স্বভাবতই দিদারুল তাঁকেও দেখতে গেল। তখন শীতকাল। কিন্তু দিদারুলের গায়ে ছিল সুতি কোট।

শামসুল ওলেমা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : এমন শীতের দিনে তোমার গায়ে সুতি কোট কেন?

চির সপ্রতিভ দিদারুল চট্ করে উত্তর দিলে : যেহেতু আমার গরম কোট নেই। কলকাতা থেকে ফিরে এসে বাড়ি পৌছতে না পৌছতেই দেখে তার নামে দশ টাকার এক মানি অর্ডার। কুপনে লেখা : শিক্ষকের সামান্য উপহার। প্রত্যাখ্যান করো না। এ টাকা দিয়ে একটা গরম কোট কিনে নিয়ো। তখনকার দশ টাকার মূল্য যে এখনকার শত টাকার সমান তা বোধ করি বলার দরকার করে না।

সাবেকি মাদ্রাসা শিক্ষায় আকস্মিক পরিবর্তন না ঘটলে ইংরেজি-বাংলার যে বাতায়নটুকু আমার মনের সামনে খুলেছিল তা আদৌ খুলত কি-না সন্দেহ। লেখা দূরে থাক, হয়তো ভালো করে বাংলাটা পড়ার সুযোগও জুটত না। নিউ স্কিম মাদ্রাসাগুলোতেও বাংলা যে খুব বেশি পড়ানো হত তা নয়। তবে পাঠ্য ও পড়ানো যাই হোক, এ অজুহাতে অনেকগুলো মাসিক ও সাপ্তাহিক মাদ্রাসায় নেওয়া হত আর কেনা হত লাইব্রেরির জন্য দেদার বাংলা বই। ফলে পত্রপত্রিকা ও বাইরের বই পড়ার একটা সুযোগ সেখানেই আমি পেয়েছিলাম। আর এ সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার আমি করেছি। কি করে জানি না পড়ার ক্ষুধা বিশেষ করে বাংলা বই পড়ার ক্ষুধা আমাকে অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই পেয়ে বসেছিল। অবশ্য যতদিন বাবার সঙ্গে ছিলাম ততদিন বাংলা বই ও মাসিক লুকিয়ে লুকিয়েই পড়তে হত। বাবার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না বলে তিনি আমাকে বেশিদিন তাঁর সঙ্গে রাখতে পারেন নি। তাই পঞ্চম শ্রেণী থেকেই আমার জায়গীরে থাকা শুরু হয়। জায়গীর মানে থাকা-খাওয়া ফ্রি বিনিময়ে গৃহকর্তার দু'একটি বংশধরকে আমপারা বা অ আ পড়ানো। আর হয়তো মাঝে মাঝে হাঁস মুরগিটা জবাই করে দেওয়া। আমাদের ছাত্রাবস্থায় দেশে খাদ্য সংকট এমন তীব্র ছিল না বলে জায়গীর প্রথা ছিল ব্যাপক। বিশেষ করে চট্টগ্রামে— বাইরে একটা ঘর আর অবস্থাটা একটু চলনসই হলেই কোন না কোন ছাত্রকে জায়গীর রাখা হতই। ওটা শুধু যে রেওয়াজ ছিল তা নয়, কেউ কেউ ওটাকে আভিজাত্যের অঙ্গ বলেও মনে করত। জায়গীরে অসুবিধা ও কাজ কর্মের চাপ, কর্তা বা গিন্নিদের ফাই-ফরমাস তো কিছু না কিছু থাকতই— যতই থাক, বাবার কঠোর শাসনের বাইরে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগটা যে পেলাম তা হলো আমার জন্যে মস্ত বড় লাভ। এ সুযোগের মধ্যে ইচ্ছামতো বেড়ানো আর ইচ্ছামতো বাংলা বই পড়তে পারার স্বাধীনতাই ছিল সবচেয়ে বড়।

গোড়া থেকে অর্থাৎ একেবারে নিচের ক্লাস থেকেই আমি যা হাতের কাছে পেতাম তাই পড়তাম। পত্রিকার কি সাপ্তাহিক কি মাসিক এক মলাট থেকে অন্য মলাট পর্যন্ত



www.pathagar.com

কিছুই বাদ যেত না। যেসব পত্রিকা আমি পড়তাম অর্থাৎ পড়ার জন্য হাতের কাছে পেতাম তার প্রিন্টারের নামও আমি জানতাম, তার মানে আমার পড়া প্রিন্টারের নামে গিয়েই থামত। আমার বিশ্বাস এ নির্বিচারে পড়াই সাহিত্যের প্রতি একটা ঝোঁক ও প্রবণতা বাল্যকাল থেকেই আমার মনে জাগিয়ে তুলেছিল। না হয় আমি যে পরিবেশ থেকে এসেছি তাতে সাহিত্যের 'স'ও আমার মধ্যে থাকার কথা নয়।

## তিন

১লা জুলাই ১৯০৩।

এ নাকি আমার জন্মের তারিখ। চাকরিজীবীর পক্ষে মাস পয়লাই সারা মাসের মধ্যে একমাত্র দিন— একমাত্র এ দিনটিতেই জন্মানোর অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা সম্বন্ধে এঁদের একটা সচেতন উপলব্ধি ঘটে। ভবিষ্যত জীবনে আমি যে নির্ঘাত একজন চাকরিজীবী হব— এ দিনে জন্ম যেন তারই পূর্বাভাস। ভাগ্যবিধাতা এভাবে আমার ভাগ্য নিয়ে কারসাজি করেছেন আমি জন্মাবার আগে থেকেই।

স্বাধীনতা আন্দোলনের আবহাওয়ায় আমার কৈশোর ও যৌবন কেটেছে অর্থাৎ অসহযোগ খেলাফতের যুগের ঝড়-ঝাপটা এক রকম আমাদের মাথার উপর দিয়েই গেছে যদিও আমাদের গায়ে তার আঁচড় লাগে নি এতটুকুও। কিন্তু হাওয়াটা ছিল ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে— আর আমাদের বয়সটাও ছিল তার অনুকূল। বলেছি তখন স্কুল কলেজ আর অফিস আদালতকে বলা হতো গোলামখানা আর চাকরিকে গোলামি। চাকরি তথা গোলামি করব না তেমন একটা সংকল্প তখন থেকেই আমার মনে প্রায় দানা বাঁধছিল।

কিন্তু কপালের লেখন কে খণ্ডাতে পারে? জন্মমুহূর্তে ভাগ্যবিধাতা আমার কপালে যে লেখন লিখে দিয়েছেন শত চেষ্টা করেও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই নি। মাস পয়লা জন্মগ্রহণের মধ্যে যে এ অমোঘ ইংগিতটুকু ছিল তার তাৎপর্য যদি তখন বুঝতাম তাহলে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস হয়তো করতাম না।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ঐ শুভ কি অশুভ মাস পয়লা কোন্ কোন্ মহামানব জন্মেছেন জানি না— জানলে এক যাত্রায় কি করে পৃথক ফল ফলে তার একটা তুলনামূলক পরিচয় নেওয়া সম্ভব হত। তবে জানি, ঐ দিন আমার মতো নিম্নমধ্যবিত্তের ঘরে হাজার হাজার শিশুর জন্ম হয়েছে যারা সারাজীবন আমার মতো শুধু যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত রয়ে গেছে তা নয়, রয়ে গেছে সাধারণ ও মাঝারি। আমি যে সাধারণ ও মাঝারি এ নিয়ে আমার মনে কোন দিনই ক্ষোভ বা আফসোস জাগে নি বরং এতে আমি একটা নিরাপদ স্বস্তি বোধ করে থাকি। উপরতলার মানুষের অনেক মাথাব্যথা!

আমাদের দেশে এখন উচ্চ শ্রেণীতে ওঠা বা অসাধারণ হওয়া মানে পাড়াপ্রতিবেশী থেকে দূরে নির্জন স্থানে বা পর্বত চূড়ায় সাধারণ মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে সুপুষ্ট আলসেটিয়ানের নিরাপদ পাহারায় বাস করা। বহু মানুষের কলরবমুখর জমিদার বাড়ির যুগ এখন গত, এখন নির্জন পর্বত চূড়ায় 'বাংলো' তৈয়ারির যুগ— হাতি-ঘোড়ার আমল ইতিহাসে পরিণত, এখন শুরু হয়েছে আলসেটিয়ান-টেরিয়ারের যুগ। দেশের হৃদপিণ্ড



www.pathagar.com

থেকে বিচ্ছিন্ন এ জীবন আমার কাছে রীতিমত ভীতিপ্রদ। নেটিভদের ছোঁয়া বাঁচাবার জন্য পরাধীন যুগে সাহেবরা যা করত এখন স্বাধীনতার যুগে মোসাহেবরা তারই করছে অনুকরণ। এসব অসাধারণরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের পাঠায় সেন্টপ্লেসিড, সেন্টগ্রেগরি বা কনভেন্ট কি হলি ক্রসে— এদের জবান ইংরেজি-বাংলা-উর্দুর এমন এক জগা-খিচুড়ি যে তা দুর্ভিক্ষের দিনের লংগর খানার খিচুড়িকেও হার মানায়। এঁরা আমাদের নতুন এংলো পাকিস্তানি। আশ্চর্য এংলো ইন্ডিয়ানদের ভবিষ্যৎহীন ভবিষ্যৎ দেখেও এঁদের হুঁস হয় না। হয়তো একদিন এঁদের বংশধরেরাই দেবে এঁদের ধিক্কার যখন তারা দেখবে দেশের মাটিতে জন্মেও তারা হয়ে আছে পরগাছা— জাতির বৃহত্তর জীবন থেকে কোণঠাসা।

আমার জন্মের পর পারিবারিক মহলে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আমার তা জানার কথা নয়। তবে এখনকার মতো তখন জীবন সংগ্রাম এত কঠোর ছিল না— নতুন শিশুর আগমনে আর একটা মুখ বাড়ল বলে এখন যেমন মা বাপের মুখের উপর আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার কালো ছায়া পড়ে তখন তা পড়ত না। তখন নবজাতক মাত্রই ছিল আশা ও আনন্দের প্রতীক। আমার জন্মে একটু বাড়তি আনন্দের কারণও ছিল। পিতা-মাতার ঘরে ছেলে হয়ে আমারই প্রথম আগমন এবং পরেও দেখা গেল ছেলে হিসেবে আমি যে শুধু প্রথম তা নয়, আমিই শেষ। আমার আগে পরে যারা এসেছে তারা সবাই মেয়ে। কাজেই আমার জন্মে, মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন যে একটু বেশি খুশি হয়েছিলেন তা বোধ করি সহজেই অনুমান করা যায়।

## চার

চাটগাঁ শহর থেকে দূরে প্রায় বত্রিশ মাইল দক্ষিণে এক অখ্যাত অজ পাড়াগাঁয়ে আমার জন্ম। অখ্যাত হলেও সব গ্রামের মতো আমাদের গ্রামেরও নাম একটি আছে। তবে নামটি কিছুটা বিদঘুটে— কেঁওচিয়া। মোটেও বাংলার মতো শোনায় না। কোন অর্থ হয় কিনা জানি না। তবুও এ হচ্ছে আমি যে গ্রামে জন্মেছি তার নাম। এক সময় দক্ষিণ চট্টগ্রাম আরাকানি মগ রাজাদের অধীন ছিল, হয়তো এ নাম সে ইতিহাসের লুপ্তপ্রায় স্মৃতিরই ভগ্নাংশ। এমন বহু স্মৃতি দক্ষিণ চট্টগ্রামে কক্সবাজার ছাড়িয়ে আরাকান সীমান্ত পর্যন্ত এখনো ছড়িয়ে আছে।

এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মোটামুটি দুটা শ্রেণী দেখা যায়— এক চট্টগ্রামী দ্বিতীয় রোঁয়াই বা রোসাঙ্গ দেশের অধিবাসী। বার্মা-চট্টগ্রাম সীমান্তের পরপারের আরকানকে প্রাচীনকালে রোসাঙ্গ বলা হোত। আলওয়াল ও অন্যান্য পুঁথিকারদের রচনায়ও রোসাঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। রোসাঙ্গ চট্টগ্রামী অপভ্রংশে রোয়াং হয়েছে। আমাদের ছোটকালে দেখেছি আমাদের পাড়া থেকেও অনেক লোক মৌসুমী শ্রমিক হিসেবে বছরে দু'বার— বর্ষা আর হেমন্তে অর্থাৎ ধান রোয়া আর কাটার সময় আরাকান যেত। তারাও আরাকান বলত না বলত রোয়াং। রোসাঙ্গ বা রোয়াং থেকে এসে যারা দক্ষিণ চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছে খাস চট্টগ্রামীরা তাদের বংশধরদের বলত, এখনো হয়তো বলে 'রোঁয়াই'। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে একটি পাড়ার নামই রোঁয়াই পাড়া। দক্ষিণ চট্টগ্রামে


www.pathagar.com

এ রকম রোঁয়াই পাড়া অসংখ্য। সেকালে রোঁয়াই আর চট্টগ্রামীদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানও কম ছিল না। উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিয়ে শাদী ছিল বিরল ঘটনা। কালের প্রভাবে এসব কৃত্রিম ব্যবধান এখন প্রায় মুছে গেছে বল্লেই চলে।

আমাদের থানার নাম সাতকানিয়া। দক্ষিণ সাতকানিয়া থেকে কাক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার লোকদের কথাবার্তায়, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়া ও পোশাক পরিচ্ছদেও রোঁয়াই বা রোসাঙ্গ প্রভাব লক্ষ্যগোচর। আরাকানিদের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্যও নজরে পড়ে।

শঙ্ক নদী পেরিয়ে যতই দক্ষিণ দিকে কাক্সবাজার মুখো এগোনো যায় ততই ভাষায়, কথার টানে আরকানি প্রভাব কানে ঠেকবেই। চট্টগ্রামের মেয়েরা নিম্ন ও উত্তমাঙ্গ ঢাকার জন্য দু'খানা করে কাপড় পরে আর তা'ও রং বেরঙের, আর লুঙ্গি যে এ অঞ্চলের পুরুষদের প্রধান পরিধেয় তাও বোধ করি আরকানী প্রভাবেরই ফল। চট্টগ্রামের মুসলমান মেয়েদের পরনে ধূতি শাড়ি স্থান পেয়েছে খুব বেশি দিনের কথা নয়। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানের অন্তঃপুরে ঘটেছে ধূতি শাড়ির প্রবেশ। তার আগে স্বামীর কাছে মেয়েদের সবচেয়ে সখের বায়না ছিল লাল টকটকে রেঙ্গুনী গামছা। উপরে গায়ে পরতেন তাঁরা বালুছড়ি ওড়না, তাও চোখ ঝলসানো রঙিন। এভাবে সেজে তাঁরা প্রায় হয়ে উঠতেন পরী।

পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলওয়ার পাঞ্জাবি প্রায় উড়ে এসে জুড়ে বসতে চেয়েছিল কিন্তু ঐ পোশাক বাঙালি মেয়ের দেহে কত যে বেমানান তা মেয়ে পুরুষ কারো চোখে পড়তে দেরি লাগে নি। ফলে সেলওয়ার পাঞ্জাবির দৌড় এখন কিশোরী পর্যন্ত এসেই থমকে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য, সেলওয়ার পাঞ্জাবির হোমলেন্ডের যেসব মেয়ে এখন এ দেশে এসে বসবাস করছে তারাও দাদি নানির পোশাক ছেড়ে শাড়িই ধরেছে এবং শাড়ি পরে হয়ে উঠেছে অধিকতর আকর্ষণীয়া। শাড়িতে শ্রীমতিদের শ্রীময়ী করে তোলার এমন একটা যাদু আছে যে শ্বেতাঙ্গিনীরা পরলেও চমৎকার মানায়। শাড়ি-পরা মেম সাহেব তো রীতিমতো দর্শনীয়া। এমন কি হাওয়াই জাহাজের যাত্রী আকর্ষণীয়া হোস্টেসরাও এখন শাড়ি পরে অধিকতর চোখ ভুলানীয়া হচ্ছে। আসলে শাড়ি মেয়েদের করে তোলে রহস্যময়ী। আর কোন্ মেয়েই রহস্যময়ী হতে না চায়?

আমাদের গ্রামের অবস্থান উত্তর সাতকানিয়ায়। আমরা চট্টগ্রামী [illegible] আদি বাসিন্দাদের বংশধর। বংশ হিসেবে এর বেশি দাবী করা বোধ [illegible]। আমাদের পরিবার বিদেশ থেকে এসেছে এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আমার জানা নেই। তাই সেই আভিজাত্যের দাবীও অচল।

তবে আমাদের পাড়ার নাম কাজীর পাড়া। পাড়ার প্রায় সবাই এক গোষ্ঠীভুক্ত। মনে হয় পূর্ব পুরুষদের কেউ একজন হয়তো এক সময় কাজী ছিলেন। সে হিসেবে আমরা সবাই কাজী, অন্তত নামের আগে তা লেখার অধিকারী। ভিন্ পাড়ার লোকেরা মাঝে মাঝে ডাকতোও তাই বলে। কিন্তু আমার পিতা-পিতামহ তাঁদের নামের আগে কাজী লিখে নিজেদের আভিজাত্য বাড়াবার কথা বোধ করি কোনদিন খেয়ালই করেন নি। এ



www.pathagar.com

কারণে আমার নাম থেকেও কাজী ফসকে গেছে। এমনকি স্কুলে ভর্তি করার সময়ও হিতৈষীরা এটুকু দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নি, তাই আমি আর আমার বংশধরেরা চিরকালের মতো একটি পদবীর আভিজাত্য আর তার সঙ্গে যুক্ত কৌলিন্য থেকে বঞ্চিত হলাম। ফলে বাংলা সাহিত্যের কাজী তালিকা থেকেও আমার নাম পড়ল বাদ। কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী ইমদাদুল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আকরাম হোসেন ইত্যাদি কাজী নক্ষত্রমণ্ডলীতে আমারই আর স্থানই হল না। আমার এক শিল্পী বন্ধু আছেন তিনিও কাজী আবুল কাসেম। হায়, আমি আর ইহজন্মে কাজী আবুল ফজল হতে পারলাম না!

আমার পিতামহ আর পিতার পীর হওয়ারও যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তাঁরা যে পেশা ও যে যুগের মানুষ তাতে পীর হওয়ার ক্ষেত্রও ছিল প্রশস্ত। লোকের এত ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হয়েও কি জানি কেন তাঁরা পীর হন নি। কেউ মুরিদ হওয়ার আগ্রহ দেখালে বাবাকে দেখেছি রীতিমতো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে। তাঁরা খেটে খেতেন— মসজিদের ইমামতি আর ছেলে পড়ানো ছিল তাঁদের প্রধান পেশা। ফলে আমার পীরজাদা কি শাহজাদা হওয়াও ঘটল না।

বলেছি আমাদের গ্রাম একেবারে অজ পাড়াগাঁ— শহর থেকে বহুযোজন দূরে। আমার ছোটবেলা কেটেছে ঐ পাড়াগাঁয়ে। প্রকৃতির আপন হাতে দেওয়া ঐশ্বর্য ছাড়া ঐখানে দেখার আর কিছুই ছিল না। আজো যে তার বিশেষ ব্যতিক্রম হয়েছে তা নয়। তবে কোন কোন বাড়িতে সাবেকি পান্তা ভাতের বদলে আধুনিক সভ্যতার নিত্যসঙ্গী চা'র চল হয়েছে সকালের নাস্তা আর মেহমানদারীর অঙ্গ হিসেবে। আমরা চা চেখে দেখার সুযোগ পেয়েছি কিছুটা সেয়ানা হয়ে যখন লেখাপড়ার জন্য শহরে এসেছি তখন। প্রথম প্রথম চা খেলে আমাদের মাথা ধরত ভালো ঘুম হত না রাত্রে। এখন চা না খেলে মাথা ধরে, ঘুমেরও হয় ব্যাঘাত। অভ্যাস ও কালের পরিবর্তনের এমনি মহিমা!

ধনী ও অবস্থাপন্ন পরিবার বলতে যা বুঝায় তেমন পরিবার আমাদের গ্রামে একটাও নেই। সবাই গরিব চাষী। যৎ সামান্য চাষের জমি ছাড়া জীবিকার দ্বিতীয় কোন পথ খুঁজতে কাকেও দেখি নি। এমন কি সারা গ্রামে একটা টিনের ঘরও ছিল না। আমার শৈশবে আমাদের বাড়িটা একবার পুড়ে গিয়েছিল— নতুন করে ঘর করার সময় বাবাই প্রথম গ্রামে টিন আমদানি করেন। পাড়ার একমাত্র মসজিদটির তত্ত্বাবধানের ভার বংশানুক্রমে আমাদের উপর। শুনেছি পিতামহই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— সেই থেকে এ ভার তাঁর বংশধরদের উপর এসে পড়েছে। বাবা টিন এনে প্রথমে দিলেন মসজিদে পরে নিজের ঘরে। কাঠের কড়ি বরগার ফ্রেমে গেঁথে মসজিদের টিন লাগিয়েছিলেন বটে কিন্তু নিজের ঘরে তা পারেন নি। নতুন কেনা টিনগুলি বাঁশের চালের উপর বেঁধে দেয়া হয়েছিল। মসজিদ এবং ঘরের এক অংশ মাটির দেওয়াল তুলে দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫১ সনের বন্যায় সে ঘর, মসজিদ ও আমার তৈয়ারি দীর্ঘ দেউড়ি বা বাইর বাড়ি সব ধসে পড়েছিল। মসজিদ আমি বন্যা নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তুলে দিই কিন্তু ভিটায় ঘর তুলি নি অনেক দিন। বড় কারণ, প্রয়োজন ছিল না। সম্প্রতি (১৯৬০-৬১) একটি ছোট্ট মাটির ঘর তোলা হয়েছে— কোন



www.pathagar.com

সময় গিয়ে এক আধ রাত থাকা যাবে এ উদ্দেশ্যে। কাজেই আমি যে ঘরে জন্মেছিলাম সে ঘরের আজ আর কোন চিহ্নই নেই।

আমাদের বাড়িটা ছিল মস্ত বড় এক পুকুর পাড়ে— পুকুরটার পাড়ের উপর জলের ধারেই ছিল আমাদের শোবার ঘরটা। এটা আসলে ছিল নাকি দেউড়ি ঘর— পিতামহ ছিলেন আলেম, ছেলে পড়াতেন আর নিজের পরিবার নিয়ে থাকতেন ওখানে। বাঁটোয়ারার সময় ভাইরা তাঁকে মূল ভিটার কোন অংশ দেয় নি। এভাবে পুকুর পাড়ের দেউড়ি ঘরই হয়ে গেছে তাঁর ও তাঁর বংশধরদের স্থায়ী বাসস্থান।

বর্ষাকালে পুকুরের পানি বাড়তে বাড়তে প্রায় ঘরের বেড়ার কাছে এসে পৌঁছত। অনেক দিন প্রায়ই লাফিয়ে পড়ত ব্যঙের বাচ্চা সোজা আমাদের ভাতের বাসনের উপর। তখন শুরু হত রীতিমতো হৈ চৈ— যে যা হাতের কাছে পেতাম চেলা কাঠ, খড়ম, চটি, লাঠিসোটা তাই নিয়ে শুরু হত ব্যঙ মারার প্রতিযোগিতা। মা হয়তো তাক করে ব্যঙটাকে একটা ধামাচাপা দিয়ে আমাদের সাধের অভিযানকে মাঝপথে খতম করে দিয়ে ফের আমাদের বসিয়ে দিতেন দক্ষিণ হাতের কাজে। অবশ্য তার আগে তিনি আমাদের সকলের বাসন থেকে কিছু কিছু ভাত তুলে ফেলে দিতেন। এটা ছিল নেহাৎ মনকে চোখ ঠারানো। কারণ ব্যঙটা লাফ দিয়ে কার বাসনে কোথায় যে পড়েছিল তা আমরা যেমন লক্ষ্য করি নি, তিনিও তা করেন-নি— তিনি ছিলেন তখন আমাদের পাতে পাতে সালুন বণ্টনে ব্যস্ত।

আমাদের পাড়ার চারদিকে প্রায় খোলা বিল। বর্ষাকালে এসব বিল থাকে প্রায় পানিতে ডোবা। বন্যা হলে তো কথাই নেই। বড় বড় বন্যার সময় আমাদের উঠোনেও এক হাঁটু পানি হতে দেখেছি। সে পানিতে এ বাড়ি ও বাড়ি হেঁটে বেড়ানো ছিল আমাদের এক সখ।

শরৎকালে কিন্তু এ বিলের যা শোভা তা যে শুধু চোখ জুড়িয়ে দেয় তা নয়, মনকেও ভুলিয়ে রাখে। যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু দেখা যায় সবুজ, সবুজ— একেবারে সবুজের মেলা। উপরের আকাশটুকু বাদ দিলে নিচে সবুজ ছাড়া আর যে কোন রং আছে তা বোঝাই যায় না। বর্ষার স্বল্পায়ু রাত্রি তখন ধীরে ধীরে দীর্ঘ হতে থাকে— ঘুমোনো যায় দু'চোখ ভরে। মুসলমান পাড়ায় আজানের আগেই শোনা যায় মোরগের দরাজ গলার আওয়াজ, যাকে আমরা বলি বাঁক। এখন যেমন তখনো আমার অভ্যাস ছিল সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়া। কাজেই মোরগের বাঁকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম যেত ছুটে। তখন কিন্তু বাইরে রীতিমতো আঁধার, তাই জেগে ঘুমোনোর পালা চলত আরো বেশ কিছুক্ষণ। তখন বেড়ার ঘরে জানালা দেওয়াকে মনে করা হত চটি জুতোয় ফিতা লাগানো। তাই বাইরে ফর্সা হয়েছে কি-না দেখার একমাত্র উপায় বেড়ার ফাঁক। সে ফাঁকে আলোর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই উঠে পড়তাম বিছানা ছেড়ে।

উঠেই ছুটে যেতাম পুকুর পাড়ে— সন্ধ্যাবেলা ব্যঙ গেঁথে যেসব বড়শি বসিয়েছি দুচার হাত তফাৎ তফাৎ তাতে মাছ ধরেছে কি-না দেখতে। কখনো কখনো পেয়ে যেতাম দু'চারটা শোল কি বোয়ালের বাচ্চা। তারপর ছুটতাম বিলে সোজা ধানক্ষেতে। তখন


www.pathagar.com

ধানের গোড়ায় গোড়ায় পানি কমতে শুরু করেছে। নির্বংশ হওয়ার আশঙ্কায় মৎস্যকুল হয়েছে দিশেহারা। উপরের জমি থেকে পানি শির শির করে বয়ে চলেছে নিচের জমিতে— ব্যাকুল মাছেরাও সে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিচের দিকে দিয়েছে পাড়ি, বোধ করি প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টায়। আগের দিন বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে, আলের মাঝখানে পানি চলাচলের পথ করে আমরা পাড়ার ছেলের দল বসিয়ে দিয়েছি 'চাই'— বাঁশের শলা আর বেতের সাহায্যে তৈরি সরু-গলা মাছধরার এক রকম ফাঁদ— অভিমন্যুর ব্যূহের মতো এতে ঢোকা যায় কিন্তু বের হওয়া যায় না। এবার ছুটে গিয়েছি সে 'চাই' তুলতে। দেখা যায় বেলে, চিংড়ি, লাটা, পুঁটি ইত্যাদি হরেক রকমের মাছে 'চাই'য়ের তলাটা প্রায় ভর্তি। সবংশে কাঁকড়াও অবশ্য বাদ নেই। মাঝে মাঝে মৎস্যভুক ঢোঁড়া সাপও যে ঢুকে না পড়ে তা নয়। 'চাই'টা এনে উঠোনের উপর উপুড় করে ঢালা হয়। মা-চাচিরা কুড়িয়ে নেন মাছগুলি। দু'চারটে কাঁকড়া রোজই থাকে— তার দু'একটার ঠেঙে সুতো বেঁধে এবার আমরা শুরু করি খেলা— দৌড় লাগাই একটার সঙ্গে আর একটার। এ সময় হঠাৎ মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটতো হলদে পাখির—আমাদের গ্রাম দেশের সবচেয়ে সুন্দর পাখি। দেখলেই আমরা ছেলের দল চেঁচিয়ে উঠতাম— আইজ গরবা আইব, আইজ গরবা আইবো। 'গরবা'— মানে মেহমান। এখন মেহমান দস্তুর মতো আতঙ্কের ব্যাপার, তখন তা ছিল খুশির। প্রায় উৎসবের সামিল। বিশেষ করে ছোটদের কাছে।

কারণ, তখনকার দিনে কোন মেহমানই খালি হাতে আসতেন না আর তাঁদের উপলক্ষ করে নাস্তা তৈরি আর মুরগি জবাই ছিল বাঁধা। মুরগি পালাও হত পাল পরব আর 'গরবার' জন্যই। হঠাৎ কোন কোন দিন সকাল বেলায় দেখতাম কোথা থেকে এক জোড়া হলদে পাখি এসে বসে পড়েছে পুকুর পাড়ের আম কি কাঁঠাল গাছে অথবা আমাদের উঠোনের সেজনা গাছের ডালে। ছোট কালে আমাদের মনে এ এক অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল যে হলদে পাখি হচ্ছে মেহমানের অগ্রদূত। এ বিষয় মেয়েদের বিশ্বাস আমাদের চেয়েও শক্ত। হলদে পাখি দেখলেই আমরা ভিতরে ছুটে গিয়ে মাকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে আসতাম। আর তখন থেকে উৎসুক চোখে পথের দিকে চেয়ে থাকতাম বাতাসা বা পিঠার পাতিল হাতে কখন দেখা দেবেন মহামান্য মেহমান সাহেব তারি প্রতীক্ষায়। সত্য সত্যই কোন কোন দিন নির্ঘাত এসে যেতেন কেউ না কেউ। তখন আমাদের খুশি দেখে কে! মেয়েদের বাপের বাড়ি কি আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার— যাকে গ্রাম দেশে বলা হয় 'নায়র' তারও মৌসুম এটা। চাষবাসের কাজ সেরে কৃষকদের যেমন জুটেছে এখন অফুরন্ত অবসর তেমনি মেয়েরাও কাজের চাপ থেকে পেয়েছে রেহাই— দেহের সঙ্গে মনও হয়েছে হাল্‌কা। তাই এ সময় তাঁরা যান 'নায়র' করতে। চাষী পরিবারে পাল্কির রেওয়াজ নেই। দূরত্ব অনুসারে শেষ রাত্রে স্বামী বা দেবরকে সঙ্গে নিয়ে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে তাঁরা হেঁটেই রওয়ানা হন। ভোর হতে হতেই কর্দমাক্ত পায়ে বাপের বাড়ির দুয়ারে এসে পৌঁছেন। পাশের বাড়িতে নায়রী এলেও আমাদের খুশির অন্ত থাকতো না। কারণ, 'নায়রী'ও খালি হাতে আসতেন না। আর যে বাড়িতেই আসুন তাঁর আনা নাস্তা বিলান হত আশে পাশের সব ঘরেই।



www.pathagar.com

ঋতু পরিবর্তনটা শহরে তেমন নজরে পড়ে না কিন্তু গ্রাম দেশে তা ভুলে থাকা সম্ভব নয়— ছেলে-বুড়ো সবাই প্রকৃতির পরিবর্তনটা বুঝতে পারে। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক নিবিড়। হেমন্তে আকাশ নির্মেঘ– আবহাওয়া এবং পথ-ঘাট শুকনো। বিলময় সোনালি ধান। দিনের বেলা ধান কাটার ধুম। সন্ধ্যার পর চলে মাড়াইয়ের কাজ। সকালে উড়ানোর পালা। এ সময় দেখা দেয় মুড়ি-মোলার ফেরিওয়ালা, পান-সুপারি বিক্রেতা, শুটকিওয়ালী ডুমনি, কাচ-চুড়িওয়ালা ইত্যাদি। কাজ করতে করতেই মেয়েরা তখন হয়ে উঠে মুখর। চোখে মুখে দেখা দেয় হাসির ঝিলিক। ধান দিয়ে কেনে এটা ওটা।

## পাঁচ

বাবারা তিন ভাই। বাবা সকলের বড়। মেজ জন তেমন লেখাপড়া করেন নি— চাষবাস দেখাশোনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের বাড়ি থেকে চাষবাসের পাট উঠে গেছে। আমাদের যা সামান্য ধানী জমি তা বর্গা দেওয়া হয়। আজো সে নিয়ম অব্যাহত। ছোটজনকে বাবা শহরে নিয়ে এসেছিলেন এবং নিজের কাছে রেখে চেয়েছিলেন লেখাপড়া শেখাতে। হঠাৎ তাঁর কি দুর্বুদ্ধি হলো নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন একদিন। পরে খবর পাওয়া গেল তিনি বার্মা চলে গেছেন পালিয়ে। এ ঘটনা আমার এত ছোটকালে ঘটেছে যে, তার কিছুই আমার মনে নেই— এমন কি সে চাচার চেহারাও আমি আনতে পারি না মনে।

বড় হওয়ার পর তাঁর কথা শুনে বহুবারই মনে এ দুরাশা জেগেছে যে, হয়তো তিনি একদিন লাল হয়েই ফিরবেন আর রাতারাতি আমাদের অবস্থা যাবে পাল্টে। কিন্তু জীবনে তিনি আর ফেরেন নি। মাঝে মাঝে দেখেছি রেঙ্গুনফেরতা কেউ কেউ এসে বাবার কাছে দাবী জানাতো— আপনার ভাই আমিনউদ্দীন আমার কাছ থেকে এত টাকা ধার নিয়েছিল শোধ দেয় নি। সত্যি বা কাল্পনিক নিরুদ্দেশ ভাইয়ের এমন বহু ঋণ বাবাকে শোধ করতে দেখেছি।

তখনকার দিনে বার্মা যারা যেত তারা সত্যি সত্যিই 'লাল' হয়ে ফিরত। অনেকে ফিরতই না। পথে ঘাটে সুন্দরী ললনা আর অপর্যাপ্ত ধন— রেঙ্গুন বা বার্মা সম্বন্ধে এ ছিল তখনকার দিনের মানুষের সাধারণ বিশ্বাস। ওখানে যারা একবার গিয়ে পড়ত এ দু'য়ের আকর্ষণ তাদের অনেকেই কাটাতে পারত না চিরটা জীবন। যারা ফিরে আসত তাদের হালচাল এমনি বদলে যেত যে, দেখলেই চেনা যেত এরা রেঙ্গুন ফেরতা। রেশমি লুঙ্গি পরে, লুঙ্গির ভিতর সার্টের প্রান্তটা ঢুকিয়ে দিয়ে কোমরে পকেটওয়ালা চৌড়া বেল্ট এঁটে বেশ ছিমছাম হয়ে মাথায় রেশমি রুমাল জড়িয়ে ঠোঁটে মোটা বর্মা চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে ঘুরে বেড়ানো এসব মূর্তি সেকালে চাটগাঁর কোন গ্রামেই দুদৃশ্য ছিল না। কেউ কেউ সোজা বর্মা-বৌ নিয়েও ফিরত। চট্টগ্রামে তেমন বৌয়ের সন্তান আজো বিরল নয়। তখনো বার্মাবাসীদের মনে জাতীয়তাবোধ বা সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগে নি। মানুষ— স্রেফ মানুষ, দেশ ধর্ম বর্ণ যাই হোক। এ ছিল সে যুগের বার্মার দৃষ্টিভংগি। বিশেষ করে মেয়েদের তো ওসবের কোন বালাই ছিলই না। পুরুষগুলি ছিল এক একটা নিষ্কর্মার ঢেঁকি। এ কারণে বার্মা হতে পেরেছিল সব জাতের ও সব প্রদেশের ভারতীয়দের


www.pathagar.com

স্বর্গভূমি। দেশগত বা জাতিগত কোন স্বতন্ত্র চেতনার গোঁড়ামির শিকার তারা তখনো হয় নি বলে বার্মা-রমণীদের মনে নারীত্বের সহজ ও স্বাভাবিক আকর্ষণ ছাড়া অন্য কোন রকম সংস্কারের বন্ধনও ছিল না। যাকে একবার মনে ধরেছে, লেগেছে চোখে ভালো, তাকে ওদের অদেয় কিছুই নেই— তার সঙ্গে জাহান্নামে যেতেও ওরা রাজি। গ্রাম দেশে, 'কালা' স্বামীর সঙ্গে চলে আসা এমন একাধিক বার্মা-রমণীকে আমি এ জাহান্নামের জীবন যাপন করতে দেখেছি। আমার এক বোনের জাও ছিল তেমন এক বার্মা-রমণী। সর্বতোভাবে বিরুদ্ধ পরিবেশ, এখানকার ভাষার এক বর্ণও নেই জানা, চালচলন, খাওয়া-পরা, পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও পরিবেশ সবই আলাদা— পদে পদে অপরিচয়ের সহস্র বাধা। এমন মর্মান্তিক জীবন কি করে যে এরা পরম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত সে রহস্য আজো আমার অজ্ঞাত। দেখেছি অনেকের নিখুঁত গৌরবর্ণ দুদিনেই তামাটে হয়ে গেছে, নিটোল স্বাস্থ্য ভেঙ্গে দেখা দিয়েছে অকাল প্রৌঢ়ত্বের বলিরেখা। আশ্চর্য তবুও এদের নিষ্ঠায় ভাঙ্গন ধরে নি এতটুকু।

আমার ছোটবেলা বেশ কিছুটা বেপরোয়াভাবেই কেটেছে। বিশেষত যতদিন গ্রামে ছিলাম জীবনটা ছিল রীতিমতো উদ্দাম। বাবা থাকতেন শহরে। মা, একটি বড় আর দু'টি ছোট বোন আর আমি— এ ছিল আমাদের সংসার। আমিই একমাত্র বেটা ছেলে অর্থাৎ আমার মুরুব্বি আমিই। শাসন করার কেউ ছিল না বলে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম। ঘরটাই পুকুর পাড়ে, গরমের দিনে সারাদিন ঐ পুকুরেই পড়ে থাকতাম, এপার-ওপার সাঁতার দিয়ে কাটিয়ে দিতাম দিনের বেলাটা। মা শত ডাক হাঁক দিয়েও তুলতে পারতেন না পুকুর থেকে। চাষাবাদ ছিল না বলে গরু ছাগলেরও বালাই ছিল না। তবুও সমবয়সীরা যখন গরু চরাতে মাঠে যেত আমিও তাদের সঙ্গে গিয়ে জুটতাম আর সারা বিকেলটা ওদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলে ওদের মতই সারা শরীরটা কর্দমাক্ত করে সন্ধ্যায় ফিরতাম ঘরে। তখন আমাদের দেশে বলি বা কুস্তিখেলা ছিল গ্রাম্য উৎসবের এক অপরিহার্য অঙ্গ— চৈত্র-বৈশাখ এলেই গ্রামে গ্রামে পড়ে যেত এর সাড়া। আজো চট্টগ্রামের জন-জীবন থেকে কুস্তিখেলা নিশ্চিহ্ন হয় নি। তবে এখন কুস্তির চেয়ে মেলাটাই হয়ে উঠেছে বড়। ছোটকালে সমবয়সীদের সঙ্গে জুটে সাত আট মাইল দূরের বলিখেলায়ও চলে যেতাম। একটু বড় হয়ে ওঠার পর দূর দূর গ্রামেও চলে যেতাম যাত্রা কি কবির গান শুনতে। সারা রাত বিনিদ্র কাটিয়ে চোখ দুটা প্রায় জবাফুল করে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন বেলা উঠে গেছে। মা বকবেন কি, ফিরে যে এসেছি এতেই যেন তিনি হাতে আসমান পেয়ে যেতেন। চাঁদনি রাতে ছেলেরা 'বদর' দিয়ে উঠলে কিছুতেই ঘরে স্থির থাকতে পারতাম না, ছুটে এসে দলে ভিড়ে পড়তাম। অনেক রাত পর্যন্ত দাড়িয়াবাঁধা কি হা ডুডু খেলে আপাদমস্তক প্রায় ধূলিধূসরিত হয়ে ঘরে ফিরে এসে নীরবে মায়ের পাশে শুয়ে পড়তাম। মা হয়তো জেগে ঘুমোতেন।

লেখাপড়ার কোন চাপ ছিল না, ছিল না কোন তাগাদা। একটি মাত্র ছেলে. বেঁচে যে আছি এতেই মা খুশি। না বাঁচার যথেষ্ট আশঙ্কা যে দেখা দেয় নি তা নয়।

এ সময়— আমার বয়স যখন সাত কি আট। আমাদের সামনাসামনি পাঁচ বাড়িতে একই সময় শুরু হয় কলেরা। ভীষণ কলেরা। মা ছাড়া আমাদের পাঁচ বাড়িতে মেয়ে


www.pathagar.com

পুরুষ কেউই অনাক্রান্ত ছিল না। ঔষধ-পথ্য খাওয়ানো থেকে এসব রোগীর সব কিছুই মাকে একা সামলাতে হত। তখন এ রোগের কোন প্রতিষেধক অন্তত গ্রাম দেশে এসে পৌঁছে নি। গ্রামের ধারে কাছে কোন ডাক্তারও ছিল না। দেখতাম মাঝে মাঝে একজন কবিরাজ এসে কি ঔষধ যেন দিয়ে যেতেন। রোজই আমাদের ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেতাম এ ঘর কি ও ঘর থেকে এক একটা লাশ বের করে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে বুক দুরু দুরু করে উঠত। পাড়া-প্রতিবেশীদের আনা-গোনা আর আমাদের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে হাঁটা প্রায় বন্ধ। সর্বত্র একটা আতঙ্ক আর মৃত্যুর বিভীষিকা। এ দুঃসময়ে আমার বড় ফুফা মনসুর আলী চৌধুরী যে অসম সাহস আর বিরল আত্মীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তার কোন তুলনা হয় না। তিনি উঠোনের মাঝখানে একটা তক্তপোষ পেতে নিয়েছিলেন। সুযোগ পেলে তাতেই একবার গড়িয়ে নিতেন। বাকি রাত কাটাতেন চারদিকে পায়চারি করে আর থেকে থেকে আজান দিয়ে। কোন ঘর থেকে হঠাৎ কাৎরানী ভেসে এলে সেদিকে যেতেন ছুটে। কেউ মারা গেলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকজন ডেকে এনে ব্যবস্থা করতেন দাফনের।

হঠাৎ আমার আর আমার বড় বোনেরও শুরু হয়ে গেল কলেরা। বলা বাহুল্য, তখনো বোনের বিয়ে হয় নি। ছোট— আমার থেকে বছর দু'য়েকের বড়। মা ছিলেন নিরীহ ও গোবেচারি মানুষ, ছিলেন দেহ ও মনে অত্যন্ত নরম। আমাদেরও কোনদিন ধমক দিয়ে কথা বলেন নি। মোটেও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন না, কষ্ট কোনদিন করেন নি, করার দরকারও পড়ে নি। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, আলেমের ঘরের বৌ— হালচাষ নেই, চাকর-বাকর কিংবা আত্মীয়-স্বজনের ঝামেলাও ছিল কম। নিজের ছেলেমেয়ে কয়টিকে নিয়ে রেঁধে বেড়ে খেয়ে ঘুমিয়ে আর হয়তো প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে কিছুটা গাল-গল্প করেই সময় কাটত তাঁর। এখন সে দুর্বল মানুষটির উপর এসে পড়েছে এতগুলি কলেরা রোগীর ভার। আমরা নিজেরা রোগাক্রান্ত হওয়ায় এ ভার যে তাঁর পক্ষে কতখানি দুর্বহ হয়ে উঠেছিল তা সহজেই অনুমেয়। বাবা খবর পেয়েছেন কি-না জানি না— খবর দেওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার। দোহাজারী রেল লাইন তখনো হয় নি। শহরে যাতায়াত চলত নৌকায়— একদিকের ভ্রমণেই লাগত দেড় দিন। সে দুর্দিনে মা একা যে অনলস কর্মক্ষমতা, সাহস ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছিলেন তা তাঁর মতো দুর্বল ও কোমলস্বভাবা নারীর পক্ষে অকল্পনীয়। তাঁর সেদিনকার সেবানিরতা আত্মনিবেদিতা চেহারা আজও আমার স্মৃতিতে জীবন্ত।

আমরা তখনো সেরে উঠি নি। একদিন মগরেবের সময় মা পুকুর থেকে অজু করে এসে আমার বিছানার পাশে জায়নামাজ পেতে নমাজ শুরু করেছেন। হয়তো বে-খেয়ালে ভরা বদনাটা রেখেছেন জায়নমাজের পাশে। আমি শুয়ে শুয়ে তা লক্ষ্য করেছি. এ রোগে তীব্র জলতৃষ্ণার কথা সবারই জানা। মা নমাজ শুরু করতেই আমি মরিয়া হয়ে গড়াতে গড়াতে বদনার কাছে পৌঁছে নলে মুখ দিয়ে প্রাণ ভরে জল পান করে অতৃপ্ত পিপাসা কিছুটা মিটিয়ে নিয়েছিলাম সেদিন। মা নমাজ ভাঙ্গেন নি। নিয়ত বাঁধা নমাজটা শেষ করেই বদনাটা অন্য ঘরে সরিয়ে রেখে তিনি ফের নমাজে খাড়া হলেন। আমাদের জন্য ব্যবস্থা ছিল সিদ্ধজল। বদনায় ছিল পুকুরের কাঁচা ময়লা পানি। মা আরো কিছুকাল নমাজ



www.pathagar.com

পড়ে, মনে হল নিয়মের চেয়ে আজ কিছুটা দীর্ঘ সময় দু'হাত তুলে মুনাজাত করলেন। জানি না কি করে সেবার আমরা দু'জনেই বেঁচে গিয়েছিলাম। মার একটা সহজ আত্মবিশ্বাস ও জীবনবোধ ছিল। দেখেছি বড় বড় দুঃখের সময়ও তিনি ভেঙ্গে পড়তেন না, হতেন না তেমন উতলা। এ রোগের আগে কি পরে আজ আর মনে নেই। তখন আমাদের একটা কিষাণ চাকর ছিল। একদিন ভিটার কাছে একটা জমিতে সে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল। আমিও সঙ্গে গেছি, ধারে কাছে আরো ছেলেমেয়ে অনেক। একটা পেয়ারা গাছের চারা দেখতে পেয়ে চাকরকে বল্লাম ওটা আমাকে কোদাল দিয়ে তুলে দিতে। আমি কিন্তু চারাটা আগলে ওখানেই রইলাম বসে। চাকরটি আমাকে না সরিয়ে আমার পেছনে দাঁড়িয়েই পেয়ারার চারা লক্ষ্য করে কোদাল মারল সজোরে। কোদাল এসে পড়ল সোজা আমার ব্রহ্মতালুর উপর। দর দর ধারে ছুটল রক্ত। হৈ চৈ আর কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল চারদিকে। আমি সংজ্ঞাহারা। যখন হুঁশ হল দেখি আমাকে তখনো ভেতরের উঠানেই শুইয়ে রাখা হয়েছে। সারা উঠান রক্তে গেছে ভেসে, আমার সারা শরীরও রক্তে লাল। চোখের জলে মার গণ্ডস্থল যাচ্ছে ভেসে। আশ্চর্য, অন্য মেয়েদের মতো মা চিৎকার করে বিলাপ করছেন না মোটেও। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঘর-বাইর করছেন শুধু, হয়তো খুঁজে ফিরছেন বেন্ডেজ বাঁধার কাপড়। সেদিনই যেন কাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল শহরে বাবাকে খবর দিতে। দিন দুই তিন পরে কি একটা নীল রঙের ঔষধ নিয়ে তিনি এসে পৌছলেন। যতদূর মনে পড়ে ঐ ঔষধটায় ভাল কাজ দিয়েছিল। সেবার মাসখানেক কি আরো কিছু বেশি বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। হয়তো নেহাত আয়ুর জোরেই এ যাত্রাও গেলাম বেঁচে কিন্তু দাগটা এখনো আছে আমার তালুর উপর অক্ষয় হয়ে।

## ছয়

বলেছি আমাদের পাড়াটা গরিবের পাড়া। টিন দূরে থাক শণ কেনার সামর্থও নেই অনেকের। তাই ধান কাটা হয়ে গেলে বিলে বিলে শুরু হয় নাড়া কাটা। এ নাড়া দিয়েই ছাওয়া হয় ঘর বাড়ি। আমার বয়সী ছেলেরাও যায় নাড়া কাটতে, নাড়া না কাটলেও বিলে যেতে আপত্তি কি? ফাঁকে ফাঁকে খেলাও তো কম চলে না। কাজেই অনেক দিন আমিও বিলে গিয়ে জুটি। একদিন কি খেয়াল হলো একটা ছেলের হাত থেকে কাঁচিটা নিয়ে আমিও শুরু করলাম নাড়া কাটতে। বাঁ হাতে গোছাটা ধরে যেই ডান হাতে জোরে কাঁচির পোঁচ দিয়েছি অমনি আমার কড়ে আঙুলের পাশের আঙুলটার নখশুদ্ধ অনেকখানি গেল কেটে, ফলে আজো বাঁ হাতের অনামিকার নখটা বাঁকা হয়ে আছে। নিজেই নিজের মুরুব্বি ছিলাম বলে ছেলেবেলাটা আমি পুরোপুরি ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। যা খুশি আর যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াতাম সারাদিন। পাড়ার পূর্বপ্রান্তেই আমাদের মসজিদটা, তার পাশে চারদিকে বড় বড় শাখা ছড়িয়ে দিয়ে এক বিরাট বটগাছ আজো দাঁড়িয়ে। ওর নিচে খোলা জায়গায় বসে ঈদের জমাৎ— অন্য সময় ছেলেরা করে খেলা। ওখানে কোনদিন হাট বসতে দেখি নি কিন্তু যায়গাটাকে বলা হত হাটখোলা। আমাদের ছোটকালে ওখানে ছোট খাটো বলি খেলা হতেও দেখেছি। ওর লাগোয়া একটি প্রাইমারি


www.pathagar.com

স্কুল ছিল তখন। মনে পড়ে কয়েকদিন ঐ স্কুলে যাতায়াত করেছি। ঐ বোধ করি আমার প্রথম ও আদি স্কুল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবিওয়ালা রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা হাতে ঐ স্কুলে কয়েকদিন যাওয়া-আসা করেছি বটে কিন্তু কিছু যে শিখেছিলাম তা মনে হয় না। যতদূর মনে পড়ে আমি ঐ স্কুলে থাকতেই লর্ড কার্জনের বহু ঘোষিত ও বহু ব্যয়িত দিল্লীর দরবার (১৯১১) উপলক্ষে দেশব্যাপী যে উৎসব হয়েছিল আমাদের অখ্যাত গণ্ড গ্রামেও তার ঢেউ এসে পৌঁছেছিল। আমাদের ঐ স্কুল ঘরটিও সাজানো হয়েছিল রঙিন কাগজ দিয়ে আর আমাদেরও হাতে হাতে বিলি করা হয়েছিল জিলাপি। এর আগে ঘরে একজন মিয়াজী রেখে আমাকে আমপারা পড়াবার চেষ্টা হয়েছিল। বোধ করি লোকটা খুব নিরীহ ছিল। যতদূর মনে পড়ে তাঁকে আমি কোনদিন আমলই দিইনি, তিনিও আমাকে পারতেন না সামলাতে। আমি প্রায়দিন এটা ওটার ছুতা করে রান্না ঘরে এসে চৌকির উপর বসে থাকতাম না হয় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে জুটে চলে যেতাম খেলতে। পরে এক রাতে আমাদের যে দেউড়ি ঘরে মিয়াজী আমাকে পড়াতেন সে দেউড়ি ঘরই গেল পুড়ে। আমার পিতামহী তখনো বেঁচে, শীতকাল এলে তিনি মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যেতেন। শুনেছি এ তাঁরই কীর্তি। কীর্তি যারই হোক ফল হলো একই, দেউড়ির সঙ্গে সঙ্গে মিয়াজীর চাকরি আর আমার পড়া হলো খতম। আবার শুরু হল আমার বেপরোয়া ডানপিটে জীবন।

পাড়ায় না আছে একটা মোল্লা মৌলবী না আছে একটা মিয়াজী, বাড়তি বয়সের ছেলেগুলি যাচ্ছে বয়ে। এরা না পারবে কোরান শরিফটা পড়তে, না জানবে নমাজের নিয়াৎ কি সূরা তার উপর মুরগিটাই বা জবাই করে কে?— এ অবস্থা পাড়ার বুড়োদের বিবেকে রীতিমতো খোঁচা দিতে লাগল। ফলে এবার যৌথভাবে মোতায়েন হলেন এক মিয়াজী। পাড়ার এক বড় দেউড়ি বা দহলিজে তিনি থাকতেন আর তার লম্বা বারান্দায় আমরা পাড়ার প্রায় বিশ পঁচিশ জন ছেলে, তার মধ্যে বয়স্ক, ঢেঙা ঢেঙা ছেলের সংখ্যাও ছিল অনেক দুই সারি হয়ে কেউ আমপারা, কেউ কোরান শরিফ, কেউ কায়দায় বোগদাদি চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে পড়তাম। বলা বাহুল্য, আকাশ ফাটানোটাই বেশি হত। এ মিয়াজীর মতো কড়া শিক্ষক আমি জীবনে দেখি নি। এঁকে আমরা আজরাইলের চেয়েও বেশি ভয় করতাম। কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্য। কারণ আজরাইলের ভয়ে আমাদের কারো পরনের কাপড় কোনদিন ভিজবে তেমন আশঙ্কা আমার নেই। কিন্তু এ মিয়াজীর ডরে আমাদের অনেকেরই প্রায়দিন পরনের কাপড় ভিজে যেত। তাঁর কাছে পড়তে যাওয়ার সময় শীত গ্রীষ্ম কি বর্ষা সব সময় আমি এবং আরো অনেকে একটা মোটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে নিতাম। এতে তাঁর হাতের বেতের বাড়িটা যে শুধু কিছুটা সহনীয় হত তা নয় নিচের ভিজা লুঙ্গিটাও পড়ত ঢাকা। ঐভাবে সর্বাঙ্গ ঢেকে দুর্গন্ধ ভিজা কাপড়ে ছুটি পর্যন্ত বসে থাকা যে কি রকম নরকযন্ত্রণা তা আজকের 'ছাত্র শিক্ষক বন্ধুত্বের যুগে' কেউ বোধ করি কল্পনাই করতে পারবে না।

এ মিয়াজীর এক মোক্ষম শাস্তি ছিল— ছাত্রের দু'হাত বেঁধে বাসা শুদ্ধ লাল খড়া পিঁপড়া লাগিয়ে দেওয়া। অপরাধের মাত্রা অনুসারে কারো কারো দুই পাও দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। মানুষ এ দুনিয়ায় আসে, হাত আর পা আত্মরক্ষার এ দুটো মাত্র সহজাত হাতিয়ার নিয়ে— মিয়াজী সে দুটাকেই আগে অকেজো করে দিয়ে তবে শাস্তির ব্যবস্থা


www.pathagar.com

করতেন। এ মিয়াজীর কিছুটা চিত্র আমার 'রাঙ্গা প্রভাতে' আঁকা হয়েছে। এ ছাড়াও 'রাঙ্গা প্রভাতে' আমার বাল্যস্মৃতি আরো কয়েক যায়গায় ছায়াপাত করেছে।

পূর্ব বাংলার গ্রাম দেশে শীতকালটা হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার সেরা মৌসুম। এ সময় বড় ছোট সকলের ঘরে কিছু না কিছু খাবার মজুত থাকে। প্রচুর ও নানা জাতের শাকসব্জি আর তরিতরকারির মৌসুমও এটা। পিঠাপুলির তো কথাই নেই। 'ধুপি' হচ্ছে খাস শীতের দিনের পিঠা, এর এক নাম তাই শীত-পিঠা। এটা খেতে হয় জ্বাল দিয়ে টকটকে লাল করা খেজুর রসে চুবিয়ে। ধুপি খাওয়ার এ হচ্ছে চট্টগ্রামী তরিকা। ভালো করে শীত না পড়লে খেজুর গাছে রস নামে না, কাটা মুখ দিয়ে ঝরে পড়ে না রস টপ টপ করে। অনেক সময় খেজুর রসের অভাবে গুড় নারকেলের 'পুর' দিয়েও ধুপি বানানো হয়। তবে এ হচ্ছে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। বাড়ির একমাত্র বেটা ছেলে বলে আমার পিঠা-পুলির আবদারটা সময় অসময়ের তোয়াক্কা না রেখেই পূরণ হত। আমার তাগাদায় পড়ে মা অনেকদিন ঘটা করেই ধুপি বানাতেন। যেদিন বানাতেন সেদিন মোরগের ডাকের আগেই মা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন। তাঁর সাড়া পেলে আমাদেরও ঘুম যেত টুটে। উঠে আতালি পাতাড়ি ছুটতাম রান্নাঘরে। ঢেঁকির পিঠে সওয়ার হয়ে তীর্থের কাকের মতো চেয়ে থাকতাম উনোনের দিকে। রাগ হত প্রথম পিঠাটা মা আমাকে কিছুতেই দিতেন না। মেয়েদের এ এক অদ্ভুত সংস্কার— বেটা ছেলের নাকি প্রথম পিঠাটা খেতে নেই। বেটা ছেলে হওয়ার অনেক সুখ-সুবিধা আমি ভোগ করেছি কিন্তু এ দুঃখটা অনেকদিন ভুলতে পারি নি। মুরগির মাথা আর কলিজাটাও মা আমাকে দিতেন না। কলিজা খেলে কলিজা নরম হয়, এ বিশ্বাসটাও মায়েদের মজ্জাগত। বেটা ছেলের ভবিষ্যতে কত বিদেশ বিভুঁয়ে যেতে হবে, কলিজা নরম হলে তা কি সম্ভব হবে? এ হচ্ছে যুক্তি। মা বাবা বেঁচে থাকলে মুরগির মাথা খাওয়াও ছিল ওদের সংস্কারে নিষেধ। মুরগির মাথার সঙ্গে মা-বাপের মাথার কি সম্পর্ক তা আজও আমার অবোধ্য। 'মাথা খাও' কথাটা মেয়েদের মুখে ঘন-উচ্চারিত— সংস্কারটার উৎপত্তির মূলও কি তাই?

বাবা শহর থেকে দু'তিন মাস অন্তর বাড়ি আসতেন। তখন আমরা সব ঠাণ্ডা, চুপচাপ— একদম মিইয়ে পড়তাম। মুখের কথা হয়ে যেত ফিস্ ফিস্। ঘরের সামনে দিয়ে আনাগোনা বন্ধ, উঁকি মেরে দেখে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে যেতাম বেরিয়ে। বাবা দূরে থাকতেন বলে শৈশবে তাঁর সঙ্গে মাখামাখি তথা অন্তরঙ্গতার সুযোগ ঘটে নি মোটেও। ফলে তাঁর সম্পর্কে আমাদের সকলের মনে সব সময় ছিল একটা আতংক। তাঁর কাছে জীবনে কোনদিন কোন ব্যাপারে আবদার করেছি মনে পড়ে না। মনে হয় না তিনিও কোন দিন কাছে ডেকে আমাদের আদর সোহাগ করেছেন। যেখানেই থাকুন সারা সকাল বেলাটি তিনি কোরান তেলাওয়াৎ আর অজিফা পাঠ করে এবং নিজের লেখা পড়া নিয়েই কাটাতেন। মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে আমার লেখাপড়াটা যাচাই করতেন। হঠাৎ একদিন বলে বসলেন— এখানে আমার লেখা পড়া কিচ্ছু হচ্ছে না। আমাকে তিনি নিয়ে যাবেন শহরে। যেমন কথা তেমনি কাজ। সত্যি সত্যি একদিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে তাঁর সঙ্গে শহরের দিকে দিতেই হলো পাড়ি। আমার শৈশব জীবনের অবাধ ও বেপরোয়া স্বাধীনতার এখানেই ঘটল ইতি।


www.pathagar.com

## সাত

আগের পরিচ্ছেদে আমার বাল্য পরিবেশের কিছু খবর নেওয়া হয়েছে। বলা হয়, মানুষের জীবন পরিবেশ আর বংশগতি অর্থাৎ Environment আর Heredity রই যোগফল। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়, তবে জীবন গঠনে এ দু'য়ের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের বিশেষ খবর আমি দিতে পারব না, কারণ, আমি নিজেই তা জানি না। যতদূর মনে হয় তাঁরা খুব সাধারণ মানুষ ছিলেন— জীবনে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করেন নি অন্তত রেখে যান নি তার কোন স্মৃতি। পিতামহ থেকেই আমার স্মৃতির শুরু। তাঁর আগেও অবশ্য আমার পূর্বপুরুষ ছিল পিতামহের পিতামহ, তস্য পিতা ইত্যাদি নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তাঁদের কারো পরিচয় আমি জানি না, এমনকি নাম জানার আগ্রহও আমার মনে কোনদিন জাগে নি। পিতামহকেও যে আমি দেখেছি তা নয়, তবে তাঁর নাম ও তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু জনশ্রুতি আমি শুনেছি।

আগেই বলেছি আমাদের বাড়িটা উত্তর-দক্ষিণ লম্বা একটা পুকুরের পশ্চিম পাড়ে— আর পাড়ার রাস্তাটা হচ্ছে পুকুরটার পূর্ব পাড়ের উপর দিয়ে। কাজেই আমাদের বাড়ি আসতে হলে উত্তর দিকটায় বাড়ির আন্দর বলে, দক্ষিণ পাড় বেয়েই আসতে হয়। মরহুম দাদু নাকি অনেক সময় অতদূর না ঘুরে পূর্ব পাড় থেকে সোজা পানির উপর দিয়ে হেঁটে বাড়ি চলে আসতেন। তাতে তাঁর কাপড়-চোপড় দূরে থাক, পায়ের পাতা দুটাও নাকি ভিজত না। আমি হাল আমলের মানুষ, আমার কাছে জনশ্রুতির বেশি এসব কথার মূল্য নেই। আমাদের গ্রামের লোকেরা কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরও এসবকে অভ্রান্ত সত্য বলেই বিশ্বাস করত। তাঁর সম্বন্ধে পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়দের মুখে আরো দু'একটা গল্প যে শুনি নি তা নয়— সেগুলো তেমন অসাধারণ নয় বলেই বিশ্বাস্য।

চৈত্র-বৈশাখ মাসের খর-রৌদ্রেও তিনি যখন আট-দশ মাইল দূরেও কোন কাজে যেতেন তখন বগলে ছাতা একটা নিতেন বটে কিন্তু এক বৃষ্টির সময় ছাড়া ছাতাটা নাকি কখনো খুলতেন না— খুলে ধরতেন না মাথার উপর! আশ্চর্য, তাঁর আমার মাঝে ব্যবধান মাত্র এক পুরুষের, অথচ আমার শীতের দিনেও মাথার উপর ছাতা না ধরলে চলে না।

পিতা ও পিতামহ উভয়ে মিলাদ পড়তেন, দূর দূর পাড়ায়ও তাঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে মিলাদ পড়তে যেতেন। প্রচুর খাওয়া দাওয়া ছাড়াও মিলাদ পড়ার জন্য তখন একটা খয়রাৎ বা দক্ষিণা দেওয়া ও পাওয়ার রেওয়াজ ছিল— আজো আছে। তার পরিমাণ পিতামহের আমলে আট আনা থেকে এক টাকা আর পিতার আমলে দেখেছি এক টাকা থেকে দু'টাকা। খুব বড় লোকের বাড়িতে পাঁচ টাকা পর্যন্ত উঠত। পিতা শহরে থাকতেন, শহরে ডাক্তারের ফি যেমন বেশি তেমনি মৌলবী মওলানাদের ধর্মীয় কাজের ফিও গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই বাবা মাঝে মাঝে বড়লোকদের বাড়িতে পাঁচ-দশ টাকাও পেয়ে যেতেন। যতদিন বাবার কাছে ছিলাম মিলাদের এ রকম দাওয়াতে অনেক সময় আমাকেও বাবার সঙ্গী হতে হত। আমারও যে সিকি দু'আনীটা না মিলত তা নয়। কিন্তু হাত বাড়াতে সংকোচ বোধ করতাম। পিতামহ মিলাদ পড়ে বিদায়ের সময় গৃহস্থ খয়রাৎ



www.pathagar.com

কত দিয়েছে বা দিচ্ছে তা কখনো ফিরে দেখতেন না, বাবাকেও আমি হাতের মুঠো খুলে তা দেখতে দেখি নি। দর করে মিলাদ কি জানাজা পড়তে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অকল্পনীয় ছিল। শুনেছি এ রকম এক মিলাদ পড়ে আসার পরদিন পিতামহ হাটের সময় টাকার আশায় পকেটে হাত দিয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন একটি ডাবল পয়সা। সে যুগে— আমাদের ছোট বেলায়ও ডাবল পয়সা চালু ছিল আর তা ছিল আকারে চাঁদির টাকার সমান। দাদু সাহেব সিন্দুক খুলে সেখান থেকে টাকা বের করে হাটে দিয়ে দিলেন। এ নিয়ে আর টুঁ শব্দটিও করলেন না। ব্যাপারটি জানাজানি হল আরো একদিন পরে যখন সেই গৃহস্থ নিজে এসে দাদুর হাতে একটি টাকা দিয়ে বল্লেন : হুজুর, লোকমুখে যা শুনছিলাম তা সত্য কি-না একটু যাচাই করে দেখলাম শুধু। গোস্তাকি মাফ করবেন।

আগেই ইংগিত করা হয়েছে আগে বা পরে যোগ করার মতো আমাদের কোন বংশ পদবী নেই। পিতামহ মৌলবী হায়দর আলী, পিতা মৌলবী ফজলর রহমান। শুধু মৌলবী আর শেষোক্তজন 'ইমাম সাহেব' নামেও পরিচিত ছিলেন। কারণ, একটানা দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে তিনি চট্টগ্রাম জুমা মসজিদে ইমামতী করেছেন। তখনো 'মওলানা' কথাটার এত ব্যাপক প্রচলন হয় নি। ওটা খুব বেশি করে চলতি হয়েছে অসহযোগ খেলাফতের আমলে। তখন জীবনে মাদ্রাসার চৌকাঠ মাড়ায় নি এমন লোককেও রাতারাতি মওলানা হতে দেখেছি। আমার পিতা পিতামহ রীতিমতো পাস করা আলেম হওয়া সত্বেও স্রেফ মৌলবীই থেকে গেছেন চিরজীবন।

বলেছি, ভ্রাতারা পিতামহকে পৈত্রিক বাস্তুভিটার অংশ দেয় নি। তিনি দেউড়িতে থেকে পাড়ার ছেলেমেয়েদের পড়াতেন— শেষ পর্যন্ত এ দেউড়ি ঘরেই তাঁকে সপরিবারে জীবন কাটাতে হয়। বাস্তুভিটা লাখেরাজ আর দেউড়ী ভিটা নয়াবাদ— একটা পুকুর পাড়, যে পুকুরের উপর আমাদের কোন স্বত্বই ছিল না। এভাবে তিনি এবং তাঁর পুত্র পৌত্ররা মৌরসী বাস্তুভিটার অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবু এ নিয়ে ভাইদের সঙ্গে তিনি কোনদিন বাদানুবাদ করেন নি, জানান নি কোন আপত্তি। আমাদের পাড়ার মসজিদ আর তার সংলগ্ন কবরস্থান পিতামহই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এর আগে পাড়ার লোকদের ভিন্ন পাড়ায় গিয়ে জুমা পড়তে হত আর তারা লাশ দাফন করত পুকুরের পাড়ে পাড়ে।

শুনেছি, তিনি দীর্ঘ বপু, সুশ্রী আর খুব পরহেজগার ছিলেন। তাঁর পুত্র আমার পিতা মৌলবী ফজলর রহমানও এ সব গুণের অধিকারী ছিলেন। আমি তাঁদের দৈহিক কি মানসিক কোন গুণই পাই নি। পেয়েছি শুধু পিতার উন্নত নাসিকাটি আর মুখের কিছুটা আদল। ছোটকালে দেখেছি যারা আমাকে চেনে না বা আগে দেখে নি, তারাও আমার উন্নত নাসিকা দেখে বলে উঠত : 'আমাদের ইমাম সাহেবের ছেলে না?'

পিতা ফজলর রহমান চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসা (হাজী মোহসিনের সাহায্যপ্রাপ্ত বলে তখন ঐ মাদ্রাসাকে মোহসেনিয়া মাদ্রাসাও বলা হত) থেকে সর্বোচ্চ পরীক্ষা অর্থাৎ 'উলা' পাস করে কিছুদিন সন্দ্বীপে ইমামতী ও শিক্ষকতা করেছিলেন। পরে চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ জুমা মসজিদের ইমাম হন— আর অত্যন্ত সুখ্যাতি ও যোগ্যতার সঙ্গে আমৃত্যু একটানা বত্রিশ বছর ঐ মসজিদে ইমামতী করে কাটান। পরহেজগার ও ধার্মিক জীবনের সঙ্গে ইমামতীর এমন একটা ঐতিহ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে চট্টগ্রাম শহর, বিশেষ


www.pathagar.com

করে আন্দরকিল্লাহ অঞ্চল থেকে আজো তাঁর স্মৃতি মুছে যায় নি। অথচ তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় চৌত্রিশ বছর গত হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের প্রবীণ সমাজে 'ইমাম সাহেব' বলতে এখনো তাঁকেই বুঝিয়ে থাকে। এর মধ্যে অবশ্য জুমা মসজিদে কত ইমাম যে রদ্‌বদল হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

বিশুদ্ধ এলহানে উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর সূরা পাঠের খ্যাতি দূরদূরান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর পেছনে জুমার নামাজ পড়ার জন্য বুড়া বুড়া লোককে পাঁচ ছয় মাইল দূর থেকেও নিয়মিত প্রতি জুমা'বারে আসতে দেখেছি। তার মধ্যে চট্টগ্রামের অন্যতম কংগ্রেস নেতা শেখে চাটগাম কাজেম আলী সাহেবের নাম এখনো স্মরণে পড়ছে। তাঁর বাড়ি মিউনিসিপাল এলেকার বাইরে বেশ দূরে— তবুও জুমা'বারে তো বটে, অন্যান্য দিনও প্রায় ওয়াক্ত তাঁকে জুমা মসজিদে এসে নমাজ আদায় করতে দেখা যেত।

মসজিদ সংলগ্ন ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেলের কোন কোন পুরোনো ছাত্রের মুখে শুনেছি— তাঁরা সচরাচর নিয়মিত নমাজ পড়তেন না কিন্তু যে যে ওয়াক্তে উচ্চ কণ্ঠে সূরা পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে তাঁরা সে সব ওয়াক্তে নমাজে হাজির হতেন। উদ্দেশ্য ইমাম সাহেবের সুললিত কণ্ঠে কেরাত পাঠ শোনা।

ঐ সময় খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলম সাহেবও উক্ত হোস্টেলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ঐ সব দিনের স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে তিনি তাঁর 'মোমেনের জবানবন্দীতে লিখেছেন : "মসজিদের ইমামকে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। খুব উঁচু চেহারা আর এত ঋজু যে এই লোকটা (মসজিদে ছাড়া) আর কাহারো নিকট মাথা নত করিবেন এরূপ মনে হয় না। বিশিষ্ট নাক, উদার চাহনি ও দীর্ঘ শ্মশ্রু অত লোকের মাঝেও মনে হইতেছিল উনি একা এবং উনিই ইমাম। আমি উঁহার পাশেই অজু বানাইতে বসিলাম। ইমাম আমার পরিচয় গ্রহণ করিলেন এবং যখন বলিলেন আমি তাঁহার বন্ধুর ভাইয়ের ছেলে তখন আমার বড় আনন্দ হইল। কিন্তু আমি আনন্দের আবেগে আকুল হইয়া গেলাম যখন রাত্রে তাঁহার আবৃত্তি শুনিলাম। একমাত্র তাঁহার কণ্ঠেই ঐরূপ আত্মনিবেদন ধ্বনিত হইতে পারে যাঁহার হৃদয় বিশ্বাসে স্থির ও ভক্তিতে প্রশান্ত।

এইদিন হইতে ইমামের আবৃত্তি আমাকে মসজিদে আকর্ষণ করিত। তাঁহার পাশে বসিয়াই আমি অজু বানাইতাম ; আর তিনি তারিফের প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, আগামী বেলায় নমাজ পড়া হবে নাকি?"

পিতা দারিদ্র ছিলেন। মৃত্যুর সময় অর্থাৎ বত্রিশ বছর চাকরি করার পরও— তাঁর মাসিক মাইনে ছিল তের টাকা। কিন্তু জীবনে কারো কাছে মাথা নত করেছেন শুনি নি। তিনি যে পেশার লোক ছিলেন সে পেশার রেওয়াজ অনুসারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে যা দিত তিনি তা নিতেন বটে কিন্তু কারো কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিতে তাঁকে আমি কোনদিন দেখি নি, শুনিয়ে নি।

বাবার মুখে শুনেছি কেরাৎ পাঠ জীবনে তিনি কারো কাছে শিখেন নি ; তবে কারী এবং ভালো কেরাৎ পড়ুয়ারা যখন কেরাৎ পড়তেন তিনি তা লক্ষ্য করতেন আর শুনতেন মনোযোগ দিয়ে। এভাবেই তাঁর কেরাৎ শিক্ষা।


www.pathagar.com

জীবনে দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ কখনো তাঁর বাদ পড়ে নি। যখন মৃত্যুশয্যায় — উঠে বসার সামর্থও যখন আর নেই, তখন তায়ম্মোম করে শুধু ইসারায় নমাজ পড়তেন। যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সেদিনও এভাবে নমাজ আদায় করেছেন। রোজ এক পারা কোরান তেলাওয়াৎ করা ছিল তাঁর আজীবনের অভ্যাস। আর সঙ্গে অজিফা তো ছিলই। বেশ বড় বড় শাদা বাঁধাই করা খাতা পাশে রাখতেন— পড়তে পড়তে যখন যা খুশি ওতে তা রাখতেন টুকে। পছন্দসই আয়াৎ, হাদিস, আরবি, ফারসি, উর্দু বয়েৎ কিছুই বাদ যেত না। আর অবসর সময় সেগুলি বার বার পাঠ করতেন, গুন গুন করে করতেন আবৃত্তি।

ফজরের নমাজের পর সারা সকাল বেলাটা তাঁর এভাবেই কাটত। দাওয়াৎ না থাকলে জোহরের পর বিকালটাও এভাবেই কাটাতেন। আছরের পর মগরিব পর্যন্ত সময়টা আশে পাশে বা আন্দরকিল্লায় পায়চারি করে বেড়াতেন— ঝড় বাদলের দিনে তা করতেন মসজিদের সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত বারান্দায়। এবাদৎ আর জ্ঞানচর্চা, সময় সময় মিলাদ ইত্যাদির দাওয়াৎ রক্ষা— এ তিনটি কাজেই তাঁর সময় কাটত। অন্য কোন সাংসারিক কাজ তাঁকে করতে দেখি নি। কোনদিন যান নি হাটে বাজারে, যান নি কোর্ট-কাছারিতে। তাঁকে যেমন সকলে বিশ্বাস করত তেমনি তিনিও বিশ্বাস করতেন সবাইকে। তাঁর টাকা পয়সা জমা রাখতেন আন্দরকিল্লার বিশেষ বিশেষ সওদাগরদের কাছে— ফেরৎ নেওয়ার সময় কখনো গুণে দেখতেন না। রাখতেন না কোন হিসেব। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি পাড়ার মসজিদ সংলগ্ন পুকুরটি খনন করার জন্যে তাঁর এক হিন্দু প্রতিবেশীর হাতে দু'শ টাকা জমা রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নন্দী মহাশয় ঐ টাকা নিজে এসে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন। পরে আমি প্রায় সাড়ে চার'শ টাকা খরচ করে ঐ পুকুর নতুন করে খনন করিয়ে দিই। তাঁর পরিচিত হিন্দুরা তাঁকে প্রায় দেবতার মতই ভক্তি করত। রমেশচন্দ্র নন্দী আমাদের অঞ্চলে ছোটখাটো জমিদার আর স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন— দুই যুক্তকর কপালে না ঠেকিয়ে তাঁকে কখনো বাবার নাম নিতে দেখি নি। শহরের হিন্দু ডাক্তার কবিরাজরা (তখন চট্টগ্রাম শহরে কোন মুসলমান ডাক্তারই ছিল না) তাঁর কাছ থেকে ফি বা ঔষধের দাম নিতেন না। একবার বাবা কঠোর বহুমূত্র রোগে ভুগেছিলেন। সদর হাসপাতালের হিন্দু এসিস্টেন্ট সিভিল সার্জেন করেছিলেন তাঁর চিকিৎসা। ডাক্তার বহুবার এসে তাঁকে দেখেছেন কিন্তু কোনদিন ফি নেন নি। এ জন্যে বাবা বোধ করি মনে মনে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। একদিন কিছু টাকা দিয়ে আমাকে ডাক্তারের বাসায় পাঠিয়ে দিলেন। আমি টাকা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি বল্লেন : 'আমরা ইমাম সাহেবের কাছ থেকে টাকা নিই না'। আমি অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এলাম। বলা বাহুল্য, জুমা মসজিদ আর সদর হাসপাতালের অবস্থান দুই মুখোমুখি পাহাড়ের উপর— মাঝখানে শুধু আন্দরকিল্লার বড় রাস্তা। দেখা যায় একটা থেকে আর একটার চেহারা। এরা যেন একে অন্যের পরিপূরক— একটায় মানুষ খুঁজে পায় মনের শান্তি, অন্যটায় দেহের।

ছোটকালে যখন শহরে আসি তখন চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেল লাইনের পরিকল্পনাও বোধ করি রচিত হয় নি। জল পথে ছাড়া শহরের সঙ্গে যোগাযোগের অন্য কোন ব্যবস্থাই


www.pathagar.com

ছিল না। আমাদের বাড়ি থেকে শহরে আর শহর থেকে বাড়ি যেতে নৌকায় প্রায় দেড়দিন লাগতো। একটা রাত নৌকায় কাটাতেই হত। নৌকা চলত জোয়ার-ভাটা নিয়ে। কাজেই যাত্রীদের প্রয়োজন ও মর্জির কোন মূল্য ছিল না। তখনো টিফিন কেরিয়ারের চল হয় নি— অথচ এক বেলার ভাত তরকারি আমাদের সঙ্গে নিতেই হতো। গোটা দুই কচি কলাপাতা একটুখানি আগুনে সেঁকে নিয়ে তাতে ভাত আর শুকনো তরকারি— অধিকাংশ সময় ভাজা মাছ বা ভুনা গোস্ত বেঁধে নেওয়া হত আমাদের অঞ্চলে একে বলা হয় 'ভাতের মোচা'— পাটের সুতা দিয়ে কষে এমন কৌশলে বাঁধা হয় যে তা দেখায় তিন নম্বরী ফুটবলের মতো, তবে রংটা সবুজ। এক সঙ্গে দু'জনের উপযোগী 'মোচাও' বাঁধা হয়— এগুলি আকারে অবশ্য পাঁচ-ছ নম্বরী বলের মতো হয়ে ওঠে। বলের কথা আকার বুঝাবার জন্যই বল্লাম বটে কিন্তু সে যুগের কয়টা মেয়েই বা ফুটবল দেখেছে? তবে কুমড়ো সব মেয়েরই দেখা। আর মেয়েরাই তো বাঁধতো 'ভাতের মোচা'। ফলে পাকা গিন্নীদের বাঁধা ভাতের মোচার চেহারা অনেকটা মাঝারি আকারের কুমড়োর মতোই হতো। অপরিসর নৌকার খোলে মাথা নিচু করে বসে অনেক 'মোচাই' আমি খেয়েছি। খেতে খুব যে খারাপ লাগত তা নয়, তবে ভাত-তরকারি সবই শুকনো বলে দু'এক গ্রাসের পর পরই পানি খেয়ে গলাটা নিতে হত ভিজিয়ে।

বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল হেঁটে এসে তবে চড়তে হত নৌকায়। গ্রাম দেশের ছেলে এটুকু পথ হেঁটে আসা তখন মোটেও গায়ে লাগত না। শহরে বাবা জুমা মসজিদের পশ্চিম দিকে হাফেজ আবদুল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে আমিও ঐ বাড়িতে এসেই উঠলাম। পূর্ব-পশ্চিম লম্বা টিনের ঘর, মাঝখানে আন্দরে যাওয়ার পথ। আশ্চর্য এ ঘরও ছিল পুকুর পাড়ে— পুকুরের নাম রাজা পুকুর। রাঙামাটির পোয়াং রাজারাই এর মালিক ; তাই এ নাম। কাজেই শহরে এসেও আমার সাঁতার কাটার বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি। হাফেজ আবদুল্লাহ হাফেজ ছিলেন বটে কিন্তু পেশা ছিল তাঁর 'ছাইয়ের'। তাই তাঁদের বাড়িকে বলা হতো ছাইয়াদের বাড়ি। সেকরারা কাজ করার সময় সোনা রূপা হাঁপরের আগুনে নরম করে বা গালিয়ে নিয়ে সেখানে বসেই ছোট ছোট হাতুড়ি পিটিয়ে নানা অলংকার পত্র তৈরি করে। এ করার সময় হাঁপরে আর পাশের ছাইয়ে অনেক সময় সোনা রূপা ও অন্যান্য ধাতুর কণা কণা টুকরো ছিটকে পড়ে যায়। এ সব ছাই বিশেষ পদ্ধতিতে ধুয়ে সে সব সোনা রূপার কণা বের করে নিতে হয়। তাই সেকরাদের ছাইয়ের বেশ দাম। হাফেজ আবদুল্লাহ দাদন দিয়ে এ ছাই কিনে নিতেন, শহরে এ ছিল তাঁর প্রায় একচেটিয়া ব্যবসায়। তিনি নিজের হাতে অলংকারও বানাতেন। এ পেশা তিনি কোথা থেকে শিখেছিলেন জানি না, তবে মাঝে মাঝে দেখতাম ঢাকা থেকে কাঠের ছোট বড় কানা-উঁচু রেকাবি মাথায় লোকজন আসত। এরা নাকি ছাই ধোওয়ায় ওস্তাদ। চাটগাঁ শহরে এ পেশায় হাফেজ সাহেব ছিলেন অন্তত মুসলমান সমাজে একক-আশে পাশের সবার চেয়ে তাঁর অবস্থাও ছিল অধিকতর সচ্ছল। বাবাকে তিনি অত্যন্ত সম্মানের চেখে দেখতেন এবং বাবা যতদিন চট্টগ্রাম শহরে ছিলেন তাঁকে আর কোথাও যেতে দেন নি। আন্দরকিল্লার বড় বড় সওদাগরেরা অনেকে বাবাকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু হাফেজ আবদুল্লাহ কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে রাজি হন নি।


www.pathagar.com

হাফেজ সাহেবের ছেলেরা বাবাকে দাদু আর আমি যখন এলাম তখন আমাকে চাচা বলে ডাকত, এমনকি যারা আমার চেয়ে বয়সে বড়ো তারাও তাই ডাকত। শুধু তারা নয়, আশে পাশের মহল্লার সব ছেলে মেয়েই তাঁকে দাদু আর আমাকে চাচা বলতো। আমার সমসাময়িকদের মধ্যে যারা এখনো বেঁচে আছে দেখা হলে তারা এখনো আমাকে তা বলেই সম্বোধন করে।

হাফেজ আবদুল্লাহর লাগোয়া পাশের বাড়ি হচ্ছে মওলানা মোহাম্মদ হোসেন তথা মোহাদ্দেস সাহেবের বাড়ি। তিনি চট্টগ্রাম সরকারি সিনিয়র মাদ্রাসার (বর্তমানে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ) হেড মৌলবী ও হাদিস শিক্ষক ছিলেন। হাদিসে অপার পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'মোহাদ্দেস সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। বাবা মসজিদের ইমাম আর আমি ইমামের ছেলে— বাধ্য হয়েই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমাকেও মসজিদে গিয়েই পড়তে হত অন্তত যতদিন বাবার সঙ্গে ছিলাম। মসজিদে প্রায়ই মোহাদ্দেস সাহেবের সঙ্গে দেখা হত। দেখা হলেই তিনি আমাকে মিতা বলে সম্বোধন করতেন। কারণ, তাঁর আর আমার উভয়ের নামের আগে রয়েছে 'মোহাম্মদ'। অধিকন্তু তখন আমাকে সবাই ডাকতও মোহাম্মদ বলে। আমি তখনো আবুল ফজল হই নি। গ্রামদেশে কেউ কেউ একটা মিঞাও জুড়ে দিত আমার নামের সঙ্গে। তখনকার দিনে মোহাদ্দেস সাহেব বেশ মোটা মাইনে পেতেন। কিন্তু তাঁর চালচলন ছিল অত্যন্ত সাদাসিদা, রোজ নিজে বাজারে যেতেন। নিজের হাতে বাজার করে নিজেই বয়ে নিয়ে আসতেন। কেন জানি না, তিনি সব সময় উর্দু বলতেন তবে সে উর্দু লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর উর্দু নয়, একদম খাস চাটগেঁয়ে উর্দু। যেমন তিনি বলতেন— গরুনে টেংরা ভাংতাহে, ছাগলনে ঘাস খাতা হে। এ ধরনের উর্দু— চাটগাঁয় যাকে বলা হয় খোট্টা। পাশের বাড়িতে থাকতাম বলে তাঁর মুখের এ রকম খোট্টা উর্দু শোনার সুযোগ আমার প্রায় হত।

তাঁর সম্বন্ধে তাঁর ছাত্রদের মুখে প্রায় শুনতাম— তিনি নাকি পরীক্ষার খাতা পড়ে দেখতেন না, উঠোনময় তলাই বা চাটাই পেতে তার উপর সব খাতা বিছিয়ে নিয়ে দেখে নিতেন কোন্ খাতায় কতখানি লেখা হয়েছে, লেখার পরিমাণ দেখেই দিতেন নম্বর। যে ছাত্র বেশি লিখত সে-ই ফার্স্ট হত। কেউ আপত্তি করলে তিনি জবাব দিতেন, যে বেশি পড়াশোনা করে নি সে বেশি লিখবে কি করে?

তাঁর সন্দেহ, ধোপারা কি সব না-পাক জিনিস দিয়ে কাপড় ধোয়, কে জানে? তাই তিনি ধোপা বাড়ির ধোয়া কাপড় বাড়িতে আর একবার না কেচে পরতেন না। একবার জনশিক্ষার বিলেতি সাহেব-ডিরেক্টর মাদ্রাসা পরিদর্শনে এসেছিলেন— স্বভাবতই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হেড মৌলবী সাহেবকেও ডিরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাহেবদের পরিচয়ের প্রথম সূচনাই হে হেন্ডশেক। মোহাদ্দেস সাহেব নাকি প্রথমে এ পরিচয় এড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নাছোড়বান্দা অধ্যক্ষের জন্য তা সম্ভব হয় নি। বাধ্য হয়ে না-পাক নছারার সঙ্গে তাঁকে হাত মিলাতেই হলো। ডিরেক্টর বিদায় হওয়ার পর তিনি নাকি হাত ধুতে আস্ত একখানা সাবান খরচ করে ফেলেছিলেন।

সেকালের চাটগাঁয়ে বিশেষ করে শহরের লোকদের সামনে মোহাদ্দেস সাহেব আর ইমাম সাহেব ছিলেন ধর্ম-জীবনের দুই আলোকস্তম্ভ। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত


www.pathagar.com

প্রীতি আর শ্রদ্ধার। মোহাদ্দেস সাহেব ভালো সরকারি চাকরি করতেন তাই অবস্থাও ছিল সচ্ছল। পাকা বাড়ি আর শহরের উপর মূল্যবান কিছু ভূসম্পত্তি করেছিলেন। সেই অনুপাতে বাবা কিছুই করেন নি বা করতে পারেন নি। এ নিয়ে তাঁকে কোনদিন কোন দুঃখ করতেও দেখি নি।

## আট

আমাদের ছোটকালে সমাজে অনেক বদ্‌রেওয়াজ ছিল। তার মধ্যে একটা— বৌ আনতে যাওয়ার সময় বরযাত্রীদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হত তথাকথিত গোলাম-বাঁদি। আসলে এরা যে খাঁটি অর্থে গোলাম-বাঁদি তা নয়— এদের পূর্বপুরুষ হয়তো কোন এককালে কোন প্রাচীন জমিদার বা অবস্থাপন্ন পরিবারের পোষ্য হয়ে তাদের ফাইফরমাস খাটত। এদের বংশধরদের কেউ কেউ তখনো বরযাত্রীদের সঙ্গে পান-বাতাসা (বিয়ে বাড়িতে পান-বাতাসা নিয়ে যাওয়াও ছিল তখন এক অপরিহার্য রেওয়াজ) বয়ে নিয়ে যেত আর খাওয়ার আগে পরে বরযাত্রীদের দিত হাত ধুইয়ে। সে যুগে কন্যাপক্ষীয়েরা বরযাত্রীদের হাত ধোওয়াত না— ধোওয়ানোকে মনে করত রীতিমতো অপমানজনক কাজ।

আমার ছোট বোনের বিয়ের সময়— বরযাত্রীদের খাবার পরিবেশনের পর ধরা পড়ল বরযাত্রীরা সঙ্গে কোন গোলাম আনে নি। এখন ওদেরে হাত ধোয়াবে কে? সামনে খাবার দেয়া হয়েছে অথচ হাত ধোয়াবার লোক নেই। সে এক মহাসঙ্কট। খাবার পরিবেশন করা মহল্লার লোকের কর্তব্য। সে কর্তব্য করে এখন তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে আর করছে হাসাহাসি, দিচ্ছে টিটকারী। বরযাত্রীরা যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়— একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন, বরের নিকট-আত্মীয়দের ধমকাচ্ছে, চাপাকণ্ঠে দিচ্ছে গালাগালি। কিন্তু এতে সমস্যার কোন কূল পাওয়া যাচ্ছে না, হচ্ছে না সমাধান। থালা থালা পোলাও-কোর্মা, মোসম্মাম সামনে নিয়ে প্রায় শ'দুই লোক বসে আছে হাত তুলে আর মহল্লার রসিক ছোকড়ারা মাঝে মাঝে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণবাণ মারছে ছুঁড়ে— খান বেয়াই সাব, শুরু করুন দুলা মিয়া ইত্যাদি। তখন বরেরা ঘোমটা দিত— দেওয়া রেওয়াজ ছিল, না দিলে বেহায়া অপবাদ শুনতে হত। কাজেই বরের লজ্জা ঢাকবার বিশেষ অসুবিধা হলো না বটে কিন্তু বেচারা বরযাত্রীদের অবস্থা হয়ে উঠল নেহাত কাহিল। হঠাৎ কি করে খবরটা আব্দর বাড়িতে বাবার কানে গিয়ে পৌছল। তিনি পাড়ার মুরুব্বি, বড় আলেম ও গুরুগম্ভীর লোক-মজলিসে উপস্থিত থাকলে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, যারা ধুমপান করে তারা তাঁকে দেখলেই হুঁকোটা সরিয়ে রাখে পেছনে, যারা এতক্ষণ ধরে হাসিঠাট্টা আর খোশগল্পে ছিল মেতে, হঠাৎ তাদের মুখে পড়ে যায় তালাচাবি। যারা মালকোঁচা মেরে কাজ করছিল তাঁকে দেখামাত্র তারা মালকোঁচাটা খুলে কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত দেয় নামিয়ে। তাই তাঁর নিজের ঘরের অনুষ্ঠানেও তিনি সরেজমিনে হাজির থাকতেন না। বসে থাকতেন নিজের কামরায়, বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন, কোন নির্দেশ দিতে হয় সেখান থেকেই দিতেন।

বৈরাতিরা খাবার সামনে নিয়ে বসে আছে শুনেই তিনি ছুটে এসে বল্লেন : এঁরা


www.pathagar.com

আমার মেহমান, অতিথি, এঁদের হাত ধোয়ানো আমার পক্ষে সোয়াবের কাজ। চিলুমসি— বদনা কই, আমাকে দাও, আমিই ধোয়াব।

আমাকে হুকুম দিলেন : আর একটা চিলুমচি-বদনা নিয়ে তুমি ঐ ধার থেকে ধোয়াতে শুরু কর।

এবার পাড়াপড়শিরা ছুটে এসে তাঁর হাত থেকে চিলুমচি-বদনা কেড়ে নিয়ে নিজেরাই বরযাত্রীদের হাত ধোয়াতে শুরু করে দিল। এভাবে সেদিনের অপ্রিয় সঙ্কটের ঘটল অবসান।

আগেই বলেছি আমাদের যৎসামান্য ধানী জমি ছিল আর তা দেয়া হত বর্গা। বর্গাদার চাষীরা পুরুষানুক্রমেই আমাদের জমি চাষ করত। বাবা চাষী বদলাতেন না। এদের কাছ থেকে নিতেন না কোন দলিল বা কবুলিয়তও। তাঁর কাছে মুখের কথাই ছিল দলিলের বাড়া। একবার এক চাষী এসে বাবাকে বল্ল : পাশের জমির মালিক আল কেটে আমাদের জমির অনেকটা তার জমির সামিল করে নিয়েছে। কোন আপত্তিই শুনছে না। বাবাকে অনুরোধ করলেন ওখানে গিয়ে উক্ত লোকটাকে নিজে একবার বারণ করতে।

বাবা যেতে অস্বীকার শুধু যে করলেন তা নয় আমাদের চাষীকে বলেও দিলেন : ও যেখানে সীমা নির্দেশ করে দেয় তুমি সে পর্যন্ত আমাদের জমি বলে ধরে নাও গে। যেটুকু জমি কম পড়ে তুমি সে অনুপাতে ধানও কম দিয়ো। পরে অবশ্য বলেছিলেন : ও যদি না হক আমাদের জমি আত্মসাৎ করে তাতে আমাদের চেয়ে ওরই ক্ষতি হবে বেশি। এটা তাঁর ধর্ম বিশ্বাস— হয়তো পরকালের কথা ভেবেই বলেছেন। আমাদের চাষীটাকে সান্ত্বনা দেওয়াও হতে পারে। আমাদের জমিতে তিনি কখনো পা দিয়েছেন মনে পড়ে না। আমাদের প্রত্যেকটা জমির দলিল দস্তাবেজে যে মাপ আছে তার থেকে কমে গিয়েছে অর্থাৎ পার্শ্ববর্তীরা আল ঠেলে বা কেটে একটু একটু করে যে যা পেরেছে নিজেদের জমির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছে। বাড়ি এলে এ খবর প্রায় শুনতেন তিনি। এ নিয়ে বাবাকে এক মুহূর্তের জন্যও মাথা ঘামাতে দেখি নি। এসব তিনি আমলই দিতেন না।

বাবার একটা ছবিও নেই, এটা আমার একটা বড় দুঃখ। তিনি যখন লাল দীঘির মাঠে ঈদের নামাজ পড়াতে দাঁড়াতেন— মাথায় হলুদ বা সবুজ বর্ণের পাগড়ি, মুখে দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি, গায়ে আসকানের উপর সুদীর্ঘ দামি চৌগা, পশ্চাতে অগণিত মুসল্লির সারি, নীরব নিস্তব্ধ নত নেত্রে দাঁড়িয়ে— সামনের রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার চলাচলও বন্ধ, অমুসলমান পথিকেরাও এক পাশে দাঁড়িয়ে অবাক নেত্রে তাকিয়ে আছে ইমামের ঋষি-মূর্তির দিকে। প্রাত সূর্যের আলো ঝলমল শিশু-রৌদ্রে দীর্ঘ ঋজু দেহে দাঁড়িয়ে তিনি যখন তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত কণ্ঠে কেরাৎ পাঠ শুরু করতেন তখন হাজার হাজার মুসল্লি মন্ত্র-মুগ্ধবৎ কান পেতে শুনতে থাকত তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত ঐশী-বাণী— এ দৃশ্য ছবিতে ধরে রাখার লোভ আমার মনে বহুবার আনাগোনা করেছে, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। পিতা শরীয়ৎ পন্থী আলেম— শরীয়তের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। শরীয়তে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। আমার দ্বারা এমন কাজ হলে তিনি মনঃকষ্ট পেতেন— আমাকে কখনও মাফ করতেন কি-না সন্দেহ। আমার দ্বারা তাঁর মনঃকষ্টের কারণ যে কম


www.pathagar.com

হয়েছে তা নয়— কিন্তু কি জানি কেন এটি আর হয়ে ওঠে নি। তিনি মারা গেছেন ২১ ডিসেম্বর ১৯২৯— তখন ছবি তোলার সুযোগ-সুবিধারও এত ছড়াছড়ি ছিল না। ক্যামেরাকেঁধো যুবকদেরও আবির্ভাব ঘটে নি শহরে বন্দরে তখনো। এখন আলমদনী আর আলমক্কীদেরও ছবির যেভাবে ছড়াছড়ি দেখা যায় সে যুগে তা ছিল অকল্পনীয়। তখন ভালো আলেমরা ছবি তোলাতেন না জান গেলেও। বলা বাহুল্য তখন হজ্বে যেতেও লাগত না ছবি। ছিল না পাসপোর্টের হাঙ্গামা।

**নয়**

পিতামহকে আমি দেখি নি বটে কিন্তু পিতামহীকে দেখেছি। অবশ্য আমি ছোট থাকতেই তিনি মারা গেছেন। দেখেছি শেষ বয়সে শীতকাল এলেই তিনি পাগল হয়ে যেতেন। উলংগ পাগল নয় তবে সারা রাত ঘুমোতেন না, বক বক করে এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়াতেন। আলেমের স্ত্রী, আলেমের মা— এভাবে বেপর্দা ঘুরে বেড়ান বে-ইজ্জতী মনে করে তাঁকে মাঝে মাঝে ঢেঁকির সঙ্গে বেঁধে রাখাও হত। সে এক করুণ দৃশ্য। বাবা শহরে থাকতেন— আমার মেঝ চাচা তখনো জীবিত, তিনি তেমন লেখাপড়া জানতেন না, এসব তিনিই করতেন। বাবা এলে এসব করা সম্ভব হত না। তিনি কোনদিন পাগল মাকে একটি কড়া কথাও বলেন নি। শহর থেকে প্রায়ই দাদির জন্য আলাদা করে কিছু টাকা আর এটা ওটা খাবার জিনিস পাঠিয়ে দিতেন।

শুনেছি দাদির পিতৃকুলের কেউ তাঁর অংশটা আত্মসাৎ করার মতলবে তাঁকে চিলের মাংস খাইয়ে পাগল করে দিয়েছেন। কথাটার মধ্যে কোন সত্য আছে কি-না, চিলের মাংস খেলে মানুষ আদৌ পাগল হয় কি-না এসব আমার অজানা— এ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসও শিথিল। বাবারও বোধ করি এ সবে কোন বিশ্বাস ছিল না। এ সম্বন্ধে তাঁর মুখে কোনদিন কোন কথা শুনি নি আর তাঁর নানা বাড়িতে যাঁরা তখনো বেঁচেছিলেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং সম্বন্ধও ছিল সহজ আর স্বাভাবিক। আমার নানা বাড়ি গেলে তিনি ওদেরও খোঁজ খবর নিতেন। বলা বাহুল্য ওঁর আর আমার নানা বাড়ি এক গ্রামে। এমনকি আমার বড় ছেলের নানা বাড়িও। পাগল অবস্থায় দাদি— স্বেচ্ছায় কি অসাবধানতায় জানি না, দু'একবার আমাদের ঘরও জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য এক ঘরে আগুন লাগলে পাশাপাশি অন্য ঘরগুলিও রক্ষা পাওয়ার কথা নয়। এভাবে প্রতিবেশীদের যেসব ঘর পোড়া যেত বাবাকে তাদের স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ দিতেও দেখেছি।

চট্টগ্রামের পটিয়া আর সাতকানিয়া থানার মাঝখানে শঙ্ক নদী। শঙ্কের দক্ষিণ কূলে সাতকানিয়া আর উত্তর কূলে পটিয়া। মা গুলশান আরা দক্ষিণ পটিয়ার হাশিমপুর গ্রামের জান আলী মুন্সীর মেয়ে। শুনেছি নানা সে যুগে খুব প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। প্রতাপশালী যে ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মার নাকি ছোটকালে নানার এক চাচাতো ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কথাবার্তা পাকা, অলঙ্কারপত্র তৈরি, সবই ঠিক শুধু বিয়েটাই বাকি। হঠাৎ কি একটা অসুখে ছেলেটা গেল মারা। বিয়ে না হোক, তাঁর মেয়ের জন্যই তো অলঙ্কারপত্র তৈরি করা হয়েছে। অতএব এসব তাঁর মেয়েরই প্রাপ্য। এ


www.pathagar.com

অজুহাতে চাচাতো ভাই আর ভাইপোদের ধমক দিয়ে তিনি নাকি সব অলঙ্কার মার বিয়ের জন্য কেনা শাড়ি-ব্লাউজ পর্যন্ত আদায় করে নিয়েছিলেন তাঁর মেয়ের প্রাপ্য বলে। তবে মার গায়ে নাকি এ অলঙ্কার কোনদিন ওঠে নি। পরে মার বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী গাছবাড়িয়া গ্রামে। ওখানে একটি মেয়ে হওয়ার পর কি একটা ব্যাপারে নানা জামাই পক্ষের উপর ভয়ানক চটে যান এবং জোর করে ধমকের চোটে মেয়েকে নেন ছাড়িয়ে। এরপরই যথাসময় বাবার সঙ্গে হয় মার বিয়ে। বাবারও দ্বিতীয় বিয়ে— এর আগে তিনি মারই এক চাচাতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি স্বল্পকালের মধ্যে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। সেকালের দোর্দণ্ডপ্রতাপরা এমনিই ছিলেন— তাঁরাই আইন, তাঁরাই সমাজ, ছেলেমেয়ের মতামতকে তাঁরা যেমন গ্রাহ্য করতেন না তেমনি কোন আমলও দিতেন না অন্যের সুখ-সুবিধাকে। অন্যপক্ষ দুর্বল হলে তো কথাই নেই— তবে প্রশংসার কথা নানা তাঁর ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা দিয়েছিলেন। পিতামহের মতো মাতামহকেও আমি দেখি নি। দেখলেও তিনি আমার এত ছোটকালে মারা গেছেন যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই আমার স্মরণ নেই। নানি সম্বন্ধেও তাই। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই নানা বাড়িকে আমি মামা বাড়ি হিসেবেই জেনে এসেছি। তাতে অবস্থার কোন ইতর বিশেষ ঘটে নি। বরং মেজমামু আবদুর রউফ চৌধুরী আদর-যত্নে যেকোন আদর্শ নানাকেও ছাড়িয়ে যেতেন। আমি তো স্রেফ ভাগিনা তবুও ছাত্রাবস্থায় যখন ওঁদের বাড়ি গেছি তখন শুধু মুরগিতে তিনি খুশি হতেন না আস্ত খাসি জবাই করে ভোজের ধুম লাগিয়ে দিতেন। তাঁর মেজাজটাই ছিল আমিরী। বিয়েও করেছিলেন স্বগ্রামের বিখ্যাত ব্যক্তি বজলর রহমান নায়েব সাহেবের ভাইঝিকে। মামু পটিয়া কোর্টে পেস্কার ছিলেন— তখনো রেল বা মটর চলাচল শুরু হয় নি। প্রতি শনিবার ঘোড়ার গাড়ি করে পটিয়া থেকে হাসিমপুর এ আটদশ মাইল আসতেন আর সোমবার সকালে ফিরে যেতেন। জীবনের বেশির ভাগ এভাবেই কেটেছে তাঁর।

ছোট মামু মোক্তার আহমদ চৌধুরী প্রায় আমারই সমবয়সী— তিনি বি. এল. পাশ করে অল্পকাল মাত্র আইন ব্যবসায় করেছিলেন। পরে বি. সি. এস. কমপ্লিট করে সরকারি চাকরিতে ঢোকেন এবং সম্প্রতি সহকারী এক্সাইজ কমিশনারের পদ থেকে রিটায়ার করেছেন। দুই থানা হলেও কেঁওচিয়া আর হাসিমপুরের দূরত্ব মাইল পাঁচেকের বেশি নয়। ছোটকালে মার সঙ্গে পাল্কিতে চড়ে হাসিমপুর আমি বহুবার আনাগোনা করেছি। মাঝখানের শঙ্ক নদীটা দোহাজারী এসে পার হতে হত খেয়ায়। বদ্ধ পাল্কিটা বাহকরা খেয়া নৌকার মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে তারা দু'দিকে দাঁড়াত। বর্ষাকালে নদীটা যখন কূলে কূলে ভরা, জলস্রোতও তীব্র গতি তখন বুকটা দুরু দুরু করে উঠত— যদি হঠাৎ নৌকা উল্টে পাল্কিটা পড়ে যায় নদী-গর্ভে! কালেভদ্রে এমন ভরাডুবি যে না হত, তা নয়। তেমন অঘটনের কিছু কিছু গল্প শোনা ছিল বলে ভয়টা আরো বেশি হত। তাই নদী পার হওয়ার সময় আমি প্রায় পাল্কির ভেতরে থাকতাম না। মাই ঠেলে বের করে দিতেন।

মা সচ্চল আর অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, তবুও আমাদের গরিব ঘরে তিনি বেমালুম খাপ খেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শরীরটা বেঁটে ও খাটো ছিল, রঙও তেমন ফর্সা ছিল না। চালচলন খুব সরল আর সাদাসিদা ছিল। ইংরেজি বাংলার অক্ষর পরিচয়ও ছিল না— তবে কোরান শরীফ আর নমাজ দোওয়া ভালোভাবেই শেখা ছিল। বাবার জীবদ্দশায় মা


www.pathagar.com

কখনো শহরে আসেন নি। পরে আমি যখন শহরে সপরিবারে থাকতে শুরু করি তখন তিনি দু'একবার এসে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন শুধু। পাড়ার বিধবা আর বেওয়ারিশ মেয়েরা ছিল তাঁর খুব বাধ্য ও অনুরক্ত— তিনি প্রায় তাদের এটা ওটা দিয়ে সাহায্য করতেন। আর তারাও খাটত সব সময় তাঁর ফাইফরমাস। বলেছি আমাদের দেশের বাড়িতে কোন পুরুষ অভিভাবক ছিল না, তবুও মাকে কোন ব্যাপারে কোনদিন বেগ পেতে হয় নি। তাঁর হাট-বাজার সব কিছুই পাড়া প্রতিবেশীরা স্বেচ্ছায় করে দিত আর সবাই তাঁকে এক বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখত বলে হাটে-বাজারে যাওয়ার সময় তাঁর চাহিদা জেনে যাওয়া এটা একটা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল গ্রামে।

প্রতিবেশীদের মা-মরা কোন কোন ছেলেমেয়ে তাঁকে মা বলেও ডাকত। আর ওরা সারাজীবন পেয়ে এসেছে তাঁর কাছ থেকে মাতৃ-স্নেহ। আমার বড় বোন আর তার স্বামীর মৃত্যুর পর ওদের চার পাঁচটি নাবালক ছেলেমেয়ের ভার তাঁর উপর এসে পড়েছিল— ওদের খাওয়া-পরা, লালন-পালন, আদরযত্ন সবই তাঁকে একা নিজের হাতে করতে হত। ১৯৪৩-এর ১২ মে তাঁর মৃত্যু ঘটে— মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুর দিন পাড়ার দূর প্রান্তের নিসম্পর্কীয়া মেয়েদের এসেও কান্নাকাটি করতে দেখেছি। তাঁর কাছ থেকে ধার নিয়েছে অথচ তিনি বেঁচে থাকতে শোধ নিতে পারে নি আর যা ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অজানা মৃত্যুর পর এমন ধারও কেউ কেউ এসে আমার কাছে শোধ দিয়ে গেছে। মার সাংসারিক যোগ্যতা বিশেষ ছিল না আর বড্ড অগোছালো ছিলেন। দেখেছি এ হাঁড়িতে ও হাঁড়িতে, এখানে ওখানে, বেড়ায়, তাকে, কাপড়ের পুটুলিতে টাকা-পয়সা অলঙ্কারপত্র গুঁজে রাখতেন। বাক্স পেটরায় কোন দিন তালাই লাগাতেন না। পাড়ার অনেক মেয়েই তাদের যা কিছু অল্প স্বল্প গোপন সঞ্চয় তাঁর কাছে এনেই তা গচ্ছিত রাখত। তিনিও এ হাঁড়ি কি ও হাঁড়িতে তা ফেলে রাখতেন। চাইলেই খুঁজে বের করে দিতেন।

একবার এক মেয়ে এভাবে তাঁর কাছে কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছিল। যা তাঁর স্বভাব না গণেই তিনি পোঁটলা বাঁধা টাকা খোলা সিন্ধুকের ভিতর একটা হাঁড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। কয়েক মাস পরে মেয়েটি যখন এসে টাকাটা ফেরৎ চাইল, না গণেই মা পোঁটলাটা ওর হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েটিও না গণে পোঁটলাটি আঁচলের নিচে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

পাঁচ ছ' মাস পরে হঠাৎ কি জন্য তিনি ঐ হাঁড়িতে হাত দিয়ে দেখেন তলায় গোটা দুই রূপার টাকা পড়ে আছে। তাঁর সন্দেহ হল এ টাকা দু'টা নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটারই, কিভাবে হয়তো পোঁটলা থেকে পড়ে গেছে। মুস্কিল হল এ আবিষ্কারের কয়েকদিন আগে ঐ মেয়েটি গেছে মারা। ওর শ্বশুর বাড়ি, যেখানে ও মারা গেছে তা আমাদের পাড়া থেকে কয়েক মাইল দূরে।

এর পর মা আমাকে কয়েকবারই বলেছেন শহরে আসা-যাওয়ার সময় ছলিমার (ঐ মেয়েটির নাম) স্বামী বা ছেলেকে তুমি দু'টি টাকা দিয়ে দিয়ো, বলো ছলিমা আমার কাছে পেত।


www.pathagar.com

বারবার বলা সত্ত্বেও আমি বড্ড গা লাগাই নি মার কথায়। যাওয়া আসার বেলায় গতির মুখে কে আবার থেমে খোঁজাখুঁজি করে।

কিছুদিন পর তিনি যখন শেষ বারের মতো রোগে পড়লেন, তখন অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে দুটা টাকা আমার হাতে দিয়ে বল্লেন— তুমি তো কাল বৌ-মাকে আনতে পটিয়া (তখন যুদ্ধের কারণে আমার স্ত্রী পটিয়া ছিল) যাবে বলছ, শুনেছি ছলিমার ছেলে দোহাজারীতে কাজ করে, যাওয়ার সময় ওকে খুঁজে বের করে টাকা দু'টা নিশ্চয়ই দিয়ে দেবে। এ টাকা দেওয়া না হলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

যাই হোক, এবার ছেলেটাকে খুঁজে বার করে টাকা দু'টি আমি দিয়েছিলাম।

সাংসারিক কাজে মা কিন্তু মোটেও পটু ছিলেন না। একটা মুরগি জবেহ করলেও যেন একা সামলাতে পারতেন না। প্রতিবেশিনীদের ডাকতেন সাহায্য করতে। একজন মেহমান এলেও দিশেহারা হয়ে পড়তেন— নিতে হত এর ওর সাহায্য। ঈদে পরবে তো কথাই নেই।

তবে একটা সহজ জীবন বোধ ছিল তাঁর! খুব সহজে বড় বড় বিপদেও উতলা হয়ে পড়তেন না। আমার ছোটকালে আমাদের বাড়ি ঘর দু'বার আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দেখেছি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। জ্বলন্ত বাঁশের টুকরা বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে মা নিজের ছোট ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে কোন বড় গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন নির্বিকার চিত্তে। এ অবস্থায় সাধারণত মেয়েরা এটা ওটা বাঁচাবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে। মাকে তেমন করতে কোনদিন দেখি নি। তাঁকে জীবনে মৃত্যু শোকও কম পোয়াতে হয় নি। স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে চোখের সামনে, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মৃত্যু ঘটেছে তাঁর মেজ ভাইয়ের, মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে বড় জামাই ও বড় মেয়ের মৃত্যুও তাঁকে দেখতে হয়েছে, দেখতে হয়েছে ছোট মেয়ের বৈধব্য। একে একে দুই পুত্র বধূর মৃত্যুও তিনি দেখেছেন। এসব আঘাতে সাময়িকভাবে তিনি যে মুষড়ে পড়েন নি তা নয়, তবে সব রকম শোক ও দুঃখ কাটিয়ে বাস্তবতার সম্মুখীন হতেও তাঁর দেরি লাগত না। তাঁকে কখনো দেখি নি ধৈর্য হারাতে কি বেসামাল হয়ে পড়তে।

## দশ

হাফেজ আবদুল্লার বাড়িতে আমি কয়েক মাস থাকার পর বাবা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি নিজেও থাকছেন খাচ্ছেন সঙ্গে আবার ছেলেও একটা। এঁরা কিন্তু আমাকে পেয়ে খুবই খুশি। হাফেজ আবদুল্লার তিন ছেলে। তিনজনই প্রায় আমার কাছাকাছি বয়সের। কাজেই আমার খেলার সাথীর কোন অভাব হলো না। আর ওদেরও একজন বাড়ল। আবদুল্লা-গিন্নী যেহেতু তাঁর ছেলেরা আমাকে চাচা ডাকে সে সুবাদে আমাকে মনে করতে লাগলেন তাঁর এক ছোট দেবর। তিনি ছিলেন চিররুগ্না, সারা দিনরাতই শুয়ে থাকতেন বিছানায়। আমাকে প্রায় তাঁর বিছানার পাশে বসিয়ে খাওয়াতেন। অসুখ-বিসুখ হলে তাঁর ঘরেই আমার বিছানা পড়ত।— বাইর বাড়িতে আমাকে কিছুতেই একা পড়ে থাকতে দিতেন না।


www.pathagar.com

এঁদের এত আন্তরিক স্নেহ যত্ন সত্ত্বেও বাবা এক বাড়িতে আমাদের দু'জনের ফ্রি খাওয়া সহজ মনে নিতে পারলেন না। আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ-গিন্নীর সব রকম আপত্তি অগ্রাহ্য করে বাবা পালাক্রমে পাশের এ বাড়ি ও বাড়িতে আমার খোরাকি খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন অর্থাৎ যাকে বলে 'খরচা দিয়ে মেহমান হওয়া' এবার আমি তাই হলাম। কিন্তু অচিরে দেখা গেল কোন বাড়িতেই স্কুল টাইমে রান্না হয় না— রোজই আমি লেট্ হতে লাগলাম। ঐসব কোন বাড়িতেই আমার মতো স্কুল-গামী ছেলে ছিল না আর এমনিও শহরের লোকেরা একটু দেরিতে খায় তাই মেয়েরা রান্নাও চড়ায় বিলম্বিত আয়েশে।

অগত্যা বাবা এবার জুমা মসজিদের নিচে হাসপাতালের আউটডোরের সামনাসামনি ইয়াসিনের হোটেলেই আমার খোরাকি খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ইয়াসিনও নামাজী মানুষ আর বাবার ভক্তদের অন্যতম। ভাতের সঙ্গে ডাল আর কিছুটা দোপেয়াজাই সালন হিসেবে নিয়মের বরাদ্দ। ভাত পেট মাপা কিন্তু ডাল তরকারি পেয়ালার মাপে। তবে ইয়াসিন মাঝে মাঝে দয়াপরবশ হয়ে সহকারীকে হুকুম দিতেন ইমাম সাহেবের ছেলেকে একটুকরা কোর্মাও দাও। কোর্মার টুকরাটা অবশ্য ফাউ। তার সঙ্গে সোয়াবের নিয়ত মিশে থাকা অসম্ভব নয়। আজ ইয়াসিন নেই— নেই তার সে হোটেলও। আশা করি ইমাম সাহেবের ছেলেকে বিনা পয়সায় কোর্মা খাওয়াবার সোয়াবে তার বেহেস্ত নসীব হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকে শুরু হলো আমার জায়গির থাকা। মাদ্রাসা এবং বাবার বাসার মাঝামাঝি চন্দনপুরে জুটে গেল জায়গীরও একটা। গৃহকর্তা কলাইওয়ালা অর্থাৎ তামা, পিতল, দস্তা ইত্যাদির হাঁড়িপাতিল, লোটা-বদনা কলাই করা ছিল তাঁর পেশা। বড় রাস্তার ধারেই তাঁর দোকান— সে দোকানেরই এক ধারে আমারও থাকার ব্যবস্থা। পেছনে উঠান পেরিয়ে আন্দর বাড়ি। বাড়িওয়ালার একটি আট দশ বছরের মেয়েকে সকাল বিকাল আমপারা পড়ানোই আমার কাজ। বিনিময়ে ফ্রি থাকা-খাওয়া। দেখা গেল একখানা তক্তপোষই আমার একমাত্র নিজস্ব এলেকা— তার উপর বসে আমার নিজের পড়া, ছাত্রীটিকে পড়ানো, ভিতর থেকে টিনের বাসনে করে আমার জন্য যে ভাত-সালন আসে তা খাওয়া আর রাত্রে ঘুমানো— এ চার কাজই করতে হত। বইর নাম 'একের ভিতর চার' দেখেছি, আমার তক্তপোষ খানার নাম 'একের উপর চার' রাখলে কিছুমাত্র বেমানান হত না। সহপাঠিদের কেউ দেখা করতে এলে তাকেও বসাতে হত ঐ তক্তপোষেরই উপর। তখন ওটা সাময়িকভাবে হয়ে পড়ত 'একের উপর পাঁচ'। শুনেছি 'একের ভিতর পাঁচ'ও বেরিয়েছে। এক ঢিলে পাঁচের যুগ পেরিয়ে আমরা এখন এক ঢিলে বহুর যুগের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। কলাই কাজের অপরিহার্য অঙ্গ হাপর থেকে আমার তক্তপোষখানার দূরত্ব দু'কদমের বেশি ছিল না, তামা পিতলের কিছু হাঁড়ি ডেকচি ছাড়া মাঝখানে ছিল না কোন ঘেরা বা পর্দার বালাই। উপরে চালে টিন নিচে হাপরের দগদগে আগুন— গরমের দিনে দোজখের আঁচ যে ভালো করেই পেতাম তা বোধ করি না বল্লেও চলে। হাপরে যখন পাম্প দেয়া হত তখন ঘরময় উড়তে থাকত ছাই— আমার বইপত্র কাপড়-চোপড় বিছানা মায় দেহটা পর্যন্ত ছাইময় হয়ে যেত। ফাউ কারবার হিসেবে কলাইওয়ালার একটা লাকড়ির দোকানও ছিল পাশে। অনেক সময় তাঁর ও তাঁর সহকারীর অনুপস্থিতিতে আমাকে উঠে গিয়ে লাকড়ি মেপে দিয়ে পয়সা নিতে হত।


www.pathagar.com

এ সত্ত্বেও জায়গীরে এসে, পিতার কঠোর শাসনের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাধীনতার যে আস্বাদ পেলাম মনের পালে হাওয়া লাগাতে তাই ছিল যথেষ্ট। ফলে পরিবেশের দুঃখকে সেদিন দুঃখ বলেই মনে হয় নি তার উপর আমার ছাত্রীটি ছিল দেখতে সুন্দরী। আমি তখন সদ্য কৈশোরে পা দিচ্ছি— ভিতরে আর এক অদৃশ্য হাত আমার চোখে নারী সৌন্দর্যের অঞ্জন শলাকা যেন ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিচ্ছিল। বোধ করি এ প্রথম একটি নতুন চেতনা ও কৌতূহল ঊষার প্রথম রশ্মিপাতের মতো আমার মনের আয়নায় উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। হয়তো তাই জুগিয়েছিল কিছুটা অতিরিক্ত আকর্ষণ— যার ফলে অসহনীয় পরিবেশও হয়তো সহনীয় হয়ে উঠেছিল অল্প কয়দিনে। চন্দনপুরা থেকে আমার মদ্রাসা, মদ্রাসার খেলার মাঠ আর পেরেড ময়দান এ-তিন খুব কাছে আর এ তিনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। প্রধান কর্তব্য অর্থাৎ লেখাপড়ার জন্যে মাদ্রাসায় যেতেই হত। বিকেলে খেলার জন্য ছুটতাম পাহাড়ের নিচে মাদ্রাসার নিজস্ব মাঠে আর খেলা দেখার জন্য পেরেড ময়দানে। তখন চট্টগ্রামের সব বড় বড় ফুটবল প্রতিযোগিতা পেরেড ময়দানেই হত। নিজে খেলার চেয়ে খেলা দেখাও সেদিন কম লোমহর্ষক ছিল না আমার কাছে। এসব কারণে গরমের দিনে প্রায় আধ-ভাজা হয়ে গেলেও চন্দনপুরার জায়গীর-জীবন আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছিল।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠার পর বাবা একদিন ডেকে বল্লেন : এবার তোমাকে কাজীর দেউড়ি 'মীর এহায়া' বাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। ওরা বড্ড পীড়াপীড়ি করছে। কাজ কিছুই না, ওদের একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে মাদ্রাসায় নিয়ে যাবে আর ছুটির পর সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসবে। ওটাও জায়গীর, তবে দায় কম।

চন্দনপুরার মায়া এবার ছাড়তে হল। বাবা সঙ্গে করে পৌছে দিলেন কাজীর দেউড়ির 'কাজী বাড়ি' যার পুরোনো নাম 'মীর এহায়া বাড়ি'। সেদিন বোধকরি আমার দু'কাঁধের ফেরেস্তারাও জানত না এখানে এসে আমি আরো অধিকতর মায়ায় আটকা পড়ে যাব এবং কালক্রমে নানা অবস্থা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে হয়ে পড়ব এ মহল্লারই স্থায়ী বাসিন্দা।

মীর এহায়া ওয়াকফ এস্টেটের গোড়াপত্তন আমার জানা নেই। তবে শুনেছি নবাবী আমলের এক সনদের ফলেই এ এস্টেটের সৃষ্টি, যা পরে ইংরেজ সরকারেরও পেয়েছিল স্বীকৃতি। এ পরিবার এক কালে পরহেজগারী ও বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বহু মাদ্রাসা-ছাত্র এ বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত— আমি যখন আসি এমন জায়গীর থাকা ছাত্র দু'একজন তখনো ছিল। মুসাফির বা প্রার্থীকে বিশুহস্তে কিম্বা অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না এ বাড়িতে। মীর এহায়া মাদ্রাসা নামে এক মাদ্রাসাও পরিচালিত হত এ বাড়ির অর্থে, পরে তা চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। তখনো ঐ মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য মীর এহায়া এস্টেট থেকে বার্ষিক কয়েক শ' টাকা সাহায্য দেয়া হত এবং মাদ্রাসার জুনিয়র সেক্সনের নামও ছিল এ পরিবারের নামানুসারে 'মীর এহায়া মাদ্রাসা'। পরে মাদ্রাসা শিক্ষায় যখন ওলটপালট ঘটে অর্থাৎ যখন নিউস্কিম রীতি চালু হয় তখন ঐ নামের ঘটে অবলুপ্তি। শুনেছি এখনো চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কয়েকটি 'মীর এহায়া বৃত্তি' দেয়া হয় আর এ দেয়া হয় মীর এহায়া ফান্ডের সঞ্চিত অর্থ বা তার সুদ থেকে। আমি যখন মাদ্রাসায় প্রথম ভর্তি হই


www.pathagar.com

তখনো মাদ্রাসার ঐ বিভাগের পূর্ব নাম অর্থাৎ 'মীর এহায়া' অব্যাহত ছিল আর আমি যখন প্রথম এ বাড়িতে আসি তখন দেখি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বাড়ির রীতিমতো মোকদ্দমা চলছে— মীর এহায়া এস্টেট থেকে মাদ্রাসাকে যে বার্ষিক সাহায্য দেওয়া হতো তার দেওয়া না-দেয়া নিয়ে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দাবী মীর এহায়া এস্টেটের সনদ অনুসারে ঐ টাকা মাদ্রাসার প্রাপ্য আর এস্টেটের তখনকার মুতাওয়াল্লীদের যুক্তি— মীর এহায়া মাদ্রাসা আর ঐ নামেরই যখন এখন কোন অস্তিত্ব নেই তখন তাঁরা এ টাকা দিতে বাধ্য নন।

বিচারে শেষ রায় কি হয়েছিল আমার জানা নেই। তবে টাকা এঁরা আর দেন নি। সম্ভবত নিউ স্কিম চালু হওয়ার পর থেকে মাদ্রাসা সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত হচ্ছিল বলে সরকার নিজেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল অথবা যে অধ্যক্ষের উদ্যোগে এ মোকদ্দমা করা হয়েছিল তিনি অর্থাৎ কামালউদ্দীন সাহেব অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় এ নিয়ে মাথা ঘামাবার লোকই ছিল না। ফলে মোকদ্দমাটা শেষ পর্যন্ত ফাইলস্থ হয়েই থাকল। মীর এহায়া বংশের কেউ একজন হয়তো পরে কাজীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে কোন এক সময় এ বাড়ির নাম 'কাজী বাড়ি' আর গোটা মহল্লার নাম কাজীর দেউড়ি হয়ে পড়ে। আজো এ দু'য়ের এ নামই প্রচলিত। এ মহল্লার অধিকাংশ জমিজমার মালিকও এ পরিবার।

কাজী বাড়ির বিরাট চৌহদ্দি। সামনে গম্বুজওয়ালা পাকা মসজিদ, মসজিদের সামনে বড় পুকুর, পাশে পারিবারিক গোরস্থান। আন্দর বাড়ির দেওয়ালগুলি পাকা বটে কিন্তু চাল বাঁশ শণের। যে বাইর বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো সেটাও আগাগোড়া কাঁচা। গোয়ালঘর রান্নাঘর তো বটেই। বাড়ির কোথাও বিলাস-দ্রব্য বা দামি আসবাবপত্র দেখি নি। মনে হয় এ পরিবার চিরকাল সাদাসিদা জীবন যাপনই করে এসেছে। এমন শহরের বাড়িতে চার চারটা পুকুর কল্পনাই করা যায় না। আমি যখন এসেছি তখন একটা পুকুর ভরাট হয়ে গেছে, তাতে তখন তরিতরকারি ফলানো হচ্ছিল। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে অসংখ্য ফলফলারের গাছ. চারদিকে লিচু বাগান— আমকাঁঠালেরও অন্ত নেই। গ্রাম দেশে দুষ্প্রাপ্য সফেটা, বিলেতি গাব, বেলম্বু প্রভৃতিও প্রথম এ বাড়িতে এসেই আমি দেখি আর স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পাই। এ বাড়ির কে এক দুঃসাহসী আঙ্গুর ফলাবার চেষ্টাও নাকি করেছিলেন সে যুগে, আমি এসে তার শুধু লতাই দেখেছি। শুনেছি আঙ্গুর ফলে নি। আমাদের দেশে সব ঋতুর সব ফলই এ বাড়িতে ফলতে দেখেছি. দেখেছি মানে চেখেছি আর চেখেছি মানে অপর্যাপ্ত খেয়েছি।

### এগার

আমার জন্য এ যেন অন্য পৃথিবী। হাপরের উষ্ণমণ্ডল থেকে একেবারে গাছ-গাছড়া-পুকুরে ঘেরা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এসে পড়া। শহর এবং গ্রাম যেন এ বাড়িতে এসে হাত মিলিয়েছে। সাঁতার কেটে গোসল করি পুকুরে অথচ খাই কলের পানি. আছি শহরে অথচ খেতে পাচ্ছি পুকুরের তাজা মাছ আর ক্ষেতে উৎপন্ন সদ্য তোলা তরিতরকারি। ঘুম থেকে উঠে পান্তাভাতের বদলে খাচ্ছি গরম গরম চা বেলা কি কুকিজ নামক বিস্কুট দিয়ে। কুকিজ


www.pathagar.com

ইংরেজি নাম বেলা কিন্তু খাস চাটগেঁয়ে। ঐ বিস্কুট তৈরিতে চন্দনপুরার বেলায়েত আলী বিস্কুটওয়ালার নাকি কোন জুড়ি ছিল না, ফলে এ বিস্কুটের সঙ্গে সঙ্গে তার নামও হয়ে গেছে অমর।

শহরে আছি অথচ গ্রামের সুখসুবিধা পুরোপুরিই ভোগ করছি এমন দুর্লভ সুযোগ জীবনে খুব কমই জোটে। এ বাড়িতে এসে আমি সে সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমি যখন আসি তখন মূল পরিবারের এক বিধবা আর তাঁর এক মেয়েই শুধু বর্তমান। এঁরা মা-মেয়ে পর্যায়ক্রমে মীর এহায়া এস্টেটের মালিক বা মোতাওয়াল্লী হন। আমার পিতাও এ বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছেন। নানা বাড়ির সম্পর্কে এ বাড়ির পুরুষরা বাবার আত্মীয় ছিলেন আর বিয়ের সূত্রেই তাঁরা পেয়েছেন এ বাড়িতে মালিকের আসন। জমিদারী তাঁরা চালাতেন বটে কিন্তু যাবতীয় কাজ-কারবার চলত মোতাওয়াল্লীর নামে। আমি এসে রমিজউন্নেসা চৌধুরাণীকে মোতাওয়াল্লী দেখতে পাই, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা পূর্বতন জমিদার বা মোতাওয়াল্লীর শেষ বংশধর মাহমুদা খাতুন চৌধুরাণী মোতাওয়াল্লী হন। এঁরা মা-মেয়ে দু'জনেই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শেষোক্তার স্নেহের কোন তুলনা হয় না। প্রথমদিন থেকে ধীরে ধীরে এমন এক অচ্ছেদ্য স্নেহের বাঁধনে তিনি আমাকে বেঁধেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তা অটুট ছিল। এরি ফলে এবং তাঁর বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে, পরবর্তী জীবনে তাঁর কনিষ্ঠা মেয়ে নূরজাহানের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। স্বামী ও স্বামীপক্ষের প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করেই তিনি এ বিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিয়েতে উভয় পক্ষের অভিভাবক স্থানীয় কেউ উপস্থিত ছিল না, আমার বাবা অবশ্য এর কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো আমার পক্ষে এ বিয়ে করা সম্ভব হত না। আমি শহরে বিয়ে করি এটা তিনি চান নি— গ্রামের বাড়িতে মা একা থাকেন, শহরের মেয়ে গ্রামদেশে গিয়ে থাকতে চাইবে না, তা হলে মার নিঃসঙ্গতার অবসান জীবনে কোনদিনই ঘটবে না তাঁর আপত্তির এ ছিল মূল কারণ।

কিন্তু মাহমুদা খাতুন চৌধুরাণীর সর্বগ্রাসী স্নেহ আমাকে তাঁর কাছে প্রায় পুত্রাধিক করে তুলেছিল। তাঁর ছেলে-মেয়েরাও আমাকে বড় ভাই বলেই জানত আর সেভাবে করতো ব্যবহার। এমন কি নূরজাহানের সঙ্গে বিয়ের পরও ওরা কেউ আমাকে ভগ্নিপতি মনে করত না, মনে করত আমি ওদের এক বড় ভাই। আজো এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

ম্যাট্রিক বা হাই মাদ্রাসা পাস করে আমি যখন ঢাকায় পড়তে চলে যাই— ছুটিছাটায় বাড়ি এলে নিজের বাড়িতে এক সপ্তাহ থাকলে এ বাড়িতে কাটাতে হত দু'সপ্তাহ। তা না হলে মাহমুদা খাতুন চৌধুরাণী কিছুতেই খুশি হতেন না, মনে আঘাত পেতেন। একবার অসুখের সময় তিনি আমার ডান হাতখানি তাঁর উত্তপ্ত কপালের উপর রেখে বল্লেন : তুমি আমাকে শুধু মা বলে জানবে তা নয়, মা বলে ডাকবেও। আমার মাথায় হাত রেখে ওয়াদা করো। করতেই হল ওয়াদা। এহেন মানুষের ইচ্ছা ও আগ্রহ আমি প্রত্যাখ্যান করি কি করে?

এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাঁর খিটিমিটিও কম হয় নি। কৈশোর ও যৌবনের শুরুতে এক সঙ্গে বড় হওয়ার ফলে নূরজাহান ও আমার মধ্যে কিছুটা ব্যক্তিগত আকর্ষণেরও যে সঞ্চার হয় নি তা নয় এবং তা অজানা ছিল না আমরা উভয়ের কারো। বলা বাহুল্য আমি ঢাকা-


www.pathagar.com

কলকাতা চলে গেলেও এ বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনো বিচ্ছিন্ন হয় নি। মাহমুদা খাতুন চৌধুরাণীর স্নেহের অন্তরালে ফল্গুধারার মতো এ আকর্ষণ যে সক্রিয় ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নূরজাহান সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী ছিল কিন্তু বিয়ের বছর দুই আগে ওদের পরিবারে সবার একবার বসন্ত হয়েছিল, ওর হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। ফলে ওর মুখশ্রী কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়। তখন ওকে বিয়ে করাটা আমার কাছে আরো বেশি নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। আমার জন্যই তো ওর বিয়ে বিলম্বিত হয়েছে। আমাকে কেন্দ্র করে মাতৃস্নেহ প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ালে এ রোগের শিকার হওয়ার বহু আগেই তো ওর বিয়ে হয়ে যেত। তাই আমি ও আমার তরফের কোন বাধাকেই আর আমল দিই নি।

তা সত্ত্বেও মনে দ্বিধা যে কিছু ছিল না, তা নয়। একদিকে ইচ্ছা ও দায়িত্ববোধ, অন্যদিকে দ্বিধা— পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বে মনের যে এক ত্রিশঙ্কু অবস্থা ঘটে এবার তার প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ ঘটল আমার। এর আগে এমন দোটানায় কখনো পড়ি নি। আমি মাতা-পিতার একমাত্র ছেলে— বাবা বেঁচে না থাকলেও তাঁর ইচ্ছা আমার অজানা ছিল না আর মা তো বেঁচেই আছেন, তাঁদের মতামত উপেক্ষা করে আমি মনের ভেতর কিছুতেই সহজ হতে পারছিলাম না। তার উপর তখন আমি বি-এ. বি-টি আর সাহিত্য ক্ষেত্রেও লাভ করেছি কিছুটা পরিচিতি। স্বভাবতই তখন আমার মনে একটু লেখাপড়া জানা মেয়ের কথাই আনাগোনা করছিল। নূরজাহান কঠোর পর্দানশিন পরিবারের মেয়ে, লেখাপড়ার— বিশেষ করে বাংলা লেখাপড়ার কোন সুযোগই পায় নি। ওর লেখাপড়ার বয়স হতে হতে ম্যাট্রিক পাস করে আমি চলে গেছি ঢাকায়। এ কারণে ওর লেখাপড়ায় সাহায্য করা আমার দ্বারাও হয় ওঠে নি। আমার দ্বিধার মূলে এসব কারণও সক্রিয় ছিল। শেষকালে আমি যে সব দ্বিধা জয় করতে পেরেছিলাম তার একমাত্র কারণ— মাহমুদা খাতুন চৌধুরাণী। তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেন নি সত্য কিন্তু গর্ভধারিণী জননীর চেয়ে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ কিছুমাত্র কম ছিল না।

বলেছি তখনো শহরের এ অঞ্চল বিরল বসতি। এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়াভাবে যে কয় ঘর ছিল তাদের সবারই পেশা ছিল সাহেবদের খানসামা আরদালি বা বাবুর্চি ইত্যাদি হওয়া। ধারে কাছে কোন দোকান পাটই ছিল না তখন। আর একদিক থেকে এ ছিল সাহেব পাড়া— সাহেব মানে বিলেতি সাহেব। তখন চাটগাঁয় অসংখ্য সাহেব— সরকারি সব কর্মচারী তো বটেই, তার উপর রেলে, কাস্টমসে, বি. ও. সিতে ছিল এন্তার সাহেব। আর তারা বাস করত আশেপাশের সব পাহাড় ও উঁচু টিলার চূড়ায় চূড়ায়। সাহেবদের ক্লাবটার অবস্থানও এ পাড়ায়, খেলার মাঠটা তো আমার বাসার সামনেই— এ মাঠের উপরই পরে তৈরি হয়েছে নিয়াজ স্টেডিয়াম। মাঠটাকে স্থানীয় লোকেরা বলতো জংলী পল্টন। এদিকে তখন খুব জংগল ছিল— বলেই কি এ নাম, না জনসাধারণের মুখে জংগী কথাটা জংলী হয়ে গেছে তা আমার অজানা। শুনেছি এক সময় জংগী অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ চলত এ মাঠে। পল্টন কথাটাও সামরিক। শেষোক্ত ধারণাটা অধিকতর সত্য মনে হয়। কাগজে কলমে মাঠটা নাকি আজো সামরিক বিভাগের এক্তেয়ারে। তখন এ মাঠেই চলতো সাহেব মেমদের হরেক রকম খেলা— টেনিস, গলফ আর ক্রিকেট— এ ছিল একেবারে রুটিন মাফিক। পাড়ার বাচ্চারা টেনিস বল কুড়িয়ে


www.pathagar.com

দিয়ে আর সাহেব মেমদের পেছনে পেছনে গলফ্ খেলার লাঠিভর্তি ব্যাগ বয়ে রোজ সিকি আধুলিটা পেয়ে যেত। এখন যেটাকে সার্কিট হাউস বলা হয় তখন সেটাকে বলা হত লাট সাহেবের বাড়ি। কথা ছিল বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ব বাংলার গভর্নর বা লাট সাহেব বছরে কয়মাস এখানে এসে কাটাবেন সে উদ্দেশ্যেই বাড়িটা করা। এ নামের উৎপত্তিও সেখান থেকে। পরে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল বটে কিন্তু তৈরি বাড়িটা রয়ে গেল আর তার নামেরও স্মৃতি।

এখন যেখানে স্টেডিয়ামের বাগান করা হয়েছে সেখানে ছিল এক টিলা, তার উপর থাকত টাউন সার্জেন্ট। আজ টিলা এবং সার্জেন্টের বাংলো দুই-ই নিশ্চিহ্ন। স্টেডিয়াম তৈরির সময় সব কেটেকুটে সমান করে ফেলা হয়েছে। তখন সার্জেন্ট মানে গোরা সার্জেন্ট। আমার ছোটকালে এক সার্জেন্টকে দেখেছিলাম তিনি নিজে ছিলেন গোরা। আসল কি এংলো আজ আর তা স্মরণ নেই কিন্তু তাঁর মেম সাহেবটি ছিলেন খাঁটি আলকাৎরা রঙের। শুনেছিলাম তাঁর আসল মেমের মৃত্যুর পর তিনি হাতের কাছে যাকে পেয়েছেন অর্থাৎ যে মেথরানি তাঁর ঘরে রোজ ঝাড়ু দিত তাকেই বিয়ে করে ফেলেছেন এবং গাউন পরিয়ে মেম সাহেব বানিয়ে দুধ-এর স্বাদ ঘোলে মিটাচ্ছেন। চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের সামান্য পশ্চিমে বটতলি লেবেল ক্রসিঙের কাছে তখন একটা মেথর পট্টি ছিল— ঐ পথে যাওয়া আসার সময় দেখতাম সাত আট বছরের একদম মেম সাহেবের বাচ্চার মতো সাদা একটি মেয়ে মেথর পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওদের মতো ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে খেলা করছে— রং তার সাদা, চোখ নীল, চুল সোনালি। অন্যদের সঙ্গে চেহারায় কোন রকম মিলই নেই তার। আশ্চর্য. মায়ের সে কিছুই পায় নি। সার্জেন্ট অন্তত মেথরানিকে পাটরানী না করলেও করেছেন দুয়োরানী আর এ মেয়েটির জনক হয়তো দিয়েছেন সাগর পাড়ি। কৌতূহলী পথ যাত্রীরা মেয়েটিকে দেখে হয়তো ভাবত— 'কাকের বাসায় কোকিল ছানা।' যত সাহেব তত মেম না থাকার এ পরিণতি দেখে মনে হয় দেহের ব্যাপারে 'কিবা হাড়ি কিবা ডোম' কথাটার সঙ্গে 'কিবা চামার কিবা মেথর' কথাটাও যোগ হওয়া উচিত। সভ্যতার শত প্রলেপ সত্ত্বেও আদিম ব্যাপারে মানুষ যে এক তাতে সন্দেহ নেই।

শীতকালে এ কাজীর দেউড়ি অঞ্চলে নাকি প্রায়ই বাঘ নামত। কাজী বাড়ির গোয়াল ঘরে ঢুকেও দু'একবার নাকি গরু মেরেছে বাঘে। অনেক শীতের রাতে বাইরে পাতা নড়ার শব্দে গা ছম ছম করে উঠত। বিশেষ করে যেদিন একলা থাকতে হত আমাকে দেউড়ি ঘরে। টাইগার পাসে খাঁচা পেতে বাঘ ধরতে আমরাই দেখেছি। কাজেই ভয়টা একেবারে অমূলক ছিল না। কনকনে শীতের সময় মাঝে মাঝে বাঘের ডাক ভেসে আসত নাসিরাবাদের পাহাড় অঞ্চল থেকে। শুনেছি বাঘ এক লাফে বাইশ হাত যেতে পারে আর হরিণ পারে তেইশ হাত। মাত্র এক হাতের জন্য বাঘ হরিণের নাগাল পায় না. না হয় কবেই হরিণ নির্বংশ হয়ে যেত! টাইগার পাস আর কাজী বাড়ির দূরত্বও বড় জোর কয়েক শ' হাত। দয়া করে কয়েকটা লংজাম্প দিলেই তো সাক্ষাৎ যমরাজ একদম কাজী বাড়ির উঠোনের মধ্যেই পৌছে যাবে।

এসব সংখ্যার প্রতি তখন মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বলে ভয়টাও মনের ভেতর


www.pathagar.com

বাইশ হাত তেইশ হাত লাফ মারত। পাকিস্তান হওয়ার আগে থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল কাটা। এখন তো আট দশ মাইলের মধ্যে ঝোপঝাড় নিশ্চিহ্ন। দূর দূর পাহাড়ের মাথায়ও উঠে গেছে বড় বড় বাড়ি। বাঘের কেন, এখন চট্টগ্রাম শহরে শিয়ালের ডাকও দুর্শ্রাব্য।

আমার জীবনের উত্তমাংশ শুধু নয়, বেশির ভাগই এ অঞ্চলে কেটেছে— মনে হয় বাকিটাও এখানেই কাটবে। তাই এ অঞ্চলের কথা কিছুটা বেশি করে কলমের মুখে আসা বিচিত্র নয়।

সব রকমে কাজী বাড়ি হয়ে উঠেছিল, আমার নিজের বাড়ি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত সামনের মসজিদটা। চোখের সামনে অমন জলজ্যান্ত পাকাপোক্ত মসজিদ— যে মসজিদের পাশের দেউড়ি ঘরে আমি থাকি আর সামনের পুকুরটায় রোজ সাঁতার কেটে গোসল করি তাকে আমল না দিই কি করে? আর ওটাতো নীরব হয়ে থাকে না। পাঁচ বেলা উচ্চ স্বরে ডাকতে থাকে। কিশোর বয়সের অমন সাধের গভীর সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে প্রায় রাত থাকতেই পাক-মসজিদটাই যেন দরাজ গলায় হেঁকে উঠত : 'ঘুমের চেয়ে নমাজ ভালো'। কাজেই ঘরে থাকলে ঐ ডাকে সাড়া দিতেই হত। তার চেয়েও অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তাম যখন মোয়াজ্জেন কোন কারণে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন আমাকে গিয়েই আজান দেয়ার দায় ঠেকাতে হত। তখন নেহাৎ মরীয়া হয়ে বিশ্ববাসীর কাঁচা-পাকা ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমাকেই আওয়াজ তুলতে হত— 'ঘুমের চেয়ে নমাজ উত্তম।' অথচ মনে মনে বেশ ভালো করেই জানতাম ভোর রাত্রির ঘুমের চেয়ে আরামের চীজ বিশ্ব দুনিয়ায় আর কিছুই নেই। কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্র হয়ে তার উপর জায়গীরে থেকে সে কথা তো মুখ খুলে বলা যায় না। যখন উপরের দিকে উঠেছি তখন মাঝে মাঝে ব্যাপারটি প্রায় দুঃসহ হয়ে উঠত যখন স্বয়ং ইমামই জুমা বারে অনুপস্থিত থাকতেন। কাজী বাড়িই মসজিদের পরিচালক। ইমাম মোয়াজ্জিন জোগানো ও বাড়িরই দায়িত্ব আর আমি যখন ও বাড়িতে খাই দাই আর কাঁসি বাজাই তখন সবাই মিলে আমাকেই ঠেলে দিত মিম্বরের দিকে। গায়ে রয়েছে মাদ্রাসার লেবেল, অস্বীকার করলে বা অপারগ হলে শুধু আমার নয় মাদ্রাসারই যাবে মাথা কাটা। আবার আমি যে এক মস্ত বড় ইমামের ছেলে তাও এ পাড়ায় কারো অজানা নয়। কাজেই দুরু দুরু বুকে অনুপস্থিত ইমামের উপর আশু গজব কামনা করে সত্য সত্যই আমাকে মিম্বরের উপর উঠে দাঁড়াতে হত। এ রকম এক ফাঁড়া কাটিয়ে ইমামের কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে একদিন মসজিদ থেকে বের হতেই তখনকার সদর মহকুমা হাকিম মি: আহমদ আমাকে পাকড়াও করে প্রায় কৈফিয়ৎ চাওয়ার ভংগিতেই বলে বসলেন : আপনি প্রথম রাকাতে খাটো আর শেষ রাকাতে লম্বা সুরা পড়লেন কেন? বিপরীতটাই নিয়ম। না জানেন তো ইমাম হতে যান কেন? সাধে কি আমি ইমাম হতে যাই। ইমামের আসনে দাঁড়িয়ে আমি লম্বা খাটো পরখ করে সুরা পড়ি না 'ধরণী দ্বিধা হও' বলি, সে কথা একমাত্র আমার অন্তর্যামীই জানেন। ক্রুদ্ধ মহকুমা হাকিমকে আমি তা বুঝাই কি করে? সেদিন কি বলে তাঁর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম আজ আর তা মনে নেই। এর পর থেকে কোন শুক্রবারে ইমামের অনুপস্থিতির আশঙ্কা দেখা দিলে গা ঢাকা দিয়ে আমি নিজেই সিটকে পড়তাম।

আমি কোন কালেই কোন কিছু মুখস্থ করতে কি রাখতে পারি না। এমনকি আমার


www.pathagar.com

প্রিয় কবির প্রিয় কবিতার দশ লাইনও আমি মুখস্থ বলতে পারব না। তাই উপস্থিত কাজ সারার জন্য সব চেয়ে ছোট কয়েকটি সূরা মাত্র আমি কোন রকমে মুখস্থ করে রেখেছিলাম। তা দিয়ে এ রকম দায় উদ্ধার ও ফাঁড়া কেটে এযাবৎ কোন রকমে নিজের মুখ রক্ষা করে এসেছি।

ইমামের ছেলে ইমামতী করবে এত নেহাত যুক্তিসঙ্গত। আমার সম্বন্ধে এ মন্তব্যও যে মাঝে মাঝে না শুনেছি তা নয়। কিন্তু দুনিয়ায় যুক্তিসঙ্গত ঘটনা কটাই বা ঘটে? বিশেষ করে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে? রবীন্দ্রনাথের ছেলে মাঝারি রকমের কবিও হন নি, অনেক ডাকসাইটে ব্যারিস্টারের ছেলে মফস্বল কোর্টের সামান্য মোক্তারও হতে পারে নি এমন নজির দেদার। হেরম্ব মৈত্রের ছেলে বিয়ে করেছিল সিনেমা তারকা কানন বালাকে— যে হেরম্ব মৈত্র থিয়েটারের পথ বাতলানোকেও মনে করত পাপের চূড়ান্ত!

বংশগতি আর মানব-চরিত্র এত দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময় যে তাতে যুক্তি কদাচিৎ হালে পানি পায়।

## বার

রাজনৈতিক স্তরে মুসলমানদের একমাত্র আশা-ভরসা তুরস্ক তখন ইউরোপের 'রুগ্‌ন মানুষে' পরিণত। ১৯১১য় ইতালি তার হাত থেকে ত্রিপলী নিয়েছে কেড়ে। ১৯১২য় শুরু হলো বল্কান যুদ্ধ। যার ফলে তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ হয়ে গেল ভাগ বাঁটোয়ারা। হাতে থাকল শুধু কনস্টান্টিনপোল। আমি তখনো বাবার সঙ্গে আন্দরকিল্লায়— তাঁর সঙ্গে পাঁচ বেলা মসজিদে যাওয়া আসা করি। দেখি জোহর ও আছরের শেষে মসজিদের প্রশস্ত বারান্দায় প্রায় দিনই জেলার মুসলমান নেতারা সমবেত হন। সবারই মুখ গম্ভীর, উদ্বিগ্ন, কেউ কেউ ক্রুদ্ধ। গরম গরম বক্তৃতা হয়, তোলা হয় চাঁদা আর তা পাঠানো হয় তুরস্কে। তখনো তুরস্কের সোলতান মুসলিম জগতের খলিফা, তাঁর নামে পড়া হয় খোৎবা। তাই খলিফার বিপদে মুসলমান মাত্রই ব্যথিত। উঠত মোটা চাঁদা। খলিফার নামে মুসলমান মাত্রই কিছু না কিছু দান করত। সব চেয়ে গরম বক্তৃতা দিতেন কাজেম আলী আর মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। কাজেম আলী সাহেব তখনো কাজেম আলী মাস্টার— তিনি ছিলেন কাজেম আলী স্কুলের শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা। সে যুগে অনেক মুসলমান নেতারই জীবনের শুরু শিক্ষকতায়। খান বাহাদুর আমান আলীকেও বলা হত আমান আলী মাস্টার অর্থাৎ তিনিও জীবন শুরু করেছিলেন শিক্ষক হিসেবে। শুনেছি সুবিখ্যাত এমদাদ দারোগাও প্রথমে ছিলেন এমদাদ মাস্টার। পরে তাঁর ছেলে খান বাহাদুর ফজলুল কাদির জোরারগঞ্জ হাইস্কুল. শহরে মুসলিম বালিকাদের জন্য গুল এজার গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে সুনাম অর্জন করেছেন। শিক্ষা ছাড়া সমাজে নব জাগরণ সম্ভব নয় মুসলমান নেতারা গোড়া থেকেই এ সত্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাই অনেকেই স্কুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় এসেছিলেন এগিয়ে। এমন কি অনেক আলেমও শুধু মাদ্রাসা নয়, একাধিক হাইস্কুলও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। পটিয়ার রাহাৎ আলী হাইস্কুল মওলানা আবদুস সোবহানেরই কীর্তি- সীতাকুণ্ড হাইস্কুল আর হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন মাওলানা ওবায়দুল হক। অথচ এঁরা কেউ বিত্তবান ছিলেন না। কেউ কেউ নিজের ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেও যেতে পারেন নি বা যান নি।


www.pathagar.com

মওলানা ইসলামাবাদী গোড়া থেকেই ছিলেন সমাজকর্মী। সাহিত্য, সাংবাদিকতা আর সমাজ সেবা এ তিন নিয়েই তাঁর সারাটা জীবন কেটেছে। মারা গেছেন একদম নিঃস্ব অবস্থায়। তখন ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান নেতাদের পোশাক ছিল আসকান পায়জামা আর লাল টুপি যাকে ইংরেজিতে বলা হত টার্কিস কেপ। বাংলায় বলা হত রুমি টুপি। কেন এ নাম আমার অজানা। পরে শুনেছি এ টুপি আসত ইটালি থেকে। তুরস্কের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই যদিও নাম টার্কিস কেপ।

আশ্চর্য, সে যুগের মুসলিম আলেমদের অনেকেই ভালো বাংলা জানতেন অথচ তখন মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বাংলা ভাষায় এঁদের অনেকের দখল দেখলে বিস্মিত হতে হয়— এঁরা যে শুধু বিশুদ্ধ বাংলায় বক্তৃতা দিতেন তা নয়, লিখতেনও বিশুদ্ধ বাংলা। এ সব আলেমের কারো বাংলা, আরবি— ফার্সি উর্দুর জগাখিচুড়ি ছিল না। শৈশবে যাঁদের বাংলা পড়ে আমরা মুগ্ধ হতাম নিঃসন্দেহে তার মধ্যে মওলানা আকরম খাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আকরম খাঁর ভাষা— যে ভাষা তাঁর 'মোস্তফা চরিতে', 'সমস্যা ও সমাধানে' আর 'কোরানের' ভাষ্যে রূপ পেয়েছে তা সে যুগের ক্লাসিক ধর্মী সুসংবদ্ধ গদ্যের এক চমৎকার নিদর্শন। মওলানা ইসলামাবাদীর গদ্য আরো সরল, সহজবোধ্য ও জনসাধারণের মুখের ভাষার কাছাকাছি ছিল। উত্তর বঙ্গের মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ও কাফী দুই আলেম ভ্রাতাও অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও ব্যঞ্জনাময় গদ্য লিখতেন। সে যুগের আলেমরা কি করে এমন চমৎকার গদ্য আয়ত্ত করেছিলেন তা ভাবলে আজো আমার আশ্চর্য ঠেকে। আরো আশ্চর্য লাগে যখন দেখি সে যুগের সব রকম সংস্থা সংগঠনের আর সামাজিক উন্নয়নের ধ্যান-ধারণা পরিকল্পনার পেছনে অনেক আলেমেরই রয়েছে সক্রিয় সহযোগিতা।

অতি ছোটকাল থেকে, এমনকি যখন মাদ্রাসার একদম নিচের দিকের ছাত্র তখন থেকেই সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া, বক্তৃতা শোনা এক বাতিক ছিল আমার। সভা কি বক্তৃতার গন্ধ পেলেই ছুটে যেতাম। তখন বক্তৃতার মানও ছিল অত্যন্ত উঁচু— বিশেষ করে রাজনৈতিক আর সামাজিক মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে যে সব সভা হত তাতে সেদিনেও অসম্ভব জনসমাগম যেমন ঘটত, তেমনি বক্তৃতাগুলির ভাষাও ছিল রীতিমতো অনলবর্ষী।

আকরম খাঁ ও ইসলামাবাদী উভয়ে শুধু ভালো লেখক ছিলেন তা নয়, ভালো বক্তাও ছিলেন। উভয়ের মাথায় তখন শোভা পেত সবুজ পাগড়ি। শিরাজী অর্থাৎ ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেব প্রচলিত অর্থে আলেম ছিলেন না কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাঁকেও পাগড়ি ছাড়া দেখি নি। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁরও বহু বক্তৃতা আমি শুনেছি— তাঁর বক্তৃতা একরকম রুদ্ধ নিশ্বাসেই শুনতে হত। যেমন ভাষা তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল গুরুগম্ভীর। আর বক্তৃতার মাঝে কোন থামাথামি ছিল না তাঁর— বক্তব্য ভাবতে কি শব্দ হাতড়াতেও তাঁকে দেখিনি। স্রোতের মতোই অনর্গল চলছে তো চলছেই। একদিন ক্লাসে আমাদের এক শিক্ষক হঠাৎ বল্লেন : আজ ঘাড়টা বাঁ দিকে হেলাতেই পারছি না।

: কেন হুজুর?

তখনো মাদ্রাসায় স্যারের প্রচলন হয় নি। ইংরেজি, বাংলা, আরবির সব শিক্ষককেই



www.pathagar.com

আমরা হুজুর বলতাম। এখন অবশ্য নিয়ম উল্টে গেছে।

: গত রাত্রে শিরাজী সাহেবের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম, ঘাড় কাৎ করে যে দাঁড়িয়েছিলাম বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগে ঘাড় সোজা করার হুঁশই ছিল না, ফলে ঘাড়ে ব্যথা হয়েছে।

শিরাজী সাহেব বক্তৃতায় এমনি সম্মোহন সৃষ্টি করতে পারতেন। জেলার যেখানেই হোক— তাঁর বক্তৃতা হবে শুনলে আমরা ছুটে যেতাম। সম্ভবত এ দেশে তিনিই সর্ব প্রথম বক্তৃতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অথবা খানিকটা পেশার চেহারা দিয়েছিলেন। তিনি সুপুরুষ ছিলেন, আসকান-পাজামার উপর যখন উষ্ণীষওয়ালা পাগড়ি বেঁধে বক্তৃতার জন্য দাঁড়াতেন তখন তাঁর চেহারায় একটা বীরত্বের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠত।

আকরম খাঁ আর মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সহকর্মী ছিলেন— উভয়ে এক সঙ্গে পড়েছেন ও চালিয়েছেন একাধিক সংগঠন। তার মধ্যে আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা আর আল-এসলাম মাসিক পত্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়ের বহু মূল্যবান রচনা আল-এসলামের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। পরবর্তী জীবনে এ দুই সহযোগীর রাজনৈতিক মতবাদ পরস্পর বিরোধী দুই বিপরীত খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। একজন সর্বতোভাবে মিশে যান মুসলিম লীগ রাজনীতিতে অন্যজন শেষ পর্যন্ত থেকে যান 'জাতীয়তাবাদী মুসলমান'। ফলে একজনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে দ্রুত আর অন্যজন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন নিঃস্ব অবস্থায়। আর নিঃস্বদের জন্যই শেষোক্ত জন রেখে গেছেন এক বে-নামা স্মৃতি চিহ্ন— চট্টগ্রামের কদম মোবারেক এতিমখানা। তিনি ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে এতিমখানার সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে দিতে পারতেন কিন্তু দেননি। তখন নিজের নাম জাহির করা অত্যন্ত অশোভন মনে করা হতো। বলেছি, পটিয়ার রাহাৎ আলী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন মওলানা আবদুস সোবহান কিন্তু নিজের নামে করেননি। সীতাকুণ্ড হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন মওলানা ওবায়দুল হক কিন্তু নিজের নাম জুড়ে দেন নি স্কুলের নামের সঙ্গে। জোরারগঞ্জ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন খান বাহাদুর ফজলুল কাদির কিন্তু নিজের নাম দেওয়ার কথা বোধ করি কল্পনাও করেন নি। তেমনি মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী কদম মোবারেক এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শেষ বয়সে নিজের শক্তি সামর্থ সবই এ এতিমখানার পেছনেই ব্যয় করেছেন কিন্তু নিজের নাম জুড়ে দিয়ে ঐ রকম 'কৃত্রিম' পথে 'অমর' হওয়ার কথা বোধ করি কোনদিন ভাবেনও নি তিনি। আর এখন? কোন রকমে একবার ক্ষমতায় বসতে পারলেই হয়— তখন রাতারাতি নিজের নামে রাস্তা, মাঠ-ময়দান, স্কুল-কলেজ কত কি হয়ে যায়! কেউ কেউ আবার সঙ্গে বিবির নাম জুড়ে দিয়ে যুগলভাবে 'অমর' হতেও চান। হায় 'অমরতা'! অমরতা কি এতই সহজলভ্য?

খান বাহাদুর আবদুল আজিজ— যিনি আবদুল আজিজ বি. এ. নামেই পরিচিত ছিলেন (সম্ভবত এ অঞ্চলে তাঁর আগে অন্য কেউ বি. এ. পাস করেন নি। তাই বি. এ. ডিগ্রীটাও তাঁর নামের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছিল) একক চেষ্টায় চট্টগ্রাম জুমা মসজিদের পাশে এক তে-তলা বিল্ডিং করে তার নাম দেন ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল। ঐ সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি ও সংলগ্ন পাঠাগার। কিন্তু কোনটায় নিজের নাম দেন নি। তিনি শিক্ষাবিদ ছিলেন। শিক্ষা বিভাগে উচ্চ চাকরিও করতেন। তাঁরই


www.pathagar.com

দৌহিত্র ও দৌহিত্রী হচ্ছেন হাবীব-উল্লাহ বাহার ও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ।

তিনিও আমার বাবার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। শুনেছি তাঁর সব কয়টি মেয়ের (তাঁর কোন ছেলে ছিল না) হাতে খড়ি হয়েছে বাবার হাতে। পরবর্তী জীবনে যখন বাহারের মারফৎ আমার ঐ পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে দেখি সবাই আমাকে সে ভাবেই স্নেহ মমতা করছে অর্থাৎ ওস্তাদের ছেলের মতোই।

অনেক কাল পরে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ লিখেছেন তাঁর নানা খান বাহাদুর সাহেব যখন মৃত্যুশয্যায় তখন নানি আম্মা সতর্কভাবে কথা পাড়লেন : যদি মন চায় তবে একবার 'তওবার' ব্যবস্থা করা যেত। মৃত্যুপথযাত্রী এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে জবাব দিলেন আল্লার দরবারে সমস্ত গুনাহ খতার জন্য আমি দিন রাতই মাফ চাইছি। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'তওবা' যদি করতে হয় তবে দুটি মাত্র লোক আছেন যাঁদের উপর সে ভার দিতে পারি। তার মধ্যে একজন জুমা মসজিদের ইমাম সাহেব।

বলেছি, তখন থেকেই মুসলমানদের মনে একটা স্বতন্ত্র চেতনা বোধ জেগে উঠতে শুরু করেছে আর তারা বুঝতে পেরেছে শিক্ষা ছাড়া, বিশেষত ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া জীবনের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। ফলে মুসলমান ছেলেরা স্কুল-কলেজে দ্রুত প্রবেশ করতে শুরু করল। সরকারি স্কুল-কলেজে মুসলমানদের জন্য আসনও নির্দিষ্ট হলো। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান কৃষিজীবী তথা পল্লীবাসী। উচ্চ শিক্ষা বা ভালো শিক্ষার জন্য এদের ছেলেদের শহরে না এসে উপায় নেই অথচ তখন শহরে মুসলমান ছেলেদের জন্য না ছিল কোন হোস্টেল— না ছিল কোন ছাত্রাবাস। ফলে শিক্ষার পথে এ এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। স্কুল পরিদর্শক হিসেবে মুসলমান ছাত্রদের এ অসুবিধা স্বচক্ষে দেখেছেন ও ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন আবদুল আজিজ সাহেব। তাই নিজের ঘর বাড়ি পাকা না করে নিজের শক্তি, সামর্থ, অর্থ ও সময় ঢেলে দিয়ে তিনি শুরু করলেন মুসলমান ছাত্রদের জন্য এক ত্রিতল আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ করতে। অবশ্য তাঁর একার চাঁদায় অত বড় বিল্ডিং করা সম্ভব হয় নি— সে যুগের চট্টগ্রামের অনেক বিদ্যানুরাগীই তাঁকে এ ব্যাপারে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু এ হোস্টেলের প্রধান ও মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থও করা হয়েছে এ হোস্টেলের কম্পাউন্ডেই। ভাবতে অবাক লাগে, সে যুগে চট্টগ্রামে ঐ ছিল একমাত্র ত্রিতল বিল্ডিং আর তা নির্মিত হয়েছিল এক গরিব সমাজের চাঁদায় আর এক মধ্যবিত্ত শিক্ষাবিদের ত্যাগ ও সাধনায়!

ত্রিতল ভর্তি ছাত্র-কলমুখর এ হোস্টেলের আওতায় আমার বাল্য-জীবনের কয়েক বছর কেটেছে। কারণ জুমা মসজিদ এবং বাবার বাসস্থান হাফেজ আবদুল্লার বাড়ি এ হোস্টেলের কয়েক গজের মধ্যেই। অবশ্য এ হোস্টেলের আবাসিক হওয়ার সৌভাগ্য আমার কখনো ঘটে নি।

প্রাতঃস্মরণীয় খান বাহাদুর আবদুল আজিজের বে-নামা স্মৃতি এ বিল্ডিং আজো অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু তা আজ আর হোস্টেল নেই। শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজে মুসলমান ছাত্রদের স্বতন্ত্র হোস্টেলের প্রয়োজন এখন ফুরিয়ে গেছে বটে কিন্তু


www.pathagar.com

জাতীয় জীবন গঠনের প্রারম্ভে শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন আগ্রহ ও চেতনা-বোধের দিনে এ হোস্টেলের অবদান কিছুতেই ভুলবার নয়। নিজস্ব পরিবেশে ও আবহাওয়ায় জীবন গঠনের একটা সুযোগ— যে সুযোগ সারা বাংলাদেশে তখন কোথাও ছিল না, খান বাহাদুর আবদুল আজিজ সেদিন মুসলমান ছাত্রদের তা দিয়েছিলেন এ হোস্টেলে। অপরিমিত সুযোগ সুবিধার মাঝখানে বসে অনেকের পক্ষে হয়তো আজ এ সুযোগটুকুর মূল্যায়ন সম্ভব হবে না কিন্তু আমরা যারা মুসলমান ছাত্রদের সেদিনের দুঃখ ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে প্রতিদিনের নীরব সংগ্রাম দেখেছি তাদের পক্ষে মরহুম আবদুল আজিজের অবদান মন থেকে মুছে ফেলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ হোস্টেল যে উঠে গেল তা আর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। আগেই বলেছি প্রয়োজনও তার ফুরিয়ে গেছে।

ইদানীং কয়েক বছর ধরে ঐ বিল্ডিঙে চট্টগ্রাম নাইট কলেজ ও মহিলা কলেজ চলছিল। এখন ঐ দুই কলেজ অন্যত্র সরে গেছে। বর্তমানে এ বিল্ডিঙে সকালে একটি নার্সারি স্কুল, দুপুরে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি হাইস্কুল ও একটি পাঠাগার চলছে। চট্টগ্রাম ল'কলেজও ঐ কম্পাউন্ডেই চলছে তবে স্বতন্ত্র ঘরে। মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি ফান্ড থেকে প্রতি বছর মেধাবী ও গরিব মুসলমান ছাত্রদের আজো কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হয়। এ সবেরই বীজ বপন করে গেছেন খান বাহাদুর আবদুল আজিজ। কিন্তু কিছুরই সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে দিয়ে 'অমর' হওয়ার চেষ্টা তিনি করেন নি। সেদিন মুসলিম সমাজকর্মীরা এমনি নিঃস্বার্থ ছিলেন আর ছিলেন রুচি এবং শোভন পরিমিতি বোধের অধিকারী।

## তের

১৯১৮। সনটা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে এ কারণে যে, ঐ বছর একই সঙ্গে চাটগাঁয় চার চারটা সম্মেলন বসেছিল— লালদীঘির ময়দানে একই প্যান্ডেলে। তখন আমি মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আগেই বলেছি নিচের দিকের ছাত্র হলেও সভাসমিতিতে যোগ দেওয়া, বক্তৃতা শোনা আমার এক বাতিক ছিল। কাজেই সপ্তাহব্যাপী এ সম্মেলনগুলির প্রত্যেকটা অধিবেশনেই আমি হাজির হতাম। সেদিন সকলের চোখে মুখে কথা আর বক্তৃতায় যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখেছিলাম তা আমার বালক মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল। যতদূর মনে পড়ে 'আঞ্জুমানে ওলেমায় বাঙলার' অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিহারের মওলানা সোলেমান ফুলোয়ারী সাহেব, বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার এ. এফ. রহমানের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্যারিস্টার আমিনর রহমান (এ. এফ. রহমান তখন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার, ভাইয়ের সঙ্গে তিনিও এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন)। তখন মুসলমান শিক্ষা সমিতির সেক্রেটারি বা সম্পাদক ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ওয়াহেদ হোসেন। তিনি সম্পাদকীয় রিপোর্ট পাঠ করেছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন আর বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন যথাক্রমে মওলানা আকরম খাঁ ও জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম.


www.pathagar.com

এ. বি. এল. (তিনি তখনো ডক্টর বা অধ্যাপক হন নি)।

এ সব সভাসমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মওলানা ইসলামাবাদী। মনে পড়ে, তিনি বক্তৃতা মঞ্চের ধারে স্বেচ্ছাসেবক পরিবৃত হয়ে পা দুলিয়ে বসতেন আর যখন কোন বক্তা উচ্ছ্বাসপূর্ণ কোন কথা বলতেন তখন তিনি উচ্চস্বরে 'মারহাবা' বলে উঠতেন, সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবর্গ লাল দীঘির ময়দান কাঁপিয়ে 'মারহাবা' 'মারহাবা'র ধ্বনিতে সারা প্যান্ডেল মুখরিত করে তুলত। সে কি এক অপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখেছিলাম সেদিন! ভলান্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খান বাহাদুর ফজলুল কাদির। বলিষ্ঠদেহ কর্মবীর ফজলুল কাদির সেদিন কি একাগ্র নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই না এক বিরাট ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন! সাদা পায়জামা, কালো আসকান আর লাল তুর্কিটুপি, টুপিতে একটি রূপালি খণ্ড চাঁদ— এ ছিল অধিনায়ক আর ভলান্টিয়ারদের য়ুনিফর্ম। একদল সাইকেলারোহী ভলান্টিয়ারও ছিল। এ দলের অগ্রনায়ক ছিল মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর জ্যেষ্ঠপুত্র পরলোকগত শামসুজ্জামান। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন খান বাহাদুর আবদুস সাত্তার— তখন তিনি চট্টগ্রাম বারের উদীয়মান তরুণ উকিল— ছিলেন উদাত্ত কণ্ঠ ও বলিষ্ঠ দেহ। সেদিন তিনিও অসাধারণ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ছনুয়ার জমিদার গোলাম কাদের চৌধুরী। এ সম্মেলনের বেশির ভাগ খরচ তিনিই নাকি বহন করেছিলেন। সেদিন সত্যই স্বেচ্ছাসেবক থেকে নেতা উপনেতা ও শ্রোতা সকলের চোখে মুখে আশা আকাঙ্ক্ষার যে স্বপন-বিভোর ব্যাকুল জীবন-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল তার কোন তুলনা হয় না। সেদিন নেতারা সব চেয়ে খুশি হয়েছিলেন সব কিছুর মধ্যে একটা নিষ্ঠা, সংকল্প ও শৃংখলার পরিচয় ও চেহারা দেখতে পেয়ে।

আঞ্জুমানের সভাপতির অভিভাষণ উর্দুতে আর শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ ইংরেজিতে ছিল বলে তার মর্ম গ্রহণ আমার সাধ্যাতীত ছিল কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম সাহিত্য আর ছাত্র সম্মেলনের সভাপতিদের অভিভাষণ শুনে ও পড়ে। এ দুই অভিভাষণেরই মুদ্রিত কপি সম্মেলনে বিলি করা হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল তা আমার কাছে ছিলও। পরে হারিয়ে গেছে। আকরম খাঁ তখন জীবনের মধ্যগগনে। আসকান পায়জামা আর সবুজ পাগড়ি মাথায় প্রদীপ্তকণ্ঠে তিনি সেদিন সাহিত্য সম্মেলনে এক স্মরণীয় অভিভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর আর অভ্যর্থনা সমিতির (সাহিত্য শাখার) সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অভিভাষণ দুই-ই ভাষা ও ভাবে অনবদ্য ও অনন্য হয়েছিল। সম্প্রতি সাহিত্য বিশারদের এ মূল্যবান অভিভাষণটি, সৈয়দ মর্তজা আলীর সম্পাদনায় 'ইসলামাবাদ' নামে 'বাংলা একাডেমি' কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এমন তথ্যবহুল, গবেষণা সমৃদ্ধ সুবৃহৎ অভিভাষণ বাংলা ভাষায় আর লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তরুণ পণ্ডিত শহীদুল্লাহ সাহেবও সেদিন যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন— ছাত্র সমাজের সামনে জ্ঞান ও আদর্শবাদের যে বাণী তুলে ধরেছিলেন তাও অতুলনীয়। এসব অভিভাষণের কোনটাই দায় রক্ষা ব্যাপার ছিল না, কেউই ফাঁকি দেন নি নিজেকে বা শ্রোতাদের। প্রত্যেকটি অভিভাষণ সুচিন্তিত পরিশ্রমেরই ফল, তাই ভাষা ও ভাবে কোথাও শৈথিল্যের পরিচয় ছিল না। সাহিত্যের মান বোঝার বয়স তখন আমাদের নয়, তবু অভিভাষণগুলি আমার মনে রেখাপাত করেছিল। এ অভিজ্ঞতা থেকে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, ভাবে


www.pathagar.com

ও ভাষায় সাহিত্য যদি উচ্চ মানের হয়, সব কথার অর্থ ও তাৎপর্য না বুঝলেও তা এমনকি বালক মনকেও নাড়া দিতে পারে, পারে আনন্দ দিতে। দেহের সঙ্গে প্রাণের যে সম্পর্ক, ভাবের সঙ্গে ভাষারও সে সম্পর্ক। মহৎভাবের উপযোগী ভাষাও যদি মহৎ না হয় তা হলে রচনা আবেদন সঞ্চারে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সে যুগের মুসলিম লেখকরা অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না বটে কিন্তু সাহিত্যের এ প্রাথমিক বোধটুকু তাঁদের ছিল। আমার বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী আদর্শ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

## চৌদ্দ

ধরতে গেলে চট্টগ্রাম মাদ্রাসাতেই আমার জীবনের রেখাচিত্র টানা হয়ে যায়। অবশ্য খসড়ার বেশি সেদিন তার হয়তো বিশেষ কোন মূল্যই ছিল না। তবুও সে খসড়াই যে কালক্রমে একটা দৃশ্যমান চেহারায় রূপ নিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বন্ধু ও সহপাঠী দিদারুল আলমের মারফৎ তাদের পারিবারিক সাহিত্যিক পরিবেশ ও দৃষ্টিভংগীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ সেই বালক বয়সেই আমি পাই, যা পরে আমাকে ব্যাপকভাবে সাহিত্যের প্রতি উৎসুক করে তোলে। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধেও আমি সেই বয়স থেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠি। তার কিছু আভাস পূর্ব পরিচ্ছেদে দেয়া হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন— যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর, জালিয়ানওয়ালাবাগ, অসহযোগ, খেলাফৎ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধতে শুরু করে এবং পরে দুর্বার হয়ে উঠেছিল, তাও আমি মাদ্রাসায় থাকতেই ঘটে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এসবের দমকা হাওয়া আমাদের মনকেও নাড়া দিয়েছে বই কি। আজ আমাকে কেউ কেউ যে 'সমাজ সচেতন' লেখক বলেন তার ভিৎ পত্তন— আমার বিশ্বাস এভাবেই ঘটেছিল।

মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আদর্শ চরিত্র ও সজ্জীবনের অধিকারী ছিলেন। এঁদের মধ্যে সুফি আবদুল ওদুদের কথাই বেশি করে মনে পড়ে। আসলে তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত— আলীগড়ের খ্যাতনামা গ্র্যাজুয়েট আর সারা জীবন ছিলেন ইংরেজি শিক্ষক। কিন্তু হাবভাব ও পোশাক-পরিচ্ছদে তা টের পাওয়ার উপায় ছিল না। ইংরেজি শিক্ষার বাহ্যিক চাকচিক্য ও অহমিকা তাঁর মনে একদিনের জন্যও রেখাপাত করতে পারে নি— না যৌবনে, না শেষ বয়সে। তিনি ছিলেন পুরোপুরি প্রাচ্য আর প্রাচ্য সুফি সাধকদের খাঁটি উত্তরাধিকারী। তাই তাঁর নামের আগে আপনাআপনিই যুক্ত হয়ে পড়েছিল 'সুফি' খেতাব। কোন সরকার বা প্রতিষ্ঠান তাঁকে এ খেতাব দেয়নি। তিনি নিজেও এ ধরনের খেতাব পছন্দ করতেন না— তবুও জনচিত্তের এ এক স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি তাঁর নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। 'সুফী সাহেব' বতল্ল মাদ্রাসায় থাকতে যেমন পরেও চট্টগ্রামে আমাদের মনে অন্য কোন চেহারাই ভেসে উঠত না— উঠত শুধু সুফি আবদুল ওদুদের। তিনি কিন্তু চট্টগ্রামের লোক ছিলেন না— ছিলেন কুমিল্লা জেলার অধিবাসী। প্রথম জীবনে চাকরি করতে এসে চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও জীবন তাঁকে মুগ্ধ করে। হয়তো এখানকার দরবেশ-আউলিয়াদের স্মৃতিও তাঁর মনে রেখেছিল গভীর রেখাপাত।

চট্টগ্রাম মাদ্রাসা (বর্তমান ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ) যখন নিউ স্কিমে


www.pathagar.com

পরিণত হয়, তখন সদ্য বি. এ. পাস করা আবদুল ওদুদ সাহেব অন্যতম ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে এখানে যোগ দেন। অত্যন্ত পরহেজগার ও আরবি ফারসি সুপণ্ডিত মওলানা মোহাম্মদ নাজের সাহেব তখন উক্ত মাদ্রাসার সিনিয়র আরবি শিক্ষক। স্বল্পবাক, নির্লোভ ও সাধু প্রকৃতির এ মওলানা নাজের সাহেবের প্রতি আবদুল ওদুদ সাহেব স্বভাবতই অচিরে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নাজের সাহেবের ধ্যান গম্ভীর মূর্তি, নির্মল চরিত্র, সজ্জীবন আর ধর্ম-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে তিনি এতবেশি মুগ্ধ হন যে, সহকর্মী হলেও অগৌণে তিনি তাঁর ভক্ত ও শিষ্য হয়ে পড়েন। কালক্রমে জীবন দর্শনের ঐক্যে ও রুচির সমধর্মিতায় উভয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য এ সম্বন্ধ ব্যক্তিগত আত্মীয়তায়ও পর্যবসিত হয়। পরে আবদুল ওদুদ সাহেব এখানে ঘরবাড়ি করে বাস করতে থাকেন এবং পদোন্নতির প্রলোভনেও চট্টগ্রামের বাইরে যেতে রাজি হননি। এভাবে সুফি আবদুল ওদুদ চট্টগ্রামের বাসিন্দা হয়ে পড়েন এবং এন্তেকালও করেন এখানেই (১৯৫৮)।

আমার পরম সৌভাগ্য, বাল্যকালে আমি মওলানা নাজের আর সুফী আবদুল ওদুদ উভয়কেই শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের হাতের অজস্র মারও আমি খেয়েছি। তখন 'Spare the rod, spoil the child'— এ আপ্তবাক্যে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক সবাই বিশ্বাস রাখতেন। আজ স্বীকার করতে আপত্তি নেই, আমি কখনো ভালো ছাত্র ছিলাম না; বিশেষত আরবি ও অঙ্কে ছিলাম নিতান্ত কাঁচা। এর একটি পড়াতেন মওলানা নাজের সাহেব, অন্যটি সুফি আবদুল ওদুদ। কাজেই আমার কপালে মারধরটা প্রায় বাদ পড়ত না। নাজের সাহেব ছিলেন অত্যন্ত গুরুগম্ভীর মানুষ, তাঁকে আমরা কখনো হাসতে দেখি নি। ছিলেন এলেমের ভাণ্ডার, যেন মূর্তিমান হাদিস-তফসিরের কেতাব। তাঁর ক্লাসে টুঁ শব্দ হত না— তিনি ঢুকলেই ছাত্রদের নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না এমন অবস্থা। মাদ্রাসা পাহাড়ে কোনদিনই ঝাড় জঙ্গলের অভাব ছিল না— সেখান থেকে সরু ডাল-পালা ভাঙ্গিয়ে এনে তিনি আমাদের কষে মার লাগাতেন। অধিকাংশ সময় এ মার আমার পিঠেই পড়ত বেশি। পড়া না শেখার তখনকার দিনে ঐ ছিল একমাত্র দাওয়াই। আমি তো হাতের কাছে বাংলা বই যা পাই, দিনরাত তাই গো-গ্রাসে গিলতে থাকি। পাঠ্য বই পড়ার সময় কোথায় আমার? কাজেই ক্লাসের পড়া শেখা হতো না কোনদিনই।

আবদুল ওদুদ সাহেব অনেক সময় কিল চাপড় কানমলা দিয়েই রেহাই দিতেন। অনেক সময় নিজের কান নিজেই মলতে হত। ওটা কিন্তু আমরা শাস্তি হিসেবেই গণ্য করতাম না। কারণ ওতে ফাঁকি দেয়ার যথেষ্ট সুযোগ মিলত। দাঁতমুখ খিঁচে কানমলার ভংগিমায় যত জোরেই হাত ঘুরাই না কেন ওতে কানের গায়ে এতটুকু ছোঁওয়াও লাগত না। বাড়ির অঙ্ক না আনার জন্য আমাকে সুফি সাহেবের ক্লাসে প্রায় বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হত। শাস্তি হিসেবে ওটাকেও আমরা বিশেষ আমল দিতাম না, যদিও প্রচলিত শাস্তির মধ্যে ওটা ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের। প্রথম পর্যায় হলো নিচে দাঁড়িয়ে থাকা। কাক যেমন নিজের চোখ নিজে বন্ধ করে কোন কিছু লুকিয়ে রাখে আর ভাবে বিশ্বশুদ্ধ কেউই দেখছে না, তেমনি আমরাও বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে চোখের সামনে বই একটা খুলে ধরে মনে করতাম আমাদের বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে থাকাটা কারো নজরে পড়ছে না। একবার


www.pathagar.com

নিজের ন্যায়বোধের পরিচয় দিতে গিয়ে আমি সুফি সাহেবের হাতে বেদম মার খেয়েছিলাম। সে মারের কথা জীবনে ভুলতে পারিনি। আমি তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। বাড়ির টাস্ক না আনার জন্য সুফি সাহেব সেদিনও আমাকে যথারীতি বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তাঁর ঘণ্টা কাবার হয়ে ঢং ঢং করে বেল বেজে উঠতেই, তাঁর হুকুমের তোয়াক্কা না করে আমি দপ্ করে নেমে পড়লাম নিচে। সুফি সাহেব মুহূর্তে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন : আমি না বলতে নেমে পড়লে যে?

আমিও নাছোড়বান্দা। দুষ্ট ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বলে বসলাম : আপনার পিরিয়েড তো শেষ হয়ে গেছে, এখন অন্য টিচারের পিরিয়ড...। আমার কথা শেষ না হতেই, টেবিলের উপর মোটা হাজিরা বই ছিল— তখন হাজিরা বই এখনকার মতো সরু ছিল না, কয়েক বছরের ছাত্রদের নাম একই বইতে লেখা হত বলে তা রীতিমতো ভারী ও মোটা ছিল, সে বই দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে তিনি আমার পিঠে বেদম প্রহার করলেন। সুফি সাহেব এর আগে এমন মার আর কাকেও মারেন নি আর এমন ক্রুদ্ধমূর্তিও তাঁর এর আগে কখনো দেখা যায় নি। সমস্ত ক্লাস ভয়ে স্তব্ধ ও নির্বাক। বালক হলেও সবাই যেন বুঝলাম মারটা কিছু বেশি হয়ে গেছে। এখনকার মতো তখন শিক্ষকের প্রতিবাদ করা বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। অভিভাবককে গিয়ে বল্লে ফল হতো বিপরীত অর্থাৎ আর এক দফা মার খেতে হত আর সে মার যে প্রচণ্ডতর হত তাতেও সন্দেহ ছিল না। অতএব আমিও ন্যায্য পাওনা হিসেবে সুফি সাহেবের সে প্রচণ্ড মার বিনাবাক্যে হজম করে ফেল্লাম।

পরদিন ক্লাসে এসেই সুফি সাহেব আমাকে কাছে ডাকলেন। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লেন : বাবা আমাকে মাফ করে দাও, কাল আমার হুঁশ ছিল না, তাই তোমাকে অমনভাবে মেরেছি। আমাকে মাফ করো, করেছ? আমার মুখ থেকে যতক্ষণ 'করেছি' বার না হয়েছে ততক্ষণ তিনি আমার হাত ছাড়েন নি। এমন স্নেহ ও ঔদার্যের কোন তুলনা আছে কি-না জানি না।

এ হেন সুফি সাহেবের প্রতি কয়েকজন ছাত্র একবার যা ব্যবহার করল তা যে শুধু অভাবনীয় তা নয়, ওতে আমাদের সকলের মুখেই যেন দোয়াতশুদ্ধ কালি ছুঁড়ে মারা হলো। সমস্ত মাদ্রাসা বিস্ময়ে ঘৃণায় হতবাক। একজনের মুখের দিকে আর একজন তাকাতেই পারছিলাম না আমরা অনেকদিন। চাকরির প্রথম দিকে সুফি সাহেব ছিলেন হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট। মাদ্রাসার মেন্ বিল্ডিং-এর পশ্চিম পাশের একতলার সর্ব দক্ষিণ রুমেই তিনি একা থাকতেন। তিনি নামাজী কালামী লোক, ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে গিয়ে নিজেই আজান দিতেন। কোনদিন আজান দিয়ে, কোন কোনদিন আজানের আগেই ছেলেদের জাগিয়ে দিতেন— দরজা খোলা পেলে বা কেউ উঠে খুলে দিলে ঢুকে নিজেই কুম্ভকর্ণদের টেনে টেনে তুলতেন। দরজা খোলা না পেলে আর হাঁক ডাকেও কাজ হচ্ছে না দেখলে জানালা পথে নিজের হাতের দীর্ঘ লাঠিটা দিয়ে খোঁচা মেরে মেরে অনেকের ঘুম ভাঙ্গাতেন। তখন মাদ্রাসায় বয়স্ক ঢেঙা ঢেঙা ছেলে অনেক আর এদের অধিকাংশই চাটগাঁর বাইরের। এখনো চাটগাঁর মাদ্রাসাগুলিতে বাইরের ছেলেই সংখ্যায় বেশি। ভোরের সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত এ ঢেঙা ছেলেদের বোধ করি আর


www.pathagar.com

সহ্য হল না। এরা টাকা দিয়ে কয়েকজন মেথরকে হাত করে পাতিল-ভরা বিষ্ঠা এনে পাশে জঙ্গলে কোথায় যেন লুকিয়ে রেখেছিল। রাত্রে তাই নিক্ষেপ করলো সুফি সাহেবের শোবার ঘরে। পরদিন সারা শহরময় হুলস্থুল— ছাত্রদের পক্ষে এমন কাণ্ড সম্ভব এ কেউ ভাবতেই পারে না। মাদ্রাসার ছাত্রদের কোথাও বের হওয়া বা মুখ দেখানোই ভার হল।

তদন্তে দোষীরা ধরা পড়ল। যতদূর মনে পড়ে জনা চার-পাঁচেক বোধ হয় রাস্টিকেট হয়েছিল— সব ঢেঙা ও উপরের দিকের বয়স্ক ছেলে।

আশ্চর্য, এদের মধ্যে একজন পরবর্তী জীবনে 'আলেম' রূপেও পরিচিত হয়েছিল, এমন কি অবিভক্ত বাংলায় এম. এল. এ.-ও হয়েছিল! যদিও লেখাপড়া হয়েছিল ঐখানেই খতম!

বলেছি আমি কখনো ভালো ছাত্র ছিলাম না— প্রচলিত অর্থে ধার্মিকও আমি নই। সুফি সাহেব নিজেও জানতেন ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি আমার তেমন আসক্তি নেই। এজন্য তিনি মনে মনে পীড়া বোধ করতেন। তবুও সুফি আবদুল ওদুদের স্নেহভাজনদের আমি ছিলাম অন্যতম। আমার পিতাকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করতেন— এ স্নেহের অন্যতম কারণ বোধ হয় তাই। যেখানে তিনি পরহেজগার আলেম ও সচ্চরিত্র ধার্মিক লোক দেখতেন সেখানে ছুটে যেতেন। আমার পিতাকেও তিনি তাই মনে করতেন। ধার্মিকের সঙ্গ ছিল তাঁর প্রিয়তম কাম্য। আমার পিতার মৃত্যুর (১৯২৯) পরেও এ সুদীর্ঘকাল যখনই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তিনি প্রায় আমার পিতার কথা বলতেন এবং আমাকে উপদেশ দিতেন বাপের মতো হওয়ার জন্য। বছর কয়েক আগে আমি যখন কঠিন ব্লাড প্রেসারে শয্যাশায়ী, তখন যদিও তিনি খুব বৃদ্ধ তবুও আমাকে দেখতে দু'বার এসেছিলেন এবং আমার আরোগ্যের জন্য দোওয়া করে গিয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রের মতো তাঁর হাতের লেখাও ছিল অতি চমৎকার। লিখতেন এক একটা অক্ষর আলাদা আলাদা — অক্ষরগুলো গায়ে গায়ে লাগতই না— সুন্দর ও সুগঠিত ছিল প্রতিটি হরফ। বোর্ডে তিনি যখন কিছু লিখতেন বা অঙ্ক কষতেন, তাঁর এ বিশিষ্ট হস্তাক্ষরের জন্য তার দিকে চেয়ে থাকতেই হত। অমন সুশ্রী হস্তাক্ষর এখন কদাচিৎ দেখা যায়। ক্লাসে ঢুকে তিনি মিনিট পাঁচেক ছাত্রদের ব্যায়াম করিয়ে নিতেন. সঙ্গে সঙ্গে নিজেও করতেন। আলস্য ও জড়তা তাড়িয়ে ছেলেদের দেহমনকে সজাগ ও উৎসুক করে তোলার জন্য এ ছিল তাঁর এক বিশেষ পদ্ধতি। আলস্য ও জড়তাকে তিনি কোনদিন প্রশ্রয় দেন নি— নিজের জীবনেও না. তাঁর ছাত্রদের বেলায়ও না। মৃত্যু পর্যন্ত আলস্য ও জড়তা তাঁর কাছে কখনো ঘেঁষতে পারে নি। নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র— যেমন নমাজের কাপড়. জায়নমাজ. মেছওয়াক. অজিফা ইত্যাদি একটা থলিতে ভরে তা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে যত্রতত্র যাতায়াত করতেন। কোন বিষয়ে কারো উপর নির্ভর করতেন না— নিতেন না কারো সেবা. নিজের কাপড়-চোপড় নিজের হাতেই কাচতেন। সুন্নৎ মাফিক বুক বরাবর এক সুদীর্ঘ লাঠি হাতে লঘু অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে তাঁকে বৃদ্ধ বয়সেও ঘুরে বেড়াতে— এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করতে দেখেছি। যানবাহন তিনি কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। পায়ে হেঁটে চলাই ছিল তাঁর চিরকালের অভ্যাস। হস্তাক্ষরের মতো তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর উচ্চারণের স্পষ্টতা ও


www.pathagar.com

আবেদনের আন্তরিকতায় এমন একটা যাদু ছিল যে যাঁরা আরবি জানেন না তাঁদের মর্মে গিয়েও তা সাড়া জাগাত। তাঁর জীবন-যাত্রা ছিল অত্যন্ত সাদাসিদা ও সরল। বিলাসব্যসন বা ধন ঐশ্বর্যের মোহ, পদোন্নতির আকাঙ্খা এ সব তাঁর মনে একদিনের জন্যও স্থান পায় নি। তিনি গরীব ছিলেন, গরিবের মতই জীবন-যাপন করতেন— গরীবদের ভালোও বাসতেন অন্তরের সঙ্গে। তাঁর আদর্শ ছিল ইসলামের মহান নবী হজরত মোহাম্মদ— সাধ্যানুসারে হজরতকে অনুকরণ ও অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। হজরত বলেছেন— 'দারিদ্রেই আমার গৌরব।' অবশ্য এ দারিদ্র পার্থিব ধন-সম্পদের দারিদ্র— মনের দারিদ্র নয়। সুফি আবদুল ওদুদ সাহেবও মনের ধনে ধনী, চরিত্র সম্পদে সম্পদশালী ও আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান ছিলেন। কিন্তু সাংসারিক ধন ও ধনীকে তিনি কতখানি তুচ্ছজ্ঞান করতেন তাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি থেকেই তা উপলব্ধি করা যায়। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কয়েকটি গোরস্থানের নাম করে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় এর কোনটিতে তাঁকে দাফন করা হলে তিনি খুশি হবেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন : না, ঐ সব কোন গোরস্থানেই নয়। যেখানে গরীবদের দাফন করা হয়েছে, দাফন করা হয়, সেখানে গরীবদের সাথেই যেন আমাকেও দাফন করা হয়। পরে নাকি যোগ করেছিলেন : পাড়ার গোরস্তানেই পাড়ার অধিকাংশ গরিবদের দাফন করা হয়েছে; আমাকেও যেন ওদের সাথে দাফন করা হয়।

সুফি আবদুল ওদুদের সমগ্র জীবন দর্শনের পরিচয় রয়েছে তাঁর এ শেষ অছিয়তে। আমার পক্ষে পরম সান্ত্বনার কথা, আমি তাঁর জানাজায় শরিক হতে পেরেছিলাম। জীবনে অনেক সুশিক্ষকের কাছেই আমার পাঠ গ্রহণের সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু সুফি আবদুল ওদুদ সাহেব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে পূতসুন্দর জীবন, এক দুর্লভ নিবেদিত মন আর স্বভাব মাধুর্যের আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তার কোন তুলনা হয় না এবং তা ভুলবার নয়। আর ভুলবার নয় তাঁর হাতের অজস্র মার। আজ পশ্চাৎ দৃষ্টি হেনে যখন সে মার খাওয়া স্বর্ণ-যুগের দিকে তাকিয়ে দেখি তখন মন আনন্দ ও গৌরবে ভরে ওঠে। মনে হয় অমন ওস্তাদের হাতের মার খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই হয়তো জীবনে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছি।

## পনর

১৯১৮। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে— সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঐ বছর ১১ নভেম্বর। জার্মানি ও তুরস্ক পরাজিত বিরাট তুরস্ক সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড করে ভাগ করে নেওয়া হলো ও দেওয়া হল ভাগ করে। এমনকি মক্কা-মদিনাও হলো তুরস্কের হাতছাড়া। এতদিন মক্কা-মদিনা ছিল তুরস্কের অধীন। তুরস্কের সোলতান ছিলেন মুসলিম জগতের খলিফা। তাঁর নামেই পড়া হত খোৎবা। সারা মুসলিম জগতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। পাক-ভারতে খেলাফৎ আন্দোলন এরি সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া। এ সময় সারা দেশ স্বাধীনতার জন্যও উন্মুখ। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটা আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিলও। হঠাৎ ১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল অবিভক্ত পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। ইংরেজের গুলীতে বহু নিরীহ লোক হতাহত হলো। এরপর থেকে স্বাধীনতা


www.pathagar.com

আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠল। এ আন্দোলনের মূল কথা ছিল— ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগ, কোন ব্যাপারেই ইংরেজের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা না করা। এ কারণেই এ আন্দোলনের নাম দাঁড়ায় অসহযোগ আন্দোলন। খেলাফৎ ও অসহযোগ— কর্মসূচির দিক থেকে এ দুই আন্দোলনের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। ফলে দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতা আন্দোলনের এ দুই ধারা একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল এবং নেতারাও হাত ধরাধরি করেই কর্মক্ষেত্রে যেমন, তেমনি জেলেও গিয়েছিলেন এগিয়ে। অনেক নেতা খেলাফৎ ও কংগ্রেস উভয়েরই কর্মকর্তা ছিলেন। এঁদের মধ্যে আলী ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা শৌকৎ আলী ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রতীক হিসেবে সেদিন প্রত্যেক সভা-সমিতি ও মিছিলে স্লোগানও দেওয়া হত একই 'বন্দেমাতরম্' ও 'আল্লাহু আকবর'। অনেক হিন্দু নেতার মুখে 'আল্লাহু আকবর' ভালো আসত না। তবুও তাঁরা প্রাণপণে চিৎকার দিতে পেছপাও হতেন না। একবার এক সভায় চট্টগ্রামের সে যুগের অন্যতম জননায়ক মহিম দাস বলে উঠলেন : 'আল্লাহু আকবরের' অর্থ বুঝি না বলে আমরা গলায় তেমন জোর পাচ্ছি না। এর বাংলা অর্থ করে নিয়ে তা দিয়েই শ্লোগান দেয়া হোক।' সঙ্গে সঙ্গে কে একজন অনুবাদ করে বল্লেন : এর অনুবাদ হচ্ছে 'ঈশ্বর মহৎ ও মহীয়ান'। পরবর্তী কয়েক সভায় মহিম দাস সত্য সত্যই তাই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল শ্রোতারা কেউ তেমন সাড়া দিচ্ছে না। মহিম দাসের একক কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কিছুটা মৃদু গুঞ্জরণ হলো শুধু। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রচলিত 'আল্লাহু আকবরেই' ফিরে যেতে হলো, স্বয়ং মহিম দাসকেও।

১৯২০ কি' ২১শে মনে নেই, স্বদেশ ফিরতি আসাম চা বাগানের কুলিদের উপর গুলী বর্ষিত হল চাঁদপুরে। ঘটনাস্থলেই কয়েকজন কুলি মারা গেল। চা বাগানের কুলিদের অসহ্য নির্যাতন সয়েই কাজ করতে হত এবং মজুরি যা মিলত তাতে পেট-পিঠের সংস্থান হত না। প্রতিবাদে কুলিরা ধর্মঘট করে— এ ধর্মঘটীদের একদল নিজেদের দেশ বিহার-উড়িষ্যায় ফিরে যাচ্ছিল। চাঁদপুরের ঘাটে এদের আটকানো হল। চা বাগানের মালিক সরকার নয় কিন্তু চা বাগানের কুলিদের আটকানো হল সরকারি আদেশে, গুলীও করল সরকারের পুলিশ বা সৈনিকরাই। কারণ চা-বাগানের অধিকাংশ মালিকই হচ্ছে ইংরেজ আর তখন এদেশে রাজত্বও ইংরেজের। ফলে ব্যক্তি ইংরেজের স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে এল ইংরেজ রাজশক্তি। শুধু তা নয়, এদেশের বেতনভোগী মানুষকে দিয়েই উদ্ধার করা হলো নিজেদের স্বার্থ। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের এই চেহারা এবং এরকম ঘটনা সেখানে হরহামেশাই ঘটে আর মনে করা হয় এটাই স্বাভাবিক। শুনেছি চট্টগ্রাম বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার মিঃ কে. সি. দে'র হুকুমেই গুলী করা হয়েছিল।

এভাবে কতকগুলি নিরীহ নিরস্ত্র কুলিকে হত্যার সংবাদ দাবানলের মতো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র আসাম বেঙ্গল রেলে ধর্মঘট ঘোষিত হলো সঙ্গে সঙ্গে। সে ধর্মঘট প্রায় দু'মাস স্থায়ী হয়েছিল। সদ্য বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এসে এ ধর্মঘটীদের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করলেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ। আর এসে দাঁড়ালেন তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী ইংরেজতনয়া নেলী সেনগুপ্তা। অন্তত পনর-বিশ হাজার মানুষ বেকার— এদের মাইনে বন্ধ। এদের


www.pathagar.com

পরিবারের অন্তত দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ যে কী বিরাট সমস্যা— বিশেষ করে সরকার-বিরোধী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা ভাবাই মুস্কিল। অকুতোভয়ে যতীন্দ্রমোহন সেদিন এ মহা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শুনেছি, চট্টগ্রামের সওদাগরেরা যতীন্দ্রমোহনকে মুক্তহস্তে সাহায্য করেছিলেন। সারা পাক-ভারত এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু শুনেছি যতীন্দ্রমোহনের ঘাড়ে বিরাট ঋণের বোঝা এসে পড়েছিল।

হাজার হাজার মানুষ বেকার। দেশের আকাশ-বাতাসে উত্তেজনা। সভা ডাকার কোন প্রয়োজন হয় না— প্রয়োজন হয় না বিজ্ঞাপন দেয়ার বা কোন রকম ঘোষণা করার। বিকাল হলেই দলে দলে লোক মুসলিম হল ময়দানে, কোন কোন দিন জে. এম. সেন হল মাঠে সমবেত হত। বর্তমানে যেখানে মেটারনেটি হাসপাতাল হয়েছে সেটাই ছিল মুসলিম হল ময়দান। পরে একবার মহাত্মা গান্ধী ঐখানে বক্তৃতা দেয়ার পর থেকে তাকে গান্ধী ময়দানও বলা হত। সে যুগের পাক-ভারতের সব নেতাই ঐ ময়দানে বক্তৃতা দিয়েছেন। সে যুগের জনসমাবেশের তুলনায় ওটা যে খুব বিরাট ময়দান তা নয়, তবে সামনে হাসপাতালের পাহাড় থাকায় তার ঢালুতে বহু লোক বসতে পারত।

ঐ ময়দানের একপাশে একতলা একটা দালানও ছিল— ওটাকেই বলা হতো মুসলিম হল। চট্টগ্রাম মুসলিম প্রধান হলেও চট্টগ্রাম শহরে মুসলমানদের সভাসমিতি করার জন্য কোন নিজস্ব স্বতন্ত্র স্থান ছিল না। এ অভাব বোধের ফলেই কয়েকজন সমাজ-দরদী সওদাগরের অর্থ সাহায্যে এ যায়গাটা কেনা হয়। এ সওদাগরদের অগ্রণী ছিলেন মরহুম আবদুল গণি সওদাগর— যিনি হাতি কোম্পানি নামেই ছিলেন পরিচিত! হাতি মার্কা লুঙ্গির তাঁরা ছিলেন একচেটিয়া এজেন্ট বা আড়তদার। তার থেকেই ঐ নামের উৎপত্তি। আজো তাঁদের বাড়িকে হাতি কোম্পানিদের বাড়ি বলা হয়। মুসলিম হলের একতলা দালানে আনওয়ার লাইব্রেরি নামে এক সাধারণ পাঠাগারও বেশ কয়েক বছর ধরে চলেছিল। পরবর্তী জীবনে ঐ ঘরে আমরা বহু সাহিত্য-সভাও করেছি। বিশেষত 'সাহিত্য মজলিস'-নামক সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সব সভা ওখানেই হত। সাদৎ আলী আখন্দ সাহেব অনেক বছর ঐ মজলিসের সম্পাদক ছিলেন। জনাব মীজানুর রহমানও মজলিসের বহু সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। তখন খুব সম্ভব তিনি কো-অপারেটিভের সহকারী রেজিস্ট্রার ছিলেন। সে যুগে সব বড় বড় রাজনৈতিক সভা-সমিতি মুসলিম হল ময়দানেই হত। ওখানে আমি গান্ধী, মোহাম্মদ আলী, শৌকৎ আলী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ বোস থেকে শুরু করে নজরুল ও এম. এন. রায়ের বক্তৃতাও শুনেছি। স্থানীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে গরম বক্তৃতা দিতেন কাজেম আলী সাহেব। তিনি ছিলেন একদিকে খাঁটি চাটগেঁয়ে, অন্যদিকে খাঁটি স্বদেশ-প্রেমিক। নিজের হাতে চাষ করতেন— সেকালে প্রতি বছরই কৃষি প্রদর্শনী হত আর সে প্রদর্শনীতে তাঁদের বাড়ির ফসল প্রায় বছরই পেত প্রথম পুরস্কার। শহরের রাস্তায় কিন্তু তাঁকে আমি আসকান-পাজামা ছাড়া দেখি নি কোনদিন। মাথায় আগে লাল তুর্কি টুপি পরতেন— অসহযোগ-খেলাফৎ আন্দোলনের যুগে যখন বিদেশী বর্জন শুরু হলো, তখন তিনি যে খদ্দর ধরেছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত তা আর ছাড়েন নি। তখন তাঁর আসকান-পাজামাও হল খদ্দরের, টুপিও। সব সময় রাস্তার একধার ঘেঁষে হাঁটতেন আর হাঁটার সময় নিচের


www.pathagar.com

দিকে ছাড়া কখনো এদিক ওদিক তাকাতেন না। তিনি না তাকালে কি হবে, তাঁকে দেখলে রাস্তার অন্য পাশ থেকেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বুড়োরা পর্যন্ত এগিয়ে এসে একটা সালাম না করে ছাড়তো না। তিনি হাত তুলে সালামটা নিতেন বটে কিন্তু চলন্ত পা দু'খানিকে থামাতেন না, নিজের গন্তব্যের দিকে চলতেই থাকতেন। এহেন মানুষ যখন সভায় দাঁড়াতেন তখন অন্য মূর্তি— মুহূর্তে ক্রোধে এমনি অগ্নি-শর্মা হয়ে উঠতেন যে, তাঁর চোখে মুখে যেন আগুন ছুটতে থাকতো। ফলে মুখ দিয়ে কথাই বেরুত না, থেমে থেমে যাও বা বলতেন তার চেয়ে তার দাঁত কড়মড় করতো অনেক বেশি। মনে হতো ইংরেজকে হাতের কাছে পেলে এখনই যেন চিবিয়ে খাবেন। তাঁর দু'একটি কথা এখনো মনে আছে। চট্টগ্রাম মুসলিম হল মাঠেই এক বিরাট জনসভা। তখনো মাইকের রেওয়াজ হয়নি। সভার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিজের গলার জোরেই নিজের কথা পৌঁছাতে হত। কাজেম আলী সাহেব দাঁতে দাঁত ঘষে বল্লেন : সারা ভারতে মাত্র পাঁচ ছয় হাজার ইংরেজ আছে, এ পাঁচ ছয় হাজার ইংরেজ আমরা তেত্রিশ কোটি (তখন লেখা আর বলায় ঐ সংখ্যাটাই ব্যবহার হতো, ওটা সঠিক সংখ্যা ছিল কি-না আমার জানা নেই) ভারতবাসীকে শাসন করছে! এ পাঁচ ছ' হাজার ইংরেজকে তাড়ানো কি এতই কঠিন? আমরা তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী যদি একসঙ্গে প্রস্রাব করে দিই তা হলেই তো ওরা কোথায় ভেসে যাবে! মুহূর্তে জনতা, হয়তো ইংরেজ তাড়াবার একটা সহজ পথের সন্ধান পেয়ে আনন্দে উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠত। মনে হলো সামনে ইংরেজ থাক বা না থাক, এখনই বুঝি সবাই প্রস্রাব করতে শুরু করবে। তখনো পাজামার যুগ শুরু হয় নি— আমরাও প্রায় লুঙ্গি গুটাতে শুরু করেছিলাম আর কি! কেউ তখন ভেবে দেখেনি সারা ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে এনে সব ইংরেজকে কোন এক জায়গায় জড়ো করানো সম্ভব কি-না এবং সম্ভব কি-না তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেও ওদের সামনে এনে দাঁড় করানো আর সবারই একই সঙ্গে যে প্রস্রাব পাবে তারই বা নিশ্চয়তা কি। তেত্রিশ কোটির অর্ধেক তো মেয়েছেলে— অতগুলি দেশী-বিদেশী পুরুষ মানুষের সামনে তারা অমন একটা বেইজ্জতি কাজ করতে রাজি হবে কি-না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ। অনেকের পক্ষে প্রাণ দেয়া সহজ কিন্তু স্বাধীনতার জন্যও আবরু বিসর্জন দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু সে উত্তেজনার মুহূর্তে এসব সন্দেহ কারো মনেই উদয় হয় নি, তখন ভাবাভাবির কোন প্রশ্নই কারো মনে ঠাঁই পায়নি। ইংরেজ তাড়াও, দেশ স্বাধীন করো এ ছিল তখন জনতার সামনে একমাত্র বুলি— একমাত্র ভাবনা। সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন তখন মানুষের চিন্তা ভাবনার বাইরে।

মহাত্মা গান্ধী ও অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম কার্যসূচি ছিল অস্পৃশ্যতা বর্জন। প্রত্যেক সভায় এ বিষয়েও গরম গরম বক্তৃতা হত। এ রকম এক-সভায় কাজেম আলী সাহেব বক্তৃতা দিতে দিতে বল্লেন : মেথর যদি অস্পৃশ্য হয় তা হলে আমরা সবাই অস্পৃশ্য— প্রত্যেক মা-ই অস্পৃশ্য। স্বীকার করি না বটে, আসলে আমরা প্রত্যেকেই মেথর। মেথর যেমন ময়লার বালতি বহন করে আমরাও প্রত্যেকে এক একটা ময়লার বালতি বহন করে থাকি। তবে মেথরের বালতির সঙ্গে আমাদের বালতির তফাৎ শুধু এটুকু— মেথরের বালতির মুখটা থাকে উপরের দিকে আর আমাদের বালতির মুখটা থাকে নিচের দিকে!


www.pathagar.com

শুনে জনতার সে কি হাসি ও উল্লাস।

আর এক সভায় ইংরেজদের বাপান্ত করার পর তিনি বল্লেন : 'ইংরেজরা যে কি রকম দুশ্চরিত্র তা কি আপনারা দেখতে চান? দেখতে চাইলে আমাকে এক এক আনা পয়সা দিন আমি এখনি মেথর পট্টি থেকে একাধিক এমন ছেলেমেয়ে এনে আপনাদের দেখাব যাদের মা মেথরানি বটে কিন্তু বাপ যে কারা তা দেখামাত্রই আপনারা বুঝতে পারবেন— এমন সোনালি চুল আর সাদা চামড়ার ছেলে মেয়ে মেথর পট্টিতে কেন, এ দেশের কোন কুলীন পাড়ায়ও জন্মায় না। এমন দুশ্চরিত্র জাতি আমাদের শাসন করবে? জনতার শেম শেমের মধ্যে তাঁর কথা গেল তলিয়ে। শেষে দাঁত কড়মড় করতে করতে তিনি নিজেও পড়লেন বসে।

রাজনৈতিক মতবাদ ও বিশ্বাসে তিনি আজীবন অটল ও অচল ছিলেন। অমন একনিষ্ঠ ও দৃঢ়চরিত্র মানুষ রাজনীতি ক্ষেত্রে কদাচিৎ দেখা যায়। শেষ বয়সে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন এবং এন্তেকালও করেন ওখানে দিল্লিতে।

## ষোল

অসহযোগ-খেলাফতের যুগে জননেতাদের নামের সঙ্গে কোন না কোন উপাধি জুড়ে দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যার ফলে চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দেশ-প্রিয় আর সুভাষচন্দ্র দেশ-গৌরব হয়েছিলেন। তখন চট্টগ্রামে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন কাজেম আলী সাহেব। অতএব তাঁরও নামের সঙ্গে একটা উপাধি থাকা দরকার। তিনি শুধু জাতীয়তাবাদী নন, ধর্ম-প্রাণ মুসলমানও। কাজেই তাঁর উপাধিটা মুসলমানী না হলে মানাবে কেন? এ দাবীর ফলেই এখন থেকে তিনি হলেন 'শেখে- চাটগাম'।

শেখে-চাটগাম কাজেম আলী সাহেব যেমন ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মেরুতে, তেমনি খান বাহাদুর আমান আলী ছিলেন তাঁর বিপরীত মেরুতে। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের এখনো সরকার বিরোধী হওয়ার সময় আসে নি। এখন তাদের গঠন ও সব দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়। তাই তিনি সরকার সমর্থক ছিলেন আগাগোড়াই। এর জন্য উত্তেজিত জনতার হাতে তাঁকে বহুবার অপদস্থ হতে হয়েছে। তবু তাঁর মত বা বিশ্বাস তিনি কখনো ত্যাগ করেন নি— তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ও নিজ সংকল্পে ছিলেন সব সময় অটল।

অসহযোগ খেলাফৎ আন্দোলনের মোকাবিলা করার জন্য সরকার তাঁকে দিয়ে peace & order অর্থাৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা নামে একটি সমিতি, একটি প্রেস ও তাঁর সম্পাদনায় 'সুনীতি' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা করান। সরকারের নিলামী ইস্তাহার এখন থেকে সুনীতিতেই ছাপা হতে লাগল। ঐ তিনেরই কর্ম-কেন্দ্র ছিল তাঁর লালদীঘির কোনার বাসা। তিনি সরকার সমর্থক ও সরকার ঘেঁষা লোক ছিলেন সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ সমাজের চাহিদা আর প্রয়োজন সম্বন্ধেও ছিলেন সচেতন। চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে তিনিই বোধ করি সর্বাগ্রে নিজের ছেলেকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাত পাঠিয়ে ছিলেন। এক ছেলেকে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়ে ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে, অন্য ছেলেকে ঢুকিয়েছিলেন সরকারি প্রশাসনিক বিভাগে। বলা বাহুল্য, এসব


www.pathagar.com

ক্ষেত্রে তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এভাবে সমাজের অভাব ও শূন্যতা পূরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি অনেক ক্ষেত্রে। ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগের অন্যতম নীতি ছিল সরকারি খেতাব, উপাধি বর্জন। কতবার কত সভায় এবং কত ভাবেই না খান বাহাদুর আমান আলীকে 'খান বাহাদুর' ছাড়বার জন্য চাপ দেয়া হয়েছে কিন্তু তাঁকে সংকল্পচ্যুত করাতে পারে নি কেউই। দেখেছি 'শেম শেমের' সমুদ্র গর্জনেও তিনি এতটুকু বিচলিত হন নি। সব সময় রয়েছেন নিজের সংকল্পে মতাদর্শে স্থির ও অটল। একবার বিপিন চন্দ্র পাল এসেছেন চাটগাঁয়। বিপিন পালের বক্তা-খ্যাতি সর্বজন বিদিত আর সুদূর বিস্তৃত। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জে. এম. সেন হলের মাঠ ভরে গেল হাজার হাজার নর-নারীতে। উদ্যোক্তারা কি জানি কি করে আমান আলী সাহেবকে রাজি করিয়েছিলেন ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে। তলে তলে কিছু একটা ষড়যন্ত্র যে ছিল তা আমরা তখনো আঁচ করতে পারিনি। যথারীতি বিপিন পাল বক্তৃতা শুরু করলেন— শেষও করলেন যথাসময়। তাঁর কণ্ঠ থামতেই খান বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন। এবার তাঁর সভাপতির ভাষণ দেওয়ার পালা। হঠাৎ চারদিক থেকে রব উঠল : 'খান বাহাদুরী ছাড়ুন,' 'খান বাহাদুরী ছাড়ুন,' 'গোলামীর তকমা ছাড়ুন', 'ইংরেজদের খেতাব ত্যাগ করুন।' সে এক হুলস্থুল ব্যাপার, হাজার হাজার জনতা এক বাক্যে 'ছাড়ুন' 'ছাড়ুন' করে চেঁচাচ্ছে। খান বাহাদুর কিন্তু স্থির, অচল, অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হট্টগোল না থামা পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে অনুত্তেজিত কণ্ঠে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন। মাঝে মাঝে সভার এদিক ওদিক থেকে 'শেম শেম' ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। সেইদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর বক্তব্য আজ আর কিছুই মনে নেই— কিন্তু তাঁর মুখের 'অর্বাচীন' শব্দটা আজো আমি ভুলি নি। যারা তাঁকে উপাধি ত্যাগের জন্য এভাবে চাপ দিচ্ছিল তাদের তিনি সেদিন 'অর্বাচীন' বলে অভিহিত করেছিলেন।

সে যুগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পরিচালনাধীনে কিছু কিছু প্রাইমারি, মধ্যবাংলা স্কুলও ছিল। চেয়ারম্যান থাকাকালে একবার এক স্কুল দেখতে গিয়ে কোন এক ক্লাসে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন : শশাঙ্ক মানে কি?

ছেলেরা সমস্বরে উত্তর দিল : চাঁদ, চন্দ্র।

: বেশ। চাঁদকে শশাঙ্ক কেন বলা হয়?

ফার্স্ট বয় উঠে বল্লে : শশ অঙ্কে যার সেই শশাঙ্ক। শশ মানে খরগোশ, দূর থেকে চাঁদের দিকে তাকালে মনে হয় চাঁদের কোলে যেন একটা খরগোশ বসে আছে, তাই চাঁদের এক নাম শশাঙ্ক।

খান বাহাদুর খুশি হয়ে বলে উঠলেন : বেশ। বেশ। আচ্ছা আমি যদি একটা খরগোশ কোলে নিয়ে বসি তাহলে আমাকেও কি শশাঙ্ক বলা হবে?

এবার ছেলেদের চক্ষু চড়ক গাছ। কচি বুদ্ধি হালে আর পানি পেল না। সবাই চুপ। সারা ক্লাসে বিমূঢ় বিস্মিত স্তব্ধতা।

তখন খান বাহাদুরই বুঝিয়ে দিলেন— না, আমি বা অন্য কেউই কোলে একটা খরগোশ নিলেই তাঁকে শশাঙ্ক বলা যাবে না। যুগ যুগ ধরে ব্যবহারের ফলে এক একটা


www.pathagar.com

শব্দের অর্থ ভাষার গায়ে এমনভাবে মিশে গেছে যে তার বাইরে প্রয়োগ করতে গেলেই তা ভুল হবে।

এঁরা সে যুগের ছাত্রবৃত্তি পড়া মানুষ। ওখানে বাংলাটা খুব ভালোভাবেই শেখানো হত। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব একবার আমার ভাষার কয়েকটি ব্যাকরণগত ভুল দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— তিনিও ছাত্রবৃত্তি পড়া, অতএব ভাষার ব্যাকরণগত ভুল তাঁদের নজর এড়াতে পারবে না। সে ছাত্রবৃত্তি অবস্থায় থাকতেই পণ্ডিত মশাইরা ছাত্রদের বাংলা ভাষার জ্ঞানটাকে এমন পাকাপোক্ত করে দিতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের আর কোথাও ঠেকতে হত না।

সে যুগের ব্যবহারজীবীদের মধ্যে খান বাহাদুর আমান আলী ছিলেন অগ্রণী আর চারিত্রিক সততায় ছিলেন বিশিষ্ট। কিন্তু জবানটি ছিল তাঁর ভয়ানক কড়া আর তিক্ত, তাঁর চেহারাটিও সুদর্শন ছিল না মোটেও। চট্টগ্রামী স্যালেং ব্যবহার করতেন যখন তখন, গালাগাল দিতেন তো বটেই। আর তা দিতেন নিজের ছেলেমেয়ে থেকে চেনা-অচেনা সবাইকে। গল্প শুনেছি একবার তিনি তাঁর বৈঠকখানায় বসে আছেন। একজন ভদ্রলোক এসে অনুরোধ জানালেন : আমার একটা সার্টিফিকেট দরকার, দয়া করে আমাকে একখানা সার্টিফিকেট দিন।

খান বাহাদুর বল্লেন : একটা কাগজ আনো।

লোকটি তাঁর টেবিলের উপর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ছাপানো কাগজ দেখে তার থেকেই একখানা তুলে নিয়ে তাই এগিয়ে দিলেন খান বাহাদুরের দিকে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে মারমুখো খান বাহাদুর এবার চেঁচিয়ে উঠলেন : এ কাগজ তোর বাপের না আমার বাপের, তুই যে এ কাগজ ধরলি? নিলি?

ততক্ষণে লোকটি রাস্তায় নেমে দে দৌড়।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাগজ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাজে ছাড়া ব্যবহার তাঁর পক্ষে কল্পনাতীত ছিল।

অসহযোগের চরম উত্তেজনার দিনে— আগেই বলেছি রোজই সভা বসত নিয়মিতভাবে— কোনদিন জে. এম. সেন হল মাঠে, কোনদিন মুসলিম হল ময়দানে। একদিন বিকালে জে. এম. সেন হল মাঠে এসে দেখি এক সুদর্শন তরুণ আসকান পাজামা পরে চেয়ারে বসে আছেন আর তাঁকে ঘিরে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ছাত্র। সবাই ঐ তরুণকে উদ্দেশ করে সমস্বরে দাবী জানাচ্ছে : ঐ মেয়েকে আপনি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবেন না, ঐ বিয়ে ভেঙ্গে দিতেই হবে, আমাদের সামনে প্রকাশ্যে আপনাকে ঘোষণা করতে হবে— ঐ মেয়েকে আপনি বিয়ে করবেন না বলে। অসংখ্য ছাত্র তাঁর চারদিকে যেভাবে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়েছে তা ভেদ করে বের হওয়াও সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। ছাত্রদের সম্মিলিত কণ্ঠের দাবী শেম্ শেম্ আর হট্টগোলে বেচারা তরুণের কণ্ঠস্বর, তার যুক্তি, অনুনয়-বিনয় সবই তলিয়ে গেল। কেউই শুনল না তাঁর কথা, শুনতে প্রস্তুত নয় কেউই তাঁর বক্তব্য। সবারই এক কথা, এক দাবী : যিনি গোলামির তক্‌মা খান বাহাদুরী ছাড়তে পারেন নি তাঁর মেয়ে কোন স্বদেশ-প্রেমিক তরুণই বিয়ে করতে পারে


www.pathagar.com

না, আপনিও করতে পারবেন না। বলুন, করবেন না, বলুন বলুন।

শুনলাম : ব্যূহবন্দী তরুণটি কক্সবাজারের উদীয়মান উকিল মি. মেহের আলী। সদ্য ল' পাস করে কলকাতা থেকে এসেছেন। আগে থেকেই খান বাহাদুর আমান আলী সাহেবের এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ল' পড়ার সময় খান বাহাদুর তাঁকে আর্থিক সাহায্যও নাকি করেছেন। কথা ছিল ছেলে পাস করে এলেই বিয়ে হবে। এখন তিনি পাস করে এসেছেন। কথাটা কি করে ছাত্র মহলে জানাজানি হয়ে গেছে। তাঁকে পাকড়াও করে এখন তারই হেস্তনস্ত করা হচ্ছে প্রকাশ্যে।

মেহের আলী সাহেবের পক্ষে উভয় সঙ্কট। তিনি কথা দিয়েছেন, হয়তো টাকাও নিয়েছেন। কিন্তু ছাত্ররাও নাছোড়বান্দা।— তাঁর কথা কানে তুলতেই রাজি নয় কেউই। রাজি নয় তাঁর মুখ থেকে সাফ জবাব না শুনে তাঁকে ছেড়ে দিতেও।

অগত্যা অনেক রাত্রে মেহের আলী সাহেব জনতার গণতন্ত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ছাত্র জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে মেহের আলী সাহেব বিষণ্ন মুখে ঘোষণা করলেন : তিনি খান বাহাদুর আমান আলী সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করবেন না যেহেতু খান বাহাদুর সাহেব খান বাহাদুরী ছাড়তে রাজি নন।

মেহের আলী সাহেব মুক্তি পেলেন। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর কথা রক্ষা করেছিলেন। খান বাহাদুর সাহেব সে যুগের এক সফল ও নামোয়ার মানুষ— সুদর্শন না হলেও তিনি তাঁর সব মেয়েকেই ভালো ঘরে ও ভাল বরে বিয়ে দিয়েছেন, দিতে পেরেছেন। যতদূর মনে পড়ে, পরে এ মেয়েরও বিয়ে ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের এক নামকরা অফিসারের সঙ্গেই হয়েছিল। সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের হাওয়া ব্যক্তি জীবনেও কিভাবে হানা দিয়েছিল তার নিদর্শন হিসেবে ঘটনাটা স্মরণীয়।

আজ মেহের আলী সাহেব পরলোকে, খান বাহাদুর সাহেব আর তাঁর ঐ মেয়েও।

## সতের

আমাদের এ কালটা কেটেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝড় ঝাপটার মধ্যে। তবুও পড়াশোনা এক রকম চলছিল— একে তো মাদ্রাসা ছিল শহরের এক পাশে, বিচ্ছিন্ন এক পর্বত চূড়ায় আর ছাত্ররাও ছিল আধা-মোল্লা আর আধা আধুনিক, তার উপর ঐ আন্দোলনের প্রধানতম অঙ্গ হিন্দু সমাজের সঙ্গে এর সংযোগ ছিল না কিছুমাত্র। কাজেই ঝড় ঝাপটার ধাক্কাটা তেমন বড় রকমের ফাটল ধরাতে পারে নি মাদ্রাসার স্বাভাবিক নিস্তরঙ্গ জীবনে। আন্দোলনের শীর্ষ মুহূর্তে যারা স্কুল-মাদ্রাসা ছেড়ে গিয়েছিল তাদের অনেকেই একে একে ফিরে এল। ফিরল না শুধু অনমনীয় দিদারুল আলম।

দেখতে দেখতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় এসে গেল। এ সময়ের একটি ঘটনা আমাকে জীবনে সত্যনিষ্ঠ হতে শিক্ষা দিয়েছে— যা না বল্লে আমার জীবনের মূল কথাটাই হয়তো বলা হবে না।

তখন ১৯২২-এর শেষ। টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে ফাইনেল দেওয়ার অনুমতি


www.pathagar.com

পেয়েছি। তখন ষোল বছরের কম হলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া চলত না, আর আঠারো অতিক্রম করলে পাওয়া যেত না কোন রকম বৃত্তি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে দেখা গেল আমার বয়স ষোলর অনেক নিচে। এ বিভ্রাটের কারণ যাঁকে সঙ্গে করে আমাকে মাদ্রাসায় প্রথম ভর্তি করাতে পাঠানো হয়, তিনি বাবাকে না জানিয়ে ভর্তির ফরমে তাঁর ইচ্ছা মতোই আমার জন্মের তারিখ আন্দাজি বসিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলেই এ অঘটন। টেস্ট পাস করেছি অথচ পরীক্ষা দিতে পারব না— দেখা দিল সংকট। শিক্ষকরাও কম উদ্বিগ্ন হলেন না। ভালো ছাত্র না হলেও অনেকে আমাকে স্নেহ করতেন। অধ্যক্ষ খান বাহাদুর মুসা সাহেব আমার বাবাকে অনুরোধ জানালেন আমার বয়স ষোল বা তার চেয়ে দু'এক মাস বেশি এ মর্মে একটা এফিডেভিট দিতে। বাবার কেতাবের পাশে আমাদের সব ভাই বোনের জন্ম তারিখ লেখা থাকত। তিনি তা দেখে তাই জানিয়ে দিলেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে। সে হিসেবে আমার বয়স দাঁড়ায় উনিশ। যখন ফাইনেল পরীক্ষা দিতে যাবো তখন স্বভাবতই আরো কয়েক মাস যাবে বেড়ে। ছোটকালে গ্রাম দেশে অভিভাবকহীন অবস্থায় বাউন্ডেলেপনা করে ফিরেছি— ফলে শহরে এসে রীতিমতো লেখাপড়া যখন শুরু করেছি তখন তলে তলে বয়স গেছে অনেক বেড়ে। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজনই হয়নি এতকাল। এখন সমস্যার সমাধান হয় কি করে? অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা বাবাকে অনুরোধ করলেন— আমার বয়স আরো কমিয়ে এফিডেভিট দিতে— না হয় ভবিষ্যতে আমার চাকরি পেতে অসুবিধা হবে আর ভাগ্যক্রমে পাসটাও যদি ভালোভাবে করি তা হলে স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। বাবা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে তা করতে শুধু অস্বীকার করলেন না, পরিষ্কার বলেও দিলেন, 'ছেলের চাকরি বা বৃত্তির জন্য আমি মিথ্যা বলতে পারব না।'

এঁদের কোন অনুরোধই তিনি শুনলেন না। একদিন কোর্টে গিয়ে তাঁর লেখা মতোই এফিডেভিট দিয়ে এলেন। জীবনে এ তাঁর প্রথম ও শেষ কোর্ট কাছারির আঙ্গিনা মাড়ানো। খান বাহাদুর মুসা সাহেব মনে মনে ক্ষুণ্ন হলেন। বলেছি, শিক্ষকদের কেউ কেউ আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাঁদের একজন (মরহুম ফৌজুল কবীর সাহেব) আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্টের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন— আমার বয়স যে ষোল এ মর্মে একখানা সার্টিফিকেট দিতে। উক্ত ডাক্তার আমার উত্তমাঙ্গ অধমাঙ্গ সব দেখে ঐ মর্মে অর্থাৎ আমার বয়স যে ষোল তা উল্লেখ করে সঙ্গে সঙ্গে সার্টিফিকেট একখানা দিয়েছিলেন। অধ্যক্ষ বাবার এফিডেভিট এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেট দুই-ই একই সঙ্গে ঢাকা সেকেন্ডারি বোর্ডে পাঠিয়ে দিলেন বটে কিন্তু সুপারিশ জানালেন ডাক্তারের সার্টিফিকেটের সপক্ষে। বাবা বোধ করি তখন কয়েকদিনের জন্য শহর থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলেন। এ সুযোগে শিক্ষকরা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকা যাতে ডাক্তারের সার্টিফিকেট গৃহীত হয় সে তদ্‌বির করার জন্য। তখন ঢাকা সেকেন্ডারি বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন মরহুম খান সাহেব আবদুর রহমান খান (তখনো তিনি খান বাহাদুর হন নি)। আমি তাঁর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার বক্তব্য জানালাম। তিনি বল্লেন, চাকরিই করতে হবে তার কি মানে আছে? পাস করে ওকালতি করবেন, না হয় অন্য কোন স্বাধীন পেশা। পরে বল্লেন : আইন হচ্ছে বয়স সম্বন্ধে মা বাপের এফিডেভিট


www.pathagar.com

চাওয়া ও গ্রহণ করা। বয়স সম্পর্কে ডাক্তারের সার্টিফিকেট আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

হলোও তাই। তাঁরা বাবার এফিডেভিটই গ্রহণ করলেন। ফলে আমার ঠিক বয়স আর সার্টিফিকেট বয়সে কোন তফাত রইল না এবং ম্যাট্রিক পাস করতেই আমার বয়স উনিশ ছাড়িয়ে গেল। এ ঘটনা আমি পরবর্তী জীবনে আমার 'রাঙ্গা প্রভাত' নামক উপন্যাসে ব্যবহার করেছি।

খান বাহাদুর মুসা ও অন্যান্য শিক্ষকরা যা আশঙ্কা করেছিলেন শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। সেবার খুব কম ছাত্রই প্রথম বিভাগে পাস করেছিল। ফলে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেও আমি স্কলারশীপ পাওয়ার কোটায় স্থান পেয়ে গেলাম। কিন্তু নির্দিষ্ট বয়স সীমা পার হয়ে গেছি বলে তা আর আমার পাওয়া হলো না। দু'বছর পর আই. এর বেলায়ও তাই ঘটল অর্থাৎ এবারও বৃত্তি পাওয়ার হকদার হয়েও তা পাওয়া গেল না বয়স বেড়ে গেছে এ অজুহাতে, চাকরির বেলায়ও ঘটল একই ব্যাপার। বি. টি. পাস করে যখন বেরুলাম তখন বয়স পঁচিশ পেরিয়ে গেছে। তাই বি. টি. ডিগ্রি-ওয়ালাদের যে চাকরি পাওয়ার কথা তা আমার ভাগ্যে জুটল না। এখানে ওখানে বেশ কিছুকাল বে-সরকারি স্কুল-মাদ্রাসায় চাকরি করার পর শেষে ঢুকে পড়লাম সরকারি চাকরির একদম নীচের ধাপে— সেখানে বয়স সম্বন্ধে তেমন কড়াকড়ি ছিল না আর ঐ চাকরির সর্বময় নিয়োগকর্তা ছিলেন বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর। তখন প্রেসিডেন্সী বিভাগে ঐ পদে বাহাল ছিলেন আমার পূর্বতন শিক্ষক শামসুল ওলামা কামালউদ্দীন সাহেব আর চাকরি একটা খালিও হলো তাঁর এলাকায়। কাজেই চাকরি পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। ঢুকলাম সরকারি চাকরিতে পঞ্চাশ টাকা মাইনের দ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে খুলনা জেলা স্কুলে। গ্রেড পঞ্চাশ টাকা বটে কিন্তু আমি পেতে লাগলাম সাড়ে সাত চল্লিশ টাকা। অর্থাৎ তখনো চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের খরচ বাবত ফাইভ্ পারসেন্ট কাট্। রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে উলুখড় প্রাণে মরে— আমরা তখনো সে উলুখড়! আঠারো ইংরেজিতে যুদ্ধ থেমে গেছে আর আমি চাকরিতে ঢুকেছি তেত্রিশের শেষের দিকে নভেম্বর মাসে। তখনো অর্থাৎ যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পনর বছর পরেও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে আমাদের মতো উলুখড়দের!

বাবার সত্যনিষ্ঠার জন্য সাময়িকভাবে আমি হয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, প্রথম দিকে কিছুটা অসুবিধাও ভোগ করতে হয়েছে বইকি কিন্তু এ জন্যে আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যও আফসোস জাগে নি। বরং তাঁর সত্যনিষ্ঠা চিরকালের জন্য আমার মনে একটা অপূর্ব আত্মমর্যাদাবোধ সঞ্চারিত করে দিয়েছে। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, যত নিচু থেকেই আমি জীবন আরম্ভ করি না কেন, জীবনে আমি ঠকি নি। আমি যা পাওয়ার যোগ্য তা আমি পেয়েছি বরং মনে হয় কিছুটা বেশিই পেয়েছি। আমার আত্মমর্যাদা ও সততা আমাকে এক একটা ধাপ অতিক্রম করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ থেকে সহকারী শিক্ষকের পদে, সহকারী শিক্ষকের পদ থেকে লেক্চারারের পদে আর লেক্চারারের পদ থেকে প্রফেসারের পদে যে পৌঁছেছিলাম তার পেছনে বাবার সত্যনিষ্ঠা আমাকে কম প্রেরণা দেয় নি। বাপের কাছে সন্তান অশেষ ঋণে ঋণী কিন্তু বাবা আমাকে পরোক্ষভাবে সত্যনিষ্ঠায় যে দীক্ষা দিয়ে গেছেন এর চেয়ে তাঁর কাছে বড় ঋণ আমি কল্পনা করতে পারি না।


www.pathagar.com

এ যাবৎ আমি আমার পাঁচ ছেলে ও এক মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছি কিন্তু কারো বয়স একতিলও এদিক ওদিক করি নি— বেশি বা কম লেখাই নি। কোন কোন সময় স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুরুদ্ধ হয়েও আমি তা করতে রাজি হই নি।

একবার আমার পরিচিত ও আমার ছেলের হিতৈষী এক শিক্ষক আমাকে এ ব্যাপারে চিঠিও লিখেছিলেন। আমি উত্তরে আমার পিতার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেছিলাম : আমার ছেলে ভবিষ্যতে কি হবে না হবে আমি বলতে পারি না কিন্তু জীবনের সূচনায় মিথ্যা দিয়ে তার হাতে খড়ি হোক, এ আমি চাই না।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন এ ঘটনার সঙ্গে আমার সাহিত্যিক জীবনের কি সম্পর্ক। আমি মনে করি যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমত, এ ঘটনাকে আমি আমার সাহিত্য কর্মের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছি— এ ঘটনা আমার মনের গভীরে দাগ না কাটলে তা কখনো আমার সাহিত্য কর্মের বিষয় হত না। দ্বিতীয়ত এবং এটিই প্রধান। এ ঘটনা আমাকে আমার সাহিত্যকর্মেও সত্যনিষ্ঠ হতে শিক্ষা দিয়েছে। রচনার ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ হওয়ার মূল্য যে অপরিসীম— সাহিত্যিক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এ শিক্ষাটুকুও আমার লাভ হয়েছে।

## আঠার

১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক পাসের সঙ্গে সঙ্গে আমার চট্টগ্রামে ছাত্র জীবনেরও ইতি ঘটে, ম্যাট্রিক মানে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা। তখন পর্যন্ত চট্টগ্রামে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস খোলা হয় নি। তাই হাই মাদ্রাসায় পাশ করে ঢাকায় যেতে হত চাটগাঁর ছাত্রদের।

এ পর্যন্ত সাহিত্যের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় তা সবটাই কেতাবী, এক কলমও লিখি নি, লিখব বা লিখতে পারব তেমন ধারণাও মনে কোন দিন উঁকি মারে নি। জাগেনি মনে তেমন দুঃসাহসিক লোভ একদিনের জন্যও। তবে আগেই বলেছি, বাংলা বই ও পত্র-পত্রিকা হাতের কাছে যা পেতাম তাই আমি পড়তাম নির্বিচারে। মাদ্রাসা হলে কি হবে সে যুগের সব প্রসিদ্ধ মাসিকই মাদ্রাসায় আসত— প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতীর সঙ্গে যেমন আমার ওখানেই পরিচয় ঘটে তেমনি ওখানেই পরিচয় ঘটে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, আল-এসলাম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মোসলেম ভারত, সওগাত ইত্যাদির সঙ্গেও। মুসলমান লেখকদের অনেক বই ছিল মাদ্রাসা লাইব্রেরিতে। নির্বিচারে রাতের পর রাত জেগে সেসব বই আমি গলাধঃকরণ করেছি। প্রথম বিষাদসিন্ধু পড়েছি তো মাতালের মতো হয়ে— রাত শেষ হয়ে বেলা কতটুকু উঠেছে সে খবরও ভুলে ছিলাম সেদিন। মহাশ্মশানও পড়েছি শিয়রে কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে সারা রাত জেগে। শিরাজী সাহেব তাঁর 'ঈশা খাঁ ও রায় নন্দিনী'র সূচনায়— 'পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেভাবে অর্ধচন্দ্র খচিত পতাকা পত্ পত্ করে উড়িয়েছেন' বই পড়তে পড়তে তা যেন চোখের সামনেই দেখতে পেতাম। তিনিও সেদিন আমাদের কম মাতাল করেন নি।

পুরোপুরি মাতাল করে ছাড়ল নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যে তাঁর যখন আবির্ভাব তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায় রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়লাম


www.pathagar.com

তাঁর 'হেনা', সওগাতে 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' আর মোসলেম ভারতে 'বাঁধন হারা'। 'বাঁধন হারা' প্রকাশিত হচ্ছিল ধারাবাহিক — মাসে মাসে কিস্তিওয়ারী। কি অদম্য উৎকণ্ঠার সঙ্গেই না তখন এক একটা মাস অপেক্ষা করে থাকতাম। এক একটা লেখা কতবার করে যে পড়েছি তার কোন হিসেব নেই। সবই নূতন— ভাষা নূতন, প্রকাশ ভংগী নূতন, বিষয়বস্তু নূতন। এর আগে মুসলমান লেখকের দেদার লেখা আমি পড়েছি, মুসলমানী বাংলা বলতে যা বুঝায় তার সঙ্গেও আমি অপরিচিত ছিলাম না— কিন্তু এমন করে সমস্ত সত্তার শিকড় শুদ্ধ নাড়া দিতে কেউ পারে নি এর আগে। সাহিত্যে নতুনত্ব যে মানুষকে এমনভাবে উত্তাল, উদ্দাম ও উন্মত্ত করতে পারে ইতিপূর্বে সে ধারণাই ছিল না আমাদের। অপূর্বতা ও নতুনত্বের সঙ্গে অদম্য প্রাণশক্তির যোগ ঘটলে তা যে এক অসাধ্য সাধন করতে পারে নজরুল নিয়ে এলো আমাদের জীবনে সে অভিজ্ঞতা। গল্পের শুরুতেই কামানের গুরুম গুরুম শব্দ— শব্দ তো নয় যেন এক অবরুদ্ধ জগতের দ্বার খোলারই জয়ধ্বনি— সত্যই আমাদের চোখের সামনে খুলে গেল সাহিত্যে এক নতুন দুনিয়ার রুদ্ধদ্বার। যে মাসের মোসলেম ভারতে একই সঙ্গে বেরুল নজরুলের 'বিদ্রোহী' আর 'কামাল পাশা' সে মাসে কি আমরা ভালো করে ঘুমুতে পেরেছি? পারি নি বল্লে আজকের তরুণরা— যারা জরাসন্ধ আর শঙ্করের নামে মূর্ছা যায়, উত্তমকুমার আর সুচিত্রা সেন যাদের ঠোঁটে ঠোঁটে তারা হয়তো বিশ্বাসই করতে পারবে না। আমাদের প্রথম যৌবনের সমস্ত আবেগ উদ্দাম ও উল্লাসই যেন ফেটে পড়েছে ঐ দুই কবিতায়। অমন ছন্দ, অমন ভাষা অমন কথা আজো পড়ি নি, শুনিও নি। সবই যেন আমার নিজের অন্তরেরই বিদ্রোহ আর জয়োল্লাস। কতবার কতভাবেই যে ঐ দুই কবিতা পড়েছি— এখান থেকে ওখান থেকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কত চরণ যে আওড়িয়ে ফিরেছি তার কোন হিসেব নেই। গদ্য, কবিতা, গান নজরুলের কলম থেকে যা বেরোয় তাই আমাদের কাছে নতুন। কি অর্থ, কি মানে তা জানার দরকার নেই, জানতে বা বুঝতে চাই নি সেদিন। ভাষা এবং ছন্দের হিল্লোলেই আমরা ছিলাম মাতোয়ারা।

কেন মাতোয়ারা ছিলাম তা আজ আর বলতে পারব না। আবেগের সে সর্বনাশা উত্তাপ আর অনুভূতির উত্তাল বন্যাবেগ আজ মন্দীভূত। কল্পনায়ও আজ তাকে ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। ভাষায় প্রকাশ তো দূরের কথা।

১৯২২ সালে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই বের হল নজরুলের 'ব্যথার দান' ও 'অগ্নিবীণা'। তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। থাকি জায়গীরে— কোন রকম আর্থিক সঙ্গতিই নেই। তবুও অর্ডার দিয়ে কলকাতা থেকে পার্সেলেই বই দু'টা আনালাম। যেদিন সে পার্সেল এসে পৌঁছল সেদিন আনন্দের চোটে মাটিতে পা ঠেকে নি। সে পার্সেল হাতে নিয়ে মনে হয়েছিল আমি সব থেকে আলাদা— আমি বিশিষ্ট। আমার সঙ্গীদের আর কারো নামে অমন পার্সেল আসে নি— কলকাতা থেকে এভাবে ভি. পি. পি'তে অমনভাবে বই আনাবার খেয়াল বা সাহসই কয়জনের ছিল সেদিন?

'ব্যথার দান' আর 'অগ্নিবীণার' সব লেখাই তো পরিচিত, সবই তো আগে বহুবার পড়া। তবুও বই দু'টা পেয়ে রক্তের সে কি চাঞ্চল্য, হৃদয়ের সে কি তোলপাড়! অতখানি


www.pathagar.com

পুলক শিহরণ নিয়ে নববধূর কর-পদ্মও বোধ করি কেউ স্পর্শ করে নি। পড়া লেখাগুলি নতুন করে চেকে চেকে আবার পড়লাম একবার, দু'বার, তিনবার...কতবার? কি মাথা ব্যথা স্মরণ করে রাখার! 'ব্যথার দানে' কবির সৈনিকবেশী ছবিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার করে দিয়েছি। অগ্নিবীণার প্রথম প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর— সারা কভার ব্যাপী থরে থরে আগুনের ফুলকি— এ বইর প্রচ্ছদ এবং লেখা দুই মিলে সেদিন আমাদের মনেও জ্বালিয়েছিল অজস্র ফুলকি!

শুধু কি তাই? সে বছরে অর্থাৎ ১৯২২ সালেই বের হল নজরুল সম্পাদিত— সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত 'ধূমকেতু'। বল্লাম বটে সম্পাদিত, আসলে ধূমকেতুর উপরে সম্পাদকের পরিবর্তে লেখা থাকত 'সারথি'। এও নতুন। নজরুলের সবই নতুন। সেদিনের তরুণদের নজরুল যে এমনভাবে আকর্ষণ করতে পেরেছিল তার মূলে ছিল এ অভিনবত্ব।

তিন মাসের চাঁদা অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়ে আমি হয়ে গেলাম 'ধূমকেতুর' গ্রাহক। আমরা কোন ছার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই কবিতা দিয়ে অভিনন্দিত করলেন 'ধূমকেতুকে'। সবই নতুন আর সবই আগুন— সম্পাদকীয়, সংবাদের শিরোনামা আর যে সব কবিতা ইত্যাদি ছাপা হত সবই একদিকে যেমন নতুন তেমনি যেন লেখা হয়েছে আগুনের কলম আর আগুনের কালি দিয়ে। সে আগুনে আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কখন পিয়ন আসে, কোন্ দিন ধূমকেতু আসবে সবই আমার নখদর্পণে। আমার আস্তানা কাজী বাড়ি মেন্ রোড থেকে সামান্য ভিতরে। যেদিন ধূমকেতু আসবে সেদিন ঘরে বসে পিয়নের অপেক্ষার তর সইত না— দুরু দুরু বুকে রাস্তায় গিয়ে পিয়নের আসা পথের দিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকতাম। বুকে কত আশা-নিরাশার উত্থান পতন।

কিসের আশা-নিরাশা?

কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে আশা-নিরাশার কি শেষ আছে? সামান্যে কত রঙ বেরঙের আশা পাখি মনের আকাশে পাখা বিস্তার করে উড়াল দেয় দিগদিগন্তে আবার কত সামান্যে, তুচ্ছতম নৈরাশ্যে মনের সাত আকাশ ভেঙ্গে হয়ে যায় চুরমার— মুহূর্তে।

সে অকারণ বুক দুরু দুরু করা বয়সে কতদিন রৌদ্রদগ্ধ রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি পিয়নের অপেক্ষায়। এ সংখ্যা ধূমকেতুতে কি আছে, কি পড়তে পাব, কি অগ্নিগর্ভ কথায় বুকের তলায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলবে কে জানে? এক দিকে এ আশা-আশঙ্কায় দোদুল্যমান অন্যদিকে পিয়ন যদি আজ না আসে. ধূমকেতুই যদি আজকের ডাকে এসে না পৌঁছে? সত্য সত্যই এক একদিন তেমন অঘটন ঘটত বই কি— সেদিন বুকের তলায় সারা আকাশটাই যেন ভেঙ্গে পড়ত। এসবকে যদি মনের দিক থেকে, আবেগ অনুভূতির দিক থেকে কিছুটা প্রস্তুতি বলা যায় তাহলে ঢাকায় ছাত্র জীবন শুরু হওয়ার আগে সাহিত্যের পথে আমার এ প্রস্তুতিটুকুই মাত্র ঘটেছিল।


www.pathagar.com

## উনিশ

চট্টগ্রামকে বলা হয় বারো আউলিয়ার দেশ। অলি দরবেশদের কবর আর দরগার অন্ত নেই চাটগাঁয়। এসবের প্রতি ছোটকাল থেকেই আমি কখনো তেমন আকর্ষণ বোধ করি নি। আমার বাবারও তেমন কোনো আগ্রহ দেখি নি। তিনি ব্যক্তিগত এবাদৎ আর সজ্জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন— পীর বা মাজার দরগা সম্বন্ধে ছিলেন নিরপেক্ষ, কিছুটা উদাসীনও। তাঁর কোন পীর ছিল না। তিনি নিজেও কারো পীর হন নি. এ ব্যাপারে আমারও মনের গড়ন অনেকখানি তাই। ছোটকাল থেকে এসব ব্যাপারে আমিও নিরপেক্ষ। মাঝে মাঝে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে জুটে বায়জিদ বোস্তাম যে গিয়েছি সে শুধু গজার মাছ আর বিপুলকায় কাছিম দেখার জন্যই। বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে এক-আধবার দলে ভিড়ে শাহ আমানত কি বদর শাহের দরগায়ও যে যাই নি তা নয়, তবে মূলত তা ছিল দলে পড়া ব্যাপার কিছুটা সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে জুটে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ানো।

একবার— বোধ করি সময়টা ১৯২১ সাল। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আমরা সবাই যাকে বলে পুরোপুরি বেকার। বিকালে হোস্টেলে বসে বসে গল্প করছি— কে একজন হঠাৎ প্রস্তাব করে বসল মাইজভাণ্ডারের মেলা হচ্ছে, চল দেখে আসি। পরীক্ষার ফলাফলটাও তো ঝুলছে মাথার উপর। উপস্থিত সবাই প্রস্তাবটা মুহূর্তেই মেনে নিলে। কাজকর্ম নেই আমিও সায় দিয়ে মেতে উঠলাম। ক্ষতি কি— বেকার সময়টার কিছুটাতো ক্তল করা যাবে। আমাকে সঙ্গীরা আর বাসায় ফিরতেই দিল না— বল্ল, সংকল্পের উত্তাপটা থাকতে থাকতেই চল রওয়ানা দেয়া যাক। তথাস্তু।

তখনো চট্টগ্রাম— নাজির হাট রেল বা বাস সার্ভিস কিছুই হয়নি ঐপথে। হাঁটন ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই। ইতিপূর্বে আমাদের দলের কেউই মাইজভাণ্ডার দেখে নি, যায় নি। পথঘাটও চেনা নয় কারো।

কিন্তু উৎসাহের চোটে সবাই এক সঙ্গে বলে বসল, এখনই যাত্রা করা যাক। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় না এক সময় গন্তব্য স্থানে নিশ্চয় পৌছে যাবই। পথ বাৎলাবার লোক পথেই মিলবে।

শীতকালের পড়ন্ত বিকাল— সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন। সারা রাত হাঁটব এ সংকল্প নিয়ে আমরা চাঁর পাঁচ জন মাদ্রাসা পাহাড় থেকে বেরিয়ে পড়লাম মাইজভাণ্ডার লক্ষ্য করে।

সোজা সড়ক ধরে চল্লে পথ যাবে অনেক বেড়ে— কে যেন বলে দিল বিল পাতারি যাওয়ার কথা। তাই সই– লোকের ক্ষেত-খামার মাড়িয়ে, চষা ও অচষা জমির ঢেলা আর আলে হোঁচট খেতে খেতে আমরা হাঁটতে লাগলাম। ভাগ্যে চাঁদনী রাত ছিল— আর পথ-ঘাটও ছিল কড়কড়ে শুকনো।

একে ওকে জিজ্ঞাসা করে সারা রাত ধরে কুড়ি বাইশ মাইল হেঁটে যখন মাইজভাণ্ডার পৌছলাম তখন চারদিক থেকে ভেসে আসছে মোরগের ডাক। এতক্ষণ হাঁটার তালে ছিলাম বলে পেটের কথা আমরা এক রকম ভুলেই ছিলাম— পা থামাতেই বুঝতে পারলাম— পেট কুলুআল্লাহ্ পড়া শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই। পেটেরই বা দোষ



www.pathagar.com

কি খেয়েছি তো সে সক্কাল বেলায়!

শহরের সীমা যখন আমরা ছাড়াই তখনই তো প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। এখনো দু' একটা হোটেল, চা-খানা নাগালের মধ্যেই ছিল। কে একজন বলেও ছিল— চল কিছু খেয়ে নিই, সামনে আর দোকানপাট মিলে কি-না সন্দেহ।

অন্য সবাই প্রস্তাবটা এ বলে নাকচ করে দিল যে— যাচ্ছি মাইজভাণ্ডারের ওরসে— সেখানে উট, গরু, ছাগল, দুম্বা এন্তার জবাই হয়, পেটটাকে তার জন্য তৈরি অর্থাৎ খালি রাখাই উচিত।

অতএব খালি পেটেই সারা রাত হেঁটে ভোর রাত্রে মাইজভাণ্ডার পৌঁছলাম। মেলায় অসংখ্য লোক— কারো চোখে ঘুম নেই। এখানে ওখানে বসে গেছে দোকানপাট- লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, জটলা করছে— সারি সারি লোক পূর্বতন শাহ সাহেবের মাজার জেয়ারত করছে। দলে দলে লোক আন্দরের দিকে যাচ্ছে আবার তেমনি দলে দলে বেরিয়েও আসছে। ওসব দেখার অবস্থা তখন আমাদের নয়। সোজা দেউড়ি ঘরে ঢুকে আমিই বল্লাম : শাহজাদা খায়রুল বসর মিয়াকে চাই। খবর পেয়েই খায়রুল বসর ছুটে এলো। ও পীর সাহেবের বড় ছেলে আর আমার সহপাঠি। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরল, তারপর হাত ধরে টেনে ওর পাশে বসালো। বসতে না বসতেই কয়েকজন লম্বা চুলওয়ালা মুরিদ ছুটে এসে ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সেজদা করতে অর্থাৎ পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ভক্তি নিবেদন করতে শুরু করলো। আমি তো হতভম্ব, জীবনে এমন অভিজ্ঞতা দূরে থাক— এমন দৃশ্যও এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আমার বাবা কাকেও তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেও দিতেন না।

আমি তড়াগ্ করে এক লাফে আমার সঙ্গীদের মাঝখানে এসে বসে পড়লাম। পরে শুনলাম— বিছানার পশ্চিম সারিতে শাহসাহেব বাড়ির ছেলেরা ছাড়া অন্য কেউ বসে না, বাদ বাকি মুরিদান ও ভক্তরা পুব সারিতেই বসে। আর এ বাড়ির ছেলেদের মুরিদরা ওভাবেই করে সালাম। এ বাড়ির বড় ছেলের পাশে পশ্চিম সারিতে বসেছি বলেই মুরিদরা আমাকেও পীর বংশের কেউকেটা ধরে নিয়েছে। ফলে এ বিভ্রাট।

ডেক্সি ডেক্সি খাবার তৈরি। কাজেই পরিবেশনে বিলম্ব হলো না। প্রবল ক্ষুধা সত্ত্বেও কিন্তু খেতে পারলাম না— পৌষের শীতে ভাত প্রায় বরফের ঢেলা, সালন যা দেওয়া হলো সবই গোস্ত বটে কিন্তু তাও জমে বরফ। অতএব ডান হাত আর রসনা কোনটাই বেশি দূর এগুতে রাজি হল না। মিনিট দশেক এদিক ওদিক ঘুরে আন্দরে শাহ সাহেবকে দেখতে গেলাম। এমন শীতের দিনেও তাঁর সর্বাঙ্গ বস্ত্রহীন।

সব মিলে কোথাও যেন আমাদের রুচির সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে পেলাম না। শুধু আমার নয়, আমার সঙ্গীদেরও কারো মন যেন খুশি হলো না। স্বস্তি পেলাম না আমরা কেউই। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে কোথাও না কোথাও আধ্যাত্মিকতা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আমরা তা উপলব্ধি করতে পারিনি। হয়তো আমাদের বয়সই তার জন্য দায়ী। কি জানি কেন সে হট্টগোলের মধ্যে মন আর এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে চাইল না। অতএব সে ভোর রাত্রেই আমরা ফের রওয়ানা দিলাম শহর মুখো। আবার বিলখাল ক্ষেতখামার ভাঙ্গতে


www.pathagar.com

লাগলাম ক্লান্ত চরণে। পথে আর কোথাও থামাথামি নয়। একদম শহরে নিজের আস্তানায় গিয়েই পা দু'খানাকে বিশ্রাম, পেটকে আহার আর পিঠটাকে বিছানায় আশ্রয় দেব। তার আগে নয়। সকলের মনে মনে এ সংকল্প।

হাঁটতে হাঁটতে যখন ফতেহাবাদ পৌছলাম তখন সূর্য সোজা মাথার উপর। পেটের ভিতর যা হচ্ছে তা না বলাই ভালো। তখন তো আর রাস্তায় রাস্তায় খাবারের কি চায়ের দোকান ছিল না।

আমাদের সকলের চেনা আর বন্ধু দিদারুল আলমদের বাড়ি ফতেহাবাদে আর বাড়িটাও আমরা যে রাস্তা ধরে চলেছি তার খুব কাছেই। আমরা মনকে চোখ ঠারালাম। একে অপরকে বল্লাম : এ পথ দিয়েই যখন যাচ্ছি চল দিদারুলকে একবার দেখে যাই।

আমি গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে এলাম। ও আমাদের দেখে অবাক হলো, খুশি হলো, পীড়াপীড়ি করল— চল বাড়ি চল। থাকতে না চাও খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করে তারপর না হয় হাঁটা দিও। বার বার এ অনুরোধ জানাল ও।

আমরা আবারও মনকে চোখ ঠারালাম, না না, কত আর বেলা হয়েছে! ওখানে যা খাওয়া খেয়েছি আজ না খেলেও চলবে, জানো তো ওখানে জবাই হয় উট, দুম্বা, গরু, ছাগল, এমন কি মহিষও। আট ন' মাইল আর কতটুকু? শহরে গিয়েই খাব।

ও অনেক পীড়াপীড়ি করল, আমরা শুনলামই না। কি জানি কেন, আমাদের সঙ্কোচ আর আত্মসম্মান অত্যন্ত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সেদিন। কোন রকমে ফতেহাবাদ হাইস্কুল পর্যন্ত আসতে না আসতেই দেখি পা আর চলে না। মনের বাঁধ এবার ভেঙে চুরমার। সবাইর এবার এক সঙ্গে মনে হলো বড্ড ভুল হয়ে গেছে। অভুক্ত অবস্থায় এভাবে শহর পর্যন্ত কিছুতেই যাওয়া যাবে না। আর এভাবে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। এবার লজ্জাসঙ্কোচ, মান-অভিমান সব সামনের দীঘির জলে নিক্ষেপ করে পঞ্চপ্রাণী ফিরে চল্লাম দিদারুলদের বাড়ি। এবার দিদারুল আরো অবাক। আমিই বল্লাম : এবার তুমি দাউয়াৎ না করলেও আমরা নিজগুণেই অর্থাৎ নিজ নিজ উদরের প্রয়োজনেই তোমার দাউয়াৎ কবুল করলাম ভাই।

দিদারুলের ক্ষিপ্রহস্তা ভাবীরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমাদের ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করে ফেল্লেন। খেয়ে দেয়ে দিবানিদ্রা দিয়ে যখন উঠলাম তখন বেলা প্রায় ডুবুডুবু— দিদারুলদের থেকে খাওয়ার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে পঞ্চপ্রাণী এবার শহরের দিকে বাড়ালাম পা।

কোন দরগা, মাজার বা ওরসে যাওয়া ঐ আমার প্রথম আর এখন পর্যন্ত ঐ শেষ।

## কুড়ি

আমার নিউ স্কিমে থেকে যাওয়ার সময় বাবাকে কথা দেওয়া হয়েছিল হাই মাদ্রাসা পাস করার পর আমি ফের সাবেকি মাদ্রাসায় ফিরে ভর্তি হব এবং ভালো করে আরবি, ফারসি শিখে পিতা পিতামহের মতো হব বড় আলেম। কথা দেয়া ব্যাপারটি ছিল আমার কাছে


www.pathagar.com

উপস্থিত ফাঁড়া কাটানো। এখন ম্যাট্রিক বা হাই মাদ্রাসা পাস করার পর আমি যখন ঢাকায় গিয়ে আই. এ. পড়ার কথা পাড়লাম তখন বাবা রেগে উঠে বল্লেন : না। এবার তোমাকে দারুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হতে হবে, জমাতে উলা পাস করার পর অন্য কথা।

আমি তো রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। বাবার কাছে যাঁদের কথার কিছুটা দাম আছে তেমন সব লোকের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দিতে লাগলাম ধন্না। সুখের বিষয়, দেখা গেল সবাই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল, আমার সংকল্পের যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী। আমার শিক্ষকদেরও অনেকে আমার সহায় হলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জুমা মসজিদে নমাজ পড়তে আসতেন তাঁরা সুযোগ পেলেই আমার সপক্ষে বাবাকে বুঝাতে লাগলেন। কেউ কেউ আশ্বাস দিলেন, এ লাইনে আই. এ. পাস করতে পারলে চাই কি সাব-রেজিস্ট্রারও হয়ে যেতে পারে ও। তখন সাব-রেজিস্ট্রার হওয়া একটা কেউ কেটা ব্যাপার ছিল। চোখের সামনে দেখাও যেতো ওঁদের বেশি করে। যদিও তখন দেশে তেলা-পোকাও পাখি নয়, সাব-রেজিস্ট্রারও হাকিম নয়, এমন সব ঠাট্টাও প্রচলিত ছিল তবুও, বিশেষত গ্রাম দেশে এঁদেরে রীতিমতো হাকিমই মনে করা হত। সে যুগের মুসলমান সাব-রেজিস্ট্রারেরা সাধারণত আসকান, পায়জামা, টুপি পরতেন, দাড়ি রাখতেন, নমাজ-রোজায় ছিলেন নিয়মিত আর স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন অগ্রণী। এ চেহারা ও জীবন বাবার পরিচিত আর পছন্দের। আমার সাব-রেজিস্ট্রার হওয়ার সম্ভাবনার কথায় বাবার মন যেন কিছুটা নরম হয়ে এলো। পটিয়া থেকে মেজ মামু আবদুর রউফ সাহেবও আমার সপক্ষে সুপারিশ করে চিঠি লিখলেন। এ মামার প্রতিও বাবার আস্থা ছিল। মামা বোধ হয় এ আশ্বাসও দিয়েছিলেন : সম্ভব হলে আমিও না হয় মাঝে মাঝে কিছু কিছু সাহায্য করব ওকে।

যদিও খুব সামান্য— আমি আই. এ. পড়ার সময় তিনি দু'এক দফা সাহায্য করেছিলেনও। সে যুগের সামান্যও এ যুগের তুলনায় অসামান্য।

আমার সহপাঠিদের মধ্যে যারা ভালো ছাত্র তারা আবার সব দিকেই ছিল ভালো। অনেকে সব সময় মাথায় টুপি রাখতো, লম্বা কোর্তা পরতো, নিয়মিত আদায় করতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ— দাড়ি যাদের উঠেছে তারা দাড়িও রাখতো। এদের কারো কারো সাথে জুমা মসজিদেই বাবার পরিচয় হয়েছে— আবার কারো কারো বাবা রীতিমতো আলেম তাও তিনি জেনেছেন। এ দলেরও কেউ কেউ আই-এ পড়তে ঢাকায় যাচ্ছে শুনে তিনি যেন আর একটু আশ্বস্ত বোধ করলেন। "ছোহবতে ছালেহ তোরা ছালেহ কুনদ্" এও তাঁর এক প্রিয় প্রবচন। ছোটকালে কতবারই তো তাঁর মুখে শুনেছি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত কি ভেবে তিনি রাজি হলেন তবে তা যে নিমরাজি এবং অনেকটা অনিচ্ছাকৃত তা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার উৎসাহের স্রোতে তা তৃণ খণ্ডের বেশি স্থায়ী হল না। তখনো ঢাকা-চাটগাঁ সরাসরি রেল লাইন হয়নি। ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ হয়ে। এ পথেই আমরা দল বেঁধে ঢাকা যেতাম আবার ছুটির সময় দল বেঁধে দেশে ফিরতাম। একটা রাত ট্রেনেই কাটতো। এ ভ্রমণটা ছিল আমাদের কাছে খুবই আনন্দের আর এক চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা। বিশেষত স্টিমারে পদ্মা পারাপারের স্মৃতি ভুলবার নয়। শুধু দুই স্টিমার ঘাটে কুলির হাঙ্গামাটাই ছিল বিরক্তিকর। আশ্চর্য আজো এ


www.pathagar.com

বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার অবসান ঘটে নি— চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দে এখনো আগের মতোই নাকি বিরাজ করছে কুলির নৈরাজ্য।

নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে ফুলবাড়িয়া। নিকটবর্তী মহল্লার নামে ঢাকা স্টেশনকে তখন ফুলবাড়িয়াই বলা হতো। ট্রেন ঢাকার দিকে এগুবার সময় সর্বাগ্রে আমাদের নজরে পড়তো দেওয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা– 'সর্বজ্বর গজসিংহ', 'দদ্রু হুতাশন' ইত্যাদি। ঔষধের এমন ভয়ঙ্কর নাম এর আগে কখনো শুনি নি। তখন মনে হতো ঔষধের দরকার পড়বে না নামশুনেই হয়তো অসুখটা পালাবার পথ খুঁজবে। দেওয়ালের গায়ে গায়ে লেখা এমনতরো বিজ্ঞাপনগুলোই ছিল আমাদের ঢাকা প্রবেশের সংকেত।

পুরোনো ঢাকা মাদ্রাসার সঙ্গে দু'টা আই. এ. ক্লাস জুড়ে দিয়ে এখন ওটাকে নাম দেয়া হয়েছে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ সংক্ষেপে আই. আই, কলেজ। আমরা ঠাট্টা করে বাংলায় আমি, আমি কলেজও বলতাম। তখন ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শামসুল ওলেমা মওলানা আবুনসর ওয়াহিদ সাহেব। ইসলামপুরার লাগোয়া আশেক লেইনে তাঁর বাসা সংলগ্ন দোতালা ছিল আমাদের মেস। অদূরে কাদের সরদারের লায়ন থিয়েটার— তখনো থিয়েটার সিনেমার হাতে পরাজিত হয় নি। এ লায়ন থিয়েটার ছিল সেদিনের ঢাকার এক বড় আকর্ষণ। এক বিহারী মৌলবী সাহেব ছিলেন আমাদের মেসে সুপারিন্টেনডেন্ট। তিনি থাকতেন পাশের বাড়িতে অর্থাৎ শামসুল ওলেমা সাহেবের নিচের তলায়। তখন নবাব আলী চৌধুরী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নবাবজাদা হাসান আলীকে রেখেছিলেন মওলানা আবু নসর ওয়াহিদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে। নবাবজাদা সেখানে থাকতেন— পড়াশোনা করতেন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের মাদ্রাসা বিভাগে আর তাঁর সর্ব সময়ের অভিভাবক ছিলেন আমাদের মেসের সুপারিন্টেনডেন্ট। বলা বাহুল্য, সুপারিন্টেনডেন্ট সাহেবও ছিলেন ঐ মাদ্রাসারই শিক্ষক। অভিভাবক শিক্ষক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিল নবাবজাদাকে দীনিয়াতে তালিম দেওয়া এবং মাদ্রাসা আর মসজিদে সঙ্গে করে আনা-নেওয়া। মাদ্রাসার বাইরে সব সময় তিনি প্রায় ছায়া হয়েই থাকতেন নবাবজাদার সঙ্গে। হাসান আলী সাহেবের বয়স তখন বোধ করি ষোল সতরই হবে— শ্বেতশুভ্র মুখমণ্ডল সবে মাত্র গোঁফ-দাড়ি উঠতে শুরু করেছে। মৌলবী অভিভাবকের পাল্লায় পড়ে তাতে ক্ষুর লাগানো ছিল অসম্ভব। কিন্তু চেহারাটি তাঁর খুব সুশ্রী ছিল বলে ঐ সদ্য-ওঠা কচি দাড়ি গোঁফে তাকে দেখাত অতি চমৎকার। অনেক কাল পরে তাঁর সঙ্গে আর একবার চাঁদপুর-গোয়ালন্দ স্টিমারে আমার দেখা হয়েছিল— তখন তিনি পুরোপুরি তরুণ এবং পিতার পরলোক গমনের ফলে নিজেই নিজের মুরুব্বি। মুখে গোঁফ দাড়ির চিহ্ন নেই, চালচলন প্রায় সাহেবি। দেখে আমাকে চিনতে পারলেন, অফার করলেন সে যুগের সবচেয়ে দামি সিগারেট 'আবদুল্লা'। আরো বহুকাল পরে তাঁকে আর একবার দেখেছিলাম কলকাতায় মরহুম এস. ওয়াজেদ আলী সাহেবের বাসায়— নজরুল ইসলামের এক গানের জলসায়। সাহেবী চেহারা আর সাহেবী পোশাকে সেদিন তাঁকে আমি ইংরেজ-নন্দন বলেই ভুল করেছিলাম। যদিও তখন তিনি ফজলুল হক— আবুল মনসুরদের সঙ্গে মিলে কৃষক প্রজা করছিলেন। আমার ভুল ভাঙ্গাল সঙ্গী আবদুল কাদির। পরে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রীও হয়েছিলেন।


www.pathagar.com

ঢাকায় আমাদের মেস আর লায়ন থিয়েটারের মাঝখানে এক মসজিদ। রোজ সে মসজিদে এশার নামাজ শেষ করে নবাবজাদাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকেই সুপারিন্টেনডেন্ট মেসের উঁচু গেটটায় নিজের হাতেই একটা বড় তালা লাগিয়ে দিতেন আর চাবিটা নিজের লম্বা কোর্তার পকেটে ফেলে নিজের আস্তানায় গিয়ে ঢুকতেন। আমরা ওৎ পেতে থাকতাম। তিনি নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেই শুরু হত আমাদের গেট টপকানো। লায়ন থিয়েটার শুধু হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকত না, ডাকত নর্তকীদের সুললিত কণ্ঠও। আমাদের মেস আর থিয়েটারটা এত কাছাকাছি যে, আমাদের কানে শুধু যে গানের সুর লহরী ভেসে আসত তা নয়, নর্তকীদের পায়ের নূপুর গুঞ্জন পর্যন্ত আমরা শুনতে পেতাম লেপের নিচে শুয়ে শুয়ে। এ অবস্থায় শুয়ে থাকতে পারা বা ঘুমুতে পারার বয়স তখন আমাদের নয়। কাজেই এক এক করে টপকানোর পালা শুরু হয়ে যেত। গেটটাও ছিল ভয়ানক উঁচু– রাত্রের অন্ধকারে টপকাতে হত বলে মাঝে মাঝে পড়ে গিয়ে কারো কারো হাত পাও যে ছড়ে না যেত তা নয়। যে রাতে 'লায়লী-মজনু' কি 'শিঁরি-ফরহাদ' হতো সে রাত হলে তিল ধারণের স্থান থাকতো না— ঢাকার কুট্টিরাই দখল করে ফেলতো আর্ধেক হল। নায়ক-নায়িকার প্রেম-ঘন মুহূর্তে ওরা শিষ দিয়ে, তালি বাজিয়ে সারা হল এমন তোলপাড় করে তুলত যে, নট-নটিদের কোন কথাই আর কানে ঢুকত না অনেকক্ষণ ধরে।

বেশির ভাগই হত উর্দু নাটক। অথচ অভিনেত্রীরা ছিল সবাই বাঙাল হিন্দু মেয়ে। এদের কুড়িয়ে আনা হত 'অখ্যাত' স্থান থেকে। কিন্তু এদের গ্রহণ আর আয়ত্ত করার শক্তি দেখে রীতিমতো তাজ্জব বনতে হয়। উর্দু নাটকে এরা যে শুধু চমৎকার অভিনয় করত তা নয়, উর্দু গান বা গজলও গাইত অত্যন্ত চমৎকার ভাবে। ছোটকালে এনে শিক্ষা দিত বলে উচ্চারণেও কোন জড়তা বা ত্রুটি ঢাকার খাস উর্দু-ভাষীরাও ধরতে পারত না। সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিদ্যুৎময়ীর কথা আজো মনে আছে। এমন মধুর কণ্ঠস্বর আর সুললিত সুরের অমন আবেদন আমি অন্য কোন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে, কোন পেশাদার অভিনেত্রীর কণ্ঠে শুনি নি। সারা ঢাকা শহর তখন ওর নামে পাগল আর সকলের মুখে মুখেই ফিরতো ওর নাম। শুনেছি ঢাকা কলেজের ছেলেরাও এ কাণ্ড করতো অর্থাৎ সুপারিন্টেনডেন্ট ঘুমিয়ে পড়লে তারাও গেট টপকাতো আর সে রমনা থেকে ছুটে আসতো লায়ন থিয়েটারে। হয়তো থিয়েটারে আজ যাবো না এ সংকল্পে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত অটল থেকে মশারী টাঙিয়ে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়েছি। শহরের স্বাভাবিক নাগরিক কোলাহল গেছে থেমে, সর্বত্র বিরাজ করছে অখণ্ড শান্তি ও নীরবতা— হঠাৎ কানে ভেসে এলো মধুর কণ্ঠের সুর লহরী। এ কণ্ঠ আমাদের মুখস্থ। বুকের তলায় শুরু হল এবার বিদ্যুৎ-চাঞ্চল্য। সারাদিনের সংকল্প এবার ভেঙ্গে চুরমার। নিজের অজান্তেই যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়াতাম মশারীর বাইরে। আমার মতো আরো অনেকের একই দশা। আমাদের মধ্যে দু'একটা 'কৃষ্ণ মেষ' যে ছিল না তা নয় তাদের ফাঁকি দিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে আসতে হত নিচে নেমে। তারপর একে একে গেট টপকিয়ে বাইরে লাফ দিয়ে পড়া। আই. এ-র দু'বছর এ ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় এডভেঞ্চার বা অভিযান।


www.pathagar.com

কলেজ কর্তৃপক্ষ একটা আস্ত থিয়েটারের এত কাছে কোন্ বুদ্ধিতে যে কৈশোর উত্তীর্ণ তারুণ্যে পাওয়া ছাত্রদের মেস্ করেছিলেন তা তাঁরাই জানেন। এতে আমাদের অনেক পয়সা এবং অনেক ঘুম নষ্ট হত। 'সময় যে টাকা' সে জ্ঞান তখনো আমাদের অজ্ঞাত। শুধু অজ্ঞাত ছিল না আমার সহপাঠি বন্ধু আবদুল হকের যিনি পরে ফরিদী নামে হয়েছেন পরিচিত। ফরিদপুরের লোক বলেই সে ফরিদী লিখতে শুরু করে। সিরাজগঞ্জের অধিবাসী বলেই যেমন ইসমাইল হোসেন সাহেব হয়েছেন 'সিরাজী' ও-ও ফরিদপুরের অধিবাসী এ সুবাদে ফরিদী লিখতে লিখতেই ও নিজের আসল নাম হারিয়ে হয়ে গেছে ফরিদী। সময়ের মূল্য সম্বন্ধে অমন সচেতন মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখি নি। ও ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র, জীবনে কোন পরীক্ষায় নাকি দ্বিতীয় হয় নি। ওর সব ব্যাপার ছিল রুটিন বাঁধা, ঘড়ি ধরা। পাঠ্য বই যেমন পড়ত রুটিন মাফিক তেমনি সাহিত্যও করতো রুটিন ধরে। ও বেশির ভাগ লিখতো কবিতা— কবিতাও লিখতো রুটিন মতো অর্থাৎ কটা থেকে কটা কবিতা লিখবে তাও নির্দিষ্ট ছিল তার দৈনিক রুটিনে। আর রুটিনের প্রতি তার এমন নিষ্ঠা যে ভুলেও কোন দিন তার নড়চড় হতো না এতটুকু। ফলে কলেজের নোট খাতার মতো তার কবিতার খাতাও মাসে ভর্তি হয়ে উঠতো। আর তা সে পাঠাতো বাংলাদেশের তাবৎ পত্রিকায় নির্বিচারে। বেশির ভাগ কবিতা চার ছয় আট লাইনের বলে সম্পাদকদেরও বেজায় সুবিধা— পাদ পূরণের জন্য আর ভাবতে হতো না। কাজেই তখন হেন মাসিক ছিল না, যেখানে ফরিদীর লেখা ছাপা হতো না। তাতেও সে তখন তৃপ্ত নয় নিজেও মাসে মাসে হাতে লেখা কাগজ বের করত— বলা বাহুল্য, তার তিন-চতুর্থাংশ ভরতি হত তার নিজের লেখা দিয়ে। 'মুকুল' ও 'সবুজ' নামে তার সম্পাদিত দুখানা হাতে লেখা কাগজের নাম এখনো মনে পড়ছে। এর একখানায় আমিও একবার 'মশার গান' নামে এক কবিতা লিখেছিলাম। সম্ভবত ঐটিই আমার প্রথম রচনা। হাতে লেখা কাগজ বলেই রক্ষা, নাম যাই হোক আসলে ওটা না হয়েছিল কবিতা, না গান। ঢাকার মশার খ্যাতি ঢাকার মসলিন থেকেও বেশি ঐতিহাসিক আর অধিকতর প্রত্যক্ষ তখন মশার হাতে চরম দুর্গতি ভোগ করতে হত আমাদের মতো ছাত্রদেরই বেশি করে।

হাতে লেখা কাগজেও আবদুল হক তার নামের শেষে ফরিদী না লিখে ছাড়তো না। এভাবেই দেখতে দেখতে ফরিদী হয়ে গেছে তার নামের অঙ্গ। এসব পদবীর মস্ত বড় সুবিধা এই যে, এর জন্য সরকার বা অন্য কারো মুখাপেক্ষী হতে হয় না, পছন্দ মতো নিজেই একটা পদবী বেছে নিলেই হলো। বলেছি ফরিদী এখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভ্য। রুটিন বাঁধা কর্তব্যপরায়ণতা চাকরি ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির যে সহায়ক— তাতে সন্দেহ নেই, ফরিদীই তো তার জ্বলজ্যন্ত প্রমাণ। (সম্প্রতি ও সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছে।)

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা তেমন সুফল ফলায় কি-না সন্দেহ। অন্তত আবদুল হকের বেলায় তেমন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে তার এ পদবীটুকুর জন্য সাহিত্যের কাছে নিঃসন্দেহে ও ঋণী। সাহিত্য না করলে কিছুতেই ফরিদী হতে পারতো না স্রেফ আবদুল হকই থেকে যেত সারা জীবন। সব ব্যাপারে আবদুল হক ছিল উদ্যোগী। তার শরীরে আর মনে আলসেমি কি জড়তা যেন কোন পাত্তাই পেত না। আমাদের মেস


www.pathagar.com

থেকে বুড়িগঙ্গা খুব দূরে নয়, তার তাড়নায় খুব ভোরে উঠে দল বেঁধে আমরা ওখানে গোসল আর সাঁতার কাটতে যেতাম। এ উদ্দেশ্যে আমরা একটা Swimming club বা সাঁতার সঙ্ঘও করেছিলাম। আর আবদুল হকই ছিল সে ক্লাবের দেহ আর প্রাণ দুই-ই। বর্ষাকালে যখন বুড়িগঙ্গা কানায় কানায় ভরে উঠতো তখন কি আনন্দেই না আমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম আর লাগাতাম এপার ওপার সাঁতরাবার প্রতিযোগিতা। ছোটকালে বেগ-পরওয়া সাঁতার কাটাটা আমার এখন খুব কাজে লেগে গেলো। প্রথম না হলেও সাঁতারে আমি প্রায় দ্বিতীয় হতাম। আহসান মঞ্জিল বা ঢাকার নবাব বাড়ির ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা করে বুড়ীগঙ্গার পথটা আমরা খাটো করে নিয়েছিলাম। কোন কোন চাঁদনী রাতে দু'চার জন মিলে বাকলেন্ড বাঁধ তথা বুড়িগঙ্গার তীরে পায়চারি করতে যেতাম— হেলানী বেঞ্চে বসে বসে রাতের পর রাত রাজা উজির মারতাম, মুখে মুখে ছড়া বানাতাম— একজন এক লাইন বল্লে অন্য জনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে অন্য লাইন জুড়ে দিতে হত। অন্ত মিল হলেই হলো— কবিতা বা ছড়ার বাদ বাকি শর্ত আমরা হাসির চোটেই উড়িয়ে দিতাম। স্বয়ং হাসির রাজা আবদুল হকই তো আমাদের দলপতি আর কবিতা রচনা তো ওর রুটিন বাঁধা কাজ। হাসির জন্য ও আজও বিখ্যাত— ঐ ব্যাপারে ও একাই একশ। ওর পাল্লায় পড়ে আমরা একবার এক গানের স্কুলেও ভর্তি হয়েছিলাম— ইসলামপুরে এক দোতালায় কয়েকটা ভাঙ্গা হারমনিয়াম নিয়ে কে যেন একটা গানের ক্লাস চালাত। এ ব্যাপারেও আবদুল হকের উৎসাহ ছিল অদম্য। কিন্তু কয়েকদিন সা-রে-গা-মা সাধার পর আমরা নিজেরাই বুঝতে পারলাম আমাদের যা গলা আর কান তা নিয়ে আমরা যদি গান শিখতে পারি তাহলে আমাদের মেসের পাশে যে ধোপা রয়েছে তার বাহনটির না পারার কথা নয়। অতএব কয়েক টাকা গচ্ছা দিয়ে আমরা এবার কেটে পড়লাম। পরে শুনেছিলাম ওটা আসলে হারমনিয়াম মেরামতের দোকান কোন স্কুল নয়। মেরামতকারী আমাদের মতো আনাড়ি আর গানের ব্যাপারে নেহাৎ গ্রাম্যদের সা-রে-গা-মা'র তালিম দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টায় আছে শুধু। গানের স্কুল হলে অন্যান্য গানের স্কুলের মতো ওখানেও মেয়েদেরই ভিড় হত বেশি অথচ ওখানে কোন মেয়ে দূরে থাক একটা খোঁপার চিহ্নও ছিল না। আমাদের গান শেখা ছেড়ে দেয়ার এটাও একটা কারণ কি-না আজ আর মনে নেই। গানের মতো সুকুমার শিল্পের চর্চা করতে গিয়েও যদি আমাদের মতো গোঁফ-দাড়ি-ওঠাদের মাঝখানে বসে বসে চর্চা করতে হয় তা হলে তার সুকুমারত্বই বা থাকে কি করে? তখন আমাদের দলপতি আবদুল হক রীতিমতো দাড়ি রাখত— ঐ মুখে ও যখন প্রাণপণে সা-রে-গা-মা-র পেছনে ধাওয়া করত তখন নিঃসন্দেহে সা-রে-গা-মা ঘর ছেড়ে পালাত!

যাক, এতদিন বেচারী সা-রে-গা-মা'কে রেহাই দিয়ে গান শেখার ব্যর্থ প্রয়াসে ইতি টেনে আমরা জন কয়েক ইসলামী বিদ্যার বিদ্রোহী ছাত্র আবার ভালোয় ভালোয় ইসলামের ছায়ায় ফিরে এলাম। আমি তো রীতিমতো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্বভাবতই আমি কিছুটা লাজুক প্রকৃতির বলে আমার গলার স্বর কিছুতেই দরাজ হতে চাইতো না। কাজেই ওভাবে গলা সাধা ছিল আমার জন্য এক অস্বস্তিকর ব্যাপার।

অধ্যক্ষ শামসুল ওলামা আবু নসর সাহেব ছাড়া ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে আবদুর রব চৌধুরী সাহেবের কথা মনে পড়ছে। অধ্যক্ষের মতো


www.pathagar.com

তিনিও সিলেটের লোক— চালচলনে সাদাসিদে ও সরল, বাইরে খুব রসিকতা-প্রিয়, ক্লাসে কিন্তু গম্ভীর ও কঠোর। তাঁকে আমি পরে সহকর্মী উপরওয়ালা হিসেবেও পেয়েছিলাম চট্টগ্রাম কলেজে। যতদূর মনে পড়ে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে তিনি আমাদের জোসেফ কনরেডের Typhoon আর রবার্ট স্টিভেনসনের Treasure Island পড়িয়ে ছিলেন। সুখের বিষয় আজও তিনি দেহ মনে তেমনিই আছেন— হাস্য-মুখ, কৌতুক-প্রিয় আর সারল্যের প্রতীক। ইংরেজির অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন সাতক্ষীরার মরহুম আবুল কাসেম সাহেব, তাঁর কথা পরে আর একবার উল্লেখিত হবে। তিনি আমাদের ইংরেজি কবিতা আর রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য সংস্করণ 'গল্পগুচ্ছ' পড়াতেন।

বর্ধমানের মওলানা ইসহাক সাহেব পড়াতেন হাদিস, পরে তিনি শামসুল ওলামা হয়েছিলেন। হাদিস-গ্রন্থ 'মেশকাত শরীফে'র প্রথমাংশ আমাদের পাঠ্য ছিল। হাদিস শাস্ত্রে মওলানা ইসহাক সাহেবের ছিল অপার পাণ্ডিত্য— প্রায় হাদিস মুখস্থ বলতে পারতেন বলে তাঁকে 'হাদিসে-হাফেজ'ও বলা হত। অত বড় কেতাবের কোথায় কোন্ হাদিস আছে একটুখানি চোখ বুঁজে নিয়ে তা তিনি বের করে নিতে পারতেন। তিনি মানুষটি ছিলেন খুব বেঁটে খাটো আর পাতলা, ঘণ্টা পড়লেই ক্লাসে আসতেন দৌড়ে। অতটুকু মানুষ তিন কদমেই যেন সিঁড়ি ডিঙিয়ে দোতালায় যেতেন পৌঁছে। পড়াবার সময়ও এত দ্রুতগতি ছিলেন যে ছেলেরা তাঁকে পাঞ্জাব মেইল বলেই অভিহিত করত। তাঁর মতো অমন অদ্ভুত স্মরণশক্তি আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি। পরবর্তী জীবনে আমার 'হাদিসের বাণী' বইটি আমি তাঁর নামেই উৎসর্গ করেছি আমার হাদিসে হাতে খড়ি তাঁর হাতে হয়েছে একথা স্মরণ করে।

তখন অর্থাৎ ১৯২৩-২৪-এ ঢাকা থেকে প্রাচী নামে একটি সাহিত্য মাসিক বের হত। যদিও সম্পাদক আর পরিচালকরা হিন্দু ছিলেন— তাঁরা পত্রিকাটিতে 'মোসলেম জগৎ' নামে একটি বিভাগও রেখেছিলেন। ফরিদীর কিছু কিছু লেখা ঐ পত্রিকায় ছাপা হত। সব পত্রিকাওয়ালারাই ওকে চিনত— ও-ই সঙ্গে করে আমাকে একদিন 'প্রাচী' অফিসে নিয়ে গিয়েছিল। ১৩৩০, অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রাচীর' মোসলেম জগৎ বিভাগে — 'হজরত মোহাম্মদের উদারতা' নামে আমার একটি লেখা ছাপা হয়। ঐটি আমার ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত লেখা। শেষের দিকে ছোট অক্ষরে লেখা হয়েছিল— 'মালমশলা A short History of the Saracens হইতে গৃহীত।' ইসলামের ইতিহাস ছিল আমাদের অন্যতম পাঠ্য। বোধ হয় রেফারেন্স হিসেবে আমীর আলীর ঐ নামের বইটা আমি তখন পড়েছিলাম। যতদূর মনে হয় ঐ একটি মাত্র লেখাতেই আমার পুরা নাম— মোহাম্মদ আবুল ফজল ছাপা হয়েছিল।

১৯২৫ সালে আই. এ. পাশ করলাম— ম্যাট্রিকের মতো এবারও দ্বিতীয় বিভাগ, ম্যাট্রিকের মতো এবারও দশ টাকা বৃত্তির হকদার হলাম কিন্তু ম্যাট্রিকের মতো বয়সের জন্য এবারও তা থেকে হলাম বঞ্চিত।

নোংরা দুর্গন্ধময় পুরোনো ঢাকা ছেড়ে এবার আমরা পা বাড়ালাম পরিচ্ছন্ন ধোপদুরস্ত প্রকৃতির শত হস্তে বিছিয়ে দেওয়া সবুজে-মোড়া নতুন ঢাকা তথা রমনার দিকে। সঙ্গে রইল আমার একটিমাত্র প্রকাশিত প্রবন্ধের সাহিত্যিক খ্যাতি তাও প্রায় আমীর আলীরই


www.pathagar.com

অনুবাদ। তখন এখানকার মতো অত লেখক ছিল না— হাঁটতে বসতে লেখাও হতো না ছাপা, ছাপার ক্ষেত্রও ছিল অত্যন্ত সীমিত। এ কারণেই বোধ করি ঐ আধা-অনুবাদী লেখাটি ছাপা হওয়ার পর থেকে আমার সঙ্গী সাথীরা আমাকে প্রায় সাহিত্যিক সাহিত্যিক ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল।

## একুশ

বি-এর বেলায় কি জানি কেন বাবা তেমন জোর করলেন না। নামের শেষে লেখার মতো একটা ডিগ্রির প্রায় চৌকাঠে এসে পা দিয়েছি তা দেখে আর ভাগ্যক্রমে চৌকাঠটি যদি ডিঙিয়েই ফেলি চাকরি একটা নির্ঘাত পেয়ে যাব পরিচিতদের এসব আশ্বাস তাঁর মনের দিগন্তেও হয়তো আশা হয়ে উঁকি মারছিল। হিতৈষীরা আমার সম্বন্ধে— সুযোগ পেলেই যেসব 'গোলাপী চিত্র' তাঁর সামনে তুলে ধরতো তাতেও মনে হয় তাঁর বিরুদ্ধতা কিছুটা জলো হয়ে এসেছিল। আমার জীবনের স্রোত এখন যে খাতে প্রবাহিত তাতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন না থাকলেও মনে হলো তা যেন তিনি অনেকখানি মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু হলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার খরচের যা বহর তা শুনে আব্বা যেন কিছুটা দমে গেলেন। তখন হল মানে একমাত্র সলিমউল্লাহ মুসলিম হল (ঢাকা আর জগন্নাথ হল ছিল হিন্দু ছাত্রদের জন্য খাস) আর তা ছিল বর্তমান মেডিকেল কলেজের দো-তালায়। নিচে ক্লাস হত— তাও সবটায় নয়; পুব দিকের সবটা জুড়ে লাইব্রেরি, পশ্চিম দিকটায় রেজিস্ট্রারের অফিস, মাঝখানের রুমগুলোতে বসতো কলা বিভাগের ক্লাস। আর দোতালার সবটা জুড়ে মুসলিম ছাত্রাবাস— সুবিখ্যাত এস.এম. হল। এখনকার মতো তখনো বিজ্ঞান ক্লাস বসত কার্জন হলে। বর্তমান হাইকোর্ট বিল্ডিঙে ছিল ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ আর বর্তমান ফজলুল হক হল ছিল ঐ কলেজের ছাত্রাবাস।

আমাদের সময় মুসলিম হলের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল তার ডাইনিং হল— নিচে দক্ষিণ দিকে ছাদে ঢাকা প্রায় শ'খানেক গজ রাস্তা পার হয়ে ঐ হলে যেতে হত খেতে। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতবড় দ্বিতীয় হল আর ছিল না। একসঙ্গে প্রায় পাঁচ শ' ছেলে টেবিল-চেয়ারে বসে খেতে পারত। ঐ হলেই সংবর্ধনা জানানো হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। আধখানা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে ঐ হলে আমরা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশন করেছি বহুবার, নজরুল ওখানে গিয়ে শুনিয়েছেন তাঁর সদ্য রচিত বহু গজল-গান, নিজে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন 'বিদ্রোহী', 'কামাল পাশা', 'খালেদ' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা। সেদিন তাঁর কণ্ঠে তাঁর রচিত গান কবিতা আবৃত্তি শুনে তরুণ শ্রোতাদের মধ্যে (বলা বাহুল্য অধিকাংশ শ্রোতাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) যে উচ্ছ্বাস, উল্লাস ও উদ্দীপনা দেখেছি তার কোন তুলনা হয় না।

মুসলিম হলের প্রভোস্ট ছিলেন তখন ডক্টর স্যার এ. এফ. রহমান— তখনো তিনি স্রেফ এ. এফ. রহমান। তাঁর নামের আদ্য শব্দ দুটো যোগ হয়েছে অনেক পরে। মুসলিম হলের তিনিই প্রথম প্রভোস্ট– অক্সফোর্ড থেকে ইতিহাসে ডিগ্রি নিয়ে এসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করেন লেকচারারের পদ। সেখান থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম


www.pathagar.com

ভাইস্-চ্যান্সেলার ডক্টর হার্টস তাঁকে নিয়ে এসে ইতিহাসের রীডার আর মুসলিম হলের প্রভোস্ট করেন। যে সেডলার কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হার্টগ ছিলেন তার এক বিশিষ্ট সদস্য; তাই তাঁকেই পাঠানো হলো প্রথম ভাইস্ চ্যান্সেলার করে কমিশনের সুপারিশকে বাস্তবায়িত করার জন্য। হার্টগ দেখতে বেঁটে খাটো ছিলেন— বিলাতেও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আর পণ্ডিত হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। সুদক্ষ পরিচালক হিসেবে এ শিশু বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-যুগে তিনি যে যোগ্যতার আর কর্ম-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ. এফ. রহমান ছিলেন উক্ত সেড্লার কমিশনের সহকারী সম্পাদক। সেখানেই হার্টগ রহমানকে নিকট থেকে দেখার পেয়েছেন সুযোগ এবং তাঁর গুণ আর যোগ্যতা সম্বন্ধে তখনই বোধকরি হয়েছেন সুনিশ্চিত। তাই তরুণ রহমানকে একই সঙ্গে রীডার আর প্রভোস্ট করে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র সমাজ আর পাক-ভারতের বৃহত্তম ছাত্রাবাস গড়ে তোলার দায়িত্ব দিতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেন নি। রহমানও দিয়েছেন তাঁর এ গুরু দায়িত্ব পালনে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয়। কোনদিন যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা সলিমউল্লাহ মুসলিম হলের ইতিহাস লেখা হয় তা হলে স্যার এ. এফ. রহমানের অবদান নিঃসন্দেহে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করবে। তিনি ধনী ও অভিজাত ঘরের সন্তান, লেখাপড়া করেছেন অক্সফোর্ডে, সূচনায় শিক্ষকতা করেছেন আলীগড়ে। আলীগড় ছিল সারা পাক-ভারতের খান্দানী মুসলমান পরিবারের ছেলেদের শিক্ষা-কেন্দ্র। কাজেই ওখানকার পরিবেশ আর আবহাওয়ায় এক ধরনের বিলাসিতা আর শরাফতীর কিছুটা বাহ্যিক চাকচিক্য যে গড়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা। রহমান সাহেব ছিলেন তারই প্রতিভূ এবং ঐ রকম একটা পরিবেশ এস. এম. হলেও চেয়েছিলেন গড়ে তুলতে। উর্দু ভাষী শরিফ পরিবারে যেমন ছোট ছোট বাচ্চাদেরও 'আপ' বলে সম্বোধন করা হয় তেমনি রহমান সহেবও আপনি ছাড়া বলতেন না। কোন ছাত্রকেও তিনি কোনদিন তুমি বলেছেন শুনিনি। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদে নিখুঁত স্যুটের ভাঁজ কোন দিন এদিক ওদিক হতে দেখা যায় নি। ক্লাশে পড়াতেন দাঁড়িয়ে— চেয়ারে বসতেন না কখনো। ছেলেরা বলাবলি করত— পাছে স্যুটের ভাঁজ ভেঙ্গে যায় এ কারণেই বসেন না তিনি চেয়ারে। আচার ব্যবহার আর চাল চলনে অমন ভদ্র আর অভিজাত তখন ঢাকা জীবনে দ্বিতীয়টি ছিল কি-না সন্দেহ। রমনার অধ্যাপক আর ছাত্র মহলে তিনি প্রিন্স অব রমনা নামেই ছিলেন পরিচিত। তাঁর স্বভাবে কোন রকম উগ্রতা বা আতিশয্য দেখি নি— দেখি নি কোন ব্যাপারে পরিমিতি বোধ হারাতে, কি উত্তেজিত হতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রেজুয়েটেরা (পুরোনো ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদেরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেজুয়েট ধরা হত) তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারতেন। এ. এফ. রহমান হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধেয়— কাজেই বিপুল ভোটাধিক্যে তিনিই নির্বাচিত হলেন। দ্বিতীয় বার নির্বাচনের আগে দেশের নানা স্থানে বিশেষত কলকাতায় হিন্দু মুসলমানে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়ে গেছে— দেশের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প। হিন্দুরা ঠাট্টা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তখন মেক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বল্লেও রেজিস্ট্রার্ড গ্রেজুয়েটদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই


www.pathagar.com

এবার নির্বাচনে ময়মনসিংহের মহারাজার হাতে এ. এফ. রহমান হেরে গেলেন যদিও যোগ্যতা কি শিক্ষাগত গুণের দিক দিয়ে মহারাজা তাঁর সঙ্গে তুলীতই হতে পারে না। হলের কিছু সিনিয়র ছাত্র নির্বাচনে তাঁর পক্ষে খেটেছিলেন— ফলাফল ঘোষণার পর তিনি হলে এসে এক সভায় ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হলেন এদের ধন্যবাদ জানাবার জন্য। তাঁর স্বাভাবিক শান্ত, ধীর, গম্ভীর ও অনুত্তেজিত কণ্ঠে শুধু বল্লেন : 'নির্বাচনের ফলাফল তো আগেই জানা ছিল। তবুও আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। আপনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।'

দেখলাম আজও তাঁর পরনের স্যুট তেমনি নিখুঁত— ঘটে নি চেহারায় কোন হতাশা বা দুঃখ দুশ্চিন্তার ছায়াপাত। কণ্ঠে নেই কোন উত্তেজনা, স্বরে নেই কিছুমাত্র রাগের চিহ্ন। ১৯২৬ কি ২৭ মনে নেই— হঠাৎ একদিন হলে খবর ছড়িয়ে পড়ল, ঢাকা শহরেও চারদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে। বংশাল, ফুলবাড়িয়া, নাজিরা বাজার ইত্যাদি এলাকায় ভীষণ দাঙ্গা চলছে। সমস্ত হল উত্তেজিত— বারান্দায় দাঁড়িয়েই আমরা শুনতে পাচ্ছি পার্শ্ববর্তী মহল্লা থেকে ভেসে আসছে সোরগোল, আর্তনাদ। অনেকে আমরা একটানে মশারির ডাণ্ডা খসিয়ে নিয়ে গেটের দিকে দৌড়ালাম। নিচে নামার একটি মাত্র সিঁড়ি, একটি মাত্র গেট। গেটে এসে দেখি অন্যতম হাউস টিউটার আবুল হোসেন সাহেব গেট আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও প্রশান্ত-স্বভাব। ধীরভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় যাচ্ছ?

উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বল্লাম : যেখানে দাঙ্গা হচ্ছে।

: তোমরা ওখানে গিয়ে কি করবে?

বল্লাম : দাঙ্গা থামাব। মুসলমানরা অত্যাচার করলে ওদের বাধা দেব, অত্যাচারিত হলে করব রক্ষা।

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন : প্রভোস্ট বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর নিষেধ। তিনি বলে দিয়েছেন : দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ মুসলিম হলের ছাত্রদের মানায় না।

রহমান সাহেবের মনের আভিজাত্য বোধের কাছে আমাদের মনে উত্তেজিত উদ্যত-ফণা সর্প যেন এবার মাথা নোয়াল। হাত থেকে মশারির ডাণ্ডা ফেলে দিয়ে বল্লাম : আমরা প্রভোস্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে চাই— আমাদের চোখের সামনে নিরীহ লোক মারা যাবে, ওদের ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আর আমরা কিছুই করতে পারব না, এ কেমন কথা স্যার?

বল্লেন : প্রভোস্ট নিচে আছেন, তোমরা চাও তো তাঁর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করগে। আমরা কয়েকজন নিচে নেমে গেলাম। দেখি হলের সামনের লনে তিন হলের তিন প্রভোস্টই দাঁড়িয়ে আছেন, আশে পাশে বোধ করি আরো কয়েকজন হাউস টিউটার, এসিস্টেন্ট হাউস টিউটারও ছিলেন। হঠাৎ পুব দিকে তাকিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন : ঢাকা হলের ছাত্ররা দলে দলে কেউ বাউন্ডারি রেলিং টপকিয়ে, কেউ মিউজিয়ামের গেট দিয়ে ফুলবাড়িয়ার দিকে ধাওয়া করেছে— কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে মশারির ডাণ্ডা,


www.pathagar.com

কেউ কেউ খালি হাতেই দৌড়াচ্ছে। খবর ছড়িয়ে পড়েছে— ফুলবাড়িয়ার নাথ বোর্ডিং হয়েছে আক্রান্ত।

ঢাকা হলের প্রভোস্ট বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ— পরে তিনি 'স্যার' ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হয়েছিলেন। তাঁর হলের ছাত্রদের রুখবার জন্য প্রাণপণে সেদিকে দিলেন ছুট। তাঁর পরনেও ছিল স্যুট— দু' পকেটে কি ভারী জিনিষ ছিল জানি না— কোটের পকেট দুটি বে আন্দাজ ফুলে রয়েছে দেখলাম আর তিনি যখন দু'হাতে দু'পকেটে চেপে ধরে দৌড়াচ্ছিলেন— তখন তাতে ঝন ঝন শব্দ হচ্ছিল। পানের বড় রকমের কৌটা থাকাও অসম্ভব নয়— থাকতে পারে বিজ্ঞানের ছোট-খাটো কিছু যন্ত্রপাতিও। সুদর্শন ডক্টর স্যার জ্ঞান ঘোষের এ দৌড়ের দৃশ্য আমি এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ডক্টর ঘোষ ছুটলেন ঢাকা হলের দিকে, এবার জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার দ্রুত পা বাড়ালেন তাঁর হলের দিকে— তাঁর ছাত্ররাও যদি কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে।

শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন এ. এফ. রহমান— গম্ভীর মুখে। আজও তাঁর পোশাক নিখুঁত— কোথাও পড়ে নি এতটুকু ভাঁজ।

আমরা কাছে যেতেই আবুল হোসেন সাহেবের মারফৎ যে কথাটা বলে পাঠিয়েছিলেন তারই শুধু পুনরাবৃত্তি করলেন : দাঙ্গায় অংশগ্রহণ মুসলিম হলের ছাত্রদের মানায় না। তিনি পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে প্রায় সাহেব ছিলেন। কিন্তু তার ভেতরে যে একটা সহজাত বাঙালিয়ানাও ছিল অনেক পরে আমরা তা বুঝতে পেরেছি। বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার কবি লেখকদের তিনি ভালোবাসতেন। ওঁদের প্রতি তাঁর এক বিশেষ অনুরাগ ছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি যখন ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় থাকতে শুরু করেন আর নজরুল হয়ে পড়েন অসুস্থ আর অভাবগ্রস্থ— শুনেছি গোপনে তিনি নজরুলকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাঠাতেন। জনাব জহুরুল ইসলাম সাহেবের (চট্টগ্রাম কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ) মুখে শুনেছি— এ. এফ. রহমান সাহেব তাঁর হাত দিয়েও এক আধবার নজরুলকে টাকা পাঠিয়েছেন।

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয় ১৯২৭-এর ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি— মুসলিম হল মিলনায়তনে অর্থাৎ উপরে বর্ণিত ডাইনিং হলে। মূল সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রভোস্ট এ. এফ. রহমান। উদ্বোধন সংগীত গেয়েছিলেন নজরুল তাঁর সদ্য রচিত 'খোশ আমদেদ' শীর্ষক গজল গান গেয়ে যার প্রথম চরণ : 'আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি'। গানটি যখন প্রথম বর্ষ 'শিখা'য় প্রথম ছাপা হয়— নিচে লেখা ছিল : পদ্মা : ২৭-২-২৭। এতে বুঝা যায় কলকাতা থেকে আসবার পথে, গোয়ালন্দ-চাঁদপুর স্টিমারে বসেই কবি গানটি রচনা করেছিলেন।

এ. এফ. রহমান সাহেব বোধকরি এ কথা কয়টি দিয়েই তাঁর অভিভাষণ শেষ করেছিলেন : "এই সাহিত্যের পূজায় আপনারা যে কষ্ট স্বীকার করে নিজ নিজ অর্ঘ নিয়ে যোগদান করেছেন তজ্জন্য অভ্যর্থনা সমিতি চিরকৃতজ্ঞ। আপনারা আমাদের অন্তরের


www.pathagar.com

ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার উপকরণ আমাদের নাই। গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলেই হয়।"

তাঁর ভাষা আর প্রকাশে কিছুটা হিন্দু পরিভাষা স্থান পেয়েছে— বিশেষত শেষোক্ত কথায়। শুনেছি ঢাকার গোঁড়া মহলে এ নিয়ে বেশ কিছু কানাঘুষা আর চাপা প্রতিবাদ উঠেছিল। কিন্তু রহমান সাহেব এত জনপ্রিয় আর এমন সজ্জন ছিলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ সেদিনের ঢাকায় অকল্পনীয় ছিল। তাই কানাঘুষাতেই ঘটল ঐ প্রতিবাদের সমাধি।

এ. এফ. রহমানের কথা উঠে পড়াতেই পরের কথা আগে এসে গেল। যে হলে এ হেন প্রভোস্ট অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনেও যিনি সাহেব আর অভিজাত সে হলের জীবনে তার কিছু প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। আর ছাত্রদের আভিজাত্য তো বাহ্যিক— ফিটফাট পোশাক পরা, হোটেল-রেস্টুরেন্টে খাওয়া আর পায়ে না হেঁটে ঢাকার বিখ্যাত ঘোড়ার পাল্কি-গাড়ি চড়ে হলে আসা-যাওয়া করা। এ সবের ধাক্কা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিভাবকদেরই সামলাতে হয়। আমার অভিভাবক ছিলেন গরিব। বাবা তখন ইমাম হিসেবে মাইনে পেতেন কুল্লে সাত কি আট টাকা। তাও কখনো মাসে মাসে পান না। এ থেকে অবস্থাটা মালুম করা যাবে যে, বাবা যখন মারা যান (ডিসেম্বর, ১৯২৯) তখন তাঁর মাইনে বেড়ে হয়েছিল তের টাকা মাত্র। তাও বাকি ছিল দেড় বছরের মতো। বিস্তর হাঁটাহাঁটি করেও আমি সে টাকা মোতোওয়াল্লীর বদ্ধমুষ্টি ফাঁক করে উসুল করতে পারি নি। বাবার অন্য যা রোজগার তা যেমন অনির্দিষ্ট তেমনি স্থিতিশীলও নয়, তাপমাত্রার মতো তার উত্থান-পতন ঘটে। তবে আমার সৌভাগ্যবশত বাবার উপর— বাবার উপর মানে তাঁর দোয়া দরুদের উপর শেষ পর্যন্ত লোকের বিশ্বাসে কোন শৈথিল্য দেখা দেয় নি। তাই মাইনে ছাড়া তাঁর যা অন্য রোজগার— বলা বাহুল্য ওটিই রোজগারের প্রধান অংশ, তাতে তেমন উল্লেখযোগ্য ফাটল দেখা দেয়নি। এ কারণেই মুসলিম হলে থেকে বি. এ. পাস করায় আমার বাধা ঘটে নি।

তাঁর অনুমতি পাওয়ার আগে তাঁকে অবশ্য প্রয়োজন হলে আমি জায়গীরে থাকব, টিউশনি করব ইত্যাকার প্রচুর আশ্বাস লোক মারফত শুনিয়েছি। এছাড়া হিতৈষীরাও জোর গলায় আশ্বাস দিলেন যে, হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্তার বৃত্তি দেওয়া হয়, নির্ঘাত তার একটা ও পেয়ে যাবেই। তখন সামান্য কিছু পাঠালেই চলবে।

এসব আশ্বাস চিরকাল আশ্বাসই থেকে গেছে। জীবনে আমি কোন বৃত্তিই পাই নি। ইতিপূর্বে দু'বার যে হক-দার হয়েছিলাম তা কখনো কাগজে কলমের বাইরে বিনিময় মাধ্যম হয়ে দেখা দেয় নি।

যাই হোক এবারও আমার স্নেদ বজায় রইল— বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেলাম।

আমাদের সময় ভালো ছাত্ররাই শুধু অনার্স পড়ত আর তিন বছরের খরচের ধকলও তো কম নয়। তাই আমি পাসকোর্সেই ভর্তি হলাম আর সাবজেক্ট নিলাম : ইংরেজি, ইতিহাস আর ইসলামিক স্টাডিস্। বলা বাহুল্য, পাসকোর্সে বাংলা বা ভার্নাকুলার ছিল


www.pathagar.com

বাধ্যতামূলক। ইংরেজি বিভাগে অধ্যক্ষ বা বিভাগীয় প্রধান ছিলেন রেন সাহেব (Wrenn)। তিনি চোখে কম দেখতেন। চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা তো ছিলই— পড়াবার সময় বইর খোলা পাতার উপর একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসও রাখতেন। ঘণ্টা শেষে ক্লাস থেকে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর রুম পর্যন্ত পথটা এক নজর দেখে নিয়ে ছেলেদের ভিড় একটু কমলেই এক দৌড়ে নিজের রুমে গিয়ে হাজির হতেন। মাহমুদ হাসান তখনো ডক্টর হননি অন্যতম এসিস্টেন্ট লেকচারার ছিলেন। তিনিও আমাদের পড়াতেন— খুব সম্ভব কবিতাই পড়াতেন। তিনি পরে ভাইস্-চ্যান্সেলারও হয়েছিলেন। তখন তিনি রীতিমতো সুদর্শন তরুণ— চালচলনে ছিলেন কিছুটা বোহেমিয়ান। থাকতেন সংস্কৃত-বাংলার অধ্যক্ষ ডক্টর সুশীল কুমার দে'র বাসায়। ইতিহাস বিভাগে অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আর রীডার ছিলেন আমাদের প্রভোস্ট এ. এফ. রহমান। ড. মজুমদার পড়াতেন ভারত ইতিহাসের আদি যুগ আর রহমান সাহেব মধ্যযুগ। রমেশ মজুমদারকে ছেলেরা পাঞ্জাব মেইল বলতো। কারণ তাঁর বক্তৃতায় থামাথামি ছিল না— কমা, ফুলস্টপের তিনি ধার ধারতেন না। ঘণ্টা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনর্গল একটানা বলে যেতেন। ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ— এ বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আন্তর্জাতিক। এ. এফ. রহমান পড়াতেন ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে একটা বহুদিনের পুরোনো হাতে লেখা নোটের খাতা সামনের টেবিলে খুলে রেখে ধীর ও গম্ভীর কণ্ঠে। তাঁর নিজের গাম্ভীর্য সারা ক্লাসটায়ও ছড়িয়ে দিত একটা নিঃশব্দ গাম্ভীর্য। পুরোনো নোটের খাতাটা ছাত্রদের ধারণা, অক্সফোর্ডে পড়বার সময় তিনি যে নোট লিখেছিলেন সেটিই এটা। ওটা দিয়ে তিনি আলীগড়ের অধ্যাপক জীবন শেষ করে এসেছেন— ঢাকা-জীবনও শেষ করবেন আর বংশধরদের মধ্যে কারো ইতিহাসের অধ্যাপক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মিরাছ হিসেবে নোটটি হয়তো তাকেও তিনি দিয়ে যাবেন।

তাঁর একটি ভাষ্য মনে পড়ছে। বোধ করি মোগল স্থাপত্য সম্বন্ধে পড়াবার সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের কথা উঠে পড়েছিল— সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : মুসলমানদের মসজিদ মেলা খোলা, প্রশস্ত, থাকেও ওতে বহু দরজা-জানালা— এটা ইসলামের উদারতারই প্রতীক। হিন্দুদের মন্দির অপ্রশস্ত, প্রায় এক দ্বারী কিন্তু চূড়াটা গগনস্পর্শী, এটা একদিকে ওদের জীবনের সংকীর্ণতা অন্যদিকে চিন্তার উচ্চতারই প্রতীক। খ্রিস্টানদের গির্জার গঠনে থাকে একদিকে উচ্চতা অন্যদিকে জটিলতা— কোনো, কার্নিশ আর খিলানের অন্ত নেই ওতে। ওদের গির্জাও ওদের ধর্ম-বোধেরই প্রতীক। খ্রিস্টিয় ধর্মশাস্ত্রে উচ্চভাবের অভাব নেই কিন্তু ট্রিনিটি 'ঈশ্বরপুত্র', 'পাপ-বোধ', 'স্বীকার-উক্তি' এসব চিন্তা নানা জটিল 'উপলব্ধি' জালে জড়িত। কাজেই ওদের উপাসনালয়ে উচ্চতার সঙ্গে জটিলতারও ঘটেছে সংমিশ্রণ। হয়তো মোগল শিল্প কলার কথা এসে পড়েছিল একদিন। তখন শিল্পকলা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন ধারণাই ছিল না। ভালো অর্থাৎ স্পষ্ট ছবিকেই মনে করতাম ভালো শিল্প। রহমান সাহেব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের পার্থক্য আমাদের বুঝালেন এভাবে : ধরুন একদল সৈন্যবাহিনী মার্চ করে চলেছে। এ দৃশ্যটা প্রাচ্য দেশীয় শিল্পী কতকগুলি গতিশীল পা এঁকেই ফুটিয়ে তুলবে, কয়েকটি রেখার সাহায্যেই শুধু চলমান সৈনিকের পরিচয়ের ইংগিত দেবে। আর পাশ্চাত্য শিল্পী সব


www.pathagar.com

সৈনিকের পুরোপুরি অস্ত্র-সজ্জিত পূর্ণাঙ্গ অবয়ব এঁকেই দৃশ্যটা একটা ফটোর মতই এঁকে দেখাবে। এরা পুরোপুরি বাস্তবমুখীন আর প্রাচ্য-শিল্পী ভাবমুখীন। শিল্প সম্বন্ধে এ বোধ করি আমার প্রথম পাঠ।

## বাইশ

ইসলামিক স্টাডিস বা ইসলামী বিষয়সমূহ যাঁরা পড়াতেন তাঁরা সবাই ভালো আলেম আর নিজ নিজ বিষয়ে ছিলেন পণ্ডিত। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ তাঁরা যে শুধু নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন তা নয়, ঐ সব ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন খুবই কঠোর। এঁদের অনেকেই ছিলেন অ-বাঙালি— উর্দুভাষী। বয়োবৃদ্ধ মওলানা মনাব্বর আলী সাহেবের কথা আজও মনে আছে। নাদুস-নুদুস দেহ আর মেহেদি রঙা দাড়িতে তাঁকে চমৎকার মানাত, হাঁটতেন আস্তে আস্তে, কথাও বলতেন ধীরে ধীরে আর সব সময় চিবোতে থাকতেন পান। তাঁর এবং তাঁর মতো আরো অনেকের সখ বা সৌখিনতার চরম ছিল পান খাওয়া। কোন বাঙালিকে অত আয়াস করে অতখানি তরতিবের সাথে পান খেতে দেখি নি। ক্লাসে আসন গ্রহণ করেই তাঁর প্রথম কাজ— পোঁটলা খুলে সুন্দর করে কেটে ভাঁজ করে রাখা দু'এক টুকরা পান নিয়ে, তাতে হরেক রকমের মশলার পূর দিয়ে মুখে পোরা। তারপর বিরাটকায় হাদিস কি তফসিরের কেতাব খুলে পড়াতে শুরু করা। ওঁর পড়ানোও ছিল পান খাওয়ার মতোই এক আয়াসী ব্যাপার। পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে খোশগল্প করতেন, পোঁটলা বের করে আবারো খেয়ে নিতেন দু'এক খিলি পান— পড়ানোর গতিও ধীর মন্থর, কোন তাড়াহুড়া নেই, নেই কোন তাগাদা, বালাই নেই তর্জন গর্জন বা বাগ্মিতা প্রকাশের। বিশ্ববিদ্যালয় নতুন আর সর্বতোভাবে আধুনিক! তার মাঝে এঁরা কয়েকজন ছিলেন প্রাচীনতার খাঁটি প্রতিনিধি। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরা ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কিন্তু সে পাণ্ডিত্যের আধুনিক বিদ্যার প্রতি এমন একটা উন্নাসিক তাচ্ছিল্য ছিল যে ঐ দিকে একবার উঁকি মেরে দেখাও তাঁরা প্রয়োজন মনে করতেন না। খেলাধূলা, নাটক-নভেল, গান-বাজনা আর তর্কবিতর্কে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কর্মচাঞ্চল্যের তো কোন অভাব নেই— সেদিনও নানা ব্যাপারে, নানা কর্মানুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার হলগুলো দিন-রাতই থাকতো কর্মমুখর। এসবের সঙ্গে এঁদের কোন যোগাযোগ ছিল না— চাকরির কথা মনে করেও কোনদিন এ সবের দিকে একবার তাকিয়েও দেখেন নি। ভাইস-চ্যান্সেলার আর বিভাগীয় অধ্যক্ষরাও যেন মনে করতেন— এঁরা যে দয়া করে ক্লাস নিচ্ছেন এতেই বিশ্ববিদ্যালয় কৃতার্থ। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এঁরা ছিলেন ধর্মীয় পাণ্ডিত্য আর পশ্চিম ভারতীয় ইসলামী জীবন-ধারার প্রতিভূ। এঁদের জীবনের চারপাশে চোখঝলসানো কোন চাকচিক্য ছিল না বটে কিন্তু ছিল একটা শান্ত গাম্ভীর্য আর পবিত্রতার দ্যুতি। তখনো বাংলা বিভাগ স্বতন্ত্র হয় নি— ছিল সংস্কৃতের লেজুড় আর এ দুয়েরই অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর সুশীলকুমার দে। অন্যতম লেকচারার ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ— তিনি অবশ্য তখনো ডক্টর হন নি, স্রেফ এম. এ. বি. এল্। খুব সম্ভব তিনি সংস্কৃত অথবা ভাষাতত্ত্বের ক্লাস নিতেন। ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নিতেন আমাদের বাংলা ক্লাস। মোহিতলাল মজুমদার


www.pathagar.com

এসেছেন আরো অনেক পরে— তাঁকে আমরা পাই নি। শহীদুল্লাহ সাহেব যত না অধ্যাপনা করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি করতেন ধর্ম প্রচার। এমন আন্তরিক ইসলাম ভক্ত সে যুগেও বিরল ছিল— এ ব্যাপারে নিজের গাঁট থেকে খরচও করতেন অকাতরে। Peace বা ইসলাম নামে ইংরেজিতে একটা আস্ত মাসিকই তিনি চালিয়েছেন বহু বৎসর ধরে— সব খরচ তো নিজে বহন করতেনই, তার উপর সম্পাদক-ম্যানেজারের সব কাজও করতেন নিজের হাতে একা। ছিল না কোন লোকজন কি সহকারী— পনর আনা লেখাই লিখতে হত নিজেকে, দেখতে হত প্রুফ, যেতে হত প্রেসে, দপ্তরির কাছে- আরো হাজারো বিরক্তিকর কাজ যা না করলে মাসে মাসে একটা কাগজ বের করাই অসম্ভব। গ্রাহক নেই, নেই বিজ্ঞাপন। কাগজ থেকে কাগজের দামটাও আসে না, তবুও দেখেছি এক অদম্য নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি Peace চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি মুসলিম হলের হাউস টিউটার— থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পশ্চিম গেটে। এ সরল বেঁটে খাটো পণ্ডিত লোকটি ইসলামী জীবন দর্শনের এক বিশেষ দৃষ্টিভংগীরই প্রতীক। সে দৃষ্টিভংগী অবশ্য কিছুটা প্রাচীনতা আর আধুনিকতায় জট পাকানো।

শহীদুল্লাহ সাহেব শুধু যে কাগজে কলমে ইসলাম প্রচার করে ক্ষান্ত হতেন তা নয়, হাতে কলমেও তিনি অনেককে ইসলাম কবুল করিয়ে ছেড়েছেন। তখন ইসলাম গ্রহণ বা 'এছলাম গ্রহণ' একটা নিয়মিত সংবাদ আর তা আমরা পড়তে পেতাম সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতেই বেশি করে। বলা বাহুল্য, মওলানা আকরম খাঁর প্রথম কাগজ হচ্ছে সাপ্তাহিক মোহাম্মদী।

একবার খবর প্রচারিত হলো চকের মসজিদে এক ইংরেজ দম্পতি শহীদুল্লাহ সাহেবের হাতে ইসলাম কবুল করবেন। কৌতূহল আর উৎসাহে আমরাও দল বেঁধে ছুটে গেলাম— দেখি মসজিদের আঙিনায় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, মাঝখানে তরুণ ইংরেজ দম্পতি লাল মুখ নিয়ে বসে আছে, রোদ এসে পড়ায় তারা ঘামছে, তাদের মুখ হয়ে উঠেছে আরো লাল। মেয়েটির মাথায় ঘোমটার মতো করে কাপড় দেওয়া। চারদিকে জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে, হাজার হাজার কৌতূহলী চোখের সামনে মেয়েটি যেন মিইয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ধর্মের এতটুকু রোশনির আভাসও আমি তাদের চেহারায় দেখতে পেলাম না। যদিও অপরাহ্ন সূর্যের আলোয় তাদের মুখ আগুনের মতোই জ্বলছিল। বোধ করি মাসখানেকের মধ্যেই জানা গেল তারা শুধু স্বদেশেই ফিরে নি, ফিরে গেছে স্বধর্মেও।

আমাদের সমাজে নব দীক্ষিতের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই, নেই ওদের আশ্রয় দেওয়ার কোন ব্যবস্থা। ফলে সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করে জীবন যাপন এদের অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন তারা বাধ্য হয় সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে। সাহায্য মানে তো ভিক্ষা। ভিক্ষা যাদের রুচিতে বাধে, তারা পড়ে যায় অত্যন্ত বে-কায়দায়। য়ুরোপে ধর্মান্তর গ্রহণ কোন সমস্যা নয়, সেখানে ধর্ম পরিবর্তনের ফলে কেউই সমাজচ্যুত হয় না— এমন কি পারিবারিক জীবনেও ধরে না কোন ফাটল। আমাদের দেশে অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একান্তভাবে করুণার উপর নির্ভর করতে হয় বলে আমাদের দেশে— বিশেষ করে আমাদের সমাজে নব দীক্ষিতের অবস্থা হয়ে পড়ে অত্যন্ত করুণ,


www.pathagar.com

কারণ। করুণা অত্যন্ত অনিশ্চিত আর তার পরিধিও নেহাত সীমিত। ব্যক্তিগত আত্মমর্যাদার কথা নাই বা বল্লাম।

তেমন এক করুণ জীবন দেখেছি আমি মুহাম্মদ ফজলুল করিম মল্লিকের। আমরা সে যুগের ঢাকার নবীন সাহিত্যিকরা সবাই তাঁকে জানতাম, সবাই তাঁকে মল্লিকদা বলে ডাকতাম এবং সবাই সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতাম তাঁকে সাহায্য করতে। প্রায় পাগলের মতোই সাহিত্যকে তিনি ভালোবাসতেন। সমানে লিখতে পারতেন কবিতা এবং গদ্য। 'চিন্তা' নামে ছোট্ট একটা কবিতার বইও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর আদি নাম হরিপ্রসাদ মল্লিক। ছিলেন হিন্দু, হিন্দু থেকে হন খ্রিস্টান, খ্রিস্টান থেকে মুসলমান। শহীদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে কলকাতাতেই পরিচয়। সম্ভবত সে পরিচয়ের ফলেই হরিপ্রসাদ মল্লিক রূপান্তরিত হন মুহাম্মদ ফজলুল করিম মল্লিকে। তিন তিনটি মহা ধর্মের স্বাদ তিনি পেয়েছেন কিন্তু একদিনের তরেও তাঁর মুখে কোন ধর্মের বুলি আমরা শুনি নি, কোন ধর্মানুষ্ঠান পালন করতেও তাঁকে দেখি নি কোনদিন। সাহিত্যই ছিল তাঁর একমাত্র নেশা। এদিকে ঘরে নেই খাবার কিন্তু আছে স্ত্রী আর দুই তিনটি ছেলেমেয়ে। দিতে পারেন না ঘর ভাড়া, বাজার করা হয় কদাচিৎ, কাপড় চোপড়েরও জীর্ণ দশা। এ অবস্থায় যা হয়— স্ত্রীর সঙ্গে লেগে থাকে খিটিমিটি দিনরাত। আমাদের কাকেও পেলে কাটিয়ে দেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা- উনুনে হাঁড়ি যে চড়ে নি সেদিকে খেয়ালই নেই। সেদিন তাঁর মতো আমাদের কাছেও ছিল গল্পের সেরা গল্প, সাহিত্যের গল্প। সে গল্পে তিনিও যেমন স্থান-কাল-পাত্র ভুলে বসতেন তেমনি আমরাও। সাহিত্যের নেশায় পাওয়া এ লোকটিকে বহুদিন উপোসে থাকতে দেখেছি। তাঁর এ নেশার সাথী হয়ে আমরা যারা জুটেছিলাম, সবাই ছিলাম ছাত্র। আয় বলতে বাড়ি থেকে যে মাসহারা পেতাম তাই। অনেক সময় বাধ্য হয়ে তারও ভাগ দিতে হতো তাঁকে— মাঝে সাঝে দিতে হতো চাল-ডাল কিনে। এ করে আর কয়দিন চলে? কাজেই নেহাত অভাব-অনটন আর দুর্ভোগের ভিতর দিয়েই কাটছিল তাঁর জীবন।

ঢাকায় তখন যে সব মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন স্ব-সমাজ সম্বন্ধে সচেতন— সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সমাজ সংস্কার আর সামাজিক উন্নতি সাধনই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান ঢাকা কলেজ) ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ আর কাজী আনওয়ারুল কাদির। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন আবুল হোসেন আর কাজী মোতাহার হোসেন। শহীদুল্লাহ সাহেবের উল্লেখ আগেই করেছি। ঢাকা সেকেন্ডারি বোর্ডের সেক্রেটারি হিসেবে কাজী ইমদাদুল হকও ঢাকায় ছিলেন— তবে আমি যখনকার কথা বলছি তখন তিনি অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ ছুটিতে চলে গিয়েছেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ— তিনিও সমাজ-হিতৈষী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মিলনীতে তসদ্দুক সাহেব করেছিলেন সভাপতিত্ব (১৯২৭)। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমাজের সম্পাদক আবুল হোসেন সাহেবকে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি যে কতখানি বিনয়ী ছিলেন তারও পরিচয় ফুটে উঠেছে। শুধু তিনি নন, সে যুগের প্রায় সব শিক্ষিত মুসলমানেরই এ ছিল মনোভঙ্গী।


www.pathagar.com

চিঠিখানা নিম্নে উধৃত হলো এ ভেবে যে, এঁদের সম্বন্ধে কেউ হয়তো আর লিখবেই না কোনদিন। অথচ অলক্ষ্যে এঁরাও সমাজ গঠনে কম সহায়তা করেন নি।

কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা
২।২।২৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার কল্যকার পত্র পাইয়াছি। আপনাদের প্রদত্ত সম্মান আমি মাথায় করিয়া লইতাম যদি আমার তাহা পাইবার এতটুকু যোগ্যতাও থাকিত। আপনারা বন্ধু, তাই আপনাদের এরূপ ভুল হইয়াছে। বন্ধুকে কি কেহ ছোট দেখে? তবে সাধারণের উপর এত বড় একটা অবিচার হইলে তাহা সকলে নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিবে কেন? আপনাদের উৎসবে আমি যোগ দিব, আনন্দ উপভোগ করিব। আমাকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবেন কেন? সভাপতি হওয়া কি আমাকে সাজে? আমি যে সাহিত্যের প্রাঙ্গণেও কোনদিন ঢুকিতে সাহস করি নাই, মন্দিরে প্রবেশ করা ত বহু দূরের কথা। আপনাদের উৎসব জয়যুক্ত হোক কিন্তু আমাকে পুরোহিত করিবেন না। আমার ও পেশাও নয়, উহাতে আমার আসক্তিও নাই।

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী,
তসদ্দুক আহমদ

[শিখা : ১ম বর্ষ : ১৩৩৩]

শেষ পর্যন্ত তসদ্দুক সাহেবকে রাজি করানো হয়েছিল এবং সভাপতি হিসেবে তিনি চমৎকার ভাষণও দিয়েছিলেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অন্যতম সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ আবদুর রশিদ বি. এ. বি. টি. সাহেবও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, কিছুকিছু লিখতেনও। চতুর্থ বছরে তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও তার মুখপত্র 'শিখা'র সম্পাদক ছিলেন (১৩৩৭)। শিখার পৃষ্ঠায় সম্পাদক হিসেবে যাঁরই নাম থাক আসলে পেছনে থেকে সব কাজ করতেন মরহুম কর্মবীর আবুল হোসেন। এভাবে পরবর্তী সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়েছিল আমারও নাম। সাহিত্য সমাজ আর 'শিখা'র পেছনে অর্থ এবং শ্রম দুই-ই জোগাতেন আবুল হোসেন সাহেব নীরবে আর আমাদের অজ্ঞাতে। দেনার দায়ও তাঁর, মতামতের জন্য জবাবদিহি বা নিগ্রহভোগের বেলায়ও তিনি।

'শিখা' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বছর খানেক আগে আবুল হোসেন সাহেব 'তরুণপত্র' নামে এক মাসিকও বের করেছিলেন। সে পত্রিকারও সব খরচ যেমন তাঁর, তেমনি লিখতেনও বেশির ভাগ লেখা তিনি নিজে। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হত উপরে উল্লেখিত নও-মুসলিম ফজলুল করিম মল্লিকের। 'তরুণপত্রের' নামের ব্লকের সঙ্গেই ছাপা ছিল— 'উড়াও তরুণ জয়পতাকা পাহাড় সাগর ভেদ করি'। আর নাম ব্লকের ঠিক নিচে মটো হিসেবে লেখা হত :

'যদি সত্যের থাকে বল
তবে নির্ভয় চিতে চল।'


www.pathagar.com

লেখা দু'টি মল্লিকের, না আবুল হোসেন সাহেবের, তা আজ আর জানার উপায় নেই। আবুল হোসেন সাহেবের কথা আর বলার ভংগীতে একটা নতুনত্ব ছিল আর তা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট আর অত্যন্ত প্রগতিশীল। ধর্ম এবং সমাজ কোন ব্যাপারেই তিনি রেখে ঢেকে কথা বলতেন না, তার জন্য বেশ দুর্ভোগও পোয়াতে হয়েছে তাঁকে। 'সবুজপত্র' আর 'তরুণপত্র' নামে আর অর্থে যথেষ্ট মিল রয়েছে— এ মিলের জন্য, না সবুজপত্রের মতো তরুণপত্রেও কিছুটা নবতর দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পেয়েছিলেন যার জন্য তরুণপত্রকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল পত্র লিখেছিলেন তা আজ সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। তরুণপত্রের যে কয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তা খুঁজে পাওয়া গেলে এসব তথ্যের হয়তো হদিস মিলত। চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৩২) একেবারে মুখপাতেই আমার 'মাতৃভাষা ও বাঙ্গালী মুসলমান' এ নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। খুব সম্ভব এটি আমার দ্বিতীয় প্রকাশিত প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য, তখনো আমি গল্প লেখা শুরু করি নি। প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলাম আমীর আলীর A short History of the Saracens পড়ে, দ্বিতীয়টি ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পড়ারই পরিণতি। অর্থাৎ ঐ দুই বই পড়েই প্রেরণা পেয়েছি, এ দুই প্রবন্ধ লেখার মালমশলাও ঐ দুই বই থেকেই সংগ্রহ করা। তরুণপত্রের ঐ একই সংখ্যায় 'লা-পরওয়া' এ ছদ্ম নামে আমি আবুল হোসেন সাহেবের 'বাংলার বলশী' নামক বইটিরও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিখেছিলাম। সম্ভবত ঐটিই আমার প্রথম পুস্তক সমালোচনা। এর পর থেকে তরুণপত্রের কভারে সম্পাদক ফজলুল করিম মল্লিকের পাশে আমার নামও সহ-সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়েছিল। খুব সম্ভব এর পর দু'এক সংখ্যার বেশি তরুণপত্র আর বের হয় নি। ৯৩ নম্বর ফুলবাড়িয়া রোডে ছিল তরুণপত্রের অফিস। তরুণপত্র উঠে যাওয়ার পর ঐ ঘর আমি ভাড়া নিয়েছিলাম। ঘর মানে একটা ছোট রুম— ভাড়া বোধ করি টাকা তিন-চারেক। সে ঘরের অদূরে ছিল 'শূলসুধা' অফিস— 'সঞ্চয়' নামে ওদের এক বিজ্ঞাপনী মাসিক ছিল। আমরা কয়জনে মিলে, তার মধ্যে প্রধান ছিল আবদুল কাদের (মাহেনও ভূতপূর্ব সম্পাদক, তিনি তখনো কাদির হন নি) ওটাকে প্রায় সাহিত্য পত্রিকা করে তুলেছিলাম। তা অবশ্য আরো অনেক পরের কথা।

এ সময় জসীমউদ্দীন তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে আমাকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লেখেন :

24th December,
Gobindapur

ভাই তরুণপত্র!

হয়ত আপনি তরুণপত্র নাও হতে পারেন। তা যেই হোন আপনি আমার স্নিগ্ধ সালাম নিবেন। কেউ কেউ বলে, খোদাকে যেভাবেই ডাকা যায় সেই ডাকই তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছে। হিন্দুরা তাই খোদাকে নানান মূর্তিতে পুজো করে থাকেন। তাতে খোদা বেচারীব নানান দুঃখ সহ্য করতে হলেও (যেমন পুরীতে টুটো জগন্নাথ, ব্রজধামে মাখন চোঁরা গোপাল) ভক্তদের ভারি সুবিধে। আর ভক্তের অধিন যখন ভগবান, তখন আমার ইচ্ছেমত একটি নাম দিয়ে আপনাকে ডাকলেও আপনার আপত্তি করার যো নেই। কাজে কাজেই


www.pathagar.com

আমার ডাকটি আপনাকে নিরবে সহ্য করতে হবে। আমি ভাই গানের ব্যবসায় করলেও (যেমন চাকরি) আমি ছবির কবি। আপনার চেহারা আমার নিশ্চয়ই মনে আছে। কিন্তু পত্রে তো চেহারা এল না। এল নাম। ঢাকা হলের নাম না জানা বন্ধুদের সব ছবিগুলো মিলিয়ে দেখছি। হয়ত তারা কেউ আমাকে এ পত্র দিয়েছেন। ভাই কাদের মিঞাকে আপনার কথা লিখেছিলাম। তিনি এ বিষয়ে একেবারে নির্বাক। তাই বেনামীভাবেই পত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। যেমন নিজের নাম লিখে ছোটকালে সোলার নাওগুলো দিঘীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া। আপনার ও ভাই কাদের মিঞার আদেশ মত যুগের আলোতে একটি কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছি। নাম পুত্র-হারা, পৃষ্ঠা দুই হবে। আপনারা সকলে আমার স্নিগ্ধ সালাম গ্রহণ করবেন। রবিবারে নারায়ণগঞ্জ মেলে ঢাকা এসে পৌছব।

আপনাদের স্নেহাকাঙ্ক্ষী
জসীমউদ্দীন

এ চিঠি আমাদের পরিচয়ের আদি যুগে লেখা— তখনো আমরা আপনি ছেড়ে তুমিতে নেমে আসি নি। জসীম তখনো ভালো কবিতা লিখত বটে কিন্তু চিঠিপত্রের বেলায় ছিল অসতর্ক ও বেখেয়ালী। এ চিঠিতে তারিখ দেয়া হয়েছে অথচ বছরের উল্লেখ নেই। ১৯৩৩ এর পৌষ সংখ্যা মাসিক 'যুগের আলো'তে ছাপা হয়েছে তার 'পুত্রহারা' কবিতাটি। সে হিসেবে ইংরেজি বছর ১৯২৬ অনুমান করা যায়। 'তরুণপত্রে'র সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্মরণ করেই বোধ করি এ সম্বোধন। চিঠিতে উল্লেখিত ঢাকা হল মানে সলিমউল্লাহ মুসলিম হল আর কাদের মিঞা মানে কবি আবদুল কাদির। দিদারুল আলম সম্পাদিত মাসিক 'যুগের আলো'র জন্য লেখা সংগ্রহ ব্যাপারে আবদুল কাদির আর আমি উভয়ে খুব আগ্রহী ছিলাম। এ সম্পর্কেই বোধ করি আমি জসীমকে লিখেছিলাম চিঠি। উদ্ধৃত চিঠিখানি তারই উত্তর। বলা বাহুল্য তখন জসীম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাথা-সংগ্রাহক। অসতর্ক কথাটা প্রয়োগ করার আরো কারণ— এ চিঠিতেও 'রবিবারের' বানান লিখেছে ও 'রবীবার'— তার কোন কোন চিঠিতে 'আমী' 'তুমী'ও দেখেছি। এসব শব্দের বানান জসীমের মতো অত বড় কবি আর এমন চমৎকার লঘু-পক্ষ, প্রাঞ্জল গদ্য লিখিয়ের না জানার কথা নয়। তাই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় একি ইচ্ছাকৃত না স্রেফ কলমের পদস্খলন না কবির কবিয়ানা?

আমি যেবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি সেবারই বোধ হয় আবদুল কাদির ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছিল। তখন থেকেই ও কবিতা লিখত— ফলে পরিচিত হয়ে পড়েছিল 'কিশোর কবি' বলে। বয়সে ও আমার থেকে কিছু ছোট হলেও মাথায় ছিল আমার থেকে উঁচু, গড়নও ছিল বলিষ্ঠ, মাথার চুলও ছিল আমাদের তুলনায় লম্বা। পরত ধুতি-সার্ট। আমরা মাদ্রাসা ফেরতারা অবশ্য পরতাম পাজামা সার্ট। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা কোথায় আজ আর তা মনে পড়ছে না, খুব সম্ভব ফজলুল করিম মল্লিকের বাসায়। সাহিত্যের ব্যাপারে ও ছিল আমাদের চেয়েও বেশি উৎসাহী, ছিল অনেক বেশি মুখর। তখনো কথা বলত জোর দিয়ে, বলতে বলতে অনেক


www.pathagar.com

সময় হয়ে যেত তন্ময়। দেখা হলে কথা বলত ও-ই বেশি করে, আর সবই সাহিত্যের কথা, কবিতার কথা। আমাদের নিয়মিত আড্ডা বসত আমাদের বন্ধু মরহুম আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের ৩৫ নম্বর দেওয়ান বাজারের বাসায়। আসলে বাসাটা ছিল ওর বড় ভাই আবদুল গণি সাহেবের— তিনি শিক্ষকতা করতেন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। গণি সাহেব ছিলেন কিছুটা নিরীহ আর নির্বাক প্রকৃতির মানুষ— পেছনে একটা রুমে পড়ে থাকতেন, কোন ব্যাপারেই রা করতেন না। মজিদ কিছুই করত না, স্রেফ শুয়ে শুয়ে আড্ডা দিয়েই কাটাত। সে কি করে, কোথা থেকে সাহিত্য-রত্ন উপাধি পেয়েছিল তাও আমার অজানা। তখন অবশ্য এমন বহু প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে পনর বিশ টাকা দিলেই সাহিত্যরত্ন, কবিরত্ন ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যেত। মজিদও যে তা করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। দেওয়ান বাজার রাস্তাটার নাম এখন খাজা নাজিম উদ্দীন রোড হয়েছে। ঐ রাস্তার একদম উপরই একতালা বাড়িটা— দিন নেই রাত নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই সব সময় বাড়িটার সামনের প্রশস্ত রুমটায় বসে আমরা আড্ডা জমাতাম। মজিদের তক্তপোষ ছাড়া আর এক আধখানা ভাঙা নড়বড়ে চেয়ার বোধ হয় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় খুব কাছে বলে আমাদের ভারি সুবিধা। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে এসেও আড্ডা জমানো যেত। সাহিত্যরত্ন হলেও মজিদকে কোন সাহিত্য করতে দেখিনি কিন্তু সাহিত্য আর সাহিত্যিকের ব্যাপারে সে মল্লিকের চেয়েও আরো এক ডিগ্রী বেশি পাগল ছিল। মাঝে মাঝে জসীমউদ্দীনও হঠাৎ এসে পড়তো আড্ডায়। তার সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ ওখানে— মজিদের ঘরে। জসীম বোধ করি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পল্লী-গান-গীতিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করছিল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক সময় এসে হাজির হতো আর আস্তানা গাড়ত সাহিত্য-রত্নের ঘাড়ের উপর। ধরতে গেলে মজিদের কোন আয়ই ছিল না তবুও কি জানি কি করে জসীমের 'রাখালী' প্রথম সংস্করণ সে-ই বের করেছিলো নিজের খরচে। সম্ভবত এর আগে জসীমের আর কোন বই-ই প্রকাশিত হয় নি। জসীম তখনো বি-এ। বলা বাহুল্য, আমিও তখন তাই। তখন ঢাকায় 'শান্তি' নামে একটি মাসিক ছিল— ঐ মাসিকের ১৩৩৬, আশ্বিন সংখ্যায় আমি 'রাখালী'র একটি আলোচনা লিখেছিলাম। ঐ সব লেখা আজ দুষ্প্রাপ্য বলে তার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

> "রাখালী"— জসীম উদ্দিন, বি-এ প্রণীত, প্রকাশক আবদুল মজিদ, ৩৫ নং দেওয়ান বাজার, ঢাকা। মূল্য এক টাকা।
>
> ...নগর ও নাগরিক জীবন আমাদের দেশে খুব পুরাতন নয় এবং বর্তমানেও তার প্রভাব দেশব্যাপী নয়। এদেশের অধিকাংশ লোকই পল্লীবাসী কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য পল্লীর মানুষ শিক্ষিত হওয়া মাত্রই শহরমুখো হইয়া উঠে। তাই বর্ত্তমানে বাংলাদেশে সাহিত্য শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে তাহার দৃষ্টি এবং রূপ শহরের। কিন্তু শহরকে বাংলা দেশ বলিলে ভুল করা হইবে, শহরের জীবন বাঙালীর জীবন নয়। শহর বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। কাজেই এই শহরকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্য ও শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে তাহা বাঙালী জীবনের প্রতিধ্বনি নয়, সারা বাঙালীর রসবোধ ইহাতে তৃপ্ত না হওয়ারই কথা। বিরাট পল্লী— বাঙালী এবং বাংলাদেশ যেখানে অনাদৃত


www.pathagar.com

উপেক্ষায় ম্লান মূকমুখে পড়িয়া আছে, তাহাতে কি কোন রূপ-রস নাই? মাটির সে মাটিমাখা সন্তান পল্লী চাষী ও চাষী মেয়েদের জীবনে কি সৌন্দর্য নাই, প্রেম নাই? কাব্য-শিল্পের উপকরণ নাই? আমাদের এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন পল্লীর কবি-প্রতিনিধি জসীমউদ্দীন তাঁর সদ্য প্রকাশিত রাখালী কাব্য-গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতায় পল্লী ও পল্লী-জীবনের কাব্য-রূপ অপূর্ব সুন্দর মূর্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ইত্যাদি।"

আবদুল মজিদ দেখতে সুপারি গাছের মতো লিকলিকে লম্বাটে ছিল কিন্তু মাথায় ছিল এক বোঝা ঘন চুল। ওর মতো বন্ধুবৎসল লোক খুব কমই দেখা যায়।

মাঝে মাঝে আমাদের দলে মুহাম্মদ কাসেম যিনি 'আগামী বারে সমাপ্য' নামে উপন্যাস লিখে এক সময় খুব নাম করেছিলেন, এসে জুটতেন। তিনিও আজ বেঁচে নেই— তিনিও আমাদের অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধু ছিলেন। 'অভিযান' নামে এক মাসিকও বের করেছিলেন কাসেম। স্বয়ং নজরুল ইসলামও অনেক লেখা দিয়ে 'অভিযান'কে সাহায্য করেছেন। গভীর আন্তরিকতা আর হৃদয়ানুভূতির তীব্রতাই ছিল কাসেমের লেখার এক বড় বৈশিষ্ট্য। তেমন বেশি লেখাপড়ার সুযোগ পান নি কিন্তু ওঁর লেখা ছিল প্রাণবন্ত আর গতিশীল, নিজে ঢাকার সাধারণ জীবন থেকে এসেছেন বলে সে জীবনটাকে ভালো করে জানতেন এবং লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। কিছু উল্লেখযোগ্য গল্পও তিনি লিখেছেন। দুঃখের বিষয়, সেসব গল্প আজো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি, এমনকি 'আগামীবারে সমাপ্য'ও আজ দুষ্প্রাপ্য।

১৯২৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে গোটা দুই বক্তৃতা দিতে রবীন্দ্রনাথ এলেন ঢাকায়। বহুকাল আগে তখনকার এক প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে তিনি আর একবার নাকি ঢাকা এসেছিলেন। তখন কবি যৌবন-মধ্যাহ্নে। এবার যখন এলেন তাঁর বয়স ষাটের উপর। পক্বকেশ, পক্বশ্মশ্রু! কিন্তু দেহবর্ণ কাঁচা সোনাকেও হার মানায়। দীর্ঘ দেহের সঙ্গে দীর্ঘ শ্বেত কেশরাশি ও সুদীর্ঘ রূপালি শ্মশ্রুর সে এক অপূর্ব সমাবেশ। যে দেহকে ঘিরে এক অপূর্ব মনীষা নানাভাবে শাখায়িত ও পল্লবিত হয়েছে অর্ধশতাব্দীরও উর্ধ্বকাল— সেই অপূর্ব দেহ-সৌন্দর্য এ প্রথম চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হলো আমাদের। এ সৌভাগ্য জীবনে ভুলবার নয়। স্মরণ হলো সঞ্জীবচন্দ্রের স্মরণীয় উক্তি— 'মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।' রবীন্দ্রনাথকে দেখার পর মনে হয়েছে সঞ্জীবচন্দ্র কিছু মাত্র অত্যুক্তি করেন নি।

ইন্টারমিডিয়েটের বেড়া ডিঙিয়ে সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠে পা গলিয়েছি। অর্থাৎ সবেমাত্র ভর্তি হয়েছি বি. এ. র প্রথম বর্ষে। কিছু কিছু সাহিত্য করার চেষ্টা করছি, চেষ্টার চেয়েও উৎসাহ-উদ্দীপনায় ডানা ঝাপটাচ্ছি অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু রচনার সঙ্গে স্কুলে থাকতেই পরিচয় হয়েছে সত্য কিন্তু সে শুধু মুখচেনা পরিচয়। ভেতরে ঢুকতে পারি নি। ভিতরে ঢোকার সুযোগ পেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পর। পাঠ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য সংকলন 'চয়নিকা'— বর্তমান 'সঞ্চয়িতার' অগ্রজ। পরে অবশ্য অনুজের খাতিরে অগ্রজকে করা হয়েছে বাতিল। 'সঞ্চয়িতা' বের হওয়ার পর স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে 'চয়নিকা' আর ছাপা হয় নি। আমরা যারা 'চয়নিকা' দিয়েই রবীন্দ্র-কাব্য পাঠ শুরু করেছি, তাদের কাছে ঐ গ্রন্থ এক মধুর স্মৃতি হয়েই বিরাজ করছে আজো। সঞ্চয়িতার মতো চাউস মার্কা বই বগলে নিয়ে ক্লাস করতে বা আড্ডা মারতে যাওয়া রীতিমতো ঝামেলার ব্যাপার! ওর তুলনায় 'চয়নিকা'


www.pathagar.com

ছিল তন্বীদেহা। যেখানে সেখানে নিয়ে যেতে, নাড়াচাড়া করতে, যখন তখন পাতা উল্টাতে ও ছিল সঞ্চয়িতার চেয়ে অনেক আরামের। বিপুল দেহা পাঁচমণীদের সঙ্গে তন্বী দেহা জীবন সঙ্গিনীর যে তফাৎ সঞ্চয়িতার সঙ্গে 'চয়নিকা'র তফাৎও প্রায় ঐ রকম ও অতখানি।

এর আগে অবশ্য আই. এ. ক্লাসেও রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র প্রবেশিকা সংস্করণ আমাদের পাঠ্য ছিল। পড়াতেন ইংরেজির অধ্যাপক আবুল কাসেম সাহেব। সবে মাত্র পাস করে লেকচারারের পদে তিনি যোগ দিয়েছেন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। তাঁর কাছে আমরা পড়তাম ইংরেজি কবিতা আর বাংলা 'গল্পগুচ্ছ'। রবীন্দ্র কাব্যের বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক কবিতার তিনি ছিলেন ভয়ানকভাবে অনুরক্ত। এমন দিন যেত না যেদিন তিনি ক্লাসে কথায় কথায় 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি' থেকে কবিতা আবৃত্তি করে না শোনাতেন। বলতেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি রোজ হয় 'নৈবেদ্য' না হয় 'গীতাঞ্জলি' থেকে আবৃত্তি করে তবে তাঁর দৈনিক কাজে হাত দেন। কাসেম সাহেব পরে অধ্যাপনা ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে আইনের ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। পেশা ছাড়া জনজীবনেও তিনি অংশ নিতেন— সদস্য হয়েছিলেন খুলনা জেলা বোর্ড ও অবিভক্ত বাংলার আইন সভার। ছিলেন সাতক্ষীরার অধিবাসী। পেশা ও জনজীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের মুখেই হঠাৎ টাইফয়েড বা অনুরূপ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি অকালে অল্প বয়সে যান মারা। আমাদের 'গল্পগুচ্ছ' পড়াবার ভার তাঁর উপর ছিল বটে কিন্তু সুযোগ পেলেই তিনি রবীন্দ্র কাব্য আবৃত্তি করে ঘণ্টা কাবার করে দিতেন। ফলে সারা বৎসরে দু'তিনটির বেশি গল্প ক্লাসে পড়ানোই হয়নি। কিন্তু গল্পগুচ্ছের প্রথম গল্পে সে যে পড়েছিলাম— 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই'— তা আমাদের কিশোর মনে এমন করে দাগ কেটেছিল যে, তা আর জীবনে ভুলতে পারি নি। এ বাক্যের অভিনবত্ব ও তির্যক ভংগী সে দিন মনে যে দোলা দিয়েছিল, আজও বাক্যটা মনে হলে সে রকম দোলাই অনুভব করে থাকি। সাহিত্যে প্রকাশের অভিনবত্ব যে কতখানি মূল্যবান ও মর্মস্পর্শী তার অজস্র প্রমাণ রবীন্দ্র সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। অবশ্য সে পরিচয় পেয়েছি আরো অনেক পড়ে। তবে তার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল এ গল্পের 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই'— এ বাক্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ভাগ্যে ঘটল মণি-কাঞ্চন সংযোগ। পাঠ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য সংকলন 'চয়নিকা' আর তা পড়াতেন স্বয়ং চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। চারু বাবু একাধারে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক, সফল অধ্যাপক, রবীন্দ্র-ভক্ত ও রবীন্দ্র-সুহৃদ। ছোটখাটো ও সদাহাস্যমুখ এ মানুষটির মতো রবীন্দ্র কাব্যের অমন উৎসাহী অধ্যাপক আমি আর দ্বিতীয়টি দেখি নি। ক্লাসে তিনি প্রত্যেকটি কবিতার উপর লিখিত নোট দিতেন। এ নোটগুলিই পরবর্তীকালে 'রবি-রশ্মি' নামে দুই বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কোন কবিতার ভাব ও মর্ম সম্বন্ধে যখনি তাঁর মনে কোন সন্দেহ জাগত অথবা ভিন্নতর মত ব্যক্ত করা হত তখনি তিনি রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখে বসতেন। উত্তর এলে তাও ক্লাসে পড়ে শোনাতেন। শুধু কি তাই? বাংলা পরীক্ষার দিন কার্জন হলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে— হাস্যমুখে ও অবিচলিত ধৈর্যের সাথে যে যা প্রশ্ন করত সেসবেরও উত্তর দিতে থাকতেন


www.pathagar.com

তিনি। ফলে ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট খাটো একটা ক্লাস জমে যেত। চরম ওয়ার্নিং বেল না পড়া পর্যন্ত তাঁর অধ্যাপনা চলত এভাবে। চারু বাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথ পড়তে পারার দুর্লভ সৌভাগ্য আমাদের অনেকের কাছে এখনো এক পরম আনন্দময় স্মৃতি হয়েই আছে। তখন আমরা যারা সাহিত্য-সভা ও সাহিত্যসংক্রান্ত যেকোন অনুষ্ঠানের সংস্পর্শে আসার জন্য এক রকম হন্যে হয়ে ঢাকার এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতাম তাদের সামনে দেখা দিল আরো একটি সুবর্ণ সুযোগ। এ সময় এক ভদ্রলোক শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে ঢাকায় একই সঙ্গে সদরঘাট বাংলা বাজারের মোড়ে এক বইর দোকান আর 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' নামে এক সাহিত্য প্রতিষ্ঠান শুরু করে দেন। খুব সম্ভব ভদ্রলোকের নাম মনোরঞ্জন চৌধুরী আর তাঁর বইয়ের দোকানের নাম ছিল 'বাণীমন্দির'। বইর দোকানটি ছোট, মাত্র এক দরজার ঘর কিন্তু সাইন বোর্ডটি ছিল বড় আর তাতে লেখা ছিল— 'এখানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম ও অতি আধুনিক লেখকদের বই পাওয়া যায়'। অচিরে এ দোকানে আমরা প্রতি সন্ধ্যায় একবার করে হানা দিতে লাগলাম। মনে পড়ে প্রথম সংস্করণের 'বিষের বাঁশী' আমি এ দোকান থেকেই কিনি। প্রচ্ছদে দীনেশ দাসের আঁকা সাপ জড়ানো ছবিটি সেদিন আমাদের মনে কি যে উন্মাদনার সঞ্চার করেছিল তা আজ আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সাহিত্যের গন্ধ পেয়ে আমি আর আবদুল হক সঙ্গে সঙ্গে 'বিশ্বভারতী সম্মিলনীর' সভ্যও হয়ে গেলাম। দেখেছি তিন-জন সহ-সম্পাদকের মধ্যে কর্তৃপক্ষ একজন মুসলমান রাখতেন আর ঐ পদে পর্যায়ক্রমে একবার আবদুল হক আর একবার আমিই হতাম। নির্বাচন হতো কি-না জানি না কিন্তু কাগজে কলমে আমাদের নাম ছাপা হত আর শান্তিনিকেতনী ধরনে সুরুচিসম্পন্ন সুমুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্র আমরা নিয়মিতই পেতাম। আর নিয়মিতই উপস্থিত থাকতাম ঐ সব অনুষ্ঠানে। আর সম্পাদক করা হত বেশ মুরুব্বি ও ভারিক্কি গোছের কাকেও। এই সম্মিলনীর দ্বারা আহূত সভায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন। চারু বাবুর বর্ণিত একটি গল্প এখনো আমার মনে আছে : একবার শান্তিনিকেতনে চারু বাবু ও অন্যান্য বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসে গল্প গুজবে রত আর পাশের ঘরে কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী কি একটা কাজে ছিলেন ব্যস্ত। হঠাৎ গল্পের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ একবার উঠে পাশের ঘরে গেলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে ভয়ানক ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জে উঠলেন : এ বাড়িতে আমি আর থাকব না, আমার পিতা, পিতামহ যা করেন নি, যা নিষেধ করেছেন বারবার, তাই হচ্ছে এ বাড়িতে এখন। না, এ বাড়িতে আমার আর থাকা চলবে না। উপস্থিত সবাইত থ। রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবীর মুখে রা নেই। সবাই ভেবে অবাক— হঠাৎ এমন কি ঘটল যার জন্যে কবি এমন রেগে গেলেন।

কবি একটু শান্ত হলে উপস্থিত সবাই সন্ত্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন : গুরুদেব, কি হয়েছে বলুন, আমরা এক্ষুণি তার প্রতিকার করছি...।'

কবি ফের ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন : না, না, আমি আর একদণ্ডও এ বাড়িতে থাকছি


www.pathagar.com

না। আমার পিতামহ কোনদিন প্রতিমা পূজা করেন নি। পিতা তো দলিল করেই প্রতিমাপূজা বারণ করে গেছেন। আমার পিতা পিতামহ যা কোনদিন করেন নি, যা করতে নিষেধ করেছেন আজ রথী কি-না বসে বসে তাই করছে!' উপস্থিত সবাই এবার রহস্য বুঝতে পেরে অট্টহাস্য করে উঠলেন। পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল— দ্রুত সরে পড়লেন দু'জন দুদিকে। নর্থব্রুক হলের সেসব সভায় চারুবাবু তখন রবীন্দ্রনাথের পরিহাস প্রিয়তার এমনি বহু গল্প শুনিয়েছিলেন। নর্থব্রুক হলেই বিশ্বভারতী সম্মিলনীর আয়োজিত উপর্যুপরি তিন সভায় কাজী আবদুল ওদুদ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ বক্তৃতা তিনটিই পরে 'রবীন্দ্র কাব্যপাঠ' নামে পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে। এ সময় নজরুল ইসলামও যখনি ঢাকা এসেছেন— বিশ্বভারতী সম্মিলনী তখন তাঁরও সম্মানার্থে সভা ডেকে তাঁর গানের ব্যবস্থা করেছে বহুবার। তখন যেখানে সেখানে ইলেকট্রিক পাখার ব্যবস্থা হয় নি— এ রকম এক গানের মজলিসে ঘর্মাক্ত কবিকে পালাক্রমে হাত পাখা দিয়ে পাখা করার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল।

বিশ্বভারতী সম্মিলনীর তত্ত্বাবধানে এ সময় রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনীও একবার ঢাকায় অভিনীত হয়েছিল— সেকালের ঢাকার প্রসিদ্ধ মুকুল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে। এ অভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সকলের নাম এখন আর মনে নেই। তখনকার ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ অপূর্ব কুমার চন্দ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাজী আবদুল ওদুদও যে অংশ নিয়েছিলেন তা বেশ মনে পড়ছে। সেদিন সারা রঙ্গমঞ্চ ফুলে প্রায় ভর্তি করে ফেলা হয়েছিল। বিশেষ করে পদ্মফুলের অমন ছড়াছড়ি এর আগে আর কোথাও দেখি নি। এভাবে ঢাকাতেই আমার ছাত্র জীবনের সূচনায় মনের মধ্যে একটা রবীন্দ্র পরিবেশ গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটেছিল। এমন সময় যখন খবর প্রচারিত হলো— রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসছেন আর তাঁর অভ্যর্থনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া হচ্ছে, তখন কালবিলম্ব না করে আমিও স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্তি হয়ে গেলাম। সদরঘাট করোনেশন পার্কে আমাদের কুচকাওয়াজের মহড়া চলতে লাগল।

এর অব্যবহিত পূর্বে দেশের উপর দিয়ে অসহযোগ খেলাফতের জোয়ার বয়ে গেছে। এখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অনেকখানি থমথমে। অসহযোগ খেলাফতের শ্লোগান ছিল বন্দেমাতরম আর আল্লাহু আকবর। অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনে ভাটা পড়লেও এ শ্লোগানের জের চলছিল তখনো— যেকোন মিছিলে তখনো পর্যন্ত ঐ দিয়েই কাজ সারা হত। বলা বাহুল্য, তখন পর্যন্ত আসরে 'জিন্দাবাদ' দেখা দেয় নি। 'জিন্দাবাদ' এসেছে অনেক পরে দ্বিতীয় যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। ওটাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। পরে অবশ্য অন্য সব পার্টি, এমনকি ধর্মীয় পার্টিগুলিও ওটাকেই মোক্ষম শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি। নিন্দুকও কি করে নিন্দিতের সাগরেদ বা অনুকারক হয়ে পড়ে 'জিন্দাবাদ' তার এক চমৎকার নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ কবি, কবি হিসেবেই তাঁর পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি। রাজনৈতিক হুজুগে তিনি কখনো মাতেন নি। রাজনীতির মধ্যে একটা চিরন্তন দ্বন্দ্বের ভাব রয়েছে— দ্বন্দ্ব রবীন্দ্র


www.pathagar.com

মানসের বিপরীত ধর্ম। তাই রাজনীতি তাঁকে কখনো আকর্ষণ করে নি। পরাধীন দেশের কবির পক্ষে রাজনীতি সম্বন্ধে যতখানি খবরদারি না করলে চলে না, তিনি শুধু ততখানিই করতেন ও করেছেন। তিনি রাজনীতিবিদ নন, নন রাজনৈতিক নেতা। অথচ তাঁকে অভ্যর্থনা করা হলো তখনকার দিনের রাজনৈতিক শ্লোগান দিয়ে। মাঝে মাঝে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি জয়'ও শোনা যেতে লাগল। সেটা আরও বেশি রাজনৈতিক, কারণ ওটা 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়ের'ই অনুকরণ। আমি মনে মনে অত্যন্ত দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল এসব শ্লোগান রবীন্দ্রনাথের জন্য নয়। কোন শ্লোগানই রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত নয়— এসব শ্লোগান শুনলে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যাই ভাবি না কেন— উপায় নেই। স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম যখন লিখিয়েছি, দলের শ্লোগান আমাকেও আউড়াতে হবে। যদিও মনে সঙ্কোচ ছিল বলে আউড়াতে গিয়ে আমি গলায় জোর পাচ্ছিলাম না মোটেও। কর্মকর্তারা ঠিক করেছেন কবিকে সোজা ঢাকা স্টেশনে না এনে, নারায়ণগঞ্জ থেকে মোটরে করে ঢাকা নিয়ে আসবেন। প্রাথমিক অভ্যর্থনা নারায়ণগঞ্জেই জানানো হবে। আর কবিকে রাখা হবে, নবাব বাড়ির অদূরে বুড়িগঙ্গায় রক্ষিত তাঁদেরই 'তুরাগ' নামক হাউস বোটে। কবিকে নদীবক্ষে রাখার দুটি কারণ— এক রবীন্দ্রনাথ চিরকাল নদী-প্রিয়, বহুকাল তিনি নদীবক্ষে কাটিয়েছেন। দ্বিতীয় কারণ— পথে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। নদীবক্ষে দর্শন প্রার্থীর ভীড় ঠেকানো সহজ-কূলের সঙ্গে যোগাযোগের তক্তাগুলি সরিয়ে নিলেই চুকে যাবে।

ব্যবস্থা হয়েছিল নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথ আমরা ভলান্টিয়ারেরা রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ ভাবে শ্লোগান দিতে দিতে হাঁটতে থাকব আর রবীন্দ্রনাথের মোটর ধীরে ধীরে এগুতে থাকবে তার মাঝখান দিয়ে।

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬— গোয়ালন্দ স্টিমার থেকে রবীন্দ্রনাথ নারায়ণগঞ্জে নামলেন বেলা দশটা কি এগারোটার দিকে। ফেব্রুয়ারির প্রচণ্ড রোদ, দীর্ঘপথ— কুচপরওয়া নেই। বিপুল জনতার মিছিল রবীন্দ্রনাথের গাড়ি মাঝখানে রেখে ঢাকার দিকে এগুতে লাগল। ভলান্টিয়ারদের শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত। যা ভেবেছিলাম— গাড়ির ভেতর উঁকি মেরে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বসে আছেন কিন্তু তাঁর সারা মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠেছে। সম্মানিত অতিথি— না পারছেন মুখ ফুটে কিছু বলতে না পারছেন নিষেধ করতে। না পারছেন কানে আঙ্গুল দিতে! একেই বলে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'। জনতার ব্যূহ ভেদ করে রবীন্দ্রনাথের মোটর এগুচ্ছে ধীরে ধীরে। গাড়ির এক দিকের পা দানিতে দাঁড়িয়েছেন অধ্যক্ষ অপূর্ব কুমার চন্দ (পরে ইনি যুক্ত বাংলার ডি. পি. আই হয়েছিলেন), অন্য পাদানিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডক্টর মাহমুদ হাসান (তখনো তিনি ডক্টর হন নি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির লেকচারার মাত্র)। এভাবে ঝুলতে ঝুলতে তাঁরা নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা পর্যন্ত এলেন। এখনকার শিক্ষাবিদরা এরকম Hero-worship-এর কথা শুনে হয়তো হাসবেন, হয়ত হাতের চার আনি খাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নতুন আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে পূর্ব সুরীদের নির্বুদ্ধিতাকে দেবেন ধিক্কার।


www.pathagar.com

বিকালে করোনেশন পার্কে বিরাট জনসভা। বলা বাহুল্য, তখন ঢাকার সব বড় বড় সভা সমিতি করোনেশন পার্কেই হত। মিউনিসিপালিটি ও নাগরিকদের পক্ষ থেকে কবিকে দেওয়া হল মানপত্র। কবি যখন মানপত্রের উত্তর দিতে উঠলেন তখন পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে। কবির জন্য মঞ্চ তৈরি হয়েছিল পার্কের পূর্ব ধারে— কাজেই কবি যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন তখন তিনি সূর্যের মুখোমুখী। দীর্ঘ বপু, চুল দাড়ি গোঁফ সবই রূপার মতো সাদা কিন্তু দেহের কোথাও জরার চিহ্ন লক্ষ্যগোচর নয়। যখন ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে, যে সূর্যের তখনকার কিরণের সঙ্গে তাঁর গায়ের রঙ একাকার হয়ে মিশে গেছে, সে সূর্যের দিকে চেয়ে, তার অস্তগমনের সঙ্গে নিজের অস্তগমনোন্মুখ জীবনের তুলনা দিয়ে এক অতুলনীয় ভাষায় বক্তৃতা শুরু করলেন তখন বিপুল জনতা কবি-মুখ নিঃসৃত ভাষার সৌন্দর্যে ও কণ্ঠের মাধুর্যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কোন কথা কি ভাবের জন্য তাঁকে ভাবতে দেখি নি, ঝরনা ধারার মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে যেন বাণীর স্রোত বয়ে চলেছে। কোন উত্তেজনা নেই, হাত-পা ছোঁড়াছোড়ি নেই, নেই পেশাদার বক্তার মতো কণ্ঠের উত্থান পতন, স্থির শান্ত মুখশ্রীতে নেই কোন বিপর্যয়— প্রায় আধ ঘণ্টা কি তারো কিছু বেশি এক অপূর্ব বাণী স্রোতে আমরা যেন অবগাহন করে উঠলাম।

তাঁরও নাম রবি। বয়সও প্রায় পঁয়ষট্টি— আজকের সূর্যের মতো তিনিও অস্তপথে পাড়ি দিয়েছেন। মনে পড়ে— তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়, সেদিন ঢাকার এ প্রথম বক্তৃতা তিনি এভাবে একথা বলেই শুরু করেছিলেন। তাঁর চেহারা দেখে সেদিন আমরা এমন তন্ময় ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, তাঁর সব কথা হয়তো ভালো করে কানেও ঢোকে নি। তাই আজ আর সেসব কথা স্মরণ করতে পারছি না।

সেদিন সন্ধ্যায় নর্থব্রুক হলে 'বিশ্বভারতী সম্মিলনীর' উদ্যোগে এক বক্তৃতা সভার আয়োজন হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত সে বৎসর পালানুসারে আমি ছিলাম উক্ত সম্মিলনীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক। সেক্রেটারি বা সম্পাদক ছিলেন অধ্যক্ষ অপূর্বকুমার চন্দ। ফলে আমিও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত সব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণপত্র পেতে লাগলাম নিয়মিত। যতদূর মনে পড়ে নর্থব্রুক হলের এ সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না— বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক টুসি ও অধ্যাপক ফরমোকি। উভয়ে ইটালিয়ান ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং এসেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। হিরজি ভাই মরিসও বোধ করি কিছু বলেছিলেন। তিনি জাতে পার্সি এবং খুব সম্ভব তখন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি।

পরদিন জগন্নাথ কলেজের সামনে অনুষ্ঠিত এক সভায়ও কবি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে সভায় ঢাকা সারস্বত সমাজের পক্ষ থেকে কবিকে করা হয়েছিল অভিনন্দিত। বলেছি এবার কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণেই ঢাকা এসেছেন। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়াই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। যতদূর মনে পড়ে কবি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন একটি The Philosophy of Art, অপরটি What is Art সম্বন্ধে!

প্রথম দিনের বক্তৃতার সূচনায় এক অঘটন ঘটল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্ চ্যান্সেলার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর হার্টগ চলে যাওয়ার পর, কিছুদিন আগে নতুন ভাইস্ চ্যান্সেলার হয়েছেন মি: জি. এচ. লেঙলি। এর আগে তিনি ছিলেন এখানকার দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। অনেক দিন ধরে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই


www.pathagar.com

ঢাকায় আছেন। এই নিরীহ সরল প্রকৃতির ভালো মানুষ মি : G. H. Langley সাহেবকে নেপথ্যে মুসলমান ছেলেরা গোলাম হোসেন লেঙলি বলেই ঠাট্টা করত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা। অতএব ভাইস্ চ্যান্সেলারই সভাপতি। ঢাকার জ্ঞানী-গুণী ও সুধীতে কার্জন হল ভর্তি। ছাত্র, অধ্যাপকদের তো কথাই নেই। স্থানাভাবে আমরা ছাত্ররা বেলকনিতে ও দোতালার বারান্দায় গাদা হয়ে দাঁড়িয়ে। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। রবীন্দ্রনাথ তখনো পুরোপুরি সুস্থ হন নি। তাই ব্যবস্থা হয়েছে বসে বসেই তিনি তাঁর বক্তৃতা পাঠ করবেন। ধবধবে সাদা বিছানা পাতা হয়েছে কার্জন হলের মঞ্চের উপর, আর রাখা হয়েছে মোটা তাকিয়া। সন্ধ্যায় সভা। সভাগৃহ বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত। শুধু রবীন্দ্রনাথের সামনে নিচু টেবিলে জ্বালানো হয়েছে এক সারি মোমবাতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক সময়ে এসেই আসন গ্রহণ করলেন। তাঁকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলার লেঙলি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট— তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের হয় না। বাজ-পড়া মানুষের মতো তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে। সারা হলে যাকে বলে পিন-পড়া স্তব্ধতা। বিস্ময়ে যেন নিঃশ্বাস পড়ছে না কারো। এভাবে কেটে গেল প্রায় পাঁচ মিনিট। হঠাৎ দেখা গেল নিচে বসা ভীড়ের মাঝখান থেকে এক প্রৌঢ়া ইংরেজ মহিলা ধীরে ধীরে উঠে এলেন একেবারে মঞ্চের উপর। পরিচিতরা দেখল মিসেস লেঙলি— স্বামীর কানে কানে কি যেন বলে দিয়ে যেভাবে এসেছিলেন সেভাবে ধীর পদক্ষেপে স্বস্থানে ফিরে গেলেন তিনি। মুহূর্তে মি: লেঙলি যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ইংরেজিতে I invite poet Rabindranath Tagore to deliver his speech- কোন রকমে এ বাক্যটুকু বলে তক্ষুনি বসে পড়লেন। সবাই বুঝল মিসেস লেঙলীর মন্ত্র।

সেদিন করোনেশন পার্কের জনসভায় রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব দেহ-শ্রী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজ তাঁর ব্যক্তিত্বের অদ্ভুত সম্মোহন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ১৯২৬ এর ১০ ফেব্রুয়ারি কার্জন হলে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্য দেখলাম জীবনে তা ভুলবার নয়, ভুলি নিও। সেদিন এশিয়ার এ মহা-কবি শুধু নীরবে বসে থেকে ব্যক্তিত্বের যে মহিমা বিকীরণ করেছিলেন তার তুলনা নেই, তেমনি এক অখ্যাতনামা ইংরেজ মহিলা নিজের প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের গুণে শুধু স্বামীর নয়, ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজ জাতির মুখ যেভাবে রক্ষা করেছিলেন তারও বোধ করি তুলনা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকেও কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল কিন্তু সব সংবর্ধনাকে হার মানিয়ে দিয়েছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সংবর্ধনা। আমি আমার জীবনে ওরকম দ্বিতীয় সংবর্ধনা দেখি নি— দেখি নি অতখানি আন্তরিকতা। সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল তখনকার মুসলিম হলের বিরাট ডাইনিং হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম সিঁড়ি থেকে হল পর্যন্ত পথের দু'ধারে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল নানা রকম ফুল আর হল ঘরের সবটা জুড়ে নানা ফুল পাতা ও লতায় সাজিয়ে এখানে ওখানে রচিত হয়েছিল অসংখ্য কুঞ্জবন আর তাতে এমনভাবে বিভিন্ন পাখি রাখা হয়েছিল যাতে খাঁচাগুলি মোটেও নজরে না পড়ে। যদিও রবীন্দ্রনাথ খাঁচায় বদ্ধ পাখি দেখলে বিরক্তি বোধ করতেন সেদিন ভক্তির আতিশয্যে এবং সমস্ত হল ঘরটাকে স্বাভাবিক কুঞ্জবন করে তোলার


www.pathagar.com

উৎসাহে, উদ্যোক্তারা হয়তো ইচ্ছা করেই সে কথা ভুলে বসেছিলেন। আজ ভাবলে অবাক লাগে ঢাকার বুকে বসে অত ফুল কি করে যোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল। প্রত্যেকটা টেবিল স্থাপন করা হয়েছিল এক একটা কুঞ্জবনের মধ্যে। আশ্চর্য, মাঝে মাঝে খাঁচার পাখিগুলোও ডেকে উঠত। অলিন্দে আর কার্নিসে ফুল ভর্তি সাজি হাতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল অনেকগুলি ছাত্রকে— কবি ঢুকবার সময় তারা তাঁর উপর করবেন পুষ্প-বৃষ্টি।

আমরা হলের ছাত্ররা আগেই আসন নিয়েছি। এবার একে একে অতিথি অভ্যাগতরা ঢুকতে লাগলেন। কবির প্রতীক্ষায় আমাদের বুকের রক্ত তোলপাড়। কবির আগে কবির সহযাত্রীরা একে একে এসে ঢুকলেন। ঢুকলেন কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পত্নী প্রতিমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। ঠাকুর-বাড়ির মেয়েদের রূপের খ্যাতি শোনা ছিল, প্রতিমা দেবীকে দেখে মনে হলো সে খ্যাতি কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। কবি যখন ঢুকলেন তখন সমস্ত হল দণ্ডায়মান— হল ঘরের প্রবেশ পথ থেকেই কবির উপর শুরু হয়েছে পুষ্প বৃষ্টি। কবির জন্য বিশেষভাবে রচিত মঞ্চ ফুল দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে তাতে ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কবি আসন গ্রহণের পরও থেকে থেকে তাঁর উপর পুষ্প বৃষ্টি চলতে লাগল। কবির সব কথা আজ আর মনে নেই। তবে যতদূর স্মরণ হয় কবি এ বলেই তাঁর বক্তব্য শুরু করেছিলেন : 'প্রাচীন কালে আমাদের দেশে রাজারা দিগ্বিজয় করে ফিরলে তাঁদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হত, আমি কি আমার দেশের জন্য তেমন কিছু জয় করে এনেছি যার জন্যে আজ আমাকেও পুষ্প বর্ষণ করে সংবর্ধনা জানানো হচ্ছে?' কবি তখনো অসুস্থ। তাই সংক্ষেপেই তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন আর খেলেন না কিছুই। শুধু হল য়ুনিয়নের ভাইস্ প্রেসিডেন্টের হাত থেকে একটি কি দুটি আঙুর তুলে নিয়ে চেখে দেখলেন।

কবিকে সে সংবর্ধনা সভায় যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়েছিল খুব সম্ভব তা রচনা করেছিলেন মরহুম আবুল হোসেন সাহেব (তাঁর কথা আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলেছি)* তিনি তখন মুসলিম হলের হাউস টিউটর। প্রভোস্ট ছিলেন ডক্টর স্যার এ. এফ. রহমান। ভাইস্ প্রেসিডেন্টের নাম মনে নেই, তবে হলের চিরাচরিত নিয়মানুসারে তিনিই অভিনন্দনপত্র পাঠ করেছিলেন। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম হলের লাইফ মেম্বারও করা হয়।

মুসলিম হলের পক্ষ থেকে কবিকে যে সুদীর্ঘ অভিনন্দনপত্র দেয়া হয়েছিল তার একটি মাত্র অনুচ্ছেদ নিয়ে উদ্ধৃত হলো :

হে পুণ্যচিত্ত, অনন্তরূপ পিয়াসী সাধক!

আমাদের আদর্শ কর্মপ্রাণ, স্নেহপ্রবণ, ভক্তবীর হযরত মুহম্মদের জীবনের মূলমন্ত্রটি তোমার একটি ছন্দে বেশ সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

তোমার এই ছন্দটি সেই পুরুষ সিংহের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিকতর প্রগাঢ় করিয়া তোলে এবং নব নব ভাবে সেই মরুর যোগীকে দেখিবার ইচ্ছা জাগায়। অনন্ত বেদনার

* আমার 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন' দ্রষ্টব্য।



www.pathagar.com

মাঝে মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে সেই বিরাট পুরুষ আত্মার মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তামসিক ভারতে তুমিই নূতন করিয়া এই 'কর্মের মধ্যে মুক্তির বার্তা ঘোষণা করিয়া নব নব কার্যধারায় ভারতবাসীকে জাগ্রত করিয়াছ।'

১৪ ফেব্রুয়ারি কবি ঢাকার প্রোগ্রাম শেষ করে ময়মনসিংহ ভ্রমণে যান। আগের দিন অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ অপূর্ব কুমার চন্দের বাসায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি ঘরোয়া বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। আগেই উল্লেখ করেছি সেবার অপূর্ব কুমার চন্দ মহাশয় ছিলেন ঢাকা বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সম্পাদক আর আমি ছিলাম অন্যতম সহকারী সম্পাদক। কাজেই ঐ সুবাদে চন্দ সাহেবের বাড়ির ঘরোয়া বৈঠকে আমিও আমন্ত্রিত। যথা সময় দুরু দুরু বুকে চন্দ সাহেবের বাংলোর বহির্দ্বারে গিয়ে হাজির হলাম। বেশি লোকজনের আনাগোনা না দেখে মনে হলো হয়তো নির্বাচিত লোক ছাড়া অন্য কাকেও ডাকা হয় নি। বহু ইতস্ততের পর বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম, দেখলাম ঈষৎ অন্ধকারে গোলগাল চেহারার এক বিরাট পুরুষ পায়চারি করছেন আর ধীরে ধীরে সিগারেট টানছেন। ভংগি দেখে মনে হলো তিনি যেন অনেকটা লুকিয়ে লুকিয়েই সিগারেট খাচ্ছেন!

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কবি কোথায়?

তিনি ইসারায় ভিতরের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন : ভিতরে চলে যান।

এবার সাহস করে ঢুকে পড়লাম। বাইরের দিকের রুমটা পেরিয়ে ভিতরের সাজানো আর মোমবাতির স্বল্পালোকিত রুমে ঢোকার মুখে এক মহিলা কপালে কি যেন লেপে দিলেন। থতমতো খেলাম— একটু অস্বস্তিও যে বোধ না করলাম তা নয়। কারণ, এ ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে এ প্রথম। পরে অবশ্য বুঝতে পারলাম ওটা চন্দন বাটা। পেছনে ফিরে দেখি কাজী আবদুল ওদুদ ঢুকছেন। তাঁর কপালেও মহিলাটি চন্দন লেপে দিলেন। যাঁরাই ঢুকছেন সবাইকে এভাবে কপালে চন্দন লেপে দিয়ে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। কাজী সাহেব তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলার লেকচারার। আমি তখন নেহাৎ ছাত্র তাই তাঁর সাথে সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রেখেই চলতাম। তাঁরও কপালে চন্দন লেপে দেওয়া হয়েছে দেখে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লাম। যাক আমি তা হলে একা নই।

দেখলাম রবীন্দ্রনাথ পাশের একটি ছোট কামরায় সোফার উপর বসে আছেন। মাঝখানে খোলা দরজা— দেওয়াল সংলগ্ন একটি পিয়ানোও নজরে এলো।

সাহসে বুক বেঁধে সে ঘরেই ঢুকে পড়লাম এবং লম্বা সোফাখানির এক প্রান্তে নীরবে বসে পড়লাম। আমার ও কবির মাঝখানে আরো দু'জন বসা ছিলেন। তাঁরা কেউ-ই আমার পরিচিত নন। হঠাৎ কে একজন কবির হাতে কবির একখানি কবিতার বই তুলে দিলেন। কবি তার থেকে গোটা দুই কবিতা পড়ে শোনালেন। গানের দাবী উঠতেই কবির গানের ভাণ্ডারী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাক পড়ল। আমার সঙ্গে বারান্দায় প্রথম দেখা মোটা ভদ্রলোকটি পিয়ানোর সামনে এসে বসলেন। বুঝলাম তা হলে ইনিই দীনেন ঠাকুর যিনি রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানে সুর দিয়েছেন আর নিজের সুমধুর দরাজ গলায় গেয়ে গেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানকে করে তুলেছেন জনপ্রিয়। যেমন তাঁর বিরাট গোলাকার মুখমণ্ডল, তেমনি গলার উদাত্ত স্বর। উপস্থিত সবাইকে তিনি প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন অনেকক্ষণ।



www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের নাতনী (নন্দিতা কি নন্দিনী বলতে পারব না) যার বয়স তখন তিন কি চারের বেশি নয় কবির সামনে লাফালাফি করে খেলছিল। হঠাৎ কবি দু'হাতে তালি দিতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে অতটুকু মেয়ে হাত তালির ছন্দে ছন্দে নাচতে লাগল। আমরা সবাই মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলাম এ ক্ষুদে শিল্পীর নৃত্য। রবীন্দ্রনাথকে এই প্রথম ও শেষ বারের মতো নিকট থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

## চব্বিশ

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা ১৯২৬ সালে। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হয় প্রথম বার্ষিক সভা— অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের প্রথম প্রভোস্ট মি: এ. এফ. রহমান আর মূল সভাপতি খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ, একথা পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে। সাহিত্য সমাজের পেছনে প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে অনেকেই ছিলেন— তার মধ্যে মি: আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন আর কাজী আনওয়ারুল কাদির প্রধান। কিন্তু সমাজের প্রথম কর্মী-সংসদ গঠিত হয়েছিল প্রধানত ছাত্রদের নিয়েই। পাঁচজন সদস্যের মধ্যে চারজনই ছিলেন ছাত্র— মুসলিম হল থেকে ছিলেন মিঃ এ. এফ. এম. আবদুল হক ফরিদী, তাঁর কথা আগেও বলা হয়েছে। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট থেকে ছিলেন মি: এ. জেড. নূর আহমদ, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ইসলাম ও মুসলিম ইতিহাস নিয়ে অনেকগুলো বইও লিখেছেন তিনি। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ছিলেন আবদুল কাদির আর আনোয়ার হোসেন। আনোয়ার হোসেন বোধ করি বর্তমানে কোন এক গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের হেডমাস্টার। পঞ্চম সদস্য ছিলেন অধ্যাপক আবুল হোসেন এম. এ. বি. এল. নিজে। তসদ্দুক আহমদ সাহেব প্রসঙ্গে যে লিখেছিলাম সেকালের মুসলিম শিক্ষিত-জন অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, তা বোধ করি আবুল হোসেন সাহেব সম্বন্ধে আরো বেশি করে খাটে। পেছন থেকে সব কিছুই তিনি করতেন কিন্তু নিজেকে জাহির করতে চাইতেন না মোটেও। সে যুগেও তাঁর মতো এমন প্রশংসা-ভীরু আত্ম-প্রচারণাবিমুখ লোক ছিল বিরল। সাহিত্য সমাজ সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে আমি ইতিপূর্বে আরো আলোচনা করেছি, তবুও তার মূল বক্তব্য সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন আছে বলেই আমার বিশ্বাস। আবুল হোসেন সাহেবের ভাষায় সাহিত্য সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল— 'চিন্তা-চর্চা' অন্য কথায় অন্ন-চিন্তার উপর 'অন্য-চিন্তা'কে তুলে ধরা। সাহিত্য সমাজের জন্ম থেকে প্রায় চল্লিশ বছর গত হতে চল্লো এর মধ্যে দেশের উপর দিয়ে ওলটপালটের কত হাওয়াই না বয়ে গেছে। আমূল পরিবর্তন ঘটেছে রাজনীতি ক্ষেত্রে, অবিশ্বাস্যভাবে রদবদল হয়েছে সামাজিক জীবনে, খুলে গেছে সুযোগ-সুবিধার এন্তার পথ। তবুও চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের কি কোন অগ্রগমন হয়েছে? ঘটেছে কি কোন বিবর্তন? সাহিত্যেও এমন কোন রচনা কি লেখা হয়েছে যাতে প্রতিফলন ঘটেছে নতুন চিন্তার? বিশেষত প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ গঠনের জন্য যে গতিশীল চিন্তা আর দুঃসাহসিক পদক্ষেপ প্রয়োজন তা তো আজো দুর্নিরীক্ষ্য। চিন্তায় ভাবে গতানুগতিক আর সনাতনী অথচ বাহ্যিক জীবন যাপনে আধুনিক ও প্রগতিশীল (এদিক দিয়ে কেউ কেউ টেডি বা বিটনিক বল্লেও চলে)


www.pathagar.com

আমাদের সমাজ আজো এ এক স্ববিরোধিতার শিকার নয় কি? মুসলিম সাহিত্য সমাজ চেয়েছিল সমাজকে এ স্ববিরোধিতার হাত থেকে বাঁচাতে, চিন্তার ক্ষেত্রেও তাকে আধুনিক ও গতিশীল করে তুলতে। বলা বাহুল্য, জ্ঞান-চর্চা ছাড়া এ কিছুতেই সম্ভব নয়। এক মাত্র জ্ঞানই খুলে দিতে পারে চিন্তার দিগন্ত। জ্ঞানই চিন্তা, চিন্তাই জ্ঞান। তাই সাহিত্য সমাজের মটো ছিল : "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট—মুক্তি সেখানে অসম্ভব।"

সাহিত্য সমাজের কোন কোন সভায় কিছু কিছু উগ্র মতামতও যে প্রকাশ পায়নি তা নয়, অনেক সময় নেহাত অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র থেকেও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এ সব মতামত। প্রথম বর্ষের বার্ষিক সভার বিবরণী থেকে আমি কিছু কিছু মতামত এখানে উধৃত করছি একালের পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য। বলা বাহুল্য, এ সব তথ্য আমাদের সামাজিক ইতিহাসেরও মূল্যবান উপকরণ। তখন ঢাকায় মক্তব্য সাব্ ইন্‌স্পেকটার ছিলেন জনৈক মৌলভী মোক্তার আহমদ সিদ্দিকী (তিনি চট্টগ্রামের বাঁশখালি থানার অধিবাসী)। তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে কার্য বিবরণীতে লেখা হয়েছে : "তিনি তাঁর পকেট হতে কাগজের তাড়া বের করতেই সভাপতি সাহেব শঙ্কিত হয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেন যেন তিনি বেশি সময় না নেন। তিনি তাঁর তাড়া তুলে ধরে বল্লেন : "আমি এখানে নানা দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, না বুঝে ধর্ম করা আর না করা একই কথা। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জোর গলায় বলতে পারি যে, মুসলমানের ধর্ম নাই— তার জীবন নিতান্ত কুৎসিত।" মনে হচ্ছে, তখন সমাজে সহিষ্ণুতা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক ধর্মপালনের বিরুদ্ধে কারো কারো মনে যে একটা প্রবল অসন্তোষ সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল এ বোধ করি তারই প্রমাণ। পরবর্তী বক্তা আমাদের তরুণ অধ্যাপক মৌ: মমতাজ উদ্দীন আহমদ (পরে ডক্টর ও অধ্যক্ষ, বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার) তিনি খুব উচ্চকণ্ঠে মাদ্রাসা শিক্ষা ও না-বুঝে ধর্মশিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, "আমরা আরবি ফারসি উর্দু প্রভৃতি বিজাতীয় ভাষার চাপে একেবারে রসাতলে যাচ্ছি। এর একমাত্র উপায় মাদ্রাসাগুলি তুলে দেয়া— নতুবা আমাদের বুদ্ধি বলুন, জ্ঞান বলুন, অর্থ বলুন, মুক্তি বলুন, কিছুই সম্ভবপর হবে না।"

আগেই বলা হয়েছে এ সভায় নজরুল উপস্থিত ছিলেন। একাধিক গান গেয়ে আর তাঁর সুবিখ্যাত 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি করে তিনি সভাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। উৎসাহের চোটে সমাপ্তি অধিবেশনে এক বক্তৃতাও দিয়েছিলেন তিনি। সে বক্তৃতার অংশবিশেষ : "আজ আমি এই মজলিসে আমার আনন্দবার্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখছি এখানে মুসলমানের নূতন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্তা চতুর্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব। আর একটি কথা— এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, মৌঃ আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ কতকগুলি গুণী ব্যক্তিও দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আমি চাই না।'

রাত দশটায় সভাপতি তসদ্দুক আহমদ সাহেব তাঁর উপসংহার বক্তৃতা দিতে উঠে বল্লেন : "আজ দুই দিন ধরে আমরা এখানে বস্তা বস্তা ময়লা কাপড় ধুয়েছি। মাঝে মাঝে এরূপ করে ময়লা না পরিষ্কার করলে সমাজের মন রুদ্ধ হয়ে যায়। এতে আমাদের দুঃখ



www.pathagar.com

ও ক্ষতি নাই। ঘরে আবর্জনা জমলে যেমন নিষ্ঠুর হস্তে সম্মার্জনী দিয়ে ঘরটি বেশ করে ঝাঁটিয়ে দেওয়া দরকার— তেমনি সমাজে আবর্জনা জমলে ঐরূপ নিষ্ঠুরভাবে ধুয়ে ফেলা দরকার। আজ আমরা যে ভাঙতে চেয়েছি— বিদ্রোহী হয়ে ভাঙতে চাচ্ছি সেটা শুভলক্ষণ মনে করতে হবে। আমাদের মনে ঐ ময়লা আবর্জনা দূর করবার স্পৃহা জেগেছে। কিন্তু বন্ধুগণ, শুধু ভাঙলে চলবে না— গড়তেও হবে। আমাদের আজ সৃষ্টি করতে হবে— নব নব উদ্ভাবনা জাগুক ও নব নব চেষ্টা আমাদের হোক— আজ আপনারা প্রতিশ্রুত হয়ে গৃহে ফিরে যান যে, 'আমরা সৃষ্টি করব'। আজ যদি জগতের সঙ্গে মেলামেশা করে জগতবাসী হয়ে গৌরব অর্জন করতে চাই তবে আমাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে— আমাদের ইচ্ছাকে নব সৃষ্টিতে লাগাতে হবে— নতুবা শুধু ভেঙ্গেই গেলে লুপ্ত হয়ে যেতে হবে। আর আমাদের ঘুমালে চলবে না। তাই খোদার কাছে প্রার্থনা করি— আপনারা বড় হোন— আপনারা আমাদের এই আসন গ্রহণ করুন— আমাদের চেয়ে বড় হোন— ইসলামকে নব মন্ত্রে নব দৃষ্টি দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পদশালী করুন।"

এরপর নজরুলের গজল দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। নজরুল ছাড়া এ সভায় মুসলিম হলের তখনকার ছাত্র আক্কাস আলী খাঁও (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ) গান করেছিলেন আর সেতার বাজিয়েছিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের তখনকার ছাত্র কাজী আনোয়ারুল হক (পূর্ব পাকিস্তানের আই. জি. ও চিফ সেক্রেটারি— বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বীরেন্দ্র গাঙ্গুলীও একটি গান করেছিলেন। এই সভায় কাজী মোতাহার হোসেন 'সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান' নামে একটি সুলিখিত ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তবুও মনে হয় গান সম্বন্ধে মুসলমান সমাজ দ্বিধামুক্ত হতে পারে নি তখনো। কর্ম-সূচিতে লেখা ছিল কোরান তেলাওয়াতের পর প্রথমে একটি গান হবে, তারপর শুরু হবে প্রবন্ধ পাঠ। কোরান তেলাওয়াতের পরে গান! অধ্যাপক আবদুল হাকিম (তিনি তখন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক— খুব সম্ভব রাজশাহী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কয়েক বছর আগে মারা গেছেন) আপত্তি তুল্লেন। কাজেই গানকে পেছনে হটতে হলো। দ্বিতীয় অধিবেশনেও সেই ব্যবস্থা। কথা ছিল জোহরের নমাজের পর একটা গান দিয়েই সভার কাজ শুরু হবে। কিন্তু তাও আর করা সম্ভব হলো না এ আপত্তির জন্য। তাই গানের মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁক দিয়ে দু'য়ের মধ্যে করতে হলো আপোষ। ফাঁকটায় বেশ কয়েকটা শক্ত শক্ত প্রবন্ধ শুনিয়ে শ্রোতাদের মনে তেলাওয়াৎ বা নমাজ যে পবিত্র ভাবের উদ্রেক করতো তাকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিয়ে তবেই গানের মতো সিকুলার বা ধর্মহীন বস্তু শোনার উপযোগী করে তোলা হতো! সেদিন এভাবে ধর্ম আর গানের মাঝখানে একটা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে একই সঙ্গে পুণ্য আর আনন্দের ভাগী হতাম আমরা। আজকের দিনে ব্যাপারটি কৌতুককর মনে হতে পারে কিন্তু মুসলিম সাহিত্য সমাজের সূচনার দিকে এ ছিল সমাজ মনের অবস্থা। এমনকি পরে মুসলিম হলে মুসলিম সাহিত্য সমাজের অধিবেশন-অনুষ্ঠানও নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে।

উপরে আমি প্রথম বর্ষের কার্যবিবরণী থেকে যে কয়েকটা মন্তব্য উধৃত করেছি তাতে মোটামুটি মুসলিম সাহিত্য সমাজের মূল সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ সুর অনেকের মনঃপূত


www.pathagar.com

ছিল না— ফলে ধীরে ধীরে একটা প্রতিক্রিয়াশীল দল এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কি একটা ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আবুল হোসেন সাহেবেরও ঘটে মতভেদ। তিনি আপোষ করার মানুষ ছিলেন না। তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বারে যোগ দিয়ে ওকালতি শুরু করেন। আইনজীবীর পক্ষে জন-সমর্থন ও আনুকুল্য অত্যাবশ্যক অন্তত প্রকাশ্য বিরুদ্ধতা ঐ পেশার প্রতিকূল। মামলাবাজ জনসাধারণ স্বাধীন চিন্তার ধার ধারে না— তারা একদিকে যেমন সহজে কাঠগড়ায় উঠে হলফ্ পাঠ নিয়ে সত্য-মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না, তেমনি অন্যদিকে কোর্টপ্রাঙ্গণের মসজিদে গিয়েও জমায় ভিড়। এ পরিবেশে এসব মানুষের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করতে হলে স্বাধীন চিন্তার পতাকা তুলে ধরা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই বোধ করি দেখা যায় পঞ্চম বছরের গোড়ায় আবুল হোসেন সাহেব সাহিত্য সমাজের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ বর্ষের (১৩৩৭) কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে : "তাঁহার (আবুল হোসেন সাহেবের) অজুহাত ছিল যে, তিনি কোনও কারণ বশত স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অক্ষম— চিন্তারাজ্যে অপর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অভিমতানুযায়ী চলা তাঁহার পোষাইবে না। বর্তমান ক্ষেত্রে স্বাধীন মত প্রকাশ করায়ও অনেক বিঘ্ন আছে। সুতরাং আপাতত তিনি তাঁহার চিন্তা ও কলম স্থগিত রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছেন।" এর কিছুকাল পরেই তিনি ঢাকা ছেড়ে কলকাতা চলে যান এবং সেখানে হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় শুরু করেন এবং প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হন।

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজে যাঁদেরে আমরা মুরুব্বি হিসেবে পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে আবুল হোসেন আর কাজী আনোয়ারুল কাদির মারা গেছেন, কাজী আবদুল ওদুদ এখন কলকাতাবাসী। অবশিষ্ট আছেন শুধু কাজী মোতাহার হোসেন। সাহিত্য সমাজের যুগে তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে সহকারী লেক্চারার। তখন তাঁর তরুণ বয়স কিন্তু দাড়ি রাখতেন লম্বা করে। তবে পরতেন ধুতি আর চড়তেন সাইকেল। চেষ্টা করতেন গান করতে তবে নেশা ছিল দাবায়। দাবা নিয়ে বসার সুযোগ পেলে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে ছাড়তেন। দাবায় তিনি নাকি অন্যতম প্রাদেশিক খেলোয়াড়— মাঝে মাঝে কলকাতার প্রতিযোগিতায়ও শরীক হতেন। পাকিস্তানে তিনি যে একজন বিশিষ্ট দাবা খেলোয়াড় তাতে সন্দেহ নেই। দাবা সম্বন্ধে একবার তিনি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধও লিখেছিলেন আর সেটা পড়া হয়েছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের এক অধিবেশনে। তাঁর অনেক রচনা, অনেক অভিভাষণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেগুলো সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হলে তাঁর চিন্তার পরিধি ও মনের ঔদার্যের একটা পরিচয় পাওয়া যেত। বহুকাল আগে তিনি 'সঞ্চরণ' নামে একটি প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন— সেটিও এখন দুষ্প্রাপ্য। তাঁর চিন্তা আর প্রকাশ-শৈলীতে এমন একটা অপূর্ব স্বচ্ছতা আছে যে, তা পাঠককে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ করে রাখে। এতখানি যোগ্যতা আর প্রস্তুতি সত্ত্বেও তিনি কেন যে গভীরভাবে আর ধারাবাহিক নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করলেন না, বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে তাঁর রচনায় যে বিচারশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তিনি ভালো সাহিত্য সমালোচকও হতে পারতেন। শুধু বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখলেও তাঁর দ্বারা আমাদের সাহিত্যের অন্তত একটা দিকের শূন্যতা পূরণ হতে পারত। জানি যা হয় নি তা নিয়ে দুঃখ করা বৃথা। সুখের বিষয়, তিনি আজো সে যুগের সরল ও সুস্থ জীবনের প্রতীক হয়েই আছেন।


www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে যাঁরা ঢাকার বাইর থেকে এসে এক আধবার যোগ দিয়েছেন তার মধ্যে এস. আকবর উদ্দীন ও সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আকবর উদ্দীন সাহেব কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা— সেখান থেকে এসে তিনি আমাদের বার্ষিক সম্মেলনে শরীক হন। সে সময় তিনি প্রচুর লিখতেন, সওগাতের পৃষ্ঠায় তাঁর অসংখ্য গল্প ছাপা হয়েছে— ধারাবাহিক ছাপা হয়েছে 'বেড়াজাল' নামে এক সুদীর্ঘ উপন্যাস। আশ্চর্য, এসবের কিছুই পুস্তকাকারে ছাপা হয় নি। ছাপা হয়েছে 'সিন্ধুবিজয়' আর 'নাদির শাহ' নামে দু'টি নাটক মাত্র। আমার বিশ্বাস নাটকের চেয়ে গল্পে তিনি অধিকতর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

কুমিল্লা থেকে আসতেন মরহুম সৈয়দ মোতাহার হোসেন চৌধুরী। তিনি লিখতেন কবিতা আর প্রবন্ধ। সুচিন্তিত প্রবন্ধের জন্য তিনি আজো স্মরণীয়। বেঁচে থাকতে কোন বইই প্রকাশ করেন নি, হয়ত পারেন নি প্রকাশ করতে। মৃত্যুর পর তাঁর অনুরাগী বন্ধুরা মিলে— 'সংস্কৃতি কথা' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে ঐটি এক স্মরণীয় প্রবন্ধ পুস্তক। মুসলিম হল আর সাহিত্য সমাজের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র কবি আবদুল কাদিরই সাহিত্য চর্চায় এখনো নিবিষ্টচিত্ত। সুফি মোতাহার হোসেনও আমাদের সমসাময়িক আর ছিলেন মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র। তাঁর সঙ্গে আতাউর রহমান খাঁর (প্রাক্তন চিফ মিনিস্টার) ছিল খুব গলাগলি। আতাউর রহমানও ছিল তখন বেশ সাহিত্যমনা— মাঝে মাঝে লিখতোও কিছু কিছু। সুফি মোতাহার হোসেন অসংখ্য সনেট লিখেছেন, তার মধ্যে উৎকৃষ্ট সনেটের সংখ্যাও কম নয়। তবুও এ যাবৎ তাঁর কোন সনেটের বই প্রকাশিত হয়নি। কোন প্রকাশক এগিয়ে আসেন নি তাঁর চমৎকার সনেটগুলি পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে। বাংলাদেশে এমন পত্রিকা খুব কমই আছে যেখানে সুফী মোতাহার হোসেনের সনেট ছাপা হয় নি। তিনি এখন ফরিদপুরে এক বে-সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন, মুসলিম হল ছেড়ে যাওয়ার পর দীর্ঘকাল কি এক দুরারোগ্য রোগে ভুগেছেন। বছর দু'তিনেক আগে ফরিদপুরেই তাঁর সঙ্গে একবার আমার দেখা— দেখলাম শরীর ভেঙ্গে গেছে আর মনে হলো কি এক আধিদৈবিক দুশ্চিন্তায় যেন ভুগছেন। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি যেন আওড়ান। অথচ রচনায় অর্থাৎ সনেটে তার কোন চিহ্ন নেই। মুসলিম সাহিত্য সমাজে কামালউদ্দিন খাঁও প্রবন্ধ পড়েছেন— তিনিও মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র। তখন চিন্তাশীল আর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। আজও বিচ্ছিন্নভাবে তাই করেন। এক সময় কবিতাও লিখতেন। এখন কবিতা লেখার ভার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী সুফিয়া কামালের হাতে। সাহিত্য সমাজের বয়োকনিষ্ঠ কর্মীদের অন্যতম ছিলেন শামসুল হুদা— বর্তমানে ঢাকা টিচারস্ ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক। কবিতা লিখতেন এবং যতদূর মনে হয় ভালোই লিখতেন। অনেকদিন লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। আবদুস্ সালাম খাঁ (প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী), নাজিরউদ্দীন আহমদ (অবসর প্রাপ্ত ডি. এম.) প্রমুখ ও সাহিত্য সমাজের সঙ্গে ছিলেন যুক্ত এবং সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে প্রবন্ধও পড়েছেন এঁরা। নাজিরউদ্দীন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন Anti-Purdah league বা পর্দা বিরোধী সঙ্ঘের কাজে। যতদূর মনে পড়ে তিনি ঐ সঙ্ঘের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। 'আল-মামুন ক্লাবের' সঙ্গেও নাজিরউদ্দীন সাক্ষাৎভাবে ছিলেন


www.pathagar.com

যুক্ত— ঐ ক্লাব প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন আবুল হোসেন সাহেব এবং প্রথম প্রতিষ্ঠা সভাতেই বোধ করি তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'আল-মামুন' প্রবন্ধটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। খুব সম্ভব এ ক্লাবেরও সম্পাদক ছিলেন নাজিরউদ্দীন। নাজিরউদ্দীন সে যুগের এক সেরা ছাত্র— ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রথম, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। ক্লাসে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আলী আহমদ (বর্তমানে রেভেনিউ বোর্ডের মেম্বার)— কিন্তু পরীক্ষায় নাজিরউদ্দীনকে কোন সময় হারাতে পারে নি, তবে চাকরির বেলায় দিয়েছে হারিয়ে! আলী আহমদ ছিল তখন একদম যাকে বলে গোবেচারি— হলে আমরা চট্টগ্রামের ছেলেরা দেশের অনুকরণে ওকে ডাকতাম 'আইল্যা-দা' বলে। দেখাদেখি অন্য ছেলেরাও তাই ডাকত। ও তখন এত সরল ছিল যে, আমরা বাজি ধরে ইচ্ছা করলে পাঁচ মিনিটে ওকে কাঁদাতে পারতাম। দিন রাত ঘ্যনর ঘ্যনর করে পড়ত— পড়ত গলা ফাটিয়ে। ফলে রুমের অন্যান্য বাসিন্দার সঙ্গে ঝগড়া তার লেগেই থাকত— শুধু চেঁচিয়ে পড়া আর সারা রাত ধরে বাতি জ্বালিয়ে রাখার জন্যই। না হয় অন্য সব ব্যাপারে সে ছিল নিরীহের চেয়েও নিরীহ। একবার দিনের বেলা ও যখন ঘুমিয়ে আমরা জনা চারেক মিলে মড়ার মতো তাকে খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে খাটিয়া শুদ্ধ তুলে অন্য রুমে রেখে এসেছিলাম। সে টেরও পায় নি। জেগে উঠে অবশ্য আমাদের উপর খুব চোটপাট করেছিল। তবে ও তখন এত দুর্বল আর ক্ষীণদেহ ছিল যে গায়ে হাত তুলতে সাহস করে নি।

শুনতে পাই আলী আহমদ সাহেব নাকি এখন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম সফল অফিসার— সামরিক শাসন আমলে ঢাকার ডি. এম. হিসেবেও তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন! তবে সফল অফিসারের নাম শুনলে আজকাল আমরা মনে মনে তেমন স্বস্তি বোধ করি না এ যা ভয়ের কথা। আমরা যেবার হলে ঢুকলাম সেবার মি: এ. জেড. রেজায় করিম ছিলেন হল য়ুনিয়নের ভাইসপ্রেসিডেন্ট। তিনি মানুষটি ছোট খাটো আর ছিলেন তখন খুব হ্যাংলা কিন্তু মুখে একটা কৌতুকের হাসি লেগে থাকত সব সময়। তিনি এমন এক চমৎকার ভংগীতে চমৎকার ইংরেজি বলতেন যে প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতোই শুনে থাকতে হত। বিতার্কিক হিসেবে তখন তাঁর খুব নাম ডাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতায়ও একাধিকবার দিয়েছেন যোগ। তিনি নাকি সে ছাত্রাবস্থাতেই প্রেমে পড়ে এক দু'তিন সন্তানবতীকে বিয়ে করেছিলেন— বক্তৃতা দিতে উঠে অনেক সময় একথাটা, হয়তো প্রেমের মহিমার দৃষ্টান্ত হিসেবেই রসিয়ে রসিয়ে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক হাসির সঙ্গে বলে যেতেন।

হলের পরবর্তী নির্বাচনের সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য রেজায় করিম সাহেব দাঁড় করালেন তাঁর দলের মি: সোলতানুদ্দীন আহমদকে। সোলতানুদ্দীন সাহেব ছিলেন তখন বক্তৃতা-ভীরু আর স্বল্পভাষী ; ছিলেন না ইংরেজি বলা কওয়ায় তেমন ছটফটে। বিপক্ষ দল থেকে দাঁড়ালেন বরিশালের মিঃ আজিজউদ্দীন আহমদ। তিনি ইংরেজির লোক বিভাগীয় অধ্যক্ষ রেন সাহেবের প্রিয় ছাত্র কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেছেন তৃতীয় শ্রেণী। এ জন্যে তাঁকে লেকচারার করে নিতে না পেরে রেন সাহেব নাকি খুব দুঃখ করেছিলেন। আজিজউদ্দীন সাহেবও খুব ভালো ইংরেজি বলতেন আর বলার ভংগীও ছিল চমৎকার। দেখতেও ছিলেন সুদর্শন, তবে রেজায় করিম সাহেবের মতো ছোটখাটো আর হ্যাংলা—


www.pathagar.com

হাঁটবার সময় কপালের লম্বা চুলগুলি প্রায় চোখের উপর এসে পড়ত। সকলের বিশ্বাস ছিল যোগ্যতম প্রার্থী হিসেবে এবার আজিজউদ্দীন সাহেবই ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন। কিন্তু রেজায় করিম সাহেবের সংগঠনী আর লোক পটানোর অসাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজিজউদ্দীন সাহেব আর তাঁর দল এঁটে উঠতে পারলেন না— আজিজউদ্দীন সাহেব গেলেন হেরে সামান্য মার্জিনে। নির্বাচনের পর হল ইউনিয়নের প্রথম সভা। নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট সোলতানউদ্দীন সাহেব বসেছেন সভাপতির আসনে। আইন পরিষদের মতো হল ইউনিয়নগুলিতেও প্রথমে সওয়াল-জবাবের জন্য কয়েক মিনিট সময় নির্দিষ্ট ছিল— আজও বোধ করি সে নিয়ম অব্যাহত। ভাইস প্রেসিডেন্টের দুর্বলতা জেনেই বোধ করি হঠাৎ পেছন দিক থেকে আজিজউদ্দীন সাহেব কি এক বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসলেন— সোলতানউদ্দীন সাহেব থতমত খেয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। সামলিয়ে নেয়ার আগেই আজিজউদ্দীন সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন : You have disgraced the chair of Muslim Hall Union বলে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন। পরবর্তী জীবনে সোলতানউদ্দীন সাহেব অল্পকালের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, আর পরে রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। আর আজিজউদ্দীন সাহেব হয়েছিলেন স্বল্পকালের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য। ব্যবসায়ে উভয়ে সফল আইনজীবী। সুনামে দুর্নামে রেজায় করিম সাহেবও কম কৃতী নন।

মুসলিম হলে ফজলুর রহমান সাহেবও আমাদের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর একটা পায়ে কিছুটা ত্রুটি আছে। তাই একটু খুঁড়িয়ে চলেন। বন্ধুরা ঠাট্টা করে তাঁকে তৈমুরলং বলত। তৈমুরলঙের সমান না হলেও পাকিস্তান-পূর্ব ও পরবর্তী রাজনীতিতে তিনি যথেষ্ট দিগ্বিজয়ের পরিচয় দিয়েছেন। দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন— ছাত্রাবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রায় সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় তিনি মুসলিম লীগ পার্লিয়ামেন্টারি পার্টির চিপ হুইপ ছিলেন— তখন কেউ কেউ তাঁকে 'মন্ত্রী নির্মাতা' বলেও অভিহিত করত। তাঁর বড় ভাই মুজিবর রহমান আমাদের সঙ্গে পড়তেন। তবে পাস করেছেন আমাদের অনেক পরে। শুনেছি তাঁকে পাস করার সুযোগ দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে রদবদলও নাকি ঘটাতে হয়েছিল। তখন অবশ্য তাঁর অনুজ বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিতে ঊর্ধ্বগামী। তাঁর মধ্যে কিন্তু কোন রাজনৈতিক উচ্চাশা দেখা যায় নি— পরেও বোধকরি তিনি যোগ দেন নি কোন রকম রাজনীতিতে। তিনি খেলাধুলা করে আর আড্ডা দিয়েই বেড়াতেন। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ বাহু মুজিবর রহমান বালিশযুদ্ধে (যাকে pillow fight বলা হয়) অনেক বালিশ ফাটিয়ে সারা মাঠময় তুলা উড়িয়ে দর্শকদের অট্টহাসির খোরাক জুগিয়েছিলেন।

আবদুস সালাম খাঁ একদিকে ভালো খেলোয়াড় আর অন্যদিকে সুদক্ষ বক্তা ছিলেন। একবার বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় তিনি একই সঙ্গে Set আর Extempore দুই প্রাইজই পেয়ে গিয়েছিলেন। আমরা যে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলাম সেবারই বোধ করি আলতাফ হোসেন (বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁরও সুন্দর ইংরেজি বলার আর বক্তৃতার খ্যাতি ছিল। তিনি বেশি বক্তৃতা দিতেন না কিন্তু যেটা দিতেন সেটা এমনভাবে দিতেন যে, সারা বছর ধরে চলত তার প্রশংসা। তাঁকে আমরা কয়েক মাসের জন্য লেকচারার হিসেবেও পেয়েছিলাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ একটা


www.pathagar.com

অলিখিত বিধান ছিল যে কেউ যদি কোন বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেত, প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দানের জন্যই বোধ করি, তাকে সঙ্গে সঙ্গেই সে বিষয়ে লেকচারার করে নেওয়া হত। মাঝখানে একবার আলতাফ হোসেন সাহেব বোধকরি মাস দু'য়েকের ছুটিতে গিয়েছিলেন। তখন অস্থায়ীভাবে এসেছিলেন মরহুম কাজী আকরম হোসেন। তিনি একবার শেলীর কি এক কবিতা পড়াতে পড়াতে মনে পড়ে চিত্তরঞ্জন দাশের 'সিন্ধু সংগীতে'র সঙ্গে তার তুলনা দিয়েছিলেন আর পাশাপাশি রেখে দুটি কবিতাই ক্লাসে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন তিনিও তরুণ, ক্লাসে আসতেন আসকান-পাজামা টুপি পরে। কি অদম্য উৎসাহ আর পরিশ্রম করেই এঁরা সেদিন পড়াতেন আর কি ভালোই না পড়াতেন!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার ছিলেন খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন। সেকালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট— ডেপুটেশনে এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। অমন সুযোগ্য রেজিস্ট্রার খুব কমই দেখা যায়। তাঁরও বোধ করি একটা পায়ে কিছুটা ত্রুটি ছিল— প্রায় যেন এক পায়ের উপর ভর দিয়েই হাঁটতেন। তাঁর অফিস ছিল যোগ্যতার আদর্শ। যেকোন চিঠি এলে সেদিনই তার উত্তর দিতে হত— তিনি যতদিন রেজিস্ট্রার ছিলেন এ নিয়মের ব্যতিক্রম শোনা যায় নি। চিঠি লিখে রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে তৃতীয় দিনেও উত্তর পায় নি এমন ঘটনা বিরল ছিল। বলা বাহুল্য ডাকের চিঠির কথাই বলা হচ্ছে। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কয়জন মুসলমান উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেমন প্রভোস্ট মি: এ. এফ. রহমান, রেজিস্ট্রার খান বাহাদুর নাজিরউদ্দীন আর লাইব্রেরিয়ান খান বাহাদুর ফখরউদ্দীন— এঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুধু যে বিশিষ্ট ছিলেন তা নয়, ব্যক্তিত্ব আর যোগ্যতায় এঁদের জুড়িও ছিল দুর্লভ। শেষোক্ত জন ছিলেন বিহারের লোক— পরে ফিরে গিয়েছিলেন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিভাগের চাকরিতে।

পূর্বে উল্লেখিত আবদুল হক ফরিদীর উদ্যোগে মুসলিম হলে সাময়িকভাবে দুটি ক্লাবেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর একটির নাম Eating Club অন্যটির Laughing Club-একটিতে চাঁদা দিয়ে খাওয়া অন্যটিতে বিনা চাঁদায় হাসা হত। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দু'য়েরই প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সাহিত্যের মতো স্বাস্থ্য বিষয়েও আবদুল হক যে অত্যন্ত সচেতন ছিল এ তারই পরিচায়ক। Laughing Club কোন স্থানকালে আবদ্ধ ছিল না যখন তখন যেখানে সেখানে রুমে, বারান্দায়, করিডরে, ডাইনিং হলে এমন কি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেও তার অধিবেশন বসতে পারত, বসতও. বসতো মানে তার একমাত্র কর্মসূচি হাসা হত। মাঝে মাঝে দুই ক্লাবের যুক্ত অধিবেশনও বসতো। তখন খাওয়ার সাথে হাসির হল্লায় অতবড় মুসলিম হলও কেঁপে উঠতো। বলার দরকার নেই এ দুই অস্থায়ী ক্লাবের স্থায়ী সভাপতিও ছিলেন স্বয়ং আবদুল হক। এ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা এত নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, এ পদের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানোর কথা আমরা ভাবতেই পারতাম না। তবে কি করে জানি না আমি একবার Laughing Club-এর সেক্রেটারি হয়ে পড়েছিলাম। মনে পড়ে ঐ বছরের হল ম্যাগাজিনে ঐ ক্লাবের একটা রিপোর্টও আমার নামে ছাপা হয়েছিল অর্থাৎ Hall activities-এর অঙ্গ হিসেবে একেও দেয়া হয়েছিল স্বীকৃতি। Eating Club এর রিপোর্ট কেন ছাপা হয় নি বলতে পারবো না। হয়তো ওটা কিছুটা বেশি বস্তুতান্ত্রিক বলে তেমন আমল পায়নি।

সুখের বিষয়, আজো আবদুল হকের খাওয়ার রুচি আর হাসির খ্যাতি অক্ষুণ্ন। ওর



www.pathagar.com

মতো অমন দিলখোলা হাসি হাসতে আজকের দিনে খুব কমই দেখা যায়। কেউ কেউ এজন্যে তাকে 'হাস্য-বিশারদ'ও বলতো।

## পঁচিশ

বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, জায়গা হচ্ছিল না সলিমউল্লাহ্ মুসলিম হলে। বর্ধমান হাউসে খোলা হল নতুন একটি শাখা। কার্জন হলের অদূরে, বর্তমানে যে বাড়িতে ব্রিটিশ কনসাল থাকেন ঐ বাড়িতেও সাময়িকভাবে খোলা হয়েছিল আর একটি শাখা। পরে ঐটি রূপান্তরিত হয় মেয়েদের হোস্টেলে। তখন ওটার নাম হয় 'চামেরি হাউস'। এ নাম কে দিয়েছিল বলতে পারব না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে চলেছিল— তাই দাবী উঠল ওদের থাকার জায়গার। তার ফল 'চামেরি হাউস'। মুসলমান মেয়েরা তখনো পর্দার বাইরে আসতে শুরু করেনি। এ নিয়ে আমরা তরুণ সাহিত্যিকদের মনে দুঃখও কম ছিল না। লিখতে চাই গল্প, উপন্যাস অথচ সমাজের অর্ধেক জীবনের সঙ্গে নেই আমাদের কোন সম্পর্ক। অন্তঃপুরকে বাদ দিয়ে গল্প উপন্যাস হয় কি করে? নারী বর্জিত নাটকের ফরমাশ আমরা শুনেছি। নারী বর্জিত গল্প উপন্যাস সে কঠোর অবরোধের দিনেও ছিল অকল্পনীয়। মুসলিম হলের সে ছাত্র জীবন থেকেই আমি কিছু কিছু গল্প লিখতে শুরু করি। গল্প লিখতে গিয়েই দেখি— আমার নিজের সমাজকেই আমি জানি না। বিশেষ করে সমাজের ঘরোয়া ও পারিবারিক জীবন। তাই কলম ছুটল সমাজের সংস্কারকে খোঁচা দেয়ার দিকে। আর এ খোঁচা দেয়া গল্পগুলি ছাপা হতো সওগাতে একটির পর একটি। আশ্চর্য, তখন কোন লেখাই আমার 'অমনোনীত' হতো না, হতো না প্রত্যাখ্যাত— অথচ এখন বয়স ষাট হওয়ার পরও আমার কোন কোন লেখা 'প্রত্যাখ্যাত' হয়ে থাকে। তখন যুগটাই ছিল উৎসাহ দেওয়ার— হয়তো উৎসাহিত হওয়ারও। নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের গুটিকয়েক পরিবারের সীমিত অভিজ্ঞতার স্বল্পপুঁজি নিয়ে ত গল্প-উপন্যাস লেখা চলে না। এ ধারণা কি করে তখন আমাদের প্রায় পেয়ে বসেছিল। তাই অবরোধের চীনের পাঁচিলে ফুটো করার জন্য আমরা কয়জন তরুণ প্রায় দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিলাম। আমি তো 'পর্দাপ্রথার সাহিত্যিক অসুবিধা' এ পীলে-চমকানো নাম দিয়ে এক দুর্দান্ত প্রবন্ধই লিখে ফেল্লাম আর সাড়ম্বরে তা পাঠ করলাম মুসলিম হলে— হল য়ুনিয়নের সাহিত্য শাখার এক অধিবেশনে। প্রবন্ধটা শুনে প্রগতিপন্থীরা খুশী হলেন বটে কিন্তু প্রাচীন পন্থীরা ধরে নিলেন, মুসলিম হলের প্রহ্লাদকূলে আমি দৈত্য বিশেষ। আমার উক্ত প্রবন্ধের মূল বক্তব্য— 'মুসলিম অন্তপুরকে আমরা জানতে পারছি না বলেই আমাদের দ্বারা সাহিত্য তথা সার্থক গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে না।' কথাটা হয়তো আংশিক সত্য তখন পূর্ণ সত্যের বিচার করার বয়স আমাদের নয়। আমরা তখন মনে আর কলমে বেপরওয়া। এ লেখাটি নওরোজে "মুসলমান কথা সাহিত্যের গতি" এ নামে ছাপা হয়েছিল। লেখাটি দেখতে পাওয়া যাবে আমার 'বিচিত্র কথা' নামক বইতে।

এ পরিবেশ আর আবহাওয়াতেই— 'পর্দা বিরোধী সংঘে'র জন্ম। তখন থেকে আমরা অবরোধের বিরুদ্ধে ছুঁড়তে লাগলাম মারণাস্ত্র। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ফজিলতুন্নেছা ছাড়া দ্বিতীয় কোন মুসলমান ছাত্রী ছিল না। কাজেই তিনিই ছিলেন আমাদের সামনে নারী প্রগতির একমাত্র প্রতীক। আজ যাদের কলরবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও অধ্যয়ন কক্ষ মুখরিত তারা


www.pathagar.com

কল্পনাও করতে পারবে না সেদিন ফজিলতুন্নেছা আর তাঁর অভিভাবকদের কি দুঃসাহসের পরিচয় দিতে হয়েছিল— কিভাবে অতিক্রম করতে হয়েছিল একটির পর একটি সামাজিক বাধা। কঠোর সব সংস্কার ও দেশাচারের বাধা ভেঙে বোরকা ছাড়া, প্রচলিত ঘোমটা ছাড়া সে যুগে একক একটি মুসলমান মেয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। নিন্দা কুৎসার কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে ফজিলতুন্নেছা যেভাবে সেদিন মুসলমান মেয়েদের সামনে উচ্চ শিক্ষার পথ খুলে দিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। মুসলিম নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর এ অবদান অসাধারণ ও ঐতিহাসিক।

ফজিলতুন্নেসা করটিয়ার এক অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে— বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়তে এসেছিলেন। বিষয় নিয়েছিলেন অঙ্ক শাস্ত্র। সেদিন এটাও কম বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। 'মুসলমানের মাথায় অঙ্ক জিনিসটা তেমন ঢোকে না'— এ রকম এক অদ্ভুত ধারণা মুসলমানদের মনেও কি করে যেন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। আমরা যারা মাদ্রাসা ফেরৎ তাদের কাছে তো অঙ্ক ছিল রীতিমতো ভীতিকর ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বিভাগে মুসলমান কোন অধ্যাপক তো ছিলই না— ছাত্রও এক আধজন ছিল কি-না সন্দেহ। এ অবস্থায় এক মুসলমান ছাত্রী এসে একেবারে এম. এ. ক্লাসেই পড়তে শুরু করে দিয়েছেন অঙ্ক! আর যখন এম. এ. ফাইনেল পরীক্ষায় তিনি পেয়ে গেলেন ফার্স্ট ক্লাস তখন বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে তা সৃষ্টি করল এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের, যে চাঞ্চল্যের ঢেউ প্রদেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদেরও মানস চেতনাকে করে তুলেছিল আলোড়িত।

আমরা 'আলমামুন ক্লাবের' সভা ডেকে ফজিলতুন্নেছাকে করলাম অভিনন্দিত। মনে পড়ে সে সভায় মরহুম ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন (খসরু) গান করে সভাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। আমাদের অভিনন্দনের উত্তরে ফজিলতুন্নেছা নাতিদীর্ঘ একটি লিখিত ভাষণ দিয়েছিলেন। 'মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' এ শিরোনামায় তাঁর উক্ত ভাষণটি ১৩৩৪-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সওগাতে' ছাপা হয়েছিল।

তাঁর বিলাত যাওয়া উপলক্ষে 'সওগাত' অফিসেও (১১ নং ওয়েলেসলি স্ট্রিট, কলিকাতা) তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বলা বাহুল্য, তখন সওগাত ছিল সব রকম প্রগতির মুখপত্র। সে সম্বর্ধনা সভায় সে যুগের কলকাতাবাসী মুসলিম কবি শিল্পী সাহিত্যিক সবাই ছিলেন উপস্থিত। স্বয়ং নজরুল ইসলাম এ উপলক্ষে গান রচনা করে সে গান নিজে গেয়ে সভাকে করে তুলেছিলেন আনন্দমুখর। ঐ গানটি কবির 'সঞ্চিতা'য় সংকলিত হয়েছে। তবুও তার প্রথম স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত করলাম :

জাগিলে "পারুল" কি গো "সাত ভাই চম্পা" ডাকে।
উদিলে চন্দ্র-লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে॥
চলিলে সাগর ঘুরে
অলকার মায়াপুরে
ফোটে ফুল নিত্য যথায়
জীবনের ফুল্ল-শাখে॥

জসীমউদ্দীনকে তো তখন প্রায় 'গেঁয়ো' বল্লেই চলে। সে জসীমউদ্দীনও এ উপলক্ষে এক দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। তাঁর কবিতার কয়েকটি চরণ :


www.pathagar.com

হে প্রভাতী তারা,
তুমি যে ঊষারে ডেকে আঁধারের কূলে আত্মহারা,
হয়ত সে রক্ত-নারী হাসিবে যখন
তাহার ল'হুর গাঙে তোমার জীবনখানি
হ'তে পারে কভু প্রয়োজন।
তবু হের, হে অগ্রচারিণী,
তোমার পশ্চাৎ পথ ধরি আসে যেন
দলে দলে নারী।

জসীমউদ্দীনের এ কবিতাটিও ছাপা হয়েছিল ১৩৩৫-এর আশ্বিন সংখ্যা মাসিক সওগাতে। বলা বাহুল্য, কবির আশা আর ফজিলতুন্নেছার অগ্র নায়িকার ভূমিকা কোনটাই ব্যর্থ হয়নি। ফজিলতুন্নেছার পেছনে পেছনে মুসলিম নারীরা যেভাবে দলে দলে উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে এসেছে— যাদের স্থান দিতে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিমশিম দশা তা দেখলেও বিস্মিত হতে হয়। সমাজ যে কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এ তারই পরিচয়। একটা মেয়ের জীবনে পরিবর্তন আসা মানে একটা পরিবারে পরিবর্তন ঘটা— সমস্ত পারিবারিক জীবনের দৃষ্টিভংগী বদলে যাওয়া।

তবুও একটা কথা বলতে হয় ফজিলতুন্নেছার কাছে যে নেতৃত্ব আমরা আশা করেছিলাম— যে আশায় আমরা তরুণ বুদ্ধিজীবীরা সেদিন উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম, ফজিলতুন্নেছা আমাদের সে আশা পূর্ণ করতে পারেন নি। সমাজ জীবনের অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম নারী জাগরণে এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূমিকা তিনি সহজেই গ্রহণ করতে পারতেন, সে দায়িত্ব পালনে তিনি এগিয়ে আসেন নি। হয়তো চাকরি জীবনই ছিল তার অন্তরায়। হয়তো তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি নিজেই ছিলেন না-ওয়াকিব। যেকোন ভূমিকা পালনের জন্য 'সচেতনতা' এক বড় কথা— সে সচেতনতার অভাব ঘটলে সুযোগ-সুবিধা, শক্তি-যোগ্যতা সব কিছুই অনেকটা অকেজো হয়ে পড়তে বাধ্য।

সাহিত্যের ব্যাপারে আমরা তখন বেশ কিছুটা বেপরওয়া। আমার এক বছর পরে আবদুল কাদিরও মুসলিম হলে এসে জুটেছিল। তার সঙ্গে আমার মন-মেজাজে অনেক গড়মিল তবুও সাহিত্যের ব্যাপারে কোথায় যেন মনের গভীরে একটা মিল ছিল, এক সুরে বাঁধা ছিল মনের ভাব। ফলে অল্পদিনে আমাদের জুটি প্রায় কায়েমী হয়ে পড়ে। আমরা তখন যেখানে সেখানে আর যা তা লিখতাম। কলকাতার সওগাতই ছিল আমাদের বাহন— ঢাকায়ও যেখানে যখন যে কাগজ বেরুত তার সঙ্গে আমরা জুটে পড়তাম। ঢাকা থেকে 'জাগরণ' বলেও ছোট্ট একটা মাসিক বেরুত। তাতেও আমাদের অনেক লেখা ছাপা হয়েছে। ঢাকার পল্লীগ্রাম থেকেও তখন 'সবুজপল্লী' আর 'বৈভব' নামেও দু'টি স্বল্পায়ু মাসিক বেরিয়েছিল। তাতেও আমরা লিখেছি। কোথায়, কখন কি কাগজ বের হচ্ছে তার সব খবরই ছিল আবদুল কাদিরের নখদর্পণে— আর কাগজের সম্পাদকরাও কি জানি কি করে তার সঙ্গে এসে জুটে যেত। লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে বসত তার ঘাড়ে। তার তাগাদায় পড়ে আমাকে অনেক লেখাই লিখতে হয়েছে। সুবিখ্যাত 'শূলসুধা' ঔষধের বিজ্ঞাপনী পত্রিকা ছিল 'মাসিক সঞ্চয়'।


www.pathagar.com

ওখানে ম্যানেজার হিসেবে আমাদের এক বন্ধু কাজ করতেন। তাঁকে কি করে হাত করে আবদুল কাদির সেই বিজ্ঞাপনী পত্রিকাটাকেই রাতারাতি সাহিত্যের পত্রিকায় করে ফেলেছিল রূপান্তরিত। প্রতি মাসে স্বনামে বেনামে ঐ পত্রিকায় আমাকেও অনেক লেখা লিখতে হয়েছে। সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে নানা টিপ্পনি কাটারও একটা রেওয়াজ ঐ পত্রিকায় আমরা চালু করেছিলাম। আবদুল কাদিরের টিপ্পনি কাটার শিরোনামা ছিল 'আর্টের আঁটনি' আর আমি লিখতাম 'সাহিত্য সংবাদ' এ শিরোনামায়, আর 'শমসের উল আজাদ' এ ছদ্ম নামে। সাহিত্য সংবাদের গোড়ায় এ উদ্ধৃতিটুকু ছাপা হত :

"— ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে।" (রবীন্দ্রনাথ)

মওলানা আকরম খাঁ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, মরহুম আবুল হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা এঁরা অনেকেই সেদিন আমাদের টিপ্পনির শিকার হয়েছিলেন। নমুনা হিসেবে দু'একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনি ১৩৩৬-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'মাসিক সঞ্চয়' থেকে উদ্ধৃত হলো :

১। 'সওগাতের' গল্প :

আশ্বিনের সওগাতের দুইটি গল্পের দুইটিতেই মদ আছে। একটিতে নায়িকা বেশ্যা, আর একটিতে নটী। সওগাত সম্পাদকের মনোবৃত্তি কোন দিকে— বুঝা গেল।

২। 'মোহাম্মদী'র বারোয়ারী :

এইবার হইতে মোহাম্মদীতে বারোয়ারী উপন্যাস বাহির হইবে— সংবাদটি সাহিত্য রসিকের পক্ষে যেমনি 'সু' তেমনি ভয়াবহ। লেখকদের নাম দেখিয়া শিল্পীপাঠক নিশ্চয়ই আউজুবিল্লাহ পড়িয়াছেন। এই বারোয়ারীর বিসমিল্লাহ করিবেন 'আপনাদের সুপরিচিত' মওলানা আকরম খাঁ। আমিন করিবেন সম্ভবত মওলানা আবুবকর, রুহুল আমিন, ইসলামাবাদী, হাঁ মনে পড়িয়াছে মওলানা নজির আহমদ। আচ্ছা মোহাম্মদী অফিসের সবাই মওলানা। এই হিন্দু মুসলমানে মিলনের দিনে নৃপেন বাবুই বা কি দোষ করিলেন? মওলানা নৃপেন চ্যাটার্জী কি খারাপ শোনায়?

৩। অন্যায় :

কার্তিকের মোহাম্মদীর পর্দা-সমস্যা প্রবন্ধের লেখক লিখিয়াছেন : 'বিধাতা নারীকে নারী এবং পুরুষকে পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।' বিধাতা বোকা ত!

৪। চুরির নূতন ঢং :

'গর্ভবতী' ও 'শ্যালিকার' কবি (ঠাট্টা করিয়া লিখি নাই, তাঁহার এই দুইটি কবিতা আমাদের বেশ ভালো লাগিয়াছে) গোলাম মোস্তফা সাহেবের কাণ্ড দেখিয়াছেন? ভাব চুরি করিতে হয় কর, শব্দ পর্যন্ত বেমালুম চুরি করিতে হয় কি— কোটেশন মার্কা দিলেও ভদ্রতা রক্ষা হইত। যাঁহার নিকট হইতে চুরি করিয়া বা ধার লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহাকেই কি বেশি করিয়া গালাগালি দিতে হয়? চুরি করিবার নূতন কায়দা বটে—


www.pathagar.com

'নিদমহলা—
গড়িব আমরা পুনঃ নব তাজ
নয়া জমানার।'

এই শব্দ ও ভাব কাহার নিকট হইতে হুবহু চুরি করা হইয়াছে এই কথা বাংলার পাঠক সাধারণ জানে। হায় নজরুল ইসলাম! অক্ষম অনুকারকের হস্তে রবীন্দ্রনাথের লাঞ্ছনার এক শেষ হইয়াছে— এইবার তোমার শুরু হইল!

৫। 'লেখক হওয়ার পথে' :

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবার আশ্বিনের 'দীপিকায়' নিজের সম্বন্ধে একটা সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন :—

'সত্য সত্যই প্রাণের ভিতর তেমন প্রেরণা আসে নাই। আমার লেখক হওয়ার খেয়াল একটা বিলাস মাত্র।'

এতদিনে বুঝিয়াছেন, তবু রক্ষা!!

যাঁদের খোঁচা দিয়েছি, কেটেছি যাঁদের নিয়ে কত না টিপ্পনি তাঁরা সবাই আমার শ্রদ্ধেয়। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে নেহাৎ তরুণ বয়সে যেসব কথা লিখেছি আজ তাঁরা সেসব কথা কিভাবে নেবেন জানি না। তবে তারুণ্যের ঝোঁকে বেপরওয়া কলম চালানো যে অনেকখানি শিংওঠা অবস্থারই সামিল এটুকু মনে রাখলে তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করতে পারবেন।

সূচনায় বলেছি ভালো ছাত্র কখনো ছিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেও ক্লাসের পড়াশোনায় মন লাগাতে পারি নি। ঘুরে বেড়াতাম এখানে ওখানে— পড়তাম এটা ওটা। রমনা থেকেও গিয়ে হাজির হতাম সদরঘাটের মুখে রামমোহন লাইব্রেরিতে, ব্যাপটিস্ট মিশন পাঠাগারে। বক্তৃতা শুনতাম পাদ্রীদের— বিনা পয়সায় একখানা করে Epiphany নামে খ্রিস্টীয় ধর্ম-পত্রিকা পাওয়া যেত, পড়ি বা না পড়ি নিয়ে আসতাম হাতে করে। রামমোহন লাইব্রেরির কম্পাউন্ডেই ছিল ব্রাহ্মমন্দির। প্রতি শনিবারে ওখানেও বক্তৃতা হত— বক্তৃতার আগে হত গান। আর গান করতেন মহিলারা। অতএব তাতে গিয়েও হাজির হতাম। অ-ব্রাহ্মদের প্রবেশে কোন বাধা ছিল না। কাজেই আমার মতো অনেক অ-ব্রাহ্মণই এসব সভায় যেতেন— অবশ্য অনেকে গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়তেন কেটে।

এবার বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে বসে আমি 'বাহাই ধর্ম' সম্বন্ধে অনেকগুলো বই পড়ে ফেলেছিলাম। তার ফলে লেখা হয়েছিল 'বাহাই ধর্ম' নামে এক প্রবন্ধ— বেশ দীর্ঘ প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি পড়া হয়েছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের এক সাধারণ অধিবেশনে। পরে ঐ প্রবন্ধ সুবিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিকে ছাপা হয়। প্রবন্ধটি দেখতে পাওয়া যাবে আমার প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ 'বিচিত্র কথায়'।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যখন আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু দিদারুল আলমের অকাল মৃত্যু ঘটে তখন আমরা উপরে উল্লেখিত 'মাসিক সঞ্চয়ে'র একটি বিশেষ দিদারুল সংখ্যা বের করেছিলাম। এ বিশেষ সংখ্যা বের করার সব কৃতিত্ব আবদুল কাদিরের। পরিকল্পনাটি প্রথম


www.pathagar.com

ঢোকে ওর মাথায়। আর লেখা সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে প্রেস থেকে পত্রিকা ছেপে বের হওয়া পর্যন্ত সব ঝুঁকি সে-ই বহন করেছে একা। তরুণ-প্রবীণ অনেক সাহিত্যিকের লেখা ঐ সংখ্যাটির গুরুত্ব ও সমৃদ্ধি বাড়িয়েছিল। এর আগে ও পরে আমাদের অনেক তরুণ ও প্রবীণ সাহিত্যিকের মৃত্যু ঘটেছে কিন্তু তখন পর্যন্ত আর কারো সম্বন্ধে কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বের হয়নি। মাসিক পত্রিকা হিসেবে 'প্রবাসীর' তখন খুব নাম-ডাক। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র যুক্তিপূর্ণ আলোচনারও খুব সুনাম তখন। বলা বাহুল্য, অন্যান্য পত্রিকার যেমন তেমনি 'প্রবাসী'রও নিয়মিত পাঠক ছিলাম আমি। মাঝে মাঝে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে বিরূপ সব মন্তব্য হত। এ রকম দু'একটি মন্তব্যের আমি জবাবও দিয়েছিলাম। আমার এরূপ এক জবাব বা প্রতিবাদ ১৩৩২ বাংলার মাঘ মাসের প্রবাসীতে 'স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়" এ নামে ছাপা হয়েছিল। আমার সেই প্রতিবাদ এভাবে শুরু হয়েছিল : "আশ্বিনের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্য দান' সম্বন্ধে আলোচনাকালে এক স্থানে লেখা হইয়াছে "শুনিলাম স্যার আবদুর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া এরূপ সব তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন যাহাতে কলিকাতাকে টাকা কম দিবার কারণ প্রদর্শন করা সহজ হইতে পারে কিম্বা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টাকা পাওয়াইবার সুবিধা হইতে পারে।" প্রবাসী সম্পাদকের এসব কথারই আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। বলা বাহুল্য, তখন স্যার আবদুর রহিম ছিলেন গভর্নরের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার আর শিক্ষা বিভাগ ছিল তাঁর জিম্মায়। প্রশংসার বিষয় প্রবাসী সম্পাদক তাঁর মন্তব্যসহ আমার দীর্ঘ প্রতিবাদ পত্রটি ছেপেছিলেন। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস দীর্ঘ ও বহু-ব্যাপক। আর দেশের পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে তার সংখ্যাতীত দলিল।

## ছাব্বিশ

আমি পাস কোর্সের ছাত্র। ১৯২৭-এ আমার বি. এ. পরীক্ষা। তখন জানুয়ারির শেষে কি ফেব্রুয়ারির শুরুতেই বি. এ. পরীক্ষা হত। পরীক্ষা পেছানো বা প্রশ্ন পত্র নিয়ে ছাত্র আন্দোলন তখনো দেখা দেয় নি। ছাত্ররা তখন শুধু রাজনৈতিক তথা স্বাধীনতা আন্দোলনেই যোগ দিত— তাও খুব সীমিত সংখ্যক। পরীক্ষার কিছুদিন আগে, বড়দিনের ছুটি হতেই হলের দুই বন্ধু হঠাৎ প্রস্তাব করে বসলো চলো হেঁটে চাটগাঁ ঘুরে আসা যাক। তার মধ্যে যুসুফ সিরাজউদ্দীনের বাড়ি আমার মতোই চাটগাঁয়, চাটগাঁ মাদ্রাসা থেকেই ও আমার সহপাঠী; ভালো ছাত্র আর খুব হিসেবী। হিসেব-নিকেশের যেকোন ব্যাপার আমরা নিশ্চিন্তে ওর হাতে ছেড়ে দিতাম। টাকার অঙ্ক যাই হোক, ও নির্ঘাত বাজেটের দুই প্রান্ত মিলিয়ে দিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে পারতো। ক্লাসের পরীক্ষায়ও অঙ্কে ও সব চেয়ে ভালো নম্বর পেতো বলে তার হিসেবের নির্ভুলতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনদিন কোন সন্দেহই জাগে নি। জেল বিভাগে চাকরি নিয়েছিল, যুদ্ধের ডামাডোলে কোনদিন যুদ্ধের চেহারা না দেখেই একদিন দেখি ও হয়ে বসেছে 'মেজর'। সরকারের সঙ্গে কি একটা খিটিমিটির ফলে শেষে চাকরিই দিয়েছে ছেড়ে— তবুও এখনো সে রীতিমতো মেজর যুসুফ সিরাজউদ্দীন। তার অনেক বালবাচ্চা— চাকরি না থাকলেও আজো সে তার


www.pathagar.com

সাংসারিক বাজেটের দুই প্রান্ত কি করে যে মিলিয়ে দিব্যি আরামে দোক্তা দিয়ে পান খেয়ে খেয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে তা ভাবলে আমার রীতিমতো অবাক লাগে। সাংসারিক বাজেটের ব্যাপারে আমাদের সব বুদ্ধি যেখানে আজ পরাজিত ও পর্যুদস্ত, সেখানে তার স্কুল জীবনের অভ্যস্ত হিসেবী বুদ্ধির যাদু আজো যেন রয়েছে অপরাজেয়। এ হেন য়ুসুফ সিরাজউদ্দীনের কাছ থেকে যখন হেঁটে চাটগাঁ যাওয়ার প্রস্তাব এলো তখন তা আর অস্বীকার করতে পারলাম না।

তখন ভূ-পর্যটনেরও একটা ধুয়া ছিল। প্রায় দেখতাম কাগজে এ না ও ভূপর্যটনে বেরিয়েছে এ খবর ছাপা হত। কারো কারো ছবি সমেত। কোন কোন ভূ-পর্যটকের বক্তৃতাও শুনেছি। এসব কারণেই বোধ করি আমরাও হেঁটে চাটগাঁ আসার প্রেরণা পেয়েছিলাম। ম্যাপ-টেপ দেখে য়ুসুফই রাস্তা-ঘাট আর নদ-নদীর হদিস জেনে নিলে। অঙ্কের মতো মানচিত্রেও আমার তেমন দক্ষতা ছিল না। মনে মনে য়ুসুফকে অনির্বাচিত নেতা মেনে নিয়ে একদিন সত্য সত্যই আমরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে চাটগাঁর উদ্দেশে নারায়ণগঞ্জের দিকে পাড়ি দিলাম। আমাদের অন্যতম সহযাত্রী মুহাম্মদ ইসহাক কাঁধে একটা বাচ্চা ক্যামেরাও ঝুলিয়ে নিয়েছিল। আমদের তিনজনকে এবার রীতিমতো অভিযাত্রীর মতোই দেখাতে লাগল। চাটগাঁ পৌছতে দিন চারেক বোধ হয় লেগেছিল— তখন গ্রাম দেশে অভাব অনটন এমন নিদারুণ হয়ে ওঠেনি। কাজেই যে বাড়িতেই রাত কাটাতে হয়েছে খোনে আমরা সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছি— দু'বেলা খাওয়ার খরচ লাগেনি কখনো। একলাগা অতখানি দীর্ঘ পর্যটনে আমরা অনভ্যস্ত। কুমিল্লা যখন পৌছেছি তখন পায়ে রীতিমতো ফোস্কা দেখা দিয়েছে। এক ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম— তিনি এক শিশি কি এক ঔষধ দিয়ে বল্লেন— শোয়ার সময় দু'পায়ে মালিশ করে শোবেন। দাম দিতে চাইলাম— তদ্রলোক নিলেন না। মনে হলো আমাদের এটুকু ভূ-পর্যটনকেও সামান্য এক শিশি ঔষধের দাম নিয়ে অমর্যাদা করতে চাইলেন না তিনি। মুসলমানদের তখন সবে মাত্র চোখ মেলে জেগে ওঠার সময়— এ জাগরণের প্রথম স্পন্দন স্বভাবতই ছাত্রদের করে তুলেছিল স্পন্দিত ও উদ্দীপিত। তখন সর্বত্র দেখা দিয়েছিল একটা প্রাণচাঞ্চল্য, আগ্রহ আর উৎসাহ। তিন তিনটা মুসলমান 'ভূ-পর্যটক' তাদের এ ক্ষুদ্র কুমিল্লা শহরে অবতীর্ণ হয়েছে শুনে স্থানীয় জেলা স্কুলের মুসলমান ছেলেরা এসে আমাদের নিয়ে গেলো তাদের হোস্টেলে। তখন ওখানে জেলা স্কুল ইন্সপেক্টার ছিলেন মিঃ এ, গণি, তাঁর বড় ছেলে এ, রশিদ তখন জেলা স্কুলের উপর দিকের ছাত্র। ভালো ছাত্র। খেলাধুলায়ও উৎসাহী। তিনি খবর পেয়ে খেলার মাঠ থেকে হাফপ্যান্ট পরা আর ঘর্মাক্ত দেহে ছুটে এসে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁদের বাসায়, পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর বাবার সাথে, খাওয়ালেন প্রচুর নাস্তাপানি। রশিদ এখন সিনিয়র সি.এস.পি.। বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে বর্তমানে বোধ করি প্রাদেশিক নির্বাচনী কমিশনার হিসেবে কাজ করছেন। পরবর্তী জীবনে, তাঁর ছোট ভাইদের অনেককে চাটগাঁয় আমি ছাত্র হিসেবে পেয়েছিলাম।

চাটগাঁ পৌছে আমরা কলেজিয়েট স্কুলের হোস্টেলেই আশ্রয় নিলাম। কলেজিয়েট স্কুল শহরের এক প্রান্তে ওখান থেকে আমার এভাবে পরীক্ষার মাঝখানে পড়াশোনা ছেড়ে ঢাকা


www.pathagar.com

থেকে চাটগাঁ আসার খবর বাবার কানে পৌঁছার সম্ভাবনা কম। এ ভেবেই আমরা আমাদের পরিচিত প্রাক্তন মাদ্রাসা হোস্টেলে যাই নি। আমার কাজী বাড়ি না যাওয়ারও এ কারণ। য়ুসুফ আর ইসহাক দিনের বেলায় দু'এক যায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। আমি কিন্তু যে একদিন এক রাত আমরা চাটগাঁয় ছিলাম তখন হোস্টেলের বাইরে একবার মুখও বাড়াই নি। তবুও কি করে পরে বাবা খবরটা শুনেছিলেন। কিন্তু ফাইনেল পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে যখন শেষ বারের মতো ঢাকা ছেড়ে বাড়ি আসি তখন মাঝখানের দু'মাসে সে খবর যেমন বাসি, বাবার রাগও তখন অনেকটা পানি। আর দিয়ে এসেছি বি, এ, পরীক্ষা। আমাদের মতো পরিবারে সেটাওতো কম কথা নয়। কাজেই কোন উচ্চবাচ্য হয় নি।

উচ্চবাচ্য কিছুটা উঠেছিল যখন পরীক্ষার ফল বের হলো আর আমি করে বসলাম ফেল্। পরীক্ষার সামান্য আগে ঢাকা থেকে হেঁটে চাটগাঁ আসার এ বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে আমি অনর্থক অনেক সময় নষ্ট করেছি এবং তার ফলেই পরীক্ষায় মেরেছি ফেল্ অভিভাবকদের এ অভিযোগের কোন সদুত্তরই আমার জানা ছিল না। কাজেই চুপ করে রইলাম। বাবা জানালেন তিনি আর পড়াতে পারবেন না, তাঁর তখন শেষ বয়স, টাকা পয়সার যোগাড় করতে পারলে তিনি হজ্ব করতে যাবেন। আর খুব দুঃখ করে সকলকে বুঝাতে লাগলেন, যে টাকা আমার পেছনে খরচ করা হয়েছে তা দিয়ে যদি তিনি দেশে জমাজমি কিনতেন তা হলে আমি এক ছেলে পায়ের উপর পা দিয়েই জীবন কাটাতে পারতাম। সোজা বলে দিলেন : যা হয় চাকরি একটা দেখো।

তখন আমাদের প্রাক্তন মাদ্রাসায় আই, এ, ক্লাস খোলা হয়েছে আর তার নাম হয়েছে চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট্ কলেজ। এখানে একজন লাইব্রেরিয়ান নেয়া হবে এ মর্মে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। মাইনে বোধ করি পঞ্চাশ টাকা থেকে শুরু। বিজ্ঞাপন দেখেই মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল— মনে হলো এতো আমার উপযুক্ত চাকরি, চারদিকে সারি সারি আলমারি ভরতি বই, তার মাঝে বসে বসে আমি ইচ্ছামতো টেনে নিয়ে যেকোন বই পড়ব, পড়তে পারব। বইর জন্য কারো কাছে দিতে হবে না ধন্না। আর অবসর মতো লিখব। লাইব্রেরিয়ানের চাকরিটাকে সেদিন আমার সত্য সত্যই খুব লোভনীয় মনে হয়েছিল। আর মাইনে? কি জানি কেন আমার মাথায় পঞ্চাশ টাকার অঙ্কটা কি করে যেন ঢুকে পড়েছিল। কখন এবং কি কারণে টাকার এ সংখ্যাটার প্রতি লোভ আমার মনে জেগেছিল তা বলতে পারবো না। একেবারে বালক কাল থেকেই আমি বহুকাল এ পঞ্চাশ টাকার স্বপ্ন দেখেছি। পঞ্চাশ টাকায় আমার চলে যাবে এ বিশ্বাস আমার মনে একরকম বদ্ধমূল ছিল তখন। লেখাপড়া করে সাধারণভাবে ঘর সংসার চালাতে পঞ্চাশ টাকার বেশি কেন লাগবে তা তখন আমার মাথায় ঢুকত না। এমন কি বি. এ. পড়ার সময়ও আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পঞ্চাশ টাকার সীমা ছাড়িয়ে যায় নি।

অতএব পঞ্চাশ টাকা মাইনের কথা শুনে আমি তো হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেলাম। আর চাকরিটা যে আমিই পাবো এবিষয়ে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহও জাগল না। কারণ, বিজ্ঞাপনে আছে আই. এ. পাস হলেই চলবে। আর যে গর্ভনিং বডি লোক নিয়োগ করবে তার সভ্যরা সবাই বাবাকে চেনেন, শ্রদ্ধাভক্তি করেন আর যে অধ্যক্ষের সুপারিশে লোক নেওয়া হবে আমি তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র। মনে হতে লাগল চাকরিটা যেন আমি


www.pathagar.com

পেয়েই গেছি— মাস পয়লার পঞ্চাশ টাকা যেন এখন থেকেই আগাম আমার পকেটে ঝন্‌ঝন্ করতে লাগল।

দরখাস্ত পাঠিয়ে অধ্যক্ষ খান বাহাদুর মূসা সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমার কথা শুনে বলে উঠলেন : তুমি কেন এ চাকরি নেবে? একবার ফেল করেছ কি হয়েছে। আবার পরীক্ষা দাও। পাস করে এলে এর থেকে কত ভালো চাকরি পেয়ে যাবে। আমি উঠে আসার সময় হয়তো সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই বল্লেন : দেখি কেমন সব দরখাস্ত পড়ে, যদি সম্ভব হয় চেষ্টা করে দেখব।

তাঁর কথায় আমি কিছুমাত্র নিরাশ না হয়ে বরং মনে একটা নতুন উৎসাহ নিয়ে ফিরে এলাম। আবার পরীক্ষা দেওয়ার কথাটা যে আমার মনে এর আগে জাগে নি তা নয়, কিন্তু বাবার স্পষ্ট জবাবে তা আর বাইরে প্রকাশ পেতে পারে নি। বাবা বুড়ো হয়েছেন আর তাঁর বহুদিনের সাধ একবার হজ্বে যাওয়ার, এও আমার অজানা ছিল না। তাই তাঁর উপর আমার খরচের চাপ আবার আর এক বছরের জন্য চাপাতে মনে একটা দ্বিধা ছিলই! আবার পরীক্ষা দেওয়ার কথাটা তাই মনে মনে এক রকম চেপেই রেখেছিলাম। মূসা সাহেবের কথায় তাতে এবার একটু জোর হাওয়া লাগল— আমার নতুন করে উৎসাহিত হওয়ার এ কারণ। এ চাকরিটা পাওয়া গেলে পরীক্ষা দেওয়াটা যে অধিকতর সহজ হবে তাও মনে আনাগোনা করতে লাগল। কারণ, পড়াশোনা তথা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির জন্য লাইব্রেরীর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কি হতে পারে? তাই গভর্ণিংবডির সভ্যদের বাসায় বাসায় আমিও গেলাম, বাবাও কারো কারো বাসায় গেলেন।

শেষে দেখা গেল গভর্ণিংবডি আমাকে দিয়েছেন দ্বিতীয় নমিনেশন। আর আমার পরিচিত একজন অনার্স গ্রেজুয়েটকে দিয়েছেন প্রথম নমিনেশন। চাকরিটা তিনিই পেলেন। যোগ্যতর প্রার্থীকে নেওয়া হয়েছে এতে দুঃখ করার কিছু নেই— দুঃখ কিছুটা হয়েছিল গাদা গাদা বই পুস্তকের মাঝখানে বসে অবাধে বই পড়ার একটা সুযোগ হাতের কাছে এসে ফস্‌কে গেল বলে।

এবার কেউ কেউ বাবাকে পরামর্শ দিলেন আমাকে দিয়ে সাব-রেজিস্ট্রারের জন্য দরখাস্ত দেওয়াতে। অন্যত্র বলেছি এটাও বাবার অন্যতম প্রিয় অথবা গ্রহণযোগ্য চাকরি। মাস্টারির পরই এটা তাঁর দ্বিতীয় পছন্দ। আর এও জানা ছিল সাব্-রেজিস্ট্রার হতে ম্যাট্রিক হলে চলে। জানাশোনা অনেক নামজাদা সাব্-রেজিস্ট্রারের ঐ ছিল নিম্নতম গুণ। অতএব দরখাস্ত একটা করা গেলো। তখন ঐ চাকরির প্রাথমিক নমিনেশন দেওয়ার মালিক ছিলেন এ. ডি. এম. (বর্তমানের এ. ডি. সি.) এ. ডি. এম. থেকে কমিশনার হয়ে ফাইল যেতো সরকারের। চূড়ান্ত নিয়োগের ভার সরকারের হাতে। ডেবিস্ নামে এক সাহেব ছিলেন তখন চাটগাঁর এ. ডি. এম। কার পরামর্শে জানি না, বাবা আমাকে নিয়ে একদিন ডেবিস্ সাহেবের বাংলোয় (এখনো এ, ডি, সি'রা সে একই বাংলোয় থাকেন) গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ডেবিস্ তাঁকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন জড়োসড়ো হয়ে, হাত বাড়াবেন কিনা যেন ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর চাকরি-জীবনে এমন চেহারার লোক বুঝি তাঁর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা করতে আসেননি— সুদীর্ঘ ঋজুদেহ, মুখভরা ধবধবে সাদা লম্বা দাড়ি, গায়ে আলখাল্লা, হাতে দীর্ঘ যষ্টি, পায়ে চটি। তাঁর বৈঠকখানার জানালা পথে দেখা যায় জুমা


www.pathagar.com

মসজিদের বড় বড় গুম্বজ। আমি ঐ পথে নির্দেশ করে বাবার পরিচয় দিলাম— তিনি ঐ মসজিদের ইমাম। ইমাম কথাটা বুঝবেন না মনে করে বল্লাম : Priest, leads prayer. তিনি যেন আরো জড়োসড়ো হয়ে পড়লেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বাবার চেহারার দিকে। পরক্ষণে দু'হাতে চেয়ার নির্দেশ করে বসতে ইংগিত করলেন। আমিই বুঝিয়ে দিলাম তাঁর আসার কারণ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বল্লেন : আমার যা করবার তা আমি করবো। জানালা পথে মসজিদের গুম্বুজের দিকে এক নজর তাকিয়ে ফের যোগ করলেন— ইমাম সাহেবের ছেলের চাকরি পাওয়া উচিত, আমি নমিনেশন দেব। বলে আমার নাম ধাম টুকে রাখলেন। বেশ কিছুকাল পরে এ ডেবিসকে এক আধ-পাগলা লোক ছুরি মেরে খুন করে ফেলেছিল। পরে জেনেছিলাম নমিনেশন ডেবিস সাহেব দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু গ্রাজুয়েট আর এম. এ. বহু প্রার্থী থাকায় কমিশনারের ওখানে ছাঁকুনিতে আমার নাম টিকেনি। অতএব এ চাকরিও ফসকে গেলো। বাকি থাকলো ফের পরীক্ষা দেওয়া। চাকরির চেষ্টায় দু'দু'বার ধাক্কা খেয়ে এবার বাবার মনও যেন কিছুটা নরম হলো— এদিকে পরীক্ষার দিনও আসছে ঘনিয়ে। ইউনিভার্সিটিতেও আর ভরতি হতে হবে না— পরীক্ষার ফি আর কয়েক মাস ঢাকায় গিয়ে থাকা খাওয়ার খরচ শুধু। বাবার সম্মতি আর প্রয়োজনীয় খরচ পাওয়া গেলো। ফেল আমি তো আর একা করিনি— ঢাকায় পৌঁছে আমার মতো এমন আরো অনেকের সঙ্গে হয়ে গেলো দেখা। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নই—· হলে জায়গা মিলবে না। তখন ঢাকায় খালি বাড়ি দেদার— দশ পনর টাকায় বেশ বড় বাড়ি পাওয়া যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুব দিকের মোড়ের কাছে অনেকগুলো দোকান। তার একটার উপরের তলায় বেশ বড় একটা ঘর আমরা পেয়ে গেলাম। সামনে খোলা বারান্দা। ওখানে দাঁড়িয়ে পূব দিকে স্টেশন অবধি, দক্ষিণ দিকে রেল লাইন ছাড়িয়ে দেওয়ান বাজারেরও কিছু অংশ আর উত্তরদিকে কার্জন হল থেকে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ পর্যন্ত সারি সারি সবুজ গাছ, এমনকি তখনকার ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজেরও (বর্তমান ঢাকা হাইকোর্ট) খানিকটা দেখা যেতো। আমরা ফেল করা জনা ছয় সাত মিলে রীতিমতো একটা মেস খুলে বসলাম ওখানে। তখন ঢাকায় ঝি বা মামার কোন অভাব ছিল না, ওরাই বাজার করতো, ওরাই রেঁধে খাওয়াতো। মাইনের চেয়েও বাজার করা আর মেসের বেঁচে-যাওয়া ভাত-তরকারিটার প্রতি ছিল ওদের লোভটা বেশি। এমন এক মামাকে নিয়ে আমি খুব ছোট্ট একটা গল্পও লিখেছিলাম। তখনকার ঢাকার 'জাগরণে' ছাপা হয়েছিল ওটা। ঐ গল্পটা আমার কোন গল্প সংকলনে স্থান পায়নি— তবে এ গল্পের পরিণতি আর পরবর্তী 'শরীফ' গল্পের পরিণতি একই।

আমাদের ঐ মেসটার একটা নামও দেওয়া হয়েছিল— রিয়ুনিয়ন (Re-union)। এ নাম কে দিয়েছিলেন তা আজ আর মনে নেই। খোলা বারান্দার দিকের লম্বা দেওয়ালটার বাইরের দিকের গায়ে কে একজন বেশ বড় বড় অক্ষরে খুঁদেও দিয়েছিল রি-য়ুনিয়ন নামটা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাওয়া আসার পথে বড় রাস্তা থেকেও এ নামটা দেখা যেত। স্বাধীনতা-যুদ্ধের অন্যতম বীর-যোদ্ধা রীফ-সরদার আবদুল করিমকে ফরাসী গভর্ণমেন্ট যে দ্বীপে নির্বাসন দিয়েছিল তারও নাম রি-য়ুনিয়ন। আমাদের মধ্যে যে-ই নামটা দিয়ে থাকুক তা যে ঐ প্রেরণারই ফল তাতে সন্দেহ নেই। রীফ সরদার আবদুল করিমের বীরত্ব কাহিনী তখন প্রায় কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছিল। ওঁকে লক্ষ্য করে নজরুলও


www.pathagar.com

এক দীর্ঘ ও বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা লিখেছেন। ক্ষুদ্র এক পার্বত্য অঞ্চলের এক বেঁটে খাটো লোক কি করে অতবড় দুর্ধর্ষ ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে অনবরত দিনের পর দিন লড়ে যাচ্ছে ঐ ছিল সে যুগের এক বড় বিস্ময়। এ মেসে বসে আমি অনেক ছোট গল্প লিখেছি— 'ইসলাম কী জয়', 'সংস্কারক', 'অনুক্ত কাহিনী' (বর্তমান নাম 'মা') ইত্যাদি গল্প যতদূর মনে পড়ে ওখানে বসেই লেখা। আমার প্রথম উপন্যাস 'চৌচিরের'ও প্রথম খসড়া ওখানেই শুরু। আমার ঐ যুগের সব লেখাই সওগাতে ছাপা হয়েছে আর তখন সওগাতে লেখা ছাপা মানে লেখক বলে স্বীকৃতি পাওয়া।

যাই হোক, সাহিত্য নিয়ে মেতে থাক্‌লেও, সবাইর সঙ্গে মিলে পরীক্ষার পড়াও নেহাত মন্দ হচ্ছিল না এবার। দেহ চর্চার দিকেও তখন আমরা কিছুটা মন দিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ইউনিভার্সিটি জিমনেসিয়ামেও যেতাম। শারীরিক উন্নতিটাকে আরো দ্রুত আর জোরদার করার জন্য আমরা কয়জন ছাতু খেতেও শুরু করেছিলাম। কিছুদিন বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে ভিজা ছোলাও খেয়েছি। আমাদের কারো তেমন কোন শারীরিক উন্নতি দেখা গেল না বটে তবে দেখলাম আমাদের সহপাঠী ও মেসের সহবাসী বরিশালের বেলায়ৎ আলী খাঁর বেঁটে শরীরটা একদম গোল হ'য়ে যাচ্ছে। আমরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে সে বলত : ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, বাড়ি গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তার ইংগিতের কারণ গতবার সে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর নির্ঘাত সে বি. এ. পাস করবে এ ভরসায় এক কন্যার পিতা নিজে গরজ করে তার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তার থেকেই জানতে পারলাম বৌটি তার তরুণী আর স্বাস্থ্যবতী। এ অবস্থায় তার কপালকে ঈর্ষা করে চুপ থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। আমরা ছেড়ে দিলেও সে অনেককাল ছাতু আর ছোলা চালিয়ে ছিল। শুনেছি আমি যা হতে পারি নি পরে ও তা অর্থাৎ সাব-রেজিস্ট্রার হয়েছে। এ অবশ্য ছোলা-ছাতুর গুণ নয়, বি. এ. পাসেরই ফল।

পরীক্ষা এবার আমারও মন্দ হলো না। যথা সময় আমিও বি. এ. পাস করে এবার রীতিমতো গ্রেজুয়েট হলাম। এ ১৯২৮-এর কথা।

## সাতাশ

বি. এ. পাস করার পর অনেকের যা হয়ে থাকে আমারও তাই হলো— দেখতে লাগলাম নতুন নতুন সব স্বপ্ন। শেষ কালে উকিল হওয়ার স্বপ্নই হয়ে দাঁড়াল সব স্বপ্নের সেরা। বি. এ. পাস করার আগে যে মনোভাব ছিল তা বদলে গেল রাতারাতি। আমাদের কৈশোর আর যৌবন-প্রারম্ভ কেটেছে অসহযোগ-খেলাফৎ আন্দোলনের আবহাওয়ায়— নজরুলের কবিতা আর গান জুগিয়েছে তাতে ইন্ধন। তখন সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে সব রকম সরকারি চাকরিকেই মনে করা হত 'গোলামি'— প্রকাশ্যেও অভিহিত করা হত তাই বলে। সরকারি অফিস আদালতের মতো সরকারি স্কুল-কলেজকেও বলা হত 'গোলাম খানা'।

দূর থেকে হলেও স্বাধীনতার কিছু কিছু হাওয়া আমাদেরও গায়ে এসে লেগেছিল— তাই 'স্বাধীন' পেশা'র একটা স্বপ্ন তখন থেকেই মনের অন্তরালে ছিল সুপ্ত। কিন্তু বি. এ. পাসের আগে তা প্রকাশের পায়নি কোন রকম পথ খুঁজে। এবার তা হয়ে উঠল অদম্য। তখন 'স্বাধীন


www.pathagar.com

পেশা' অর্থে আমরা বুঝতাম প্রধানত 'ওকালতি'— উকিল বা ব্যারিস্টার হওয়া। তখন কাগজ খুল্লেই যাঁদের নাম চোখে পড়তো— গান্ধী, জিন্না, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল ইত্যাদি সবাই ছিলেন আইনজীবী। ব্যারিস্টার হওয়া আমার পক্ষে স্বপ্নের বাইরে— সংকল্প করলাম বি. এল. পড়ে উকিলই হবো। বি. এল. পড়তে অসুবিধাও তেমন নেই, দিনের বেলায় ছোটখাটো একটা কিছু করে সন্ধ্যায় ল' ক্লাসে হাজিরা দিলেই হলো। তাই ল' পড়ার ইচ্ছা আমার মনে প্রায় দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। স্বপ্নে শুধু নয় জাগরণেও যেন বাড়ির সামনে নিজের নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড এখন থেকেই দেখতে লাগলাম।

ভয়ে ভয়ে আমার সংকল্পের কথা বাবার কানেও পৌঁছালাম। তিনি শুন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। প্রায় মারমুখো হয়েই বল্লেন : এ জন্যেই গোড়া থেকে আমি তোমার ইংরেজি পড়ার বিরোধী ছিলাম, সারাজীবন মিথ্যার ব্যবসায় করার জন্য তোমার পেছনে আমি এতগুলো টাকা খরচ করিনি। উকিল হলেই মিথ্যা বলতে হয়-এ ধারণা ছিল তাঁর মনে বদ্ধমূল। আমি চুপ করে আছি দেখে ফের যোগ করলেন : 'নিজের মক্কেলকে চোর-ডাকাত খুনি জেনেও যে উকিল শুধু টাকার লোভে তাকে সমর্থন করে থাকে, আমি তোমাকে তেমন উকিল বানাতে পারব না।' কিছুটা শান্ত হওয়ার পর বল্লেন : 'আমি চাই তুমি মাস্টার হও, শিক্ষার চেয়ে ভালো পেশা আর নেই। ইন্সপেক্টর সাহেবকে আমি বলেছি, তিনি তোমাকে মাস্টারি একটা দেবেন আর পরে বি. টি. পড়বার জন্যও ট্রেনিঙে পাঠাবেন বলেছেন।

স্বাধীন পেশার লোভ তখন আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, আমি বাবার কথা কানেই তুল্লাম না। বাবা তো শহরে থাকেন। বাড়ি গিয়ে মার যৎকিঞ্চিৎ পুঁজিপাটা হাৎড়িয়ে খোরাকির কিছু ধান বিক্রি করে, উকিল হওয়ার দুর্দমনীয় বাসনা বুকে নিয়ে একদিন আমি গোপনে সত্য সত্যই কলকাতার ট্রেনে চেপে বসলাম। কলকাতায় যে-কোন রকমের চাকরি একটা জুটিয়ে নেওয়া সহজ, রিপন কলেজের ল' ক্লাসে হাজিরার কড়াকড়িও নেই। গর-হাজির থেকে কলকাতার বাইরে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে গণ্ডগ্রামে চাকরি করেও অনেকে কলকাতায় ল' পড়ে এসব খবরও শোনা ছিল। পরিচিত ঢাকায় না গিয়ে ল' পড়তে অপরিচিত কলকাতায় আসার এটাই বড় কারণ। এ সঙ্গে সাহিত্যের দিকে আকর্ষণও থাকা অসম্ভব নয়। তখন আমরা যে সাহিত্য করতাম তারও কেন্দ্র ছিল কলকাতা।

এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় চাকরি করতেন, থাকতেন মাদ্রাসার কাছে তালতলার মোড়ে। কলকাতায় গিয়ে তাঁর ওখানেই আস্তানা গাড়লাম— মাদ্রাসার সামনে এক হোটেলে তিনিও খেতেন, আমিও খেতে লাগলাম। তখন তিন-চার আনায় বেশ ভালো খাওয়া হয়ে যেতো— সলাৎ তো ফ্রিই পাওয়া যেত। খুব গরম পড়লে হোটেলের বয় ছুটে গিয়ে এক পয়সার বরফ নিয়ে এসেও গ্লাসে ডুবিয়ে দিতো। পকেটে টাকা থাকতে থাকতেই রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ল' ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেলাম। পয়সা বাঁচবার জন্য অনেকদিন ওয়েলেসলী থেকে হেঁটেই ল' ক্লাস করতাম। পরে দেখলাম রোজ ক্লাসে যাওয়ার দরকারই পড়ে না— অনেকে মাসামাসিও ক্লাসে আসে না। পরিচিত কেউ একজন প্রক্সি দিলেই চলে। ল'র অধ্যাপকরা সবাই ত হাইকোর্টের উকিল-ব্যারিস্টার— হাইকোর্ট-ফেরত ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে তাঁরা আসেন ক্লাস করতে। এ অবস্থায় ছাত্রদের কে এলো না এলো এ নিয়ে মাথা ঘামাবার মন-মেজাজ


www.pathagar.com

থাকার কথা নয় তাঁদের। কাজেই একজনে পাঁচ-সাতজনের প্রক্সি দিলেও এ নিয়ে কেন আপত্তি উঠত না। শুনি এর মধ্যে অনেকেই পেশাদারী— নিয়মিত অনুপস্থিতের কাছ থেকে তারা রীতিমতো মাসোয়ারাও পেয়ে থাকে প্রক্সি দেওয়ার ফি হিসেবে।

আইনের ছাত্র হিসেবে প্রথম কার ক্লাস করেছিলাম তা আজ আর মনে নেই। তবে তাঁর প্রথম কথাটা আজো মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, অবশ্য ইংরেজিতে : 'মানুষের সবচেয়ে প্রিয়তম বস্তু হচ্ছে প্রাণ আর সম্পত্তি, এ দু'য়ের রক্ষার দায়িত্ব আইন ব্যবসায়িদের— এ দু'য়ের ব্যাপারে মানুষ জাতধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিচার করে না।' কথাগুলো সত্য বলেই হয়তো আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল সেদিন। আইন ব্যবসায় সম্বন্ধে মনে যে দ্বিধা ছিল মুহূর্তে তা কেটে গেল এবার।

আইন পড়ার অদম্য আগ্রহ নিয়ে যখন সামান্য মাত্র পুঁজি নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসি তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল একমাত্র পুত্রের জেদের কাছে বৃদ্ধ পিতা নিশ্চয়ই এবারও নতি স্বীকার করবেন— অন্যান্য বারের মতো অনিচ্ছায় হলেও আমার এ একগুঁয়েমিটা তিনি মেনে নেবেনই। কিন্তু পরে দেখা গেল কিছুতেই তিনি নোয়ালেন না— নিলেন না আমার কোন খবরও। আমার দুরবস্থার কথা জানিয়ে মাফ চেয়ে, অনুনয় বিনয় করে অনেক চিঠি লিখলাম। কোন উত্তরই দিলেন না তিনি। প্রায় সাত আট মাস বোধ হয় ল'কলেজের খাতায় আমার নাম ছিল, এ কয়মাস এখানে ওখানে চাকরি করে, এর ওর বাসায় থেকে, জায়গীর আর টিউশনি করেই কোন রকমে কাটালাম। প্রথম যেখানে উঠেছিলাম সেখান থেকে ১১নং ওয়েলেসলি স্ট্রীট— 'সওগাত' অফিস খুব কাছেই আর ঐ অফিসে লেখক হিসেবে আমি তো স্ব-নামেই পরিচিত। ফলে আড্ডা দেওয়ার আর তখনকার লেখকদের সঙ্গে জানাশোনার খুব সুবিধা হয়ে গেল। ওখানেই পরিচিত হলাম মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ আর খান মঈনউদ্দীনের সঙ্গে— হবীবউল্লাহ বাহারের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল ; তবে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার সুযোগ মিল্‌লো সওগাতের আড্ডায়। পাশেই ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মওলানা আজাদ কলেজ)— ফজলুর রহমান তখন ওখানে ছাত্র, মাঝে মাঝে লিখতেন কবিতা, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ওঁর কবিতার ছিলেন খুব ভক্ত। তিনিও আসতেন, পরে ফজলুর রহমান 'দীওয়ানে জেবুন্নেসার' অনুবাদ করেছেন, রাজনীতিতে হয়ে পড়েছেন গোঁড়া কংগ্রেস-পন্থী। বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ মন্ত্রিসভার তিনি অন্যতম সদস্য। নদীয়ার অধিবাসী, ল' পাস করে কৃষ্ণনগরেই শুরু করেছিলেন আইন ব্যবসায়। পরে আমি যখন কৃষ্ণনগর কলেজে চাকরি করতে যাই তখন তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা আরো বেড়ে উঠেছিল।

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহেব তখন যৌবন মধ্যাহ্নে— সদা-হাস্যময়, সুদর্শন নাসিরউদ্দীন সাহেব ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। আমরা লেখকরা তাঁর কাজের মাঝখানে ঢুকে পড়লেও রোজই একই হাসি মুখে তিনি বলে উঠতেন : আসুন, আসুন, বসুন। এর ব্যতিক্রম কোনদিন দেখিনি। সম্পাদকদের মধ্যে নাসিরউদ্দীন সাহেব ছিলেন আওয়ামী মেজাজের মানুষ, সকলের প্রতিই ছিল তাঁর দিল-দরিয়া ভাব। তাঁর এমন মেজাজের জন্যই সওগাত অফিস সহজে হয়ে উঠেছিল সে যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের এক বড় আড্ডা— বলা বাহুল্য, ঐ আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন


www.pathagar.com

নজরুল। ছোট বড়, নবীন প্রবীণ, দক্ষিণ আর বামপন্থী সে যুগে এমন মুসলমান সাহিত্যিক কেউই ছিল না যে অন্তত এক আধবারের জন্যও ঐ আড্ডায় ঢুঁ মারেন নি। শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফার সঙ্গেও আমার ওখানেই প্রথম পরিচয়।

বহু উত্থান-পতনের ভিতর দিয়েই নাসিরউদ্দীন সাহেব মানুষ— সওগাতকে কেন্দ্র করে তিনি বড় হয়েছেন বটে কিন্তু সওগাতের জন্য ক্ষতি স্বীকারও তিনি কম করেন নি। তবে পরাজয় স্বীকার করেন নি কোনদিন। সে যুগের বহু নবীন লেখকই সাহিত্যের আসরে ঠাঁই পেয়েছেন স্রেফ সওগাতের পৃষ্ঠ-পোষকতার ফলেই। নাসিরউদ্দীন সাহেব নিজে খুব কম লিখতেন, তবে বুঝতে পারতেন, যে কোন লেখার মান আর মূল্য। মুদ্রণ শিল্পে সে যুগে মুসলমানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে পারদর্শী। মুসলমান সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় প্রচুর আর দরাজ হস্তে ছবি ছাপার প্রচলনও তিনিই করেন সর্বপ্রথম— বহু চিত্রশোভিত বড় আকারের 'বার্ষিকী' বের করারও তিনিই পথ প্রদর্শক। 'বার্ষিক সওগাত' আর 'মহিলা সংখ্যা সওগাত' শুধু চিত্র সম্ভারের জন্যই ছিল লোভনীয়। সচিত্র 'সাপ্তাহিক সওগাত' বের করে ঐ ধরনের সুশোভিত উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিকী বের করারও পথ দেখিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সম্পাদিত সচিত্র 'শিশু সওগাত'ও ছিল খুব আকর্ষণীয়। হয়ত সমাজ বিভিন্ন ধরনের এতো সব উচ্চাঙ্গ পত্র-পত্রিকা হজম করার অবস্থায় তখনো পৌঁছেনি বলে 'মাসিক সওগাত' ছাড়া আর সবই অকালে পেয়েছে অক্কা। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাংবাদিক আর লেখকের সমস্যাও তখন কম ছিল না। তবুও এ সব ক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব নাসিরউদ্দীন সাহেবের, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ল' ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, বাড়ির সঙ্গে নেই সম্পর্ক— এদিকে পকেট শূন্য। 'সওগাত' অফিসে দু'একবার চাকরির উমেদারি করলাম। লোকের প্রয়োজন ছিল না বলেই বোধ করি প্রথম দিকে তেমন কোন সাড়া মিল্লো না। বি. এ. পাস করলেও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমি তো একদম আনাড়ি— গল্প লেখা আর সাংবাদিকতা তো আলাদা ব্যাপার। কাজেই ওঁদের উৎসাহিত না হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা— রোজই একবার করে সওগাত অফিসে হাজিরা দিই। বসে বসে গল্প করি আর নাসিরউদ্দীন সাহেবের খরচে 'সিংগল চা' ধ্বংস করি। তখন সওগাত অফিসের সিংগল চা'র খুব নাম-ডাক। নাসিরউদ্দীন সাহেব শুধু যে 'সিংগল' চা খাওয়াতেন তা নয়, পান-সিগারেটও বাদ যেত না, মাঝে মাঝে 'গোস্-পরটা'ও আসতো, কোন কোন দিন সিনেমায়ও নিয়ে যেতেন সদলবলে।

তখন মাসিক আর সাপ্তাহিকের সম্পাদনার যাবতীয় কাজ দেখা-শোনা করতেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। একদিন তাঁর মনে বোধ করি আমার জন্য কিছুটা দয়ার সঞ্চার হলো। এর আগে নাসিরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে তিনি আমার সম্পর্কে কিছু আলাপ করে নিয়েছেন কিনা জানি না, সেদিন আমাকে দেখেই বল্লেন : বসুন। 'দি মুসলমান' পত্রিকার একটা সংখ্যা এগিয়ে দিয়ে তার একটা কলাম নির্দেশ করে বল্লেন : এটা অনুবাদ করেন দেখি। ওখানে তাঁর সামনে বসেই আমি অনুবাদটা করে ফেল্লাম। তিনি দেখে দু'এক জায়গায় দু'একটা লাল কালির দাগ যেন দিলেন। পরে অবশ্য হেসে বল্লেন : চলবে। দু'চার দিন করলেই ঠিক হয়ে যাবে।


www.pathagar.com

এবার চাকরি আমার হলো। মাইনে কত তা বলতে পারব না। সংখ্যাটা আমি নিজেও কোনদিন শুনেছি বলে মনে হয় না। নাসিরউদ্দীন সাহেব এ ব্যাপারে— প্রবীণদের কথা বলতে পারব না নবীনদের কাছে তিনি কোন রকম কমিটই করতেন না, কমিট করবার জন্য আমাদেরও কোন মাথাব্যথা ছিল না— পেট চল্লেই হলো। মনে হয় সাহিত্যিকরা যে নেহাৎ অপরিণামদর্শী আর অত্যন্ত অমিতব্যয়ী তা তিনি ভালো করেই জানতেন। তাই কখনো তিনি আমাদেরে এক সঙ্গে এক টাকা দু'টাকার বেশি দিতেন না। পরিবার নিয়ে যাঁরা থাকতেন তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা।

ওয়াজেদ আলী সাহেবের কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরদিন যখন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় সওগাত অফিসে উঠছি তখন দেখি সুগঠিত দেহ, শ্যামবর্ণ আর মাথায় ঘন চুল এক তরুণ আমাকে পাশ কাটিয়ে গম্ভীর মুখে নেমে যাচ্ছে!

উপরে উঠে এসে ফরাসে বসতে বসতেই ওয়াজেদ আলী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম : এ মাত্র যিনি নেমে গেলেন তিনি কে?

ওয়াজেদ আলী সাহেব কিছুটা রোগাটে আর খিটখিটে মেজাজী ছিলেন। কোন রকম রোগ না থাকলেও তিনি মনে করতেন তিনি অসুস্থ। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তাচ্ছিল্যের ভংগীতে কলমশুদ্ধ হাতটা আকাশের দিকে তুলে বল্লেন : প্রেমেন্দ্র মিত্র, আপনার চাকরি হল বলেই ওর চাকরি খতম হলো।

শুনে মনটা একদম বিগড়ে গেলো। সে যুগেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কত লেখাই ত পড়েছি। আজ আমিই কিনা তাঁর কর্মচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ালাম। শুনেছি কাকও কাকের মাংস খায় না— লেখক হয়ে আমি একটা লেখকের চাকরি খেলাম। অনেকক্ষণ মন-মেজাজ খারাপ হয়ে রইলো— কিন্তু চিরকালই পেটের কাছে মন হার মেনে এসেছে। এবারও হার মানলো। এ সব ব্যাপারে যুক্তির অভাব কোন কালেই হয় না : প্রেমেন্দ্র মিত্রের ত অনেক চাকরি, আমার তো শুধু এ একটি। পুরোনো কথাটা আমার নিজের মনই বেঁকিয়ে নিলে : My necessity is greater than thine। এ শান্তি বারি ছিটিয়ে মনকে ঘুম পাড়ালাম। প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন সওগাত, বাংলার কথা, Forward ইত্যাদি বহু কাগজে ঘণ্টা হিসেবে কাজ করতেন— পেতেন কোথাও পনর, কোথাও বিশ কোথাও বা পঁচিশ। সওগাতে বোধ হয় পনরই পেতেন। বেশির ভাগ অনুবাদের কাজই করতেন। বিকেলে আমরা আড্ডা দিতে আসার আগেই তিনি তাঁর সওগাতের ডিউটি শেষ করে অন্য কাগজে চলে যেতেন বলে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নি। ঐ সময়ের সওগাতে 'মখফী' ছদ্ম নামে যে লেখাগুলো ছাপা হয়েছে, শুনেছি তা প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই লেখা, বলা বাহুল্য, 'মখফী' আওরেঙ্গজেব দুহিতা বিদুষী জেবুন্নেসারই ছদ্ম নাম। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেখান থেকেই নিয়েছিলেন এ নাম।

এর কয়েক মাস পরেই বকর-ঈদ। তার আগের দিন হঠাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্র সওগাতের আড্ডায় এসে বলে বসলেন : আমার গোমাংস খেয়ে দেখার খুব ইচ্ছা, আমাদের সমাজে তো তার উপায় নেই। আমি কাল এসে আপনাদের সঙ্গে বসে গোমাংস খেয়ে যাব। সে সঙ্গে একথাটিও যোগ করেছিলেন : আমি যদি আগে বিয়ে করে না বসতাম তা হলে নিশ্চয়ই আমি একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করতাম। বস্তির হলেও আমার আপত্তি


www.pathagar.com

নেই। পারস্পরিক বিয়ে আর এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের মিলন হতেই পারে না ইত্যাদি।

পরদিন সওগাত অফিসে নানাভাবে রান্না করা প্লেট ভর্তি গরুর গোস্ত আর পরটা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করে রইলাম ব্রাহ্মণ সন্তান প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতীক্ষায়। কিন্তু দিনভর তাঁর টিকিটিও দেখা গেল না। অগত্যা আমরাই গো-জাতির প্রতি আমাদের যা কিছু শ্রদ্ধা ভক্তি তা দক্ষিণ হস্ত আর রসনার সাহায্যে নিবেদন করতে লাগলাম। আসলে সংস্কার মরেও মরে না— অনেক সৎসংকল্পও এ সংস্কারের চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যেতে দেখা যায়। একবার এক হিন্দু বন্ধুর বাড়ি মুরগি খেয়ে আমার তো ভয়ানক পেটের অসুখ হয়ে পড়েছিল— অসুখটা রান্নার দোষে ঘটেছিল, না মুরগিটা জবাই করা হয়নি এ চিন্তাটা মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে খেতে পেটেও গোলমাল বাধিয়ে বসেছিল, তা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। মোল্লা-মৌলবী ঘরের ছেলে, জবাই সম্বন্ধে অবচেতন মনে একটা বদ্ধমূল সংস্কার থাকা বিচিত্র নয়। সে যুগের অত্যাধুনিক প্রেমেন্দ্র মিত্রও হয়তো শেষ পর্যন্ত পিতৃ-পুরুষের সংস্কারটা জয় করতে পারেন নি কিছুতেই। তাঁর অমন সৎসংকল্পটা বানচাল হয়ে যাওয়ার ঐ হয়তো কারণ।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি আর খুব সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন— আর তখন ছিলেন মনে প্রাণে জাতীয়তাবাদী, পরতেন সব সময় খদ্দর। খুব সম্ভব এঁরা কয়জনে মেস করে ৭ নং স্বর্ণময়ী রোডের এক তেতালা কি চৌতালায় থাকতেন— জনাব আয়নুল হক খাঁও থাকতেন ওখানে। আয়নুল হক খাঁ সাহিত্যিক ছিলেন না কিন্তু সাহিত্যিকদের ছিলেন অকৃত্রিম সুহৃদ। স্বর্ণময়ী রোডের ঐ মেসেও আড্ডা দিয়ে আমরা অনেক রাত কাটিয়ে দিয়েছি। একবার হঠাৎ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে ওয়াজেদ আলী সাহেব চীৎকার দিয়ে বলে উঠলেন— ঐ কোনায় এ মাত্র একটা ছোট সাপ কিলবিল করতে দেখলাম। ঘরে যে কয়খানা তক্তপোষ ছিল তাতে বসে ঘরভর্তি লোক আমরা তর্কের তুফান ছুটিয়েছি বটে কিন্তু চোখ তো রয়েছে আমাদের খোলা। আমরা কেউ সাঁপ দেখা দূরে থাক— সরু সিঁড়ি বেয়ে তেতালা চৌতালায় সাপ যে আদৌ আসতে পারে এ কথাই আমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারলাম না। অসম্ভব, দিনদুপুরে ভূত দেখা গেলেও যেতে পারে কিন্তু কলকাতার তেতালা চৌতালায় সাপ কিছুতেই দেখা যেতে পারে না— আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠের এসব প্রতিবাদের দিকে ওয়াজেদ মিয়া কানই দিলেন না— তাঁর তক্তপোষ সংলগ্ন টেবিলের উপর লাইন টানার কার যেন একটা রোলার ছিল অদৃশ্য সাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেটাই তুলে নিয়ে তিনি তক্তপোষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন— সাপটা মারা না হলে তিনি কিছুতেই তক্তপোষ থেকে নামবেন না।

অগত্যা টেবিল-চেয়ার, বিছানা-পত্র, বাক্স-তোরঙ্গ, পুরোনো খবরের কাগজের গাদা যেখানে যা ছিল সব ওলট-পালট্ আর তন্ন তন্ন করে সাপটাকে খোঁজা হলো, সাপ দূরে থাক একটা বেঙ, বিচ্ছুও খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও। তাঁকে কোনো রকমে আল্‌তোভাবে উঠিয়ে বারান্দায় নিয়ে এসে এবার তাঁর নিজের বিছানাপত্র আর তক্তপোষটাও উল্টে পাল্‌টে দেখা হল। আমরা উপস্থিত পাঁচ সাতটা প্রাণী কাল্পনিক এক সাপের পেছনে ব্যর্থ অভিযান চালিয়ে হয়রান হয়ে গেলাম, তবুও তাঁর চেহারা দেখে মনে


www.pathagar.com

হলো না তিনি পুরোপুরি নিঃশঙ্ক হতে পেরেছেন!

আমার বিশ্বাস তাঁর অসুখটাও ছিল এমনি কাল্পনিক। এ অসুখের দোহাই দিয়ে তিনি প্রায় ঘন ঘন বাড়ি চলে যেতেন। আর কিছুকাল পরেপরেই তাঁর বাড়ি সাতক্ষীরা থেকে আসা পোস্টকার্ডটা বাঁ হাতে তুলে ধরে আমাদের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বলে উঠতেন : দেখেছ গিন্নির কাণ্ড। চোখে কিন্তু তাঁর খুশির ঝিলিক।

: আপনি অত ঘন ঘন বাড়ি যান কেন? ধমক দেয়ার সুযোগটা আমরাও ব্যবহার না করে ছাড়ি না।

: তোমরা সব ছেলে মানুষ অতসব বুঝবে না।

কি করি আমরাও না বোঝার ভান করে শুধু সিংগল চা'র সঙ্গে গোস্-পরাটার দাবীটুকু জানিয়েই চুপ মেরে যেতাম।

: আগে বাড়ি থেকে আসি।

: আবার বাড়ি! আমরা বিস্ময়ে ফেটে পড়ি।

: ছেলেকে দেখতে হবে না? তোমরা সব ছেলেমানুষ এসব বুঝবে না। হাসি-খুশিতে তাঁর চোখমুখ তখন আরো উদ্ভাসিত।

অতএব ছেলেকে দেখার জন্য তিনি আবার সাতক্ষীরা রওয়ানা দিলেন। তাঁর এ রকম এক দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আমাকে প্রায় দু'মাস ধরে সাপ্তাহিক সওগাতের সম্পাদকীয় লিখতে হয়েছিল। তরুণ বয়সের আবেগ দিয়ে লিখতাম বলে আমার সম্পাদকীয় অনেকে নাকি পছন্দ করতেন। বিশেষত তরুণ পাঠকরা। বলা বাহুল্য, তখন সমাজেরও আবেগের যুগ, আবেগ জাগিয়ে তোলার সময়।

তখন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় বড় দিন উপলক্ষে উৎসবের ধুম লেগে যেত— দিল্লী থেকে আসতেন ভাইসরয়, সারা ভারত ছেঁকে রাজ-রাজড়া এসেও জুটতেন, নানাভাবে উৎসব মুখর হয়ে উঠতো কলকাতা। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরও এলেন কলকাতা। হায়দ্রাবাদকে তখন স্বাধীন 'মুসলিম রাজ্য' মনে করা হত আর মনে করা হত মুসলিম সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। ওখানকার ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম উর্দুকে করা হয়েছে উচ্চ শিক্ষার বাহন। এসব কারণে হায়দ্রাবাদের নিজামকে মুসলমানেরা একটা আলাদা শ্রদ্ধার চোখে দেখত। কথা উঠলো নিজামের কলকাতা আগমন উপলক্ষে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে সাপ্তাহিক সওগাতে লিখতে হবে সম্পাদকীয়। ওয়াজেদ আলী সাহেব উপস্থিত আছেন, নাসিরউদ্দীন সাহেবও, সম্ভবত আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবও। ওয়াজেদ মিয়াই বল্লেন : এ সম্পাদকীয়টা আবুল ফজলই লিখুক, ও যথেষ্ট আবেগ দিয়ে লিখতে পারবে। অন্যরাও তাতে সায় দিলেন। অগত্যা আমাকে লিখতেই হল ঐ সংখ্যার সম্পাদকীয়। ১৯২৮-এর ২৮ ডিসেম্বর সংখ্যায় সাপ্তাহিক সওগাতে নিজামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতিসহ 'স্বাগতম রাজ অতিথি' এ শিরোনামায় আমার সে সম্পাদকীয় ছাপা হল। যে কয়মাস সওগাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই কিছু না কিছু লিখতে হতো আমাকে, করতে হতো অনুবাদ আর এটা ওটা টুকি টাকি কাজ। আমার লেখা দু' একটি গল্পও ছাপা হয়েছে সাপ্তাহিক সওগাতে।


www.pathagar.com

সওগাত অফিসে তখন সব সময় গুড়্গুড় করে ঘুরে বেড়াতো নাসিরউদ্দীন সাহেবের একমাত্র মেয়ে নুরু (বর্তমানে 'বেগম' সম্পাদিকা)— ফ্রক পরা এ ফুট ফুটে ছোট্ট মেয়েটিই ছিল তখন সওগাত মজলিসে আমাদের আনন্দের এক বড় উৎস। অফিসের পেছনেই নাসিরউদ্দীন সাহেব সপরিবারে থাকতেন— তাই নুরু যখন তখন বেরিয়ে এসে আমাদের ব্যস্ততার মাঝখানেও একটা খুশীর হাওয়া বইয়ে দিতো। পরে মাঝে মাঝে সুফিয়া এন. হোসেনও (বর্তমানে সুফিয়া কামাল) আসতেন। তখনো তিনি পর্দার বাইরে এসে দাঁড়ান নি। সওগাত অফিস থেকে বিলাত গমনোপলক্ষে ফজিলতুন্নেসাকে যে সংবর্ধনা জানানো হয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে— খুব সম্ভব এ সংবর্ধনা সভাতেই সুফিয়া কামালকে আমি সর্বপ্রথম দেখি— তাও দূর থেকে। তখন তাঁর কিছু কিছু কবিতা সওগাতে ছাপা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে অনেক পরে।

হবীবউল্লাহ বাহারের তখন খুব উৎসাহ আর জোশের সময়। একদিকে মোহামেডান স্পোর্টিং, অন্য দিকে সাহিত্য, মাঝখানে রাজনীতি। এর একটাতেই মানুষের মাথা বেঠিক হয়ে যাওয়ার কথা— সেখানে বাহার এক সঙ্গে তিনটা নিয়েই মেতেছিলেন। খেলাধুলা আর রাজনীতি— এ আমাকে দিয়ে হবে না তা বাহার ভালো করেই জানতেন। কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে আমাকে করলেন টার্গেট। কলকাতায় তখন তাঁরা গোরাচাঁদ রোডে থাকতেন— আমাকে একদিন জোর করে নিয়ে এলেন ওখানে, বল্লেন : এখন থেকে এখানেই থাকবেন, খাবেন আর বসে বসে শুধু লিখবেন।

চট্টগ্রামে 'বুলবুলিস্তান' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন; জানালেন সে সংকল্প, বলতে লাগলেন ব্যাপকভাবে সাহিত্য প্রকাশের অদ্ভুত সব পরিকল্পনার কথা। এসব নিয়ে দিন রাত শুধু বকবক করতেন। আমাকে নীরব শ্রোতা পেয়ে আরো বেশি মেতে উঠতেন— ওঁর পাল্লায় পড়লে নির্ঘাত ধরে নিতে হতো রাত্রের ঘুমটা সেদিন মাটি। ও নিজেও রাত্রে ঘুমাতো খুব কম। এসব দেখে ওঁর অভিভাবকরাও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন— এ বোধ করি মাথা খারাপ হওয়ার লক্ষণ। চিকিৎসার ব্যবস্থা হল— বাহার শুনে চটে মটে লাল। ঔষধ পত্র খেতে শুধু যে অস্বীকার করলেন তা নয়, ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন তা বাইরে। আমাকে পেয়ে ওঁর অভিভাবকরা যেন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন। ওঁদের ধারণা বাহার একমাত্র আমার কথাই শোনে— ওকে ঔষধ খাওয়াবার দায়িত্বটা এবার তাঁরা আমার হাতেই দিলেন ছেড়ে। বাহারের আম্মা তখনো বেঁচে— আমার পরিচয় পেয়ে তিনিই সব চেয়ে বেশি খুশী হলেন— তাঁদের সব বোনের লেখাপড়ার প্রথম হাতেখড়ি নাকি আমার বাবার হাতে, এমনকি বাহার নাহারেরও নাকি। এসব কথা আমি জানতাম না— জানলেও এসবের কোন গুরুত্ব ছিল না আমার কাছে।

বাহারদের বাসায় এসে প্রথম প্রথম আমি বেশ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। আমার অস্বস্তির বড় কারণ— আমি জানতাম বাহার পুরোপুরি বেকার— ওদের সংসার চলত খালু শহীদউদ্দীন মাহমুদ আর ভগ্নিপতি ডাক্তার ওহীদউদ্দীন মাহমুদের আয়ে। বাহার বেকার হয়েও খরচ করতেন দু'হাতে, বাসা থেকে বেরিয়েই আমাদের নিয়ে প্রথমে ঢুকতেন কোন একটা ভাল রেস্টুরেন্টে, বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিলটাও শোধ করতেন নিজে। পয়সা কোথায় পেতেন তা আমার অজ্ঞাত। শুধু জানতাম নানা অপুত্রক ছিলেন


www.pathagar.com

বলে তাঁর চট্টগ্রামের সম্পত্তি থেকে এঁরা কিছু কিছু শেয়ার পেয়ে থাকেন। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দের অনেকে গরিব ছিল, বাহারের ওখানে তারা এসেও জুট্‌তো। ওদের ২৩ নং ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রিটের বাসায় একদিন দেখি তখনকার মোহামেডান স্পোর্টিং-এর বাচ্চা খেলোয়াড় আব্বাস বসে আছে, আব্বাস তখন ছাত্র। তার কলেজের ফি কি করে দেওয়া যায় এ সম্পর্কেই যেন আলাপ হলো। একদিন ঐ বাসায় কয়েক মিনিটের জন্য হুমায়ূন কবীরকেও দেখেছিলাম। হুমায়ূন কবীর বোধ করি সেবার এম. এ. ফাইনেল দেবে বা দিয়েছে। কি এক লেখা সম্বন্ধেই যেন আলাপ হলো। বোধ করি তখন বুলবুল প্রকাশের কল্পনা জল্পনা চলছিল। রাজনৈতিক কর্মীরাও অনেকে আসতেন বাহারের কাছে। একদিন পথে সৈয়দ জালালউদ্দীন হাশেমীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন বাহার। হাশেমী সাহেবের একটি পা ছিল না— ক্রাসের উপর ভর দিয়েই চলতেন। তবুও সেদিনের তরুণ রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী-পরে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট মারা যাওয়ার পর অনেক কাল প্রেসিডেন্টও ছিলেন তিনি।

এভাবে বাহারের সময় আর শক্তি হয়ে পড়েছিল ত্রি-ধা বিভক্ত। এ তিন ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমানে জনপ্রিয়— এ তিন আড্ডাতেই তিনি ছিলেন সেরা গল্পবাজ আর দরাজহস্ত। অথচ তিনি বেকার, এক বেকার আর এক বেকারকে এনে ঘাড়ে চাপালে স্বভাবতই অভিভাবকদের নাখোশ হওয়ার কথা। তাই প্রথম দিকে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছিল। কিন্তু আমাকে পেয়ে বাহারের আম্মা আর অন্যান্যদের আগ্রহ আর আনন্দ দেখে আমার অস্বস্তি একদিনেই কেটে গেল।

বাহারের নানা খান বাহাদুর আবদুল আজীজ— খুব সম্ভব ছাত্রাবস্থায় 'ওবেদি-বিয়োগ' নামে এক চটি বই লিখেছিলেন। কোথা থেকে তার পুরোনো কপি একটা সংগ্রহ করে এনে বাহার আমাকে বল্লেন : 'এ বই আমি নতুন করে ছাপাব, আপনি এর একটা ভূমিকা লিখে দিন।' মোগলের পাল্লায় পড়লে যে দশা আমারও সে দশা— অগত্যা লিখতেই হলো ভূমিকা, আমার জীবনে এটিই প্রথম ভূমিকা লেখা। সে ভূমিকাসহ 'ওবেদি বিয়োগ' যথা সময় ছাপা হয়ে বেরিয়েও ছিল। শাহেদ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীদের নানা মওলানা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী ছিলেন ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ— প্রাচ্য-বিদ্যায় ডাক সাইটে পণ্ডিত। খান বাহাদুর আবদুল আজীজ ছিলেন তাঁর অন্যতম ছাত্র। 'ওবেদি বিয়োগ' মওলানা সাহেবের মৃত্যুর পর ছাত্র আবদুল আজিজের লেখা 'শোক গাথা'— গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধার্ঘ। 'ওবেদি বিয়োগের' এ ভূমিকা আমার প্রথম প্রবন্ধ পুস্তক 'বিচিত্র কথায়' মুদ্রিত হয়েছে।

দৈনিক সংবাদের সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী বাহারের খালাতো ভাই। জহুরের মা মারা গেছেন জহুরের শৈশবে। জহুর নানী আর খালাদের সঙ্গে তখন কলকাতায়। বাহারেরা তখন ছিল গোরাচাঁদ রোডে, আমিও আছি ওখানে, শামসুন্নাহারেরাও ছিলেন। বাহার মাঝে মাঝে জহুরকেও সঙ্গে নিয়ে সওগাত অফিসে আসতেন। আর প্রায় ওকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতেন : বল দেখি কলকাতায় কি কি সংবাদপত্র আছে?


www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে জহুর তোতাপাখির মতো বলে যেতো : স্টেটস্‌ম্যান, অমৃত বাজার, আনন্দ বাজার, বেঙ্গলী, ফরওয়ার্ড ইত্যাদি।

: কি কি মাসিক আছে বল দেখি এবার?

আবার শুরু হল তোতা পাখির শেখানো বুলি : প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, সওগাত, মডার্ণ রিভিয়ু ইত্যাদি। সংবাদপত্রের নাম মুখস্থ করে করেই যার জীবনের শুরু পরবর্তী জীবনে সে যে নির্ঘাত সম্পাদক হবে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয়। হয়তো জহুরও আবাল্য সে স্বপ্নই দেখে এসেছে।

একদিন— সেদিন জহুরও বাহারের সঙ্গে ছিল। সওগাতের আড্ডা থেকে বাহার যেন কোথায় গেলেন। যাওয়ার সময় জহুরকে রেখে গেলেন আমার কাছে। বলে গেলেন : ফেরার সময় একেও ট্রামে করে বাসায় নিয়ে যাবেন। আমার তো রীতিমতো হৃদকম্প শুরু হয়ে গেলো। আমি তো সওগাতের কাজ সেরে ফিরবো রাত আটটা কি ন'টায়। তখন একটা আস্ত বালককে নিয়ে আমি কি করে ট্রামে ওঠা-নামা করব?

প্রথম যখন কলকাতায় আসি ট্রামে উঠতে গিয়ে আমি পা ফস্‌কে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম একদিন। সঙ্গে বাহার ছিলেন, তিনি ত্বরিত ধরে না ফেল্লে সেদিন হয়তো ট্রামের নিচেই অক্কা পেতাম। ট্রামে উঠতে গিয়ে নাকি ম্যথিয়ু আর্নল্ড মারা গিয়েছিলেন— ট্রামের নিচে চাপা পড়ে মরার অতখানি সাহিত্যিক খ্যাতির দরকার হয় না, আমার মত বহু সাধারণ লোকও যে ট্রামের নিচে চাপা পড়ে মরেছে তার নজিরের অভাব নেই। সে থেকে ট্রাম-ভীতি আমাকে প্রায় পেয়ে বসেছিল— একা থাকলে ট্রামে চড়তামই না আমি। সেদিনের ঘটনাটা ত বাহার ইতিমধ্যেই বন্ধু মহলে রাষ্ট্র করে দিয়েছে। এমনকি একদিন কথাটা নজরুল ইসলামকেও শুনিয়ে দিল : জানেন কাজী-দা, আবুল ফজল ট্রামে চড়তে পারে না। এ নিয়ে নজরুল আমাকে কম দিন ঠাট্টা করেননি। আজ সে হাবীবউল্লাহ বাহারই ট্রামে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক বালককে দিয়ে যাচ্ছেন আমার জিম্মায়। প্রতিকারের কোন উপায় নেই— কথা কয়টা বলেই বাহার অদৃশ্য। হয়তো গড়ের মাঠের উদ্দেশ্যে এম্পেলেনেডের ট্রামেই লাফ দিয়ে উঠেছেন এতক্ষণে।

বহু তাগাদা আর অনুনয় বিনয়ের পর, সঙ্গের আট ন' বছরের এতিম বাচ্চাটির দোহাই দিয়ে রাত ন'টার দিকে নাসিরউদ্দীন সাহেবের কাছ থেকে একটি আস্ত টাকা আদায় করে নিতে সক্ষম হলাম। তখন একটাকার দাম সত্য সত্যই ষোল আনা। রাস্তায় নেমে আসতে না আসতেই মনের দুরু দুরু ভাব আরো বেড়ে গেল। সন্ধ্যার পর আলো-আঁধারে মিশে কলকাতায় রাস্তা-ঘাট হয়ে ওঠে এক রহস্যময়, তার ভেতর দিয়ে এক বালককে নিয়ে চলন্ত বা আধা চলন্ত ট্রামে ওঠার কথা ভাবতেই তো আমার নাড়ী বন্ধ হয়ে যাওয়ার দশা। মনে হতে লাগল এর থেকে পুলসেরাত পার হওয়া যেন অনেক সহজ। ধারে কাছে একটা রিক্সাও দেখতে পেলাম না কোথাও। এ আলো-আঁধারী পথে রিক্সাকে নির্দিষ্ট গলির পথ দেখিয়ে এক নির্দিষ্ট নম্বর ঘরের সামনে নিয়ে আসাও আমার কাছে সেদিন রীতিমতো দুঃসাধ্য মনে হয়েছিল। প্রথম প্রথম দিনের বেলায়ও এ ঘর খুঁজে নিতে আমার কষ্ট হত। এমন সময় দেখি সামনে দিয়ে কিছুটা মন্থর গতিতে চলেছে এক টেক্সি। সাহসে বুক বেঁধে ওটাকেই থামালাম, ড্রাইভারকে রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর বল্লাম।


www.pathagar.com

বল্ল-পৌছে দিতে পারবে, তবে ভাড়া লাগবে এক টাকা। এক টাকা! ছো! এক টাকা তো আমার পকেটেই আছে। অতএব এবার বুক ফুলিয়ে বালক জহুরের হাত ধরে চড়ে বসলাম টেক্সিতে। রাখলাম পায়ের উপর পা। পাঁচ মিনিটেই দেখি বাড়ির সামনে এসে থেমে পড়েছে টেক্সি। পকেট গড়ের মাঠ করে কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে এবার নেমে পড়লাম টেক্সি থেকে। একথা ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে কোনদিন প্রকাশ করিনি। করলে বাহার আর এক দফা আমার ভীরুতা আর কাপুরুষতার গল্প করার সুযোগ পেয়ে যেত আর জনাব নাসিরউদ্দীন সাহেব এমন অমিতব্যয়ীকে হয়তো আর কোনদিনই একটি আস্ত টাকা এক সঙ্গে দিতেন না!

সওগাত অফিসে কাজ পাওয়ার আগে আমি ঝাউতলা রোডে এক বাড়িতে কিছুদিনের জন্য জায়গীর ছিলাম। বাড়ির মালিকরা ছিল খান্দানী কশাই— নিউ মার্কেটেও ছিল ওদের গোস্তের দোকান। বেশ পয়সাওয়ালা— নিজেদের ঘোড়ার গাড়িও ছিল একটা। সে গাড়ি করেই নিউ মার্কেটে আর অন্যত্র গোস্ত নেওয়া হত। ওখানে যে কয়দিন ছিলাম মাছ-তরকারির চেহারা দেখিনি কোনদিন। দু'বেলাই খেতে দিতো গরুর গোস্ত। থাকতে হতো বাইরের ছোট্ট একটা একতালায়। আলাদা ঘর ছিল না বলে গাড়ির বিহারী গাড়োয়ানও থাকতো আমার সঙ্গে। তখন আমার অবস্থা এমন যে, গাড়োয়ান কেন ঘোড়ার সঙ্গে থাকতে হলেও আপত্তি করার উপায় ছিল না। এ বাড়ির পরিবেশ আর আবহাওয়ায় লেখা হয়েছে আমার 'নবাব আমির বাদশা' গল্প। এ গল্পও প্রথমে ছাপা হয় সওগাতে— মাসিক সওগাতের ১৩৩৫ এর পৌষ সংখ্যায়।

## আটাশ

একদিন বিনা মেঘে অশনিপাতের মতো হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির— বাবা ভয়ানক অসুস্থ। সেকালে কথায় কথায় টেলিগ্রাম করা হত না। টেলিগ্রামকে মনে করা হত সাংঘাতিক বিপদসংকেত। টেলিগ্রামের নামে হৃদকম্প শুরু হত অনিবার্যভাবে প্রায় সকলেরই। আমারও শুরু হলো। বোন তিনজনই বিবাহিত, থাকে নিজ নিজ শ্বশুর বাড়ি। বাড়িতে মা একা, নিঃসঙ্গ, শহরে বাবা শয্যাশায়ী। আমার চলছে এখনো পাঠ্য জীবন— জীবিকার নেই কোন ঠিকানা। লিখে উপার্জনের কথা সেদিন আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর।

অনেক দুর্ভাবনা নিয়ে ফিরে এলাম চাটগাঁ— কম্পিত বুকে এসে দাঁড়ালাম বাবার শয্যাপার্শ্বে। বহুমূত্ররোগে তাঁর দেহ কঙ্কালসার— দুর্বল হয়ে পড়েছেন বেজায়। গৃহকর্তা হাফেজ আবদুল্লাহ, তাঁর ছেলেরা আর ভক্ত ও অনুরাগীরা সেবা যত্ন করছেন প্রাণপণে। চিকিৎসা করছেন হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট। রোজ এসে দেখে যান কিন্তু ফি নেন না। এঁকে ফি দিতে গিয়েই আমাকে শুনতে হয়েছে : চিকিৎসা করে আমরা ইমাম সাহেবের কাছ থেকে ফি নিই না, এ উত্তর। ডাক্তার কবিরাজ বলতে সবাই ছিলেন হিন্দু এঁদের কাকেও আমি বাবার কাছ থেকে ফি কেন, ঔষধের দাম নিতেও দেখিনি।

রোগশয্যা থেকে বাবা ফের জারি করলেন নিষেধাজ্ঞা ওকালতি পড়ো না। আমি চাই তুমি শিক্ষক হও, এর চেয়ে ভালো পেশা আর নেই।

অতএব এবার আমিই নোয়ালাম। ল' পড়ার সংকল্প ছাড়লাম চিরকালের জন্য।


www.pathagar.com

বাঁচবেন না এ আশঙ্কা করেই যেন এ সময় বাবা শহরে তাঁর পরিচিত এক পরিবারে আমার বিয়েও ঠিক করেছিলেন। কন্যাপক্ষ ছোটখাটো জমিদার। আমি ল' পড়ে উকিল হতে যাচ্ছি এ শুনেই বোধ করি ওঁরা আমার প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। ল' পড়া আমি ছেড়ে দিচ্ছি শুনে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লেন। বায়না ধরলেন বাবার কাছে ছেলেকে ওকালতি পড়াতে হবে, তা হলে আমাদের জায়গা জমিদারির কাজ কর্মগুলো দেখাশুনা করতে পারবে। ওকালতি পড়ার খরচ না হয় আমরাই দেব।

তখন তর্ক করার অবস্থা বাবার নয়। আর এ বিষয়ে তাঁর মতামত এত দৃঢ় ও অনড় যে, এ নিয়ে কোন রকম তর্ক করাই ছিল তাঁর কাছে অবান্তর। তিনি স্রেফ বিয়েটা ভেঙ্গে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন— এ সম্পর্কে আর কোন আলাপ আলোচনা করতে করলেন অস্বীকার— আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মেয়েটি ভাগ্যবতী আমি জীবনে উকিল হতে পারি নি তিনি পরে উকিল গিন্নী হয়েছিলেন।

এভাবে একটা বছর আমার নষ্ট হলো। বাবার অভিলাষ আমি শিক্ষক হই— পাকা শিক্ষক হতে হলে বি. টি. ডিগ্রি অপরিহার্য। তখন দেশব্যাপী চলছে মন্দা, চাকরি বাকরি দুষ্প্রাপ্য। ১৯২৯-এর জুলাই মাসে বি.টি. পড়ার জন্য ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হলাম। আবার শুরু হল ঢাকার পুরোনো জীবন। তখন ট্রেনিং কলেজ ছিল আর্মানিটোলায়— মাঝারি সাইজের একটা দোতালা বিল্ডিং। নিচে আর্মানিটোলা গভর্ণমেন্ট হাইস্কুল, উপরে ট্রেনিং কলেজ। তখন এ ট্রেনিং কলেজের খুব সুনাম— আসামের জন্য একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক সিট খাস ছিল। এমন কি সুদূর হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, মাদ্রাজ থেকেও ছাত্র আসতো। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর মাইকেল ওয়েস্ট— তিনি প্রচলিত অর্থে শুধু শিক্ষাবিদ ছিলেন না, শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক মূল্যবান বইও লিখেছেন। গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য আমাদের বাংলা পড়াতেন, তিনিও সুশিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাদের দিয়ে শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র একটা নাট্যরূপ তৈয়ার করিয়ে নিয়ে কলেজে মহাসমারোহে তা অভিনয় করিয়েছিলেন। আমাকেও যেন কি একটা ছোট পার্ট দেয়া হয়েছিল। ঐ বোধ করি জীবনে আমার প্রথম ও শেষ অভিনয়। আমার 'চোর' গল্পটি এখানে বাংলা ক্লাসের টিউটোরিয়াল ওয়ার্ক হিসেবে, গুরুবন্ধু বাবুর নির্দেশেই লেখা। তিনি শুধু চোর, দালাল, ডিটেকটিভ— এ তিনটি মাত্র শব্দ সংকেত হিসেবে দিয়ে একটি গল্প লিখে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। 'চোর' গল্পটি পরে মাসিক মোহাম্মদীতে ছাপা হয়েছিল। মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন তখন একমাত্র জনাব মোখলেসর রহমান। তিনি হাতিয়ার অধিবাসী— পরে বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। তখনো লম্বা দাড়ি রাখতেন, ছিলেন পুরোপুরি নামাজী-কালামী কিন্তু সব রকম খেলাধুলায়ও ছিলেন ওস্তাদ। ফুটবল খেলে এসেই নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন, নামাজ শেষে বসে যেতেন হারমোনিয়ম নিয়ে গান করতে। ইনডোর গেমেও তাঁর সঙ্গে আমরা পেরে উঠতাম না। থাকতেন হোস্টেলে, হোস্টেল সুপারিন্টেনডেন্ট হয়ে। কোন ব্যাপারেই তাঁর মধ্যে কোনদিন এতটুকু ঢিলেমি কি আলসেমি দেখিনি। ছিলেন প্রায় সব কাজেরই কাজী, সব বিদ্যায় পটু— রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ইকবাল, হাফিজ আর কোরান, হাদিস সবই আউড়াতে পারতেন সমানে। দেহটি যেমন তাঁর সুগঠিত ও বলিষ্ঠ, তেমনি অসাধারণ


www.pathagar.com

প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। অমন তুখোড় আর অলরাউন্ড লোক খুব কম দেখা যায়। সুখের বিষয় তিনি আজও বেঁচে আছেন আর যাপন করছেন সক্রিয় জীবন।

যেসব বিদ্যা সম্বন্ধে আগে কোন ধারণাই ছিল না আমার এখানে ট্রেনিং কলেজে তেমন সব নতুন বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হলাম। পরিচিত বিষয়সমূহের শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক নীতি ছাড়াও শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব, বুদ্ধি ও মেধার পরিমাপ, দৈহিক গঠন ইত্যাদির জ্ঞান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং কলেজে না এলে তা হয়তো আমার কাছে অজানাই থেকে যেত। অঙ্কন-বিদ্যাও যে শিক্ষার একটা অপরিহার্য অঙ্গ, তাও এখানে এসে বুঝতে পারলাম।

সামনে পরীক্ষা বলে সেবার বড় দিনের ছুটিতে বাড়ি না এসে হোস্টেলেই রয়ে গেলাম। হঠাৎ ১৯শে ডিসেম্বর টেলিগ্রাম পেলাম বাবার অবস্থা খুবই খারাপ— সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ। শহর ছেড়ে চলে এসেছেন দেশের বাড়িতে। ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমি বাড়ি এসে পৌছলাম। তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসতেই তিনি তাঁর শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে আমার মুখে-চিবুকে একবার বুলিয়ে নিলেন। মনে হল, আমি দাড়ি রেখেছি কি-না তাই যেন দেখলেন। চোখে মুখে নিরাশার ভাব ফুটে উঠলো। খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লেন : দাড়ি রেখো। নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত না পড়ো অন্তত ফজর-মগরেব এ দুই ওয়াক্ত ত্যাগ করবে না। আর তেলাওয়াৎ করবে কোরান শরিফ। তাঁর মুখের এ কথা কয়টিই যে আমার জন্য তাঁর শেষ কথা, তখন বুঝতে পারিনি। রাত্রি দশটার দিকে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। উপস্থিত এক আত্মীয় আমাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন : ভাই, তোমাকে দেখার জন্যই শুধু তিনি এতদিন বেঁচেছিলেন। এর এক সপ্তাহ পরে ২৮শে ডিসেম্বর (১৯২৯) আমার পরম বন্ধু দিদারুল আলমও গেল মারা। শহরে ফিরে এসেছি বাবার মৃত্যুর চতুর্থ দিনের ফাতেহার পর। কাজী বাড়ির বাইরের ঘরের তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে ভাবছি নিজের ভূত ভবিষ্যৎ। এমন সময় অধুনা-লুপ্ত দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান-সম্পাদক কবি আবদুস সালাম ঢুকে এ মর্মান্তিক সংবাদ আমাকে জানালে। ওর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম ফতেয়াবাদের পথে। দেখলাম মৃত্যু আর রোগের সঙ্গে সংগ্রামে সংগ্রামে দিদারুলের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহখানি একদম জীর্ণ হয়ে গেছে— আয়ত চক্ষু দুটিতে আর কোন দীপ্তি নেই, নেই আলো, বুজে আছে চিরকালের মতো। সন্ধ্যা নাগাত তাকেও মাটির নিচে শুইয়ে দিলাম। মাত্র সপ্তাহের ব্যবধানে আমার জীবনের দুটি বড় বন্ধন— একটি অচ্ছেদ্য রক্তের, অন্যটি রক্ত সম্পর্কহীন এক অনির্বচনীয় প্রীতির, ছিন্ন হয়ে গেল। হারালাম এক সঙ্গে পিতার মঙ্গলময় আশ্রয় আর বন্ধুর প্রীতি-মধুর আশ্বাস।

মৃত্যুর মাত্র ১৩ দিন আগে ১০ই ডিসেম্বর (১৯২৯) তার অতি সুন্দর সুগঠিত হস্তাক্ষরে দিদারুল আলম ঢাকা ট্রেনিং কলেজের ঠিকানায় আমাকে একখানা পোস্ট কার্ড লেখে। ঐটিই তার শেষ চিঠি। নিম্নে তা উদ্ধৃত হলো :

ফজল, আমি মরি নাই। তবে মৃত্যুদূতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছি। রেঙ্গুন হইতে আসিয়া ১০৩/৪ ডিগ্রী জ্বর, এখন শয্যাত্যাগ কষ্টকর। খুব শুকাইয়া গিয়াছি। কেবল একটা জিনিসের দরকার— টাকা। টাকা, টাকা, টাকা। বাঁচিবার জন্য টাকা চাই। তোদের বলিয়াছিলাম আমার 'ফয়ার দেশে' (তার লিখিত ও তার সম্পাদিত 'যুগের আলো' মাসিকে


www.pathagar.com

ধারাবাহিক প্রকাশিত উপন্যাস— লেখক) চালিয়ে কিছু টাকা বের করে দিতে— অন্তত চেষ্টা ত কর। কিন্তু কাদিরের (কবি আবদুল কাদির) মুখে আগুন, শা...ফরমাস করে লেখার জন্যে। ডাক্তার বদ্যি আর সব বলকারক ঔষধে আমার ঘর ভরপুর। আমার জীবন রক্ষার জন্যে সবার চিন্তা, আর আমি লিখি পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ! তুই মাসিক মোহাম্মদীতে এত রাবিশ গল্প (হয়তো 'চোর' গল্পটার কথাই বলছে ও— লেখক) লিখিলি! তুই যে ভারী ব্যস্ত তা আমি বিশ্বাস করি। তোদের সবাইকে এ সময় একবার দেখতে ইচ্ছা হয়। বাড়ি যদি আসিস তা হলে নিশ্চয়ই তো এখানে আসবি। এখন বাড়ি আগের চেয়ে গুলজার— সবাই বাড়িতে কিনা! আমার অসুখের জন্যে যা দুশ্চিন্তা। তুই এলে আমোদ পাবি। কাদির পড়াশোনা করছে কেমন? যাক্, সব খবর লিখিস। ইতি—

তোমাদের দিদার,

১০। ১২। ২৯

বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। তাই জীবিত অবস্থায় দিদারুলের সঙ্গে আর একবার শেষ দেখা হলো না আমার।

মাস দুই পরেই বি. টি. র বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবে কাজেই ঢাকায় ফিরে আসতে হলো। ফিরে এলাম বুকের তলায় শোকের দুই ক্ষত চিহ্ন নিয়ে— হতাশা আর নৈরাশ্যের বেদনা চাপা দিতে চেষ্টা করেও চাপা দিতে পারছিলাম না। কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না শিক্ষা-বিজ্ঞানের নীরস সব বইয়ের পাতায়। বিশেষ করে দিদারুলের মৃত্যুই আমাকে বেশি করে বিচলিত করেছিল। পিতা পরিণত বয়সে মারা গেছেন কিন্তু দিদারুল তো মাত্র ছাব্বিশ বছরের তরুণ! কত আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নে ভরা ছিল তার মন। আমার মনের প্রথম দোসর, সাহিত্য পথের প্রথম সাথীকে হারিয়ে আমার নিজের মনের আকাশ যেন ভেঙ্গে খান খান। পিতার মৃত্যু ভুলে যেতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি কিন্তু দিদারুলের মৃত্যু বারে বারেই আমার নির্জন মুহূর্তকে দীর্ঘকাল ধরে বিচলিত করে তুলেছে। তার মৃত্যুর প্রায় ছ'মাস পরে ১১। ৬। ৩০ তারিখে, আমার এক 'হাত বইয়ে'র পাতায় একথাগুলো লিখেছিলাম দেখতে পাচ্ছি :

'কি জানি কেন আজ সকালে বারবারই দিদারুলের কথা মনে পড়ছে। হায়, এ জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। আর কোন জীবন আছে কি-না জানি না, যদি থাকে আজ মনের ভেতর এ একটি মাত্র প্রার্থনাই একান্ত হয়ে উঠেছে— স্বর্গে হোক, নরকে হোক, আবার যেন তার সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হয়। আকৈশোর দু'জনে কত স্বপ্ন দেখেছি, এঁকেছি কত বিচিত্র স্বপ্নের ছবি। সে স্বপ্নের কিছুই সফল না হতে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল। এ বেদনা আজ মনের ভেতর অত্যন্ত নিবিড় হয়ে উঠেছে।'

দেখতে দেখতে পরীক্ষার সময় এসে গেল। মাত্র নয় মাসে এখানে অর্থাৎ ট্রেনিং কলেজে অনেকগুলো বিষয় আয়ত্ত করে নিতে হয়। আর সবগুলো বিষয় একদম নতুন। সাধারণ কলেজীয় পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে এসবের কোন মিল নেই। কাজেই বি. টি. পরীক্ষায় ভালো করতে হলে অখণ্ড মনোযোগ অত্যাবশ্যক! সফল সাহিত্যিক আমি না হলেও


www.pathagar.com

সাহিত্যের নেশাটা গোড়া থেকেই হয়ে পড়েছিল আমার প্রথম প্রেম। ফলে ক্লাসের পড়াশোনায় আমি কখনো অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারি নি। কোন পরীক্ষাতেই আমার ফল ভালো না হওয়ার এও এক কারণ। এবার তো দু' দুটা শোকের আঘাতে মনটা আরো বিচলিত ও বিক্ষিপ্ত। পরীক্ষা দিলাম বটে কিন্তু ফল ভালো হলো না— প্রাক্‌টিকেলে অর্থাৎ ক্লাসে পাঠ দানের বিষয়ে পাস করলাম কিন্তু থিয়োরিটিকেলে অর্থাৎ কেতাবী বিদ্যার লেখা পরীক্ষায় করলাম ফেল্। আবার থিয়োরিটিকেলে পরীক্ষা দিতে হবে আগামীবার। অর্থাৎ আরো একটা বছর আমাকে থাকতে হবে প্রতীক্ষা করে।

ফেলের খবর পেয়ে ১৯শে এপ্রিল (১৯৩০) আমার সে হাত-বইতে একথা কয়টিও লিখেছিলাম : "মনে হয় মানুষ নিজে বড় না হলে অন্যে বড় হোক এ কামনা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। যখন শুনলাম পরীক্ষায় ফেল করেছি তখন সঙ্গীদের কয়জন পাস করেছে সে খবর জানবার কোন রকম কৌতূহলই বোধ করলাম না বরং ফেলের সংখ্যাটা বেশ বড় শুনে অনেকটা যেন আশ্বস্তবোধ করলাম। যদি শুনতাম সব ছেলেই ফেল করেছে তা হলে হয়তো আরো বেশি করে খুশী হতাম। আমার বন্ধু আমার চেয়ে বড় হোক এ আমি সর্বান্তকরণে কামনা করি, এ কথা যে বলে সে তার মনের সব সত্যকে প্রকাশ করে বলে মনে হয় না— সে নিজের মনকে ফাঁকি দেয় অনেকখানি। প্রতিবেশীর কল্যাণ আর ঐশ্বর্য কামনার আগে নিজের জীবন কল্যাণ— সুন্দর আর ঐশ্বর্যমণ্ডিত হওয়া দরকার, না হয় নিজের কথা হবে স্রেফ ফাঁকি, এক রকম কপট উক্তি।"

পড়ার অত্যধিক চাপ থাকা সত্ত্বেও লেখার অভ্যাস আমার ওখানেও অব্যাহত ছিল। বেশ কয়েকটি লেখা ওখানে ট্রেনিং কলেজের হোস্টেলে বসেই লিখেছি মনে পড়ে। ওখানে থাকতেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্কটি আবার নতুন করে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। এর ফলে আমাকে করা হয় সাহিত্য সমাজের সম্পাদক। ১৯৩১শের বার্ষিক সম্মেলনে আমিই পাঠ করলাম সম্পাদকীয় বিবরণী আর পরবর্তী সংখ্যা 'শিখার' কভারে ছাপা হলো আমার নাম সম্পাদক হিসেবে। কিন্তু সম্পাদকীয় কাজ কর্ম যা কিছু তা সবই আগের মতো করতেন আবুল হোসেন সাহেব।

আমার প্রথম উপন্যাস 'চৌচির' যদিও আগের লেখা কিন্তু আমি ট্রেনিং কলেজে থাকতেই ওটা প্রথম ছাপা হয় 'সওগাতে'। কেন জানি না ঐ সঙ্গে আমার ছোট্ট ছবিও একটা ছাপা হয়েছিল। এ ছবিটা পরে আরো কি একটা লেখার সঙ্গে আবারও ছাপা হয়েছিল সওগাতে। ছবিটা কিন্তু আদতে তোলা হয়েছিল ট্রেনিং কলেজের বাংলা বিভাগের তাগিদে— ঐ বিভাগের সব ছাত্রকেই বেশ দামি কাগজে এক একটা Scrap book করতে হতো আর তাতে লাগাতে হতো নিজ নিজ ফটো।

পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি ফিরে এলাম না। ঢাকায় রয়ে গেলাম— পরবর্তী পরীক্ষা তো সে আগামী বছর। মিটফোর্ড হাসপাতালের সামান্য পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা থেকে অনতিদূরে জুটে গেল এক 'জায়গীর'। ওঁদের ছিল সাবানের বড় কারখানা। পাকা বাড়ি, অবস্থা খুব সচ্ছল। গৃহকর্তার দ্বিতীয় পক্ষ নবাব বাড়ির মেয়ে। বড় ছেলে মুহাম্মদ শরিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র— বেশ সাহিত্যপ্রিয়। ফলে তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়ে গেল অতি সহজে। শরিফের ব্যবহারও তাঁর নামের মতোই ছিল— তিনি বোধ করি এখন শিক্ষা


www.pathagar.com

বিভাগে কর্মরত। ওখানে আমি খুব সমাদরেই ছিলাম। হঠাৎ ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের জুনিয়র সেক্সনে একটা অস্থায়ী চাকরি পেয়ে গেলাম। মাসিক বেতন ষাট টাকা। তখন ষাট টাকা আমাদের কাছে রীতিমতো মোটা অঙ্ক। ওখানে মাস ছয় কাজ করেছিলাম। ঐ আমার প্রথম সরকারি চাকরি।

ষাট টাকার চাকরি পাওয়ার পর জায়গীরে থাকার কোন মানে হয় না। অতএব জায়গীর ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, রেলওয়ে লেবেল ক্রসিঙের দক্ষিণে দোতালায় দু'খানা কামরা ভাড়া করে এবার রীতিমতো ভদ্রলোকের জীবন-যাপন করতে শুরু করে দিলাম। ঢাকার বিখ্যাত ঘোড়ার গাড়ি করেই এখন রমনা থেকে শহরের অন্য প্রান্ত ভিক্টোরিয়া পার্ক সংলগ্ন মাদ্রাসায় যাতায়াত করতে লাগলাম। যাতায়াতে বড় জোর আট আনার বেশি খরচ হত না। তখন একদিকের ভাড়া চার আনার মতোই ছিল, ভাগীদার পেলে দু' আনা এক আনায়ও হয়ে যেত। বাড়িতে ধান চাল যা পাওয়া যেত তাতে মার সব খরচ পুষিয়ে যেত, কাজেই আমার রোজগারের আমিই ছিলাম একমাত্র মালিক। শিক্ষকতা করতে গিয়ে মাদ্রাসার ছাত্রদের সম্বন্ধে মনে মনে যেন একটা বিরূপ ভাব গড়ে উঠেছিল। দেখছি ২১। ৪। ৩০ তারিখে আমার হাত বইতে এ কথা কয়টি লিখে রেখেছিলাম :

'কয়দিন ধরে ঢাকা মাদ্রাসায় মাস্টারি করছি। নিজেও ছোটকালে মাদ্রাসায় পড়েছি তবে চোখ খোলার পর এ প্রথম মাদ্রাসা জীবনের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ ঘটল। আজ দশটার সময় Teachers' waiting room-এ বসে আছি, দেখছি দলে দলে ছেলেরা মাদ্রাসায় ঢুকছে, অধিকাংশের পরনে বিশ্রী লুঙ্গি, ময়লা সার্ট বা কোর্তা, মাথায় ততোধিক ময়লা টুপি। কেউ কেউ আসকান, পায়জামাও পরেছে বটে কিন্তু কারো পোশাকে কোন শ্রী সৌন্দর্যের বালাই নেই। কেউ হয়তো পায়জামার উপর খাটো একটা সার্ট পরেছে। কেউ হয়তো তার উপর চড়িয়েছে একটা ময়লা কোট। সৌন্দর্য আর পরিমিতিবোধের অভাবে মুসলমান ছেলেরা (বিশেষ করে মাদ্রাসার ছেলেরা) পোশাকের আর্টকে যেন ধরতেই পারছে না। যাদের পয়সা আছে তারাও কিছুমাত্র সৌন্দর্য সচেতন নয়। এদের জীবন যাত্রায়ও আর্টের কোন পরিচয় নেই! আর্ট আর সৌন্দর্যের সাধনায় মুসলমান সমাজ যে কত পেছনে পড়ে আছে তা এ মাদ্রাসার ছেলেদের দেখলেই সহজে বুঝতে পারা যায়। অথচ দেখা যায় দুপুর-ছুটির ঘণ্টা পড়লেই মাদ্রাসার ছেলেরা দলে দলে মসজিদের দিকে দেয় ছুট্। ধর্মের এক কাজ তো মানুষকে ভেতরে বাইরে নির্মল ও সুন্দর করে তোলা। শিক্ষারও উদ্দেশ্য সুন্দর জীবন যাপন শিক্ষা দেওয়া আর মানুষের সব বৃত্তিকে বিকশিত করে তোলা। এখানে তা দেখতে পাচ্ছি কই?'

প্রায় মাস ছয় বোধ হয় আমি ওখানে শিক্ষকতা করেছিলাম— বি. টি. না হওয়ায় স্থায়ী হতে পারি নি। এ সময় আমি অনেক লিখেছি. ছিলামও বেশ নির্ভাবনায়। তখনকার দিনে মাসিক ষাট টাকার বাজার মূল্য ছিল যথেষ্ট অর্থাৎ তখন কোন রকম আর্থিক অভাবই ছিল না আমার— দু দুটো রুমের একমাত্র মালিক আর দখলকার আমি একা। যে নির্জনতা আমার চির প্রিয় এখানে আমি তা পুরোপুরি ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ফলে হাতের কলম বেপরওয়া হতে কোন বাধা ছিল না। ঐ সময় প্রকাশিত সব লেখায় তাই একটা বেপরওয়া ভাবের পরিচয় ফুটে আছে।


www.pathagar.com

আবদুল কাদির বার দুই বি. এ. ফেল করে তখন কলকাতা চলে গেছে। ও কবি। ওর মনটা পুরোপুরি কবির মন অথচ ওর এক একগুঁয়ে ধারণা অঙ্ক ও খুব ভালো জানে, অতএব অঙ্ক নিয়েই সে বি. এ. পাশ করবে। এ ব্যাপারে বন্ধুবান্ধব, হিতৈষী কারো মানা সে শুনে নি। ফলে দু'বারই ফেল করে বসল অঙ্কে। ঐ দিকে বাংলায় পেতো সে সর্বোচ্চ নম্বর, তার বাংলার খাতা নিয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাসে ছাত্রদের সামনে তার লেখা উত্তর পড়ে শোনাতেন। একমাত্র ঐ অঙ্কের জন্যই তার আর জীবনে গ্রেজুয়েট হওয়া হল না।

কলকাতা গিয়ে, কিছুদিন ঘোরাফেরা করার পর হঠাৎ কাদির 'জয়তী' নামে এক মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বের করে বসল। আর আমার উপর আসতে লাগল লেখার তাগাদা। প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৩৭) বের হলো আমার 'বিংশ শতাব্দী' নামক গল্প। এ গল্প পড়ে কাজী আবদুল ওদুদ নাকি বলে উঠেছিলেন : Very forceful but barbarous. দু'বছরে 'জয়তী'র বেরিয়েছিল মোট চৌদ্দটি সংখ্যা— এর এগারো সংখ্যাতেই বেরিয়েছে আমার গল্প, নাটিকা আর উপন্যাসের অংশ।

'কল্লোল' বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই 'জয়তী'র আবির্ভাব— তাই বোধ করি কল্লোলেরও অনেক লেখক 'জয়তী'তে এসে ভিড় জমিয়েছিল। 'কল্লোলে'র আন্দোলন ছিল পুরোপুরি সাহিত্যিক। 'জয়তী'র ছিল সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আর রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী বদলেরও আন্দোলন। কোন রকম পুঁজির ব্যবস্থা ছাড়া সে যুগে একটা মাসিক চালানো সম্ভব ছিল না। তাই জয়তী বেরিয়েছে গড়ে দু'মাসে এক সংখ্যা, এতেও সম্পাদকের অবস্থা হয়ে পড়েছিল চরম কাহিল। এ সময় হঠাৎ এক লাইনের একখানা পোস্টকার্ড পেলাম কাদিরের কাছ থেকে। তাতে শুধু লেখা ছিল : 'জয়তী' কেন বেরুচ্ছে না? পরশু থেকে কলের জল ছাড়া আর কিছুই খাইনি।' যতদূর মনে পড়ে আমি টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারে পনরটি টাকা পাঠিয়েছিলাম। মাদ্রাসার অস্থায়ী চাকরি খতম হয়েছে অনেক আগে। এবারের পরীক্ষায় বি. টি. পাস করলাম। পাস করার পর ১৯৩১ থেকে আমার ঢাকা বাসেরও ঘটলো ইতি।

## ঊনত্রিশ

বি. টি. পাস করে চাটগাঁ ফিরে এলাম। সময় কাটছে এক দোদুল্যমান অবস্থায়। বি. টি. পাস করলেও বি. টি. পাসের চাকরি অর্থাৎ সরকারি স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদ আমার জুটছে না, জুটবার সম্ভাবনাও নেই। কারণ, আমার বয়স পঁচিশ পার হয়ে গেছে। পিতার সত্যকথন এভাবে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল আমার চাকরির পথে! বাস্তবে আমার থেকে বয়স্করাও কিন্তু পার হয়ে গেলো চাকরির পুলসেরাত। বাইরে জীবিকার তো এ অবস্থা— কিন্তু ভেতরের দ্বন্দ্বটাই আমাকে এ সময় করে তুলেছিল বেশি দিশেহারা। বিয়ের তাগাদা নিজেও যে বোধ না করছিলাম তা নয়— মাও দিচ্ছিলেন এ সম্পর্কে ঘন ঘন তাগিদ। কাজী বাড়ির মাতৃসমা মাহমুদা খাতুন চৌধুরানী আজো আমার প্রতীক্ষায় রেখে দিয়েছেন তাঁর মেয়েকে আইবুড়ো। তাঁর সকরুণ মুখের দিকে একবার তাকালেই আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। আছি ওখানে, তাঁর বাড়িতে, কাজেই যখন তখন বিশেষত দু'বেলা খাওয়ার সময় তাঁর মুখের উপর চোখ পড়তই। স্বামীর প্রকাশ্য অমতেই তিনি চেয়েছিলেন আমাকে


www.pathagar.com

জামাই বানিয়ে ধরে রাখতে; আমার দো-মনা ভাব দেখে আর আমার থেকে স্পষ্ট কোন কথা আদায় করতে না পেরে তিনি এমন মুষড়ে গেলেন যে, শেষে আমার সামনে আসতেই যেন সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলেন। আগে খাওয়ার সময় আমার সামনে এসে বসতেন, এখন দেখি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকেই তাকিয়ে থাকেন আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকে। তাঁর অবস্থা দেখে আমার অন্তরের সব অনুভূতি আলোড়িত হয়ে ওঠে। নতমুখেই খাওয়া শেষ করি। মনের দ্বিধা কিছুতেই যেন কাটাতে পারি না।

প্রথম দ্বিধা বাবা আমার শহরের বিয়েতে রাজি ছিলেন না— তাঁর বর্তমানে তাঁর কথা না মানা আর অবর্তমানে না মানার মধ্যে মনের দিক থেকে, সংস্কারের দিক থেকে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। এ ব্যবধান অদৃশ্য বলে তার প্রভাবও প্রবলতর। মারও ছিল আপত্তি, তবে সে আপত্তি ক্ষীণকণ্ঠ। মুরুব্বিদের মধ্যে আর ছিলেন মামুরা— এ বিয়েতে তাঁদেরও মত ছিল না। ভগ্নিপতিরাও খুশি নন। কাজেই আমাকেই একা নিতে হচ্ছে সব ঝুঁকি। ১৯৩১-৩২শে এসব ব্যাপারে একচোটে সব মুরুব্বির মানা ঠেলে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার তেমন দৃষ্টান্ত চারদিকে বেশি দেখতে পেতাম না বলে সাহসেও যেন কুলোচ্ছিল না।

দ্বিতীয়ত, ঢাকা-কলকাতায় সামাজিক রূপান্তরের যে চেহারা দেখে এসেছি তাতেও যেন মনে বিয়ে সম্পর্কে ভাবান্তর ঘটেছিল। স্কুল-কলেজে, সভা-সমিতিতে শিক্ষিতা মেয়েদের আবির্ভাব স্বভাবতই আমাদের মনেও শিক্ষিতা জীবন-সঙ্গিনীর বাসনা যে জাগিয়ে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্য করি, লেখার সঙ্গে নামও কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপা হয়, চলনসই একটা ডিগ্রিও রয়েছে হাতে, কাজেই অমন একটা সঙ্গিনী আমার পক্ষে হয়তো খুব দুর্লভ নয়। আমার দ্বিধার এও অন্যতম কারণ।

এ দুই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে প্রতিদিন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি অথচ পারছি না কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে।

মাহমুদা খাতুন চৌধুরানীর মেজ মেয়ের বিয়ে হয়েছিল চাঁদগাঁও, তাঁদের বাড়ি থেকে মাইল তিন চারেক উত্তরে। গ্রামটা পুরোপুরি শহরতলী। হঠাৎ খবর এলো তাঁর ঐ মেয়ের হয়েছে বসন্ত। তিনি তাঁর বড় ছেলে আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে মেয়েকে দেখতে এলেন। তখন চাটগাঁয় পাল্কি-গাড়ির ব্যাপক প্রচলন— ঐ সব ঘোড়ার গাড়ি করে পর্দা বজায় রেখে মেয়েরাও তখন এখানে ওখানে যাতায়াত করতেন। আজ পর্দার সঙ্গে সঙ্গে পাল্কি-গাড়িও অদৃশ্য। আশ্চর্য, ঢাকার সব গাড়িই পাল্কি-গাড়ি— আমাদের ছাত্রাবস্থায় ঢাকায় কোন রকম ফিটন-গাড়ির চেহারাই আমরা দেখি নি। আজো ঢাকায় যাত্রীবাহী ঘোড়ার গাড়ি যা আছে সবই পাল্কি-গাড়ি। অথচ চাটগাঁর রাস্তা থেকে ঐ গাড়ি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন।

কথা ছিল রোগিণীকে দেখে আমরা সে গাড়িতেই ফিরে আসব। তাই গাড়িটা রেখে দেওয়া হয়েছিল। এর আগে আমি যাকে জল-বসন্ত বলে তা দেখেছি, নিজেও বোধ করি ছোটকালে জলবসন্তে ভুগেছি। কিন্তু আসল বসন্তের আক্রমণ সর্বদেহব্যাপী হলে তা যে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য সে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। এখানে এ প্রথম সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আমি এমন অভিভূত হয়ে পড়লাম যে, তেমন অভিভূত জীবনে আমি কখনো হই নি। আমি ছোটকালে, যখন মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখন কাজী বাড়ি এসেছি, তখন থেকেই রয়েছি মাহমুদা খাতুন চৌধুরানীর স্নেহচ্ছায়ায়। তাঁর ছেলেমেয়েরা, একমাত্র বড়টি ছাড়া,


www.pathagar.com

আর সবাই আমার সঙ্গে, আমার চোখের সামনেই বড় হয়েছে। সকলের, বিশেষ করে শেষের পিঠোপুঠি মেয়ে দু'টির যৎসামান্য যা লেখা পড়া তাও হয়েছে আমার কাছেই। এরা সকলেই আমাকে জানে বড় ভাইয়ের মতো। ফলে, এক অচ্ছেদ্য স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এদের সঙ্গে। এ দুই বোনের বড়টি আজ এ ভয়াবহ রোগের শিকার হয়ে অর্ধ-মৃতা অবস্থায় পড়ে আছে বিছানায়। এ দৃশ্য দেখেই আমি অভিভূত হয়েছি। মৃত্যুর কথা ভেবে নয়। এ রোগের হিংস্র থাবা যে কি কদর্য আর ভীতিপ্রদ দৃশ্যের সৃষ্টি করতে পারে তা দেখেই আমার সমগ্র সত্তা অমনভাবে মোচড় দিয়ে উঠেছিল। রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে মাত্র কয়েক মিনিট দাঁড়াতে পেরেছিলাম। তখন চোখের জল কি ভাবে রুখে রেখেছিলাম আজ আর তা বলতে পারব না। মেয়েকে ঐ অবস্থায় ফেলে মাহমুদা খাতুন সাহেবা আমাদের সঙ্গে এলেন না। তিনি রয়ে গেলেন মেয়ের সেবা-যত্নের জন্য। আমরা দু'জন ঐ গাড়ি করেই ফিরে এলাম। গাড়িতে উঠে নীরবে পেছনের সিটের কোনা ঘেঁসে যে মাত্র বসে পড়েছি তখনই দরদর করে আমার দুচোখ বেয়ে জলধারা নেমে এলো। সারাপথ ফুলে ফুলে আমি শুধু কেঁদেই চল্লাম— রোগিণীকে দেখার পর থেকে না পেরেছি একটা কথা বলতে, বাড়ি পৌছার আগ পর্যন্ত না পেরেছি চোখের জল সামলাতে। অথচ মেয়েটির আপন বড় ভাই আমার সামনের সিটে বসে সারাপথ শুধু বিড়িই ফুঁকেছে। জীবনে এমন কান্না আর কখনো কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না। কেন এ কান্না, কারণ বিশ্লেষণ করতে পারব না। শুধু মনে আছে— চাঁদগাঁও থেকে কাজীর দেউড়ি সারাপথ গাড়ির কোনায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে চোখের জল ফেলেছি। এ কান্নার স্মৃতি আমি জীবনে ভুলতে পারিনি। এমন অকারণ কান্নাও বোধ করি আর কোনদিন কাঁদিনি।

মেয়ে একটু ভালো হয়ে ওঠার পর সপ্তাহখানেক বাদে মাহমুদা খাতুন সাহেবা ফিরে এলেন। কিন্তু এলেন গায়ে জ্বর নিয়ে। একদিন পার হতে না হতেই তাঁর গায়েও দেখা দিলো বসন্তের গুটি। দেখতে দেখতে বাড়ির সবাই হল বসন্তের শিকার— ছেলেবুড়ো, মেয়েপুরুষ বাদ গেলো না কেউই। সে এক অদ্ভুত আর দুঃসহ অবস্থা। এক চোখ কানা একটা চাকর ছিল সে তো ভয়ে ঘরেই ঢোকে না— পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কি এক রহস্যময় কারণে সারা বাড়িতে একমাত্র আমিই ছাড়া পেলাম এ রোগের আক্রমণ থেকে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সব দায়িত্ব এসে পড়লো আমার উপর। পাঁচটা বিছানায় পাঁচটা রোগী পড়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে— একবার একে দিতে হচ্ছে পানি আর একবার ওকে। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করা আর খাওয়ানো সবই আমার ঘাড়ে। ধারে কাছে নেই কোন আত্মীয়-স্বজন— এ অঞ্চলে তখন জায়গা জমির কোন দামই ছিল না, এখানে ওখানে ওদের দু'এক ঘর প্রজা ছিল বটে কিন্তু কোন খাজনা-পত্তর দিত না। এরা শহরের পরগাছা, নিজস্ব বাস্তু-ভিটাও এদের নেই। অত্যন্ত গরিব, পুরুষেরা সাহেবদের বয়-বেয়ারা, বাবুর্চি, খানসামার কাজ করে। মালিকের অনুমতি নিয়ে কোন রকমে এক একটা দোচালা কুঁড়ে বেঁধে থাকে। ওদের এক ঘরের এক বর্ষিয়সীকে ডেকে অনেক অনুনয় বিনয় করে রাজি করালাম, আশ্বাস দিলাম সে এসে সাগু বার্লিটা আর আমার জন্য দু'বেলা দুটো ডাল-ভাত রেঁধে দেবে শুধু। তাকে আর কিছুই করতে হবে না, এমনকি রোগীর ঘরে ঢোকারও তার দরকার নেই। সৌভাগ্যবশত রান্নাঘরটা শোবার ঘর থেকে বেশ দূরে। বোধকরি সে কারণেই ও রাজি হল।


www.pathagar.com

আশ্চর্য, রোগের আক্রমণটা প্রচণ্ডতম হলো বাড়ির অনূঢ়া কনিষ্ঠা মেয়েটির উপর। ওর সারা দেহে তিল ধারণের রইল না জায়গা। বাদ যায় নি চোখের পাতা দুটোও। চোখ দুটাকে বাঁচাবার জন্য অনবরত দিতে হচ্ছে থেৎলে নিয়ে পুটলি বাঁধা পিঁয়াজের ভাপ। সব আড়াল, সঙ্কোচ, সংস্কার, বাধা যে কখন পালিয়ে গেল তা টেরও পাই নি। সকলের সব কিছু আমাকেই করতে হচ্ছে— কোন উপায়ই নেই, আমার যেমন তাদেরও তেমনি।

ব্যারামের সূচনার দিকে মা মেয়েকে ডেকে অবশ্য বলে দিয়েছিলেন : শমছা, করবলার দিন শরম করার কোন মানে হয় না। কোন শরম করবে না মা। এখন আল্লাহ ওকে ভাল রাখলেই হয়। শমছা ওর ডাক নাম— ভাল নাম নূরজাহান।

সেবা-যত্নের বিশেষ করে এ রোগের কোন অভিজ্ঞতা আমারও ছিল না আগে। এমনকি এমন রোগীর সান্নিধ্যেও আমি ইতিপূর্বে কোনদিন আসিনি। মাত্র কয়েকদিন আগে এমন এক রোগীকে দেখে আমি কেঁদে গায়ের সার্টের সামনেটা সম্পূর্ণ ভিজিয়ে ফেলেছিলাম! অদৃষ্টের পরিহাস আজ আমাকেই একা এমন পাঁচ পাঁচটা রোগীকে হচ্ছে সামলাতে। অথচ আজ আমার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। অবস্থা আমার মতো লোককেও অসম সাহসী করে তুলেছে— দায়িত্ব সব কিছুকেই যেন করে দিলে সহজ।

কোথায় গেল আমার ঘুম, কোথায় গেল বিশ্রাম? সব কিছুই বানচাল হয়ে গেল আমার ছক কাটা জীবনের। যাই হোক, আমার শ্রম ব্যর্থ হয় নি— যথা সময় সব ক'জনই এক রকম সুস্থ হয়ে উঠল। বলেছি রোগের প্রকোপটা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল শমছার। কাজেই ওর ফাঁড়া কাট্‌তেই লাগল দেরি। এতদিন ওকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল দিনরাত মশারি ঢাকা দিয়ে— ঔষধ পথ্যও খাওয়ানো হত সে অবস্থায়। ওর অমন চমৎকার চেহারা আর চাঁপা ফুলের মতো রঙ একদম ঝলসে দাগ দাগ হয়ে গেছে। সমস্ত দেহ-শ্রী বিনষ্ট হয়ে সে এক অদ্ভুত প্রেত মূর্তির মতোই দেখাচ্ছে ওকে। দেখে আমার সমস্ত ভেতরটা আঁৎকে উঠলো— কিন্তু ঐ বীভৎস মুখের চোখ দুটিতে ফুটে রয়েছে এক অসীম নির্ভরতা আর নিবেদন।

হঠাৎ মনের ভেতর এক অদম্য নৈতিক বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

আমার জন্য অপেক্ষা করে না থাকলে বা না রাখা হলে কবেই তো ওর বিয়ে হয়ে যেত, ও যে রকম স্বাস্থ্যবতী আর সুন্দরী ছিল নিঃসন্দেহে ভালো ঘরে ও ভালো বরে বিয়ে ওর হতোই। এসেছিলও ঐ রকম বহু ঘর। এখন এ চেহারায় ঐ রকম বিয়ে ওর আর কিছুতেই আশা করা যায় না। বুঝতে পারলাম নিজের অপরাধ। মনে হল আমার সব সাহিত্যই ব্যর্থ— একটা ভড়ং মাত্র। মুহূর্তে কেটে গেল মনের এতদিনকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব— মনে মনে করে বসলাম সিদ্ধান্ত।

কিন্তু সর্বাগ্রে চাই কিছুটা জীবিকার সংস্থান। একদিন বিকেলে সদরঘাট থেকে বেড়িয়ে ফিরছি, হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল আমার পূর্বতন শিক্ষক শামসুল ওলেমা কামালউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে। তিনি তখন চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টার — সদরঘাটে, কর্ণফুলি নদীর কাছেই বাসা, অফিস শেষে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন।

সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলেন : কি করছ?


www.pathagar.com

বল্লাম : বি. টি. পাস করে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বল্লেন : কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় মৌলবী দিন কুড়ি ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছে, এ কয়দিনের জন্য ওখানেই যাও।

অবাক হয়ে বল্লাম : দ্বিতীয় মৌলবীর পদে! আমি তো ফারসির কিছুই জানি না, আরবি যা পড়েছিলাম চর্চার অভাবে তাও গেছি ভুলে।

তাঁর অভ্যাস ছিল চোখ বড় বড় করে কথা বলা। তেমনি করে চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন : ও হো যায়গা, হো যায়গা। তুমি কাল অফিসে এসে আমার কাছ থেকে নিয়োগপত্র নিয়ে যেয়ো। এভাবে দিন কুড়িয়েকের জন্য দ্বিতীয় মৌলবী হয়ে আমি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে যোগ দিলাম। অনেকে অবাক হলো, তখনকার দিনে দাড়ি গোঁফ আর টুপিটাপি ছাড়া প্রথম কি দ্বিতীয় কোন মৌলবীর চেহারাই ভাবা যেত না। আমার তো ওসব কিছুই ছিল না। দ্বিতীয় মৌলবী সাহেব আবার হোস্টেল সুপারিন্টেনডেন্টও ছিলেন। কাজেই আমাকেও হতে হলো তাই। ঢাকা থেকে চাটগাঁ হেঁটে এসে যে হোস্টেলে আমি একবার আত্মগোপন করে ছিলাম এ সেই হোস্টেল।

ভাগ্যে আরবী ফারসির ক্লাসগুলিতে ছাত্র-সংখ্যা ছিল খুব কম— উপরের দিকে তিন চার জনের বেশি নয়। পার্শির ক্লাসগুলি তো গল্প করেই কাটিয়ে দিতাম, আর এ ক্লাসগুলি হতো হেডমাস্টারের অফিস থেকে বেশ দূরে, বাইরের কয়েকটি ছাড়া ছাড়া রুমে। ক্লাসিক্সের ক্লাসগুলি গল্প-গুজবে কাটিয়ে দেয়া তেমন বে-রেওয়াজও ছিল না। তদুপরি আমার মতো আমার ছাত্ররাও জানে আমার মেয়াদ মাত্র কুড়িদিন। কাজেই গল্পে তাদেরও দেখা গেল না অরুচি। এ দিন কুড়ির ছাত্রদের মধ্যে মি: ইদ্রিস (বর্তমানে পুলিসের অতিরিক্ত আই. জি.), অধ্যাপক তোফায়েল আহমদও (বর্তমানে চট্টগ্রাম নাজির হাট কলেজের অধ্যক্ষ) ছিলেন।

যথা সময় কুড়িদিনের মেয়াদ শেষ হয়ে আমি আবার হয়ে পড়লাম বেকার।

কিছুদিন পর খবর পেলাম চাটগাঁ সরকারি মাদ্রাসার এক সহকারী শিক্ষক ছুটি নিয়েছেন দু'মাসের। আমার প্রাক্তন মাদ্রাসা— এখান থেকেই আমি পাস করেছি হাই মাদ্রাসা। অধ্যক্ষ খান বাহাদুর আসাদ সাহেবও এককালে আমার শিক্ষক ছিলেন— কাজেই এ অস্থায়ী চাকরি পেতেও তেমন বেগ পেতে হলো না। তখন মাদ্রাসার সঙ্গে আই. এ. ক্লাস যোগ করা হয়েছে নামও দেয়া হয়েছে চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ। বাংলার জন্য কোন অধ্যাপকের পদ তখনো সৃষ্টি হয়নি বলে— সহকারী শিক্ষকদেরই কেউ একজন আই. এ. ক্লাসেও বাংলা পড়াতেন। আমি যে কয়দিন ছিলাম, বাংলা পড়াবার দায়িত্ব আমাকেই দেওয়া হয়েছিল। ওখানে ইন্টারমিডিয়েট শেষ বর্ষে আজিমউদ্দীনকে পেয়েছিলাম ছাত্র হিসেবে। আজিমউদ্দীন পরে চাঁদপুর কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। পরে আবার ঐ পদ ছেড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন সহকারী কন্ট্রোলার হিসেবে। পরে হন কন্ট্রোলার। এ সেদিন মারা গেলেন ঐ পদে থাকা অবস্থায়। ঐ কলেজে তখন মিঃ আলতাফ হোসেন (বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) ছিলেন ইংরাজির অধ্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র— তাঁর ইংরেজি লেখা আর বলার খ্যাতি


www.pathagar.com

ছিল দেশ জোড়া। প্রধানত আজিমউদ্দীনের তাগাদায় ঐ কলেজেই আমি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করলাম। তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা ওদের পাঠ্য ছিল। কবিতাগুলির মর্মোদ্ধার নাকি তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। মোটামুটি পাঠ্য কবিতাগুলিই ছিল আমার আলোচ্য। বলা বাহুল্য, আমার নির্ভর ছিল চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া নোট— অনেকেই জানেন এ নোটগুলিই পরে 'রবিরশ্মির' অঙ্গীভূত হয়েছে। আমার এ লেখা কোথাও ছাপা হয়নি আজ তার চিহ্নও অদৃশ্য।

দেখতে দেখতে এ দু' মাসও খতম হয়ে গেলো। আবার সম্মুখীন হলাম বেকারির। মনে মনে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছি এ কারণে তা আর বাস্তবায়িত করাও হচ্ছে না সম্ভব। অবশ্য আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে কন্যা পক্ষকে আমি করে রেখেছি নিশ্চিন্ত।

মাদ্রাসা পাহাড়টার ঠিক নিচেই কাজেম আলী হাই স্কুল-- ষেসরকারি হাই স্কুল। তখন হেডমাস্টার ছিলেন মি: আবুল খায়ের। আজ তিনি পরলোকে। বি. টি.-তে তিনি আমার সহপাঠি ছিলেন। খবর দিলেন তাঁর স্কুলে সহকারী হেডমাস্টারের পদ খালি পড়েছে— আমি চাইলে অস্থায়ীভাবে যোগ দিতে পারি।

তথাস্তু। যোগ দিলাম। মাইনে বোধ করি ষাট টাকা। মনে হল কিছুকাল নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। আমি তো থাকি কাজী বাড়ি, ঘর ভাড়া কি খাই-খরচা কিছুই লাগে না। সময় বয়ে চলেছে— এসে গেছে ১৯৩২। কন্যা পক্ষের তাগাদা তীব্রতর হয়ে উঠলো। অগত্যা সম্মতি দিতে হলো দিন ধার্যের।

একদিন বিনা আড়ম্বরে বিনা অলঙ্কারে কোনরকম দামি শাড়ি ইত্যাদি ছাড়া ঘরোয়াভাবে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলো। আটপৌরে আসকান পাজামা ছাড়া আমারও হল না নতুন পোশাকে বর সাজা। মেয়ের মা আর বড় বোন ছাড়া দু'পক্ষের মুরুব্বিরা ছিলেন অনুপস্থিত। আমার পক্ষ থেকে শরিক হয়েছিলেন কেবল আমার দুই ভগ্নিপতি।

সব চেয়ে বেশি খুশী হলেন মা মাহমুদা খাতুন চৌধুরানী— তাঁর জীবনের এক বড় বাসনা চরিতার্থ হল। আমিও যেন স্বস্তি পেলাম দ্বিধা আর নৈতিক দায়িত্ব মুক্ত হয়ে।

ওকে নিয়ে নৌকা করে দেশে মার কাছে গেলাম। কয়েকদিন ওখানে কাটিয়ে মামার বাড়ি ঘুরে, ট্রেনে চড়ে আবার সাবেক আস্তানা কাজী বাড়ি ফিরে এলাম উভয়ে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম-দোহাজারী রেল লাইন চালু হয়েছে।

এবার রীতিমতো সংসার করতে হবে। তাই শাশুড়িকে জানালাম— এবার আমি আলাদা বাসা করবো। দু'জন মানুষ এভাবে আপনাদের ঘাড়ের উপর থাকা শোভা পায় না।

তিনি বল্লেন : বেশ, আমি জায়গা দিচ্ছি এখানেই ঘর একটা তুলে নাও। তোমাদের কামরাটার সঙ্গেই তো যথেষ্ট ফাঁকা যায়গা পড়ে রয়েছে ওখানেই তুলে নাও না কেন?

তাঁর ঐ প্রস্তাব আমার মনঃপুত নয়— ঐ হলে অবস্থা প্রায় হয়ে পড়বে ঘরজামাই হওয়ার মতোই। যা আমি হতে চাই না। তিনিও নাছোড়বান্দা। তা হলে তোমার যেখানে পছন্দ— তবে আমার চোখের সামনে থাকা চাই।

তাঁদের বাড়ি থেকে দূরে, একেবারে সদর রাস্তার ধারেই আমি একটা বাসার পরিমাণ জায়গা নির্বাচন করলাম। জায়গাটি রাস্তা থেকে খুব নিচু তবে চারদিক মেলা খোলা, আশে


www.pathagar.com

পাশে কোন ভিড় নেই লোকজনের। সামনের রাস্তার ওপারেই পল্টনের খোলা মাঠ। অদূরে সার্কিট হাউস, চট্টগ্রাম ক্লাব আর পরিচ্ছন্ন রেলওয়ে এলাকা। বেড়াবার জন্য ভারি চমৎকার জায়গা। কালক্রমে এ জায়গাটুকু হয়ে উঠেছে আমার চিরস্থায়ী বাসস্থান।

কয়েক মাসের মাইনের টাকা জমিয়ে তা দিয়ে মাটি ভরিয়ে তার উপর বাঁশের একটা চৌচালা ঘরের ভিত পত্তন করলাম। বেড়া লাগানো হয়েছে, চাল টাঙানো হয়েছে, শুধু দরজা জানালাগুলিই বাকি। চারদিকে মেলা খোলা, ঘেরা-বেড়া ছাড়া মেয়েছেলে থাকবে কি করে? তাই দেওয়া হচ্ছে। দিনের মধ্যে কয়েকবারই শমছা তাদের বাড়ির পাঁচিলের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ নতুন ঘরটা কতদূর উঠেছে, কাজ কতদূর এগিয়েছে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখত। ঐখানে গিয়ে কবে সে নিজস্ব সংসার গড়ে তুলবে এ আশায় যেন গুনছিল দিন।

মার কাছে প্রায় বায়না ধরতো : রাত্রে আমি গিয়ে একবার দেখে আসি, মা?

মা কিছুতেই রাজি হতেন না। বলতেন : এ অবস্থায় একটা ছাড়া-ভিটায় যাওয়া ভালো না। ঘরের সব কাজ কাম শেষ হোক, জায়গাটা চারদিকে বন্ধ করা হোক (ভিটায় চারদিকে দোয়া-দরুদ পড়ে পেরেক ইত্যাদি পুঁতে জ্বীন-পরী আসার পথ বন্ধ করার সংস্কারকেই ভিটা-বন্ধ করা বলা হয়), তারপর তুই গিয়ে মিলাদ পড়াবি।

নতুন তৈয়ারি ঘরটা কেমন হয়েছে, কামরাগুলো কত বড় করা হয়েছে তা দেখার জন্য একদিন আমার সমানেই পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলে মা ধমক দিয়ে বল্লেন : এ অবস্থায় সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হলে জ্বিন-পরীর নজর পড়ে, তাই বের হওয়া মানা। তারপর একটুখানি মুচকে হেসে বল্লেন : মাস দুই পরে তো আমার নাতি-নাতনিকে কোলে নিয়েই যেতে পারবি। শুনে সলজ্জ হাসি গোপন করে ও সরে পড়ল ওখান থেকে।

ও তখন সাত-আট মাসের অন্তসত্ত্বা।

ঘরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে— দরজা-জানালা লাগিয়েছি, লেপা-পোঁছা চলছে।

হঠাৎ একদিন ওর এমন স্রাব শুরু হল যে কিছুতেই তা বন্ধ হল না। হাতের কাছে ডাক্তার কবিরাজ যা পাওয়া গেলো ডাকা হলো, দোয়া-দরুদ তো শুরু থেকেই লেগে আছে। কিছুতেই স্রাব বন্ধ করা গেল না, করান গেলো না প্রসবও। কয়েক ঘন্টা দারুণ সংগ্রামের পর ও নেতিয়ে পড়ল— চোখ বুজলো চিরকালের জন্য। তার জন্য বাঁধা ঘর তার আর দেখাই হল না জীবনে। কন্যাকে হারিয়ে মাহমুদা খাতুন যত না মুহ্যমান হলেন আমাকে চিরতরে হারাবার ভয়ে যেন আরো বেশি দিশেহারা হয়ে পড়লেন এবার। এরপর আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কাঁদতেন। তিনি সারাটা জীবন নিজের পৈত্রিক বাড়িতে কাটিয়েছেন তবুও নিজেকে মনে করতেন একা অসহায়। মা রমিজউন্নিসার মৃত্যু হয়েছে আগে। বিয়ের পর দুই মেয়ে চলে গেছে শ্বশুর বাড়ি, বড় ছেলেটি লেখাপড়া তেমন করেনি, অনেকটা বাউণ্ডুলে উড়ু উড়ু স্বভাবের ঘর-পলানো স্বভাব। ছোট ছেলে খুবই ছোট— নিচের দিকে স্কুলে পড়ে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় যান্ত্রিক। ফলে সব সময়



www.pathagar.com

নিজেকে বড্ড নিঃসঙ্গ মনে করতেন। অসুখ-বিসুখ হলে— অসুখ-বিসুখ তো তার প্রায় লেগেই থাকতো, আমাকেই করতে হত তাঁর দেখাশোনা আর সেবা যত্ন। হয়তো এসব কারণেই আমাকে মনে করতেন তাঁর একমাত্র অবলম্বন। মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত না থাকলে অত্যন্ত অযত্ন অবহেলার মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটবে— এ এক অদ্ভুত ভয় তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল। তাঁর আরজু অপূর্ণ থাকে নি— আমার সামনেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে সেবা করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

দুনিয়াতে কিছুই থেমে থাকে না— দিন যায় দিন আসে। ধীরে ধীরে সরে যায় শোকের আঘাতও। মন মেনে নেয় সব অবস্থা— মন অবস্থার দাস কথাটা মিথ্যা নয়, তা বারে বারে নতুন করে প্রমাণিত।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাড়ির কাজ আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এখানে আমার আর থাকার কোন মানে হয় না। শোভাও পায় না। এ জা'গার উপর আমার আর হক রইল কোথায়? শাশুড়ি কিন্তু বার বার বলতে লাগলেন— তুমি আমার চোখের সামনে থাকলে আমার মনে হবে আমার মেয়ে বেঁচে আছে, তোমাকে দেখে আমি কন্যাশোক ভুলতে পারব। তুমি আবার যে মেয়েকেই বিয়ে করে আনো তাকেই আমি আমার মেয়ে বলে মনে করবো। বুঝলাম এ সবই মনকে চোখ ঠা'রানো। তবুও তাঁর স্নেহ যে আন্তরিক ও অকৃত্রিম এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার মন কিন্তু কিছুতেই সায় দেয় না— কেন আমি তাঁর জায়গা নেবো, তাঁর মেয়ে নেই, মেয়ে রেখে যায়নি কোন সন্তান, কোন নিদর্শন। তাঁর জমির উপর আমার দাবী কি? মনের এ দ্বিধা আমার কিছুতেই কাটতে চায় না। অবশ্য শহরে যখন চাকরি করছি বাসা একটা আমার দরকার বই কি। যতই আমি এখানে স্থায়ীভাবে বাসা করে থাকতে অস্বীকার করি ততই তিনি চোখের জল ফেলতে থাকেন আর এক নিদারুণ হতাশায় দিন দিন যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে থাকেন।

অগত্যা তাঁকে একদিন আমার মনের কথা খুলেই বল্লাম : আপনার মনের এ ভাব চিরকাল থাকবে না, থাকতে পারে না। আপনার নিজের থাকলেও আপনার উত্তরাধিকারীদের তা থাকবে কেন? সব সময় একটা বেওয়ারিস মানুষকে চোখের সামনে এভাবে তাদের জায়গা দখল করে থাকতে দেখলে তাদের মনে আপত্তি জাগা খুবই স্বাভাবিক। সে আপত্তি ঈর্ষা বিদ্বেষে পরিণত হতেও কতক্ষণ?

তবুও তিনি নাছোড়বান্দা। জোর দিয়ে বল্লেন : ও কিছুতেই হতে পারে না। তবুও তোমার ভয় থাকলে জা'গাটা তোমাকে এখনই রেজেস্ট্রি করে দেওয়া হবে। আর দলিলে আমার ছেলেদেরও বলব সই করতে। এখন রাজি তো?

তখন তাঁদের সম্পত্তির ভার ছিল তাঁর বড় জামাইয়ের হাতে। তাঁকে ডেকে বলে দিলেন— আমি যেখানে ঘর তুলেছি সে জায়গাটা যেন চৌহদ্দি শুদ্ধ আমাকে অবিলম্বে রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয়।

এ জমির উপর প্রথমে যে কাঁচা ঘর তুলেছিলাম তাতে আমি বহু বছর কাটিয়েছি। পরে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সামান্য আগে গৃহনির্মাণ করপোরেশন থেকে ঋণ নিয়ে তার সঙ্গে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চয় আর অর্ধেক পেনসন-বেচা টাকা যোগ করে বর্তমান বাড়িটা করি— যার নাম এখন 'সাহিত্য নিকেতন'।



www.pathagar.com

কাজী বাড়ি সম্পর্কে কিছুটা দীর্ঘ করে বলার কারণ এ বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সব চেয়ে নিবিড় ও সব চেয়ে দীর্ঘ, এমন আদর-স্নেহও আমি অন্য কোথাও পাই নি। আর এ বাড়ির পটভূমিতে রচিত হয়েছে আমার অনেক লেখা, এমন কি আমার প্রথম উপন্যাস 'চৌচির'ও। জীবনে রোমাঞ্চের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ও ঘটে এখানে। তীব্র আবেগ-অনুভূতির অভিজ্ঞতা ছোট বড় সব শিল্পীর জন্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের সত্যকে মিশাতে গেলে কোন সত্যেরই কুলকিনারা পাওয়া যাবে না। সাহিত্য সব সময় কল্পনা-নির্ভর।

এ সময় আমার বন্ধু আবদুল হক ফরিদী চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আরবি-ফারসির লেকচারারের পদ পেয়ে চাটগাঁ এলেন। এ ওর প্রথম সরকারি চাকরি। দেখা দিল ওর থাকার সমস্যা। কাজী বাড়ি ছাড়ার একটা অজুহাত পেয়ে গেলাম। কোন পক্ষে কোন আশা নেই, নেই তেমন কোন বন্ধন— আর কতদিন এ ভাবে ওদের অন্ন ধ্বংস করব। কাজেম আলী স্কুলের মাস্টারি তো এখনো বাহাল আছে। তাই তাড়াতাড়ি আমার নতুন ঘরটার বাকি কাজগুলি সেরে ফেলে এবার ওখানেই ফরিদীকে নিয়ে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে স্বাধীনভাবে শুরু করলাম বসবাস। ফরিদী আমাদের বাসাটার নাম দিল পল্টন কটেজ। সামনে পল্টন মাঠ। তাই এ নাম। কাজেম আলী স্কুলের ছেলেরা হাতে লেখা একটা কাগজ বের করবে, আমার কাছে কিছু লেখা চাইল। 'মানুষ' নামে ছোট্ট একটি লেখা ওদের দিয়েছিলাম। পরে ঐ লেখা অন্য কাগজেও ছাপা হয়েছে। একদিন কাজেম আলী স্কুলের অস্থায়ী চাকরিও শেষ হয়ে গেলো। বোধ হয় প্রায় এগারো মাসের মতোই ওখানে ছিলাম। আবার শুরু হল বেকারি— স্বাধীনভাবে বাসা করে থাকছি, কাজেই আগের মতো গড়িমসি করা চল্লো না। শুরু করলাম ইন্সপেক্টার অফিসে হাঁটাহাঁটি। মুসলিম শিক্ষার সহকারী ইন্সপেক্টার বল্লেন— সীতাকুণ্ড হাই মাদ্রাসার হেড মাস্টারের পোস্ট খালি আছে, যদি যেতে চান দিতে পারি। তবে মাইনে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। তার বেশি দেওয়ার সামর্থ নেই মাদ্রাসার।

তাই সই— বেকারির চেয়ে বেগারিই ভালো।

গিয়ে দেখলাম সীতাকুণ্ড সুন্দর জায়গা। স্টেশন থেকেও কাছে— যখন ইচ্ছা শহরে আসা যায়। মস্ত বড় দীঘির এক পাড়ে মাদ্রাসা অন্য পাড়ে হাইস্কুল। তাতে ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবও নাকি একদিন হেডমাস্টারি করেছেন (১৯১৪-১৫)। মাদ্রাসা আর হাইস্কুল দুই-ই মরহুম মওলানা ওবায়দুল হকের কীর্তি। যেসব আরবি শিক্ষিত মৌলবী মওলানা, নিজেরা ইংরেজি শিক্ষিত না হয়েও, বাংলাদেশে ইসলামী বিদ্যার সাথে সাথে ইংরেজি বিদ্যা বিস্তারেও উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার মধ্যে সীতাকুণ্ডের এ মওলানা ওবায়দুল হক অন্যতম। এখন সমাজ সেবা করে লোক রাতারাতি ধনী হয়ে যায় তখন অর্থাৎ মওলানা ওবায়দুল হকদের সময় সমাজ সেবা করে লোক নিঃস্ব হয়ে যেতো। মওলানা ওবায়দুল হকের প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুল আর মাদ্রাসা দুই-ই পাকা, এমন কি দীঘির ঘাট দুটিও পাকা! কিন্তু তাঁর নিজের ঘর কাঁচা, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি কিছুই দিয়ে যেতে পারেননি। আমি যখন ওখানে গিয়েছি তখনও তাঁর এ পুত্রকে আমি মাদ্রাসার প্রাইমারি বিভাগে মাস্টারি করে কায়ক্লেশে সংসার চালাতে দেখেছি।



www.pathagar.com

মাদ্রাসার সামনেই বড় রাস্তা, রাস্তার ওপারে আর একটা বড় দীঘি, সে দীঘির পাড়ে লম্বা একটা দো-চালা কুঁড়ে ঘর মাদ্রাসার হোস্টেল। তারই একটা কামরা আমাকে দেওয়া হল থাকার জন্য। হেডমাস্টারের ঐ কোয়ার্টারস্। মাইনে পঞ্চাশ টাকা হলে কি হবে, আর সে পঞ্চাশ টাকাও তো নিয়মিত পাওয়া যায় না— নিজে একটা চাকর রেখে আলাদা রান্না করিয়ে নিয়ে খাই। সস্তার যুগ বলে ঐ টাকা দিয়ে বেশ আরামেই ছিলাম। দুধের সের চার পয়সা থেকে ছ'পয়সা— সদ্য দু'ইয়ে আনা খাঁটি দুধ। দু'আনার মাছ কিনলে দু'বেলা খেয়ে আরো কিছু বিলি করা যায়।

মাইনে কম হলেও নিজেই নিজের কর্তা, মাদ্রাসায়ও তাই — একা, নির্ঝঞ্ঝাট, দিন কাটছিল বেশ আরামে। কি জানি কেন তখন কোন উচ্চাশাই হানা দেয়নি। শুধু বাম হাতের দুই আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে ডান হাতে লিখতে থাকার একটা ছবি মাঝে মাঝে মনে উঁকি মারত। একবার আস্ত একটিন 'গোল্ড ফ্লেক' সিগরেট কিনে, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রীতিমতো অভ্যাস করতে শুরু করলাম। দু'একদিনেই বিরক্তি ধরে গেলো; মোটেও ভালো লাগে না, ফুসফুসে যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে বাকি সিগারেটগুলো অন্যদের বিলি করে দিলাম। আমার বাবাও ধূমপান করতেন না। শুনেছি পিতামহও না। যতদূর মনে পড়ে 'নারী ও পুরুষ' উপন্যাসটির, পরে যার নাম হয়েছে 'জীবন পথের যাত্রী', প্রথম খসড়া সীতাকুণ্ডে, আমার ঐ কুঁড়ে ঘরের নির্জন কামরাটিতে বসেই করা।

হয়তো মার তাগাদাতেই, এবার মামুরাই আমার বিয়ের জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে যে বিয়ে করেছিলাম তা সফল হয়নি, অকালে তার সমাপ্তি ঘটেছে। এবার তাই সংকল্প করলাম নিজে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকবো— 'মুরুব্বিরা যা করেন তাই ভালো' এ নীতিকেই নেবো মেনে। তাই মেয়ে দেখতে কেমন, তা খোঁজ নেওয়ারও দরকার মনে করলাম না। বলেছি পটিয়া থানার হাশিমপুর গ্রামেই আমার নানা বাড়ি। ঐ গ্রামের নায়েব বাড়ি সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত ঘর, আমার দুই মামু ঐ বাড়িতেই বিয়ে করেছেন। পাত্রী মামিদের ভাগ্নী, তবে পিতৃহীনা। মামিরা সুন্দরী— তাঁদের ভাগ্নীও সুন্দরী হবে এ আমি না দেখেই অনুমান করে নিয়েছিলাম। এবার কপালটাকে মুরুব্বিদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু সম্মতি জানিয়েই থাকলাম নিশ্চিন্ত।

নির্দিষ্ট দিনে বাড়ি থেকে বরযাত্রী বাহিনী নিয়ে তাঞ্জামে চড়ে বিয়ে করতে এলাম। তখনকার রেওয়াজ অনুসারে ধান কাটা বিলে হিমেল বাতাসে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতে হলো। সে যুগে বিশেষ করে বড় বাড়ির বিয়ে শাদীতে এরকম দুর্ভোগ প্রায় অপরিহার্য ছিল। এ কারণেই বোধ করি গ্রাম দেশে তখন 'ভাত খেয়ে বৈরাত্ যাওয়া' একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছিল। বোধ করি রাত বারোটা কি একটায় ডাক পড়লো আসন গ্রহণের। তারপর আমাদের দেওয়া জিনিস পত্র দেখানো হল, আক্দ হল, খাওয়া হল। এবার আমাকে নিয়ে গেল ভেতর বাড়িতে 'মুখ দেখাতে'। বুক দুরু-দুরু করতে লাগলো— কি দেখবো, কেমন দেখবো কে জানে, দেখতে যাচ্ছি সম্পূর্ণ অপরিচিত একখানা মুখ, সে মুখ কেমন? কে যেন আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, বুঝতে পারলাম আমার হাতখানি কাঁপছে। আনন্দে, পুলকে না শঙ্কায়, সে কথা আজ আর মনে নেই। ঘরে ঢোকার পর যেখানে বসতে বল্লো সেখানে বসলাম। দেখলাম আমার সামনে আপাদমস্তক


www.pathagar.com

আমাদের আনা রেশমী গাড়িটায় ঢাকা বসে আছে আরো একটি প্রাণী। বুঝলাম এই নব বধূ, আমার ভাবী জীবন সঙ্গিনী।

কে একজন ওর ঘোমটাটা তুলে ধলে আমাকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে হুকুম করলো। দেখলাম দেখে খুব খুশি হতে পারলাম না। মুখখানি কিছুটা ম্লান আর নিষ্প্রভ মনে হল। বয়সও মনে হল কম। তবুও কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণের একটা দীপ্তি ও প্রাণ-চাঞ্চল্যের আভাস দেখতে পাচ্ছি না কেন? এমন ঝলমলে পোশাক আর অলঙ্কারেও ওর চোখ-মুখ হাসি-খুশিতে কেন ঝলমল করছে না? আগেই জেনেছি ওর নাম সাজেদা খাতুন। সাজেদা শৈশবেই পিতৃহীনা। মা আর নানী, এ দুই বিধবার কাছেই ও মানুষ। ঐ কারণেই কি ওকে কিছুটা মনমরা দেখাচ্ছে এ বিয়ের দিনেও?

বাড়ি গিয়ে ওকে ভালো করে দেখার পর এসব প্রশ্ন মনে আর স্থান পায়নি। দেখলাম, ও সত্যিই গ্রাম্য শরীফ ঘরের অতি ভালো মেয়ে, সব ব্যাপারেই সংযত, চলায়, বলায়, আচারে, ব্যবহারে কোথাও বাড়াবাড়ির লেশমাত্র নেই। কথার মতো হাসিটাও যেন ওজন করা। মনে হল ওর দ্বারা জীবনে কারো কোন অশান্তি ঘটবে না। দু'চার দিনেই বুঝা গেল ও যেমন সংযত তেমনি সঞ্চয়ীও। নষ্ট করে না কিছুই। অবহেলা নেই কোন কিছুর প্রতি। পুরোপুরি যেন গৃহলক্ষ্মী। কাজেই প্রথম নৈরাশ্য আমার কেটে যেতে দেরি লাগলো না।

ছুটি শেষ হতেই আমি ফিরে এলাম সীতাকুণ্ড।

এ সময় কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম— প্রেসিডেন্সী বিভাগে এক ভার্ণাকুলার শিক্ষকের পদ খালি, মাইনে পঞ্চাশ থেকে একশ কি একশ দশ। মুসলমান আর বি. টি. হলে দেওয়া হবে অগ্রাধিকার। বিজ্ঞাপনের নিচে সই ছিল কে. আহমদ। অর্থাৎ শামসুল ওলেমা কামালউদ্দীন আহমদ। তখন তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টার। কি মনে করে দরখাস্ত একটা পাঠিয়ে দিলাম। এখানেও তো পঞ্চাশ টাকাই পাচ্ছি আর তাও তো নিয়মিত মেলে না। ঐখানে অন্তত নিয়মিত মিলবে। এসব ভেবেই হয়তো দরখাস্তটা করেছিলাম।

এ সময় আমার 'চৌচির' বইটা ছাপার খেয়াল আমাকে প্রায় পেয়ে বসেছিল। প্রকাশক তো জুটবে না জানা কথাই। ছাপতে হবে নিজের খরচে। মনে মনে এ ঝুঁকি নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে কলকাতায় কবি আবদুল কাদিরকে লিখলাম কোন প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিতে। কাদিরের এক সহপাঠি সুরেশচন্দ্র দাস কলকাতায় অবিনাশ প্রেস নামে এক প্রেস দিয়ে সবে মাত্র বসেছে। কাদিরের প্রস্তাবে সে সানন্দে রাজি হলো বইটি ছেপে দিতে আর রাজী হল কিস্তি করে টাকা নিতে। আমার প্রতি সব চেয়ে বড় অনুগ্রহ হল ঐটি। পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলাম, ছাপা শুরু হয়ে গেল। মুদ্রিত প্রথম ফর্মাটা যখন হাতে পেলাম তখন আনন্দে পুলকে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় উড়তে লাগলাম। চাকরির দরখাস্তের কথা প্রায় ভুলেই ছিলাম— যদিও নিচের দিকের চাকরিতে বয়সের তেমন বাঁধাধরা কড়াকড়ি ছিল না, তবু আশা করারও তেমন কোন সুনিশ্চিত কারণ মনে জাগে নি। অবশ্য দরখাস্ত করার পর পরই হবীবউল্লাহ বাহারকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম এ সম্পর্কে— পরে শুনেছিলাম বাহার ওর বোন শামসুন্নাহার মাহমুদকে দিয়ে শামসুল ওলেমাকে আমার কথা বলিয়েছিলেন।

একদিন দেখি সত্য সত্যই এক নিয়োগপত্র এসে হাজির। আমাকে নিয়োগ করা


www.pathagar.com

হয়েছে খুলনা জেলা স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে। নিয়োগ পত্র পেয়ে চক্ষু আমার চড়কগাছ। প্রেসিডেন্সী বিভাগ মানে মনে করতাম কলকাতা— হয়তো ওখানকার কোন স্কুলেই হবে ভেকেন্সিটা! এমনি একটা অকারণ বিশ্বাস মনে কেন যেন করে বসেছিলাম। কলকাতা তখন আমাদের, বিশেষ করে লেখকদের স্বপ্নপুরী— ওখানে যে কোন রকমের চাকরি পাওয়াটাকে মনে করতাম দুর্লভ সৌভাগ্য।

আর এখন কি-না আমাকে যেতে বলা হচ্ছে খুলনা— খুলনা কি করে, কোন্ পথে যেতে হয় তাও আমার অজানা। জানাশোনা কেউ আছে বলেও মনে পড়ছে না।

কে একজন বল্লেন : পথের কথা স্টেশন মাস্টার বলতে পারবেন।

বিকালে গিয়ে স্টেশন মাস্টারের কাছে খোঁজ নিলাম। তিনি বল্লেন : চাটগাঁ থেকে ট্রেনে চাঁদপুর। চাঁদপুর থেকে স্টিমারে বরিশাল, বরিশাল থেকে আর এক স্টিমারে খুলনা। সময় লাগে প্রায় দু'রাত একদিন। রীতিমতো ঘাবড়াবার কথা।

মাত্র কয়েক মাস আগে নতুন বিয়ে করেছি, বাড়িতে বৌ আর মা একা, নিঃসঙ্গ। তাদের ছেড়ে যেতে হবে ঐ দূর দেশে। মাইনে পঞ্চাশ টাকা হলে কি হবে, তখনো চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জের, ফাইভ্ পার্সেন্ট কাট্ এরি নাম 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে উলুখড় প্রাণে মরে'। অর্থাৎ আমি পাব সাড়ে সাতচল্লিশ টাকা, এখন যা পাচ্ছি তার থেকে আড়াই টাকা কম! মহা দ্বিধা ভাবনায় পড়ে গেলাম। বাড়ি এসে বাপ-দাদার কবর জেয়ারত করলাম জানতে চাইলাম মার মতামত।

মা বল্লেন : তোমার বড় মামুকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো। তিনি কি মত দেন দেখো। মামু নিজেও সরকারী চাকরি করেন, ছোট চাকরি— পটিয়া কোর্টের পেশ্কার। প্রতি শনিবার বিকালে বাড়ি আসেন, সোমবার সকালে ফিরে যান।

তাই রবিবারে হাশিমপুরে গিয়ে নিয়োগপত্র তাঁকে দেখালাম।

তিনি খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বল্লেন : সরকারি চাকরি হাতছাড়া করতে আছে? পেয়েছ তোমার বাপের দোয়ায়। মজুরি যদি করতেই হয় হুজুরের করাই ভালো।

বাড়ির মুন্সিকে ডেকে বলে দিলেন : 'দেখো পাড়ায় কোথাও একটা খাসি টাসি পাওয়া যায় কি-না। এনে তাড়াতাড়ি জবেহ করে দাও।' তারপর পাড়ায় আত্মীয়-স্বজন আর মুরুব্বি স্থানীয় যাঁরা ছিলেন একে একে তাঁদের নাম করে রাত্রে খাওয়ার দাওয়াত করতে বলে দিলেন।

ঐ তাঁর চিরকেলে স্বভাব। সামান্য কারণেই খাওয়া দাওয়ার দরাজ ব্যবস্থা করে বসতেন। আর এতেই পেতেন আনন্দ। এত আনন্দের সঙ্গে খাওয়াতে আমি খুব কম লোককেই দেখেছি। নিজে কিন্তু খেতে পারতেন না, ছিলেন কিছুটা পেটরোগা। আমি ভাগিনা— আমার জন্য ঘটা করে মুরগি-খাসি জবাইর কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবুও তিনি তা করতেন।

রাত্রে খাওয়ার পর আমাকে বল্লেন : নতুন চাকরি, যত তাড়াতাড়ি জয়েন করো তত ভালো, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো, সকালে প্রথম গাড়ি ধরতে হবে।

তখনো হাশিমপুর রেল স্টেশন হয়নি। মাইল ছয় হেঁটে কাঞ্চন নগর গিয়েই ট্রেন ধরতে হত আর প্রথম গাড়ি ধরতে হলে রওয়ানা দিতে হত রাত থাকতেই।


www.pathagar.com

তাঁর অনুগত একজনকে ডেকে বলে দিলেন সে যেন মোরগবাঁকের আগেই একটা হারিকেন নিয়ে হাজির হয়, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তুলে দিতে হবে ট্রেনে। এর জন্য বখশিস পাবে। নভেম্বর মাস— শীতের রাত। ভোর রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে ছ'মাইল পথ হেঁটে কাঞ্চন নগরে এসে ট্রেন ধরলাম। যাত্রা শুরু হল সাড়ে সাতচল্লিশ টাকার পথে।

সীতাকুণ্ডে আমি সকলের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলাম— বিশেষ করে মৌলবী সাহেবদের। ওখানে একই বিল্ডিঙে পাশাপাশি— ওল্ড্ স্কিম আর নিউ স্কিম দু'রকম মাদ্রাসাই চালু ছিল। এ দুয়েরই মৌলবী শিক্ষকরা কি জানি কেন আমাকে খুব সমীহ আর শ্রদ্ধা করতেন। অথচ এঁরা ছিলেন মনে প্রাণে ধার্মিক আর আমি ছিলাম ধর্মানুষ্ঠান পালনে অনিয়মিত আর উদাসীন — আমার চালচলনও ছিল এঁদের বিপরীত। এসবই তাঁরা জানতেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে ভালোবাসতেন, একটু বেশি রকম শ্রদ্ধাও যেন করতেন। আজও সেসব শিক্ষকদের কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে তাঁদের চোখে মুখে আনন্দের যে ঝিলিক খেলে যায় তা যে আন্তরিক তা বুঝতে আমার এতটুকু বেগ পেতে হয় না। তাই সীতাকুণ্ড ছেড়ে যেতে মনে বেশ বেদনা বোধ করেছিলাম।

পেছনের দিকে ফিরে তাকালে নিজের সম্বন্ধে শুধু এটুকুই দেখতে পাই : আমি কখনো নিজের সততা হারাই নি আর হারাই নি নিজের আত্মমর্যাদা। পরে এ সম্পর্কে অনেক অযাচিত প্রশংসা অপরের মুখেও আমি শুনেছি।

চাঁদপুর থেকে বরিশাল, বরিশাল থেকে খুলনা— এ দীর্ঘ স্টিমার ভ্রমণটা খুবই ভালো লাগল। জাহাজের কেপ্‌টেন খালাসীরা সবাই প্রায় চাটগাঁর লোক, পরিচয় পেয়ে আদর যত্ন করল। স্টিমার খুব ভোরে গিয়ে পৌঁছলো খুলনা ঘাটে। একটা ঘোড়ার গাড়ি করে জেলা স্কুলের মুসলিম হোস্টেলে গিয়ে উঠলাম। সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে দেখে অবাক, তাঁকে দেখে আমিও খুশির চোটে লা-জওয়াব। বিস্মিত কণ্ঠে বল্লেন, আগে একটা চিঠি দেন নি কেন, তাহলে আমি ছাত্র পাঠিয়ে দিতাম স্টিমার ঘাটে।

: আমি কি জানতাম আপনি এখানে আছেন?

মৌলবী আবুল হাশেম চাটগাঁর লোক— আমার পরিচিত। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে দ্বিতীয় মৌলবী ছিলেন। কিছুকাল আগে হেড মৌলবীর পদে প্রমোশন পেয়ে এখানে এসেছেন। আমি যে একবার চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে দিন কুড়িয়েকের জন্য দ্বিতীয় মৌলবী হয়েছিলাম সে ছিল এঁরই লিভ্ ভেকেন্সি। আমাকে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন, ব্যবস্থা করে দিলেন হোস্টেলে আমার থাকা খাওয়ার।

খুলনা শহরটা দেখে আমার খুশি আর ধরে না। শহরের একদিকে ভৈরব অন্য দিকে রূপসা নদী তর তর করে বয়ে চলেছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অমন তকতকে পরিষ্কার শহর এর আগে আমি কখনো দেখি নি। হোস্টেলটা তো একদম রূপসার পাড়েই, ছাত্রদের অনেকে ওখানে যায় গোসল করতে সাঁতার কাটতে।

একতালা স্কুলটাও সুন্দর। স্কুল লাগাওয়াই ছাত্রদের খেলার মাঠ আর হেডমাস্টারের কোয়ার্টার। চারদিকে রাস্তাগুলিও পরিষ্কার তকতকে। হেডমাস্টার খান সাহেব সিরাজউদ্দীন সাহেবের গুরু গম্ভীর সৌম্য সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তিনি বহুকাল চাটগাঁয়


www.pathagar.com

ছিলেন, সরকারি মুসলিম হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক, পরে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। ছিলেন জুমা-মসজিদ সংলগ্ন ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেলে। নমাজী-কালামী মানুষ, আমার বাবাকে চিনতেন তাঁর পেছনে পড়েছেন অনেক নমাজ। আমার পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হলেন। আমাকে গ্রহণ করলেন আন্তরিক স্নেহের সঙ্গে।

কাজে যোগ দিলাম— ১৭ নভেম্বর ১৯৩৩। এ তারিখেই শুরু হল আমার একলাগা সরকারি চাকরি।

ক্লাসে যাওয়ার আগে হেড মাস্টার সাহেব তাঁর রুমে ডেকে নিয়ে উপদেশ দিলেন : ক্লাসে বেশি হাসবেন না, বজায় রাখবেন গাম্ভীর্য।

তিনি নিজেও ছিলেন খুব গম্ভীর প্রকৃতির। চমৎকার চেহারা টকটকে ফর্সা রঙ কিন্তু মুখে কোনদিন হাসি দেখিনি তাঁর। সব সময় পরতেন আসকান-পাজামা আর রুমি টুপি। তাঁরই বড় ছেলে মুসা আহমদ এখন সিনিয়র সি. এম. পি.— তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র, বোধ হয় ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। সেবার কবি ফররুখ আহমদও ছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী— ঐ স্কুলেরই ছাত্র। যতদূর মনে পড়ে তখন তাঁর বাবা ছিলেন ওখানে পুলিশ ইন্সপেক্টার। তখনকার তাঁর কোন কবিতার কথা আমার মনে নেই, তবে মনে হয় তিনি তৈরি হচ্ছিলেন কবিতা লেখার জন্য। একবার আমি কলকাতা যাচ্ছি শুনে আমাকে হুইটম্যানের এক কপি 'Leaves of Grass' কিনে আনতে বলেছিলেন। বইটি আমি পেয়েছিলাম কি-না আর আদৌ এনেছিলাম কি-না তা আজ আর স্মরণে পড়ছে না।

আমাকে প্রথম দিকে ক্লাস দেওয়া হল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত— উপরের দিকে বাংলা আর নিচের দিকে পড়াতে হত হরেক রকম বিষয়।

তখন খুলনা রীতিমতো হিন্দু প্রধান— স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনও ছিল না মুসলমান।

একজন মুসলমান দ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে এসেছে শুনে প্রথম থেকেই ছাত্র আর শিক্ষক মহলে শুরু হলো কিছুটা কানাঘুষা। পরে অভিভাবক মহলেও উঠল চাপা গুঞ্জন। উপরে হেডমাস্টার মুসলমান, বিভাগীয় ইন্সপেক্টারও তাই, গুঞ্জনটা বোধকরি তাই খুব সোচ্চার হল না। উপরের দিকের ক্লাসেও কিছুটা বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করলাম। তখন আমার তরুণ বয়স, মনে সাহস আর উৎসাহ প্রচুর। তার উপর ছেলেদের প্রতি ছিল আমার অকৃত্রিম স্নেহ। অমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট, ধোপদোরস্ত ছেলে ইতিপূর্বে কোন স্কুলে কি মাদ্রাসায় দেখিনি আমি। দেখলেই মনে হয় সবাই তেল মেখে স্নান করেছে। মাথা আঁচড়িয়েছে, পেট ভরে খেয়ে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরে তবে স্কুলে এসেছে— বুঝতে পারা যায় অধিকাংশই সচ্ছল মধ্যবিত্তের সন্তান। এদের দেখলে না ভালোবেসে, না স্নেহ করে পারা যায় না— এ প্রায় ফুলকে ভালোবাসার মতোই। এমন ফুটফুটে মুখগুলির দিকে তাকালে জাত ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ে না। আপনা থেকেই এদের প্রতি আমার স্নেহ স্বতঃউৎসারিত হয়ে উঠল। ফলে কালক্রমে ঐ স্কুলে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব ছেলেকে আমি চিনতাম, সব ছেলের নাম জানতাম, সকলকে আমি নাম ধরে ডাকতে পারতাম। পারিবারিক আর অভিভাবক আলাপ আলোচনার ফলে এসব ছাত্রের কারো কারো মনে আমার প্রতি প্রথম দিকে কিছু বিরুদ্ধতা থাকলেও তাদের ব্যবহার ছিল


www.pathagar.com

অসীম ভদ্র। আমি চাটগাঁর লোক। অনেকে আমাদের ভাষাকে বাংলা বলেই স্বীকার করেন না— তার উপর আগাগোড়া লেখা পড়া করেছি পূর্ব বাংলায়, যে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছি তাও ঐখানে। এসব কারণে আমার উচ্চারণে ত্রুটি থাকাটা খুব অস্বাভাবিক নয়। গোড়ার দিকের শিক্ষাটা মাদ্রাসায় হয়েছে, ওখানে বাংলা উচ্চারণ সম্বন্ধে কেউ কোনদিন অবহিত করান নি। আমাদের শিক্ষকরাও ছিলেন সবাই চট্টগ্রামের বা কাছাকাছি অঞ্চলের। উচ্চারণ যে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আমাদের বেলায় ওটার উপর তেমন কোন জোর দেওয়া হয়নি। খুলনা গিয়েই আমি এটা ভালো করে টের পেলাম।

তবে আমার ত্রুটি সম্বন্ধে আমি সজাগ ছিলাম। তাই আমি কান পেতে থাকতাম ছেলেরা কোন শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করে তা শোনার জন্য। ক্লাসে প্রায় আমি এক ধারসে ছেলেদের রিডিং পড়তে দিতাম। অচিরে আবিষ্কার করলাম প্রত্যেক ক্লাসেই এমন কিছু ছাত্র আছে যারা সত্যই চমৎকার নির্ভুল রিডিং পড়তে সক্ষম। এটা গৃহশিক্ষার ফলও হতে পারে। নির্ভুল পাঠ যে কতখানি শ্রুতিমধুর এ স্বাদও যেন এ প্রথম ওখানে গিয়েই পেলাম।

আমার বাবার ভালো কেরাৎ পড়ার সুনাম ছিল। কিন্তু কখনো কেরাৎ পাঠ তিনি কোন কারীর কাছে শিখেন নি। বলতেন, কারী আর ভালো কেরাৎ পড়ুয়াদের পড়া তিনি মন দিয়ে, কান পেতে শুনতেন শুধু। এ করেই তাঁর কেরাৎ শেখা। অলক্ষ্যে তাঁর এ নীতিই যেন আমিও গ্রহণ করে বসলাম। আর এ নীতি আমাকেও দিয়েছে আশাতিরিক্ত ফল।

দু'বার দুটি শব্দের খাস পূর্ব বঙ্গীয় (খুলনা কলকাতার খুব কাছাকাছি আর কলকাতার সঙ্গেই তার সম্পর্কও ছিল বেশি। তাই খুলনাকে তখন পূর্ববঙ্গ মনে করা হত না। খুলনাবাসীদের দৌড়ও ছিল কলকাতার দিকে। পশ্চিমবঙ্গের খান্দানিরা বিয়েও করতেন খুলনায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও শ্বশুর বাড়ি খুলনা) প্রয়োগ ব্যবহার করে কিছুটা জব্দও হয়েছিলাম। কি একটা পরীক্ষার পর ক্লাসে যেতেই ছেলেরা জানতে চাইল নম্বার। বল্লাম : এখনো খাতা কাটা হয়নি। শুনে সমস্বরে ছেলেরা হেসে উঠল।

অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম : হাসছ কেন?

পেছনের বেঞ্চ থেকে একজন বলে উঠল : স্যার, কাঁচি দিয়ে কাটবেন না ছুরি দিয়ে? হাসির রোল উঠল আবার। ঢাকা চাটগাঁয় আমার সব সময় খাতা কাটা বলে এসেছি। তাই ভুলটা সহসা বোধগম্য হলো না।

কিছুটা ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম : অন্য স্যারেরা কি বলেন?

অনেকে প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলো : খাতা দেখা বলেন স্যার।

: ও এখন থেকে আমিও না হয় তাই বলব। এ বলে হুকুম দিলাম : বই খোলো।

আর একবার একই ক্লাসে কি-না মনে নেই। সেদিন ছেলেদের ফি নেয়ার তারিখ ছিল।

রোলকলের পর বল্লাম : কে কে বেতন দেবে হাত তোল দেখি।

এবারও ছেলেরা হেসে উঠলো।

আবার কি ভুল করে বসলাম! বুঝতে না পেরে কিছুটা ধমক দিয়েই বল্লাম : বেতন দেবে না? হাসতে হাসতে কয়েকজন এক সঙ্গেই বল্লে : স্যার, আমরা বেতন দেব কেন?


www.pathagar.com

মনিব চাকরকে বেতন দেয় আর যারা চাকরি করে তারাই বেতন পায়। আমরা বেতন দেব কাকে?

বেশ অপ্রস্তুত হয়ে বল্লাম : তা হলে তোমরা কি দেবে?

: আমরা স্যার ফি দেব, মাইনে দেব।

এখন ব্যাপারটা ভালো করে বুঝলাম— বেতন আর মাইনের পার্থক্যটাও খোলাসা হয়ে গেল। এরপর থেকে এ ধরনের ভুল আর করি নি।

বলেছি সীতাকুণ্ডে থাকতেই 'চৌচির' প্রেসে দিয়েছিলাম। ছাপা শেষ হওয়ার আগেই হাবীবউল্লাহ বাহার প্রস্তাব দিলেন : আমরা 'বুলবুল পাবলিশিং হাউস' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা করছি 'চৌচির' প্রকাশের দায়িত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। এ যাবৎ প্রেসকে ছাপা আর কাগজ বাবত আপনি যা টাকা দিয়েছেন তা আমরা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, বাকি খরচ আমাদের।' আমি সানন্দে রাজি হয়ে সব ভার বাহারের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ১৯৩৪ এর জানুয়ারি মাসে 'চৌচির' বের হলো। বইটির রুচিসম্মত চেহারা দেখে আমি খুশি হলাম। আমার প্রথম প্রকাশিত বই, হাতে নিয়ে যে উল্লাস বোধ করেছিলাম তা আজ আর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার প্রথম আর তার প্রিয় ছিল বলে বইটি উৎসর্গ করেছিলাম বন্ধু দিদারুল আলমের নামে। পাণ্ডুলিপি অবস্থায় 'চৌচিরে'র কি নাম রেখেছিলাম তা আজ আর মনে নেই। 'চৌচির' যে ছিল না প্রথম সংস্করণের ভূমিকার একথা কয়টিতেই তা প্রমাণিত : "এই গল্পের নামকরণ করেছেন হারামণির মণিকার বন্ধু মনসুর উদ্দীন এম. এ.— নায়ক তার নামের জন্য আমার অন্যতম বন্ধু সুসাহিত্যিক কামাল উদ্দীন খাঁর কাছে ঋণী।"

## একত্রিশ

মনসুর উদ্দীন তখনো কলকাতা কারমাইকেল হোস্টেলে ছিলেন। সবে মাত্র এম. এ. পাস করে সেরেছেন, পেয়েছেন প্রথম শ্রেণী। দেশের হারিয়ে যাওয়া লুপ্তপ্রায় লোক-সংগীত সংগ্রহ করে হয়েছেন খ্যাতিমান। চেহারাটাও প্রায় করে তুলেছেন তাঁর প্রিয় বাউল কবিদের মতো। তাঁর 'হারামণি' আমাদের সাহিত্যে এক অমূল্য ও স্মরণীয় অবদান। খুব ক্ষীণ দেহ হলে কি হবে মনসুর উদ্দীনের মতো অমন উৎসাহ উদ্দীপনা বিশেষ করে সাহিত্যের ব্যাপারে খুব কম লোকের দেখা যায়। মনসুর উদ্দীন আজো সাহিত্য সাধনায় সক্রিয়। আমাদের যে কয়জন মুষ্টিমেয় অকৃত্রিম সাহিত্যসাধক আছেন নিঃসন্দেহে মনসুর উদ্দীন তার অন্যতম।

খুব সম্ভব আমি যখন কলকাতায় ল' পড়তে গিয়েছিলাম তখনই মনসুর উদ্দীনকে পাণ্ডুলিপিটা দেখিয়েছিলাম। পাণ্ডুলিপিটা পড়ার পর তিনি লেখাটার নাম 'চৌচির' দিতে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। নামটি আমারও মনঃপুত হওয়ায় আমিও তা সানন্দে গ্রহণ করি।

নায়কের নাম প্রথমে ছিল সলীম। পাণ্ডুলিপিটা পড়ার কি শোনার পর কামালউদ্দীন


www.pathagar.com

খাঁ বল্লেন : সলীম বড় মামুলি, আগে একটা 'ত' বসিয়ে দিয়ে তসলিম করে নিন, নামটা সুন্দর হবে। মুহূর্তে নামটা আমি লুফে নিলাম।

কামালউদ্দীন খাঁ আমার মুসলিম হলের বন্ধু— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. সি. পাস করেছেন। সদালাপী, সহৃদয় ও বন্ধুবৎসল— তদুপরি সাহিত্যরসিক, তখন কবিতা আর প্রবন্ধ লিখতেন। বলা বাহুল্য, তিনি তখনো সুফিয়া কামাল এ নামের অর্ধেকের ভাগী হন নি। দেখা যায় কামাল উদ্দীন এখন অনুবাদই করছেন বেশি— খুচরো অনুবাদ, হয়তো এ করছেন অন্য কারণে। প্রসন্ন হৃদয়, হাস্যমুখ কামালউদ্দীনকে এক রকম সারাজীবনই অসীম ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। আশ্চর্য চরম দুর্দিনেও তাঁকে বিচলিত হতে কি মুখের হাসি হারাতে দেখি নি। কামালউদ্দীন খাঁর ত্যাগ আর প্রসন্নতার অনুকূল পরিবেশ না হলে আমার বিশ্বাস সুফিয়া কামালের কবি জীবন ব্যাহত হত। হয়তো কামালউদ্দীনও স্বীকৃত লেখক হতে পারতেন কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁদের সাংসারিক অবস্থা উভয়ের এক সঙ্গে বেড়ে ওঠার অনুকূল ছিল না। তাই কামাল স্বেচ্ছায় নেপথ্যে সরে গেছেন। তাঁর এ নেপথ্য অবদানের ফলেই সুফিয়া কামাল আজ কবি সুয়িা কামাল হতে পেরেছেন। উভয়ের বন্ধুমণ্ডলীর কাছে এ সত্য অজানা নয়। শক্তি বা প্রতিভা স্রেফ একটি বীজ মাত্র। কিছুটা অনুকূল পরিবেশ ছাড়া তা অঙ্কুরিত হওয়ার সুদূর সম্ভাবনাও থাকে না।

এক রবিবার ছুটির দিনে হোস্টেলে নিজের ঘরে বসে আছি হঠাৎ খুলনার খ্যাতনামা এডভোকেট আবদুল হাকিম সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে আমার সঙ্গে পরিচয় করে বল্লেন : আপনাকে নিয়ে আজ স্কুলের গভর্নিং বডির সভায় তুমুল কাণ্ড। আমি মিটিং করে সোজা ডি. এম-এর বাংলো থেকেই আসছি।

হাকিম সাহেব খুলনা বারের অন্যতম জনপ্রিয় উকিল, ইংরেজি বাংলা সমানে বলতে ও লিখতে পারেন। সাহিত্য রসিক আর বিদ্বান বলে তাঁর খুব খ্যাতি। দু'একটি লেখা বাইরে কলকাতার কাগজেও ছাপা হয়েছে। পরে তিনি ইস্ট পাকিস্তান এসেমব্লির স্পীকার হয়েছিলেন— ছিলেন অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদেরও সভ্য।

তাঁর কথা শুনে আমি তো হতবাক। ভয় হলো শেষকালে সাড়ে সাতচল্লিশ টাকার চাকরিটাই না খসে যায়। আমার হতভম্ব ভাব দেখে তিনিই আবার বল্লেন : ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। আমাদের হেড্ মাস্টারকে সোজা মানুষ দেখালে কি হবে, দেখলাম ভয়ানক শক্ত! ডি. এম. কেও বিশেষ আমল দিলেন না। তখন খুলনার ডি. এম. ছিলেন বি. বি. সরকার আই. সি. এস. তিনি স্কুল গভর্নিং বডির সভাপতি। মিটিং বসেছিল তাঁর বাংলোয়।

হাকিম সাহেব এবার সব কথা খুলে বল্লেন : হিন্দু সদস্যরা (বলা বাহুল্য, সংখ্যায় তাঁরাই বেশি) এক বাক্যে আপত্তি তুলে বলেছেন সংস্কৃত পড়াতে পারে না, এমন একজন লোককে সরকার দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে নিয়োগ করেছেন এ সম্বন্ধে গভর্নিং বডি থেকে আপত্তি জানানো উচিত।

উত্তরে হেডমাস্টার নাকি বলেছেন : দ্বিতীয় পণ্ডিত নামে মাত্র পণ্ডিত, আসলে তিনি



www.pathagar.com

ভার্নাকুলার টিচার, তাঁকে বাংলাই পড়াতে হয়। মাত্র উপরের চারটি ক্লাসেই সংস্কৃত আছে, হেড্ পণ্ডিত ঐ চারটি ক্লাসে সংস্কৃত পড়িয়েও অন্য ক্লাস নিতে পারেন এবং নিয়ে থাকেনও। আর এখন যিনি দ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে এসেছেন তিনি বি. এ. বি. টি. বাংলা শুধু ভালো জানেন না, বাংলায় বইও লিখেছেন আর সে বই বহু বিজ্ঞজনের দ্বারা হয়েছে প্রশংসিতও। তার চেয়েও বড় কথা, এযাবৎ কোন ছাত্রের কাছ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শোনা যায় নি।

হিন্দু সদস্যরা তবুও একটা প্রস্তাব পাস করাবার জন্য নাকি জেদ করেছিলেন। দেখা গেল ডি. এম.-ও তাঁদের কথায় নিম রাজি। তখন হেডমাস্টার বল্লেন : সরকারি স্কুল কলেজের গভর্ণিং বডি স্রেফ একটা এডভাইজারি বডি— নিয়োগের মালিক সরকার। সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার কোন অধিকার নেই গভর্নিং বডির, এমনকি বদলিরও না।

এভাবে আমাকে নিয়ে সে দিনের চায়ের পেয়ালায় তুফানের সমাপ্তি ঘটে।

সব খুলে বলে হাকিম সাহেব বল্লেন : দেখি কি বই লিখেছেন?

এক কপি 'চৌচির' তাঁকে উপহার দিলাম। এর আগে অবশ্য হেডমাস্টারকেও এক কপি দিয়েছি। সদস্যদের আপত্তি আমার কাছে প্রায় চ্যালেঞ্জের মতো মনে হলো— আমি এখন থেকে আরো বেশি করে মনোযোগ দিলাম ভালো শিক্ষক হওয়ার দিকে। আমার চেষ্টা ও মনোযোগ ব্যর্থ হয় নি। বছর শেষে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্ররা যখন প্রমোশন পেয়ে নবম ক্লাসে উঠল তারা সদলবলে হেডমাস্টারের কাছে এসে দাবী জানাল— আমাদের বাংলা ক্লাসটা যেন ফজল সাহেবকে দেয়া হয়। তখন নবম দশম শ্রেণীতে বাংলা পড়াতেন নন্দলাল চক্রবর্তী নামে স্থানীয় একজন প্রবীণ শিক্ষক। স্বভাবতই ভেতরে ভেতরে তিনি কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। শতকরা পঁচানব্বই জন ছাত্রই হিন্দু। হেডমাষ্টার মুসলমান এ ধুয়ায় সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তোলাও এ অবস্থায় সম্ভব নয়। তবুও হেডমাষ্টার দ্বিধা করতে লাগলেন, বল্লেন : নাইন টেনে একই সিলেবাস, একজনেই তো পড়ানো ভালো।

ছেলেরাও নাছোড়বান্দা, বল্ল : আমরা যখন টেনে উঠবো তখন ফজল সাহেব টেনেও আমাদের বাংলা নেবেন।

অগত্যা হেডমাস্টার রাজি হলেন। হেডমাস্টার সিরাজউদ্দীন সাহেব বদলি হয়ে যাওয়ার পরও এ ব্যবস্থাই বহাল থাকে। সাহিত্য ও ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলে একটা কথা শোনা যায়, আমার শিক্ষক জীবনে যদি কোন স্বর্ণযুগ থাকে তা হলে তা হচ্ছে আমার খুলনার শিক্ষক জীবন। ওখানে আমি প্রাণ ঢেলে ছাত্রদের স্নেহ করেছি, পেয়েছি ওদের কাছ থেকে স্বতস্ফূর্ত প্রাণঢালা শ্রদ্ধা-ভালবাসা।

শিক্ষাবিদ ডক্টর ওয়েস্ট তাঁর Language in Education গ্রন্থে লিখেছেন The teacher of mother tongue is born not made মাতৃভাষা বা সাহিত্য যাকে বলে Emotional Subject অর্থাৎ আবেগের বিষয়। যেসব শিক্ষকের এ সাহিত্যিক আবেগটুকু নেই তাঁদের পক্ষে সাহিত্যের ভালো শিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়। বোধ করি এ আবেগটুকু ছিল আমারও এক সম্বল— এ আবেগ দিয়ে পড়িয়ে আমি আমার প্রতি বিরূপ ছাত্রদের মনও জয় করে নিয়েছিলাম। পরে খুলনার সামাজিক জীবনেও আমি হয়ে পড়েছিলাম অত্যন্ত জনপ্রিয়।



www.pathagar.com

অনেক পরের কথা। আমি তখন কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপক। কলকাতা খুব কাছেই। কাজেই ঘন ঘন যাতায়াতে বাধা ছিল না। একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি— হঠাৎ এক বয়স্ক ছেলে এসে পায়ে হাত দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বল্ল : চিনতে পারলেন, স্যার?

: হ্যাঁ মনোতোষ সরকার। এখন কি করছ?

এম. এ. পড়ছি। আপনি তো আমাদের মেট্রিক পরীক্ষার আগে খুলনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, আমি স্যার ম্যাট্রিকে সেকেন্ড হয়েছিলাম, কিন্তু সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলাম বাংলায়। সেভেন থেকে টেন এ চার বছর আপনার কাছে বাংলা পড়েছিলাম সে স্মৃতি কখনো ভুলতে পারব না, স্যার।

মনোতোষ সরকার তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুর ছেলে। দেখতাম উচ্চবর্ণের ছেলেরা ওকে একটুখানি যেন হেয় চক্ষে দেখত। কিন্তু পরীক্ষায় সে হত ফার্স্ট।

এ রকম আর একটি ছেলেকে পেয়েছিলাম ওখানে নাম— কুমার মিত্র। কোন এক গরিব স্কুল মাস্টারের ছেলে। ক্লাসে শুধু ফার্স্ট হত না, দেশের কাজে, সমাজ সেবায়ও ছিল অগ্রণী। পরত সব সময় খদ্দরের জামা কাপড়। খুলনা ছেড়ে আসার বহু বছর পরে, মাত্র কয়েক বছর আগে হঠাৎ রাজশাহী জেল থেকে আমাকে এক চিঠি লিখে বসেছিল ও। কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে জেলে গেছে। চিঠিতে আমার 'চৌচির'-এর কথা উল্লেখ ছিল, কাজে আর জেলে ডুবেছিল বা আছে বলে পরে আমি আর কি কি লিখেছি তার খবর রাখতে পারে নি বলে তার জন্য দুঃখও জানিয়েছিল। জানি না এখন ও ছাড়া পেয়েছে কি-না।

পাকিস্তান হওয়ার কিছুকাল পরে খুব সম্ভব ১৯৫০-এ আমার শ্বশুর মাহবুব-উল আলম সাহেব খুলনায় ডিস্ট্রিক সাব রেজিস্টার ছিলেন। একদিন কলকাতা থেকে এক তরুণ তাঁর অফিসে কি একটা দলিল রেজেস্ট্রি করতে আসেন। তখনও ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে কোন রকম পাসপোর্ট ভিসা চালু হয়নি। শিক্ষিত আর সম্ভ্রান্ত চেহারা দেখে আমার শ্বশুর তাঁকে নিজের পাশে একখানা চেয়ারে বসালেন। আলাপ প্রসঙ্গে তাঁর বাড়ি চাটগাঁ শুনে ছেলেটি নাকি তাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন : আবুল ফজল সাহেবকে চেনেন?

উত্তরে তিনি যখন বল্লেন : ও তো আমার জামাই, ওর সঙ্গে আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। লোকটি নাকি তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে— আমার উদ্দেশ্যে এক সালাম ঠুকে বলতে লাগল— এ খুলনা জিলা স্কুলে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। জীবনে এমন শিক্ষক আর দেখেনি। He was a great teacher, অত স্নেহ কোন শিক্ষকের কাছে পাই নি, অমন মনে প্রাণে পড়াতেও দেখি নি অন্য কাউকে। আমার নাম শঙ্কর ঘোষ— আপনি দেশে গেলে তাঁকে আমার সালাম জানাবেন।

বাচ্চা শঙ্করকে আমি ক্লাশ সেভেনেই ছেড়ে এসেছি। স্কুলের সামনেই ওদের বাড়ি— ধনী মহাজন জমিদার কুমুদ ঘোষের ছেলে। এরা এক সঙ্গে কয় ভাই এ স্কুলে পড়ত। পড়াশুনায় যেমন খেলাধুলায় তেমনি ছিল তুখোড়। ধনীর ছেলে কিন্তু ব্যবহার অত্যন্ত নম্র মধুর।


www.pathagar.com

এখন বি. এ. পাশ করেছে, কলকাতার কোন এক বিখ্যাত টিমে খেলে। ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাবে তাই পৈত্রিক কিছু জায়গা জমি বিক্রি করতে খুলনা এসেছে।

মনে পড়ে আমার শ্বশুর চিঠিতে এসব কথা লেখার পর ছোট্ট একটা আলাদা কাগজে ইংরেজিতে একথা কয়টিও লিখে পাঠিয়েছিলেন, I feel proud of you. I wish at least one of my grandsons should be a teacher.' একথা কয়টি তিনি ইংরেজিতে কেন লিখেছিলেন জানি না। পরে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করিনি।

আমার দু'ছেলের পড়াশোনা শেষ হয়েছে— দুঃখের বিষয় যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি তাদের কাকেও শিক্ষক কি অধ্যাপক হতে রাজি করাতে পারিনি। সমাজের দৃষ্টিভংগী কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে এ তারই নিদর্শন। যাকে এক সময় নোবল প্রফেশন বা মহৎ পেশা বলা হতো এখন তার আর কোন আকর্ষণ নেই। এসব পেশার দিকে এখন যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা অনেকটা দায়ে, বাধ্য হয়েই যাচ্ছেন। স্বেচ্ছায় কেউ-ই নয়।

আমাদের দেশের এক বড় ব্যাধি সাম্প্রদায়িকতা— এ ব্যাধি কতদিকে, কতভাবে যে শিকড় বিস্তার করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। অসহযোগ আন্দোলনের পর পরই কলকাতায় শুরু হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা। তারপর থেকে দেশের আকাশ বাতাস প্রায় বিষিয়ে ওঠে— ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। খুলনায় শিক্ষকতার সময় অথবা তার আগে কি-না আজ আর মনে পড়ছে না— কবি বন্ধু খান মঈনউদ্দিনের সঙ্গে একবার পায়জামা পরে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার সময় পথে প্রায় মার খাওয়ার দশা হয়ে পড়েছিল। কলকাতায় এক শ্রেণীর কাগজে তখন খুব ফলাও করে ছাপা হত নারী হরণের খবর। আর সব নারী হরণের জন্য দায়ী করা হতো মুসলমানদের।

আমরা কি এক নাটক দেখতে যাচ্ছি মনোমোহন থিয়েটারে— মঈনউদ্দীন, আমি আর মঈনউদ্দীনের স্ত্রী রহিমা খানম। আমার পরনে পাজামা, মঈনউদ্দীনের ধুতি, মঈনউদ্দীনের স্ত্রীর বাঙালী মেয়ের ধুতি শাড়ি। ঐ পোশাকে বাঙালী মেয়েকে হিন্দু মুসলমান ভাগ করে চিনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব বল্লেই চলে। আবার রহিমা খানম করপোরেশন প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতেন বলে চলাফেরা আর কাপড়-চোপড়েও একটু আধুনিকা ছিলেন বই কি! যে রাস্তা ধরে তিনজনে হেঁটে যাচ্ছিলাম, সেটা বোধ করি হিন্দুপ্রধান এলাকা— চারদিক থেকে সবাই আমাদের দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। কয়েকজন তো আমাদের পিছু নিল। দেখতে দেখতে জনতার সংখ্যা বেড়ে উঠল। থিয়েটারের কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই কয়েকজন তরুণ আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল : এ মেয়েটিকে আপনারা কোথেকে নিয়ে আসছেন? মঈনউদ্দীনই উত্তর দিলে— কেন? বাড়ি থেকে!

ওরা বিশ্বাসই করে না, পথও ছাড়ে না। ওদের বিশ্বাস— আমাদের সঙ্গিনীটি হিন্দু মেয়ে, আমরা ওকে ফুসলিয়ে কিম্বা এ দিন দুপুরে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছি। আমার পরনে যখন পায়জামা রয়েছে ধুতি পরলেও সঙ্গীটিও মুসলমান না হয়ে যায় না! আর দুই মুসলমান মিলে একটা নিরীহ হিন্দু মেয়েকে যে আমরা ঘর থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছি এ সম্বন্ধে ওরা নিশ্চিত। মহা ফ্যাসাদ, আমরা যতই বলি আমরা মুসলমান, মেয়েটিও শুধু যে


www.pathagar.com

মুসলমান তা নয়, আমাদের একজনের বিবাহিতা স্ত্রীও, ততই ওদের অবিশ্বাস বেড়ে যায়। জনতার হৈ চৈ শুনে নিকটবর্তী মনোমোহন থিয়েটার থেকে অনেকে বেরিয়ে এলেন। তার মধ্যে মঈনউদ্দীনের বন্ধু খলিলর রহমানও ছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণেই আমরা থিয়েটার দেখতে আসছিলাম। আমাদের দেরি দেখে তিনি সস্ত্রীক থিয়েটারে ঢুকে পড়েছিলেন আগে। তিনি কাছাকাছি থাকতেন বলে স্থানীয় অনেকের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি জনতাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন : এরা আমার পরিচিত আর বন্ধু— এরা মুসলমান, ইনি মঈনউদ্দীনকে দেখিয়ে বল্লেন, এর স্ত্রী, নির্ভেজাল মুসলমান মেয়ে।

জনতার হাত থেকে এভাবে রক্ষা পেয়েছিলাম সেদিন।

কলকাতায় তথা সওগাতের আড্ডায় আমার যেসব বন্ধু লাভ হয়েছিল তার মধ্যে খান মঈনউদ্দীন অন্যতম। তখন থেকেই ও মাথায় ঝাঁকড়া চুল রাখত; পান খেত প্রচুর, কথায় আর চালচলনে ফুটে উঠত একটা কবি কবি ভাব। লিখতও কবিতা, মাঝে মাঝে গল্পও। সাদা দিল মেলাখোলা ব্যবহার। স্ত্রী রহিমা খানমও তাই। দু'জনেই করপোরেশন স্কুলে মাস্টারি করতেন। ওর বাসায়, বিশেষ করে ১৮ নং মুসলমান পাড়ার বাসায় আমরা বহু আড্ডা দিয়েছি, বহু বার খেয়েছি, কাটিয়েছি বহু রাত। মঈনউদ্দীনের কেতাবী বিদ্যা তেমন ছিল না। তবে পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত সব সময়— জড়িত ছিল অনেক পত্রিকার সঙ্গে। সাহিত্য আর সাহিত্যিকের সঙ্গ ছিল তার বাতিক। ফলে সব সাহিত্যিকের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল তার বন্ধুত্ব। তখন যুগটাই ছিল বন্ধুত্ব আর সখ্যতার। কে বড় কে ছোট কে পাস করা কে না-পাস করা, কে উপরে উঠে যাচ্ছে, কে নিচে নেমে যাচ্ছে এসব প্রশ্নই সেদিন অবান্তর ছিল। সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক, সাহিত্য-উৎসাহী হলেই হলো। অমনি হৃদ্যতা গড়ে উঠত যেন বহুদিনের চেনা শোনা— মনে হত আমরা সবাই একই পথের পথিক, একই ভাবের ভাবুক। পত্রিকার অফিসে দু'চার বার যাতায়াত করলে কি দু'চার লাইন লেখা ছাপা হলেই একে অপরকে আমরা আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয় মনে করতাম। কে খাচ্ছে কে খাওয়াচ্ছে, পয়সাটা কার পকেট থেকে যাচ্ছে, কার লাভ হচ্ছে, কার লোকসান হচ্ছে এসব কথা তখন মনের ত্রিসীমানায়ও স্থান পেত না। মঈনউদ্দীনের ঘর-বাইর এক ছিল বলে, মনের দিক থেকে আমরা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হলেও তার সঙ্গে বন্ধুত্বটা সহজেই নিবিড় হয়ে উঠেছিল।

অবস্থার হেরফেরে কলকাতার মঈনউদ্দীন আর ঢাকার মঈনউদ্দীনে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে বই কি। আমাদের সবারই ঘটেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আর আর্থিক আভিজাত্যের যুগল আক্রমণে সাহিত্যিক, শিল্পীদের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব আর সখ্যতা আজ বিরল ব্যাপারে পরিণত।

১৯৩৬-এ আমি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ থেকে সহকারী শিক্ষকের পদে উন্নীত হলাম। ঐ বছরের ৫ জুলাই আমার প্রথম ছেলে আবুল মোহসিনেরও জন্ম। স্কুলেই পেলাম টেলিগ্রাম। এক অনির্বচনীয় পুলকে জীবনটা যেন ভরে উঠল, দেখতে দেখতে বাকি ক্লাসগুলি যেন আনন্দের পাখায় ভর করে হয়ে গেল খতম। প্রথম পিতৃত্ব যে কত আনন্দের আর কত মধুর তার স্বাদ সেদিনই প্রথম পেলাম। বহুদিন পর্যন্ত সে স্বাদ আমার মনের ভেতর ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে ফিরেছে? ছেলের কি নাম রাখব? বাছা বাছা নাম মনের


www.pathagar.com

ভেতর এসে ভিড় জমিয়ে তুল্লো— নিজের নাম ওর মার নাম, ওর দাদার নাম সব জড়িয়ে মিশিয়ে কত নামই না উদ্ভাবন করতে চেয়েছি সেদিন। আগের অংশ পিছে, পিছের অংশ আগে এনে কত কাটাকুটি! ভাবতাম নামটা সংক্ষিপ্ত আর অর্থপূর্ণ হওয়া চাই। জোড়াতাড়া দিয়ে একই নামের মধ্যে পিতৃ মাতৃকূলের প্রতিনিধিত্ব করাতে গেলে নামটা স্বভাবতই বে-আন্দাজি লম্বা হয়ে পড়ে। আবার মোহসিন অংশটি থাকা চাই-ই। বাঙালি মুসলমানের ইতিহাসে ঐ একটি নাম আমার মনে এমনভাবে খোদাই হয়ে গিয়েছিল যে তা কিছুতেই বাদ দিতে পারছিলাম না। এসব কারণে শেষ পর্যন্ত ওর নাম আবুল মোহসিনে গিয়েই ঠেকল আর তাতেই পেল স্থিতি।

## বত্রিশ

'নারী ও পুরুষ' তথা 'জীবন পথের যাত্রীর' প্রথম খসড়া সীতাকুণ্ড থাকতেই করা হয়েছিল সে কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। ১৭ নভেম্বর (১৯৩৩) অর্থাৎ বছরের শেষের দিকেই আমি কাজে যোগ দিয়েছি খুলনা জেলা স্কুলে। মাসখানেক পরেই বড়দিনের ছুটি। অনেক দূরের পথ, মাইনে অল্প— তাই বড়দিনের ছুটিতে আর বাড়ি না এসে অনেক খেটে 'নারী ও পুরুষের' একটা প্রেস কপি তৈরি করে নিয়ে চলে গেলাম কলকাতা। আবদুল কাদির তখন থাকত পাটোয়ার বাগানের তেতালার এক ঘরে। ওখানে গিয়েই উঠলাম— দিন আর বিনিদ্র রাত কাটতে লাগল সাহিত্যালাপে আর দেশের ভবিষ্যত নিয়ে হাতি ঘোড়া মারায়। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব তখন কাজ করতেন মোহাম্মদী অফিসে— মাসিক মোহাম্মদীর ভার ছিল তাঁর উপর। একদিন কাদির আর আমি গিয়ে তাঁকে বল্লাম : আমার সঙ্গে একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আছে, যদি চান মাসিক মোহাম্মদীর জন্যে দিতে পারি।

তিনি তাঁর অভ্যস্ত হাসি হেসে বল্লেন : বসুন। আগে চা খান।

চা খাওয়ার পর বল্লেন : কাল আমি কাদির সাহেবের বাসায় যাব, আপনি পড়বেন আমরা বসে বসে শুনব, পরে মতামত দেয়া যাবে।

পরদিন যথাসময় তিনি কাদিরের পাটোয়ার বাগানের সে তেতালার চিলেকোঠায় এসে হাজির। চা খেলেন, পান খেলেন আর বসে বসে পরম ধৈর্য সহকারে শুনলেন আমার পড়া।

এভাবে পর পর তিনদিন এসে শেষ পর্যন্ত লেখাটা শুনে গেলেন তিনি। লেখা সম্বন্ধে কোন মতামত দিয়েছিলেন কি-না সে কথা আজ আর মনে নেই, তবে শেষ দিন যাওয়ার সময় পাণ্ডুলিপিটা চেয়ে নিয়ে গেলেন।

সারা ১৩৪১ সাল ধরে মাসিক মোহাম্মদীতে লেখাটি ধারাবাহিক ছাপা হলো। ছাপা হওয়ার পর লেখাটির এক প্রস্থ কাটিংস্ আমি শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে একবার পড়ে দেখার জন্য পাঠিয়েছিলাম তাঁর পণ্ডিচেরীর ঠিকানায়। তিনি নিজেও চিন্তা আর তর্কমূলক উপন্যাস লিখতেন— বোধ করি এ কারণেই বিশেষ করে তাঁর কাছে পাঠানো। তিনি বেশ যত্ন নিয়ে, দাগ দিয়ে দিয়েই আমার লেখাটি পড়েছিলেন— পড়ার পর লিখেছিলেন এক


www.pathagar.com

দীর্ঘ পত্র। সে পত্রটিও প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪২ সনের ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে।

সেকালে লেখকদের প্রতি আবুল কালাম শামসুদ্দীনের একটা সহজাত দরদ ছিল— ছোট বড় সব লেখককেই তিনি হাসি মুখে সাদরে গ্রহণ করতেন। কিছুটা যেন বিরূপ ছিলেন গোলাম মোস্তফা সাহেবের প্রতি। গোলাম মোস্তফা সাহেবও যেন সেটা জানতেন আর নিজেও যেন পোষণ করতেন বিরূপ ভাব শামসুদ্দীন সাহেবের প্রতি।

মাত্র কয়েক বছর আগে শামসুদ্দীন সাহেব 'দৃষ্টি কোণ' নামে এক বই প্রকাশ করেছেন। বইটি পড়ে আমি মোটেও খুশি হতে পারি নি এবং লিখে বসি বইটার এক দীর্ঘ বিরূপ সমালোচনা। এ জন্যে আমাকে বেশ কিছুটা কাগজী চোটপাট সহ্য করতে হয়েছে তাঁর ভক্ত আর অনুরাগীদের কাছ থেকে। যাই হোক, ২১। ৭। ৬১ তারিখে গোলাম মোস্তফা সাহেব আমাকে এক ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন, তার সামান্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো...'আপনার যেসব লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা আগ্রহের সঙ্গে পড়ি। জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন দত্ত সম্বন্ধে আপনার সুচিন্তিত প্রবন্ধ আমার খুব ভাল লেগেছে। তাছাড়া যে দৃষ্টিকোণ থেকে আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের 'দৃষ্টিকোণ'কে তীর মেরেছেন তা অব্যর্থ হয়েছে। আপনি অতটা কঠিন হবেন ভাবতে পারি নি আগে। কাছে থাকলে অনেক কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতাম।'

উপরে উভয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি যে অনুমান করেছি তা হয়তো সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক নয়। পরে আমি আমার 'কায়েদে আজম' নাটকটি আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের নামে উৎসর্গ করে তাঁর সহৃদয়তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়েছি! আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী আর আবুল মনসুর আহমদ— আমাদের সাংবাদিকতার সূচনার যুগে এ ত্রয়ীর অবদান নিঃসন্দেহে মূল্যবান আর স্মরণীয়। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘতম ঐতিহ্য আর অভিজ্ঞতার দাবী অবশ্য আবুল কালাম শামসুদ্দীনের— আমাদের মধ্যে তাঁর মতো একটানা এতখানি দীর্ঘ সাংবাদিক জীবন আর কারোর নয়। 'আজাদ' প্রকাশিত হওয়ার আগে শামসুদ্দীন সাহেব সওগাত আর মোহাম্মদী— দুই কাগজেই কাজ করেছেন. ওয়াজেদ আলী সাহেব প্রধানত সওগাতের সঙ্গেই ছিলেন যুক্ত আর আবুল মনসুর সাহেব ছিলেন 'The Mussalman' আর 'খাদেমের' সঙ্গে। তবে যতদূর মনে হয় মাসিক সওগাতের সম্পাদকীয়টা আবুল মনসুরই লিখতেন। তার জন্য কিছু কিছু ফালতু পারিশ্রমিক তিনি পেতেন। শাণিত তীক্ষ্ণ রসিকতা তাঁর রচনার এক বড় গুণ— এ জন্য তাঁর সাংবাদিক রচনাও ছিল সুখপাঠ্য আর উপভোগ্য। তাঁর রসিকতা অনেক সময় বিপক্ষের জন্য হয়ে উঠত মর্মভেদী। তাঁর নিজস্ব ঘরোয়া স্টাইল অনেকেরই পছন্দ। আবার বিরুদ্ধবাদীরও অভাব নেই। সাহিত্যিক হিসেবে এ তিনজনের মধ্যে আমার ধারণা তিনিই শ্রেষ্ঠতম। রাজনীতিতে অমনভাবে জড়িয়ে না পড়লে তাঁর দ্বারা আমাদের রস রচনার দিক অনেকখানি সমৃদ্ধ হতে পারত। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ছিলেন যুক্তিবাদী— তাঁর রচনার বড় গুণ ভাষা আর চিন্তায় স্বচ্ছতা। যুক্তিবাদী বলেই তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে বিশ্লেষণধর্মী। শামসুদ্দীন সাহেবের রচনায় আবেগের প্রাধান্য সহজেই লক্ষ্যগোচর— তাঁর সম্পাদকীয় এ কারণেই জনপ্রিয়। ভাঙ্গা-গড়া তথা জাতীয় জাগরণের যুগে যুক্তির চেয়ে


www.pathagar.com

আবেগের আবেদন অনেক বেশি বলা যায় মূল্যও বেশি। তাঁর ভাষা অনেকখানি সাধু ঘেঁষা কিন্তু সংহত ও বলিষ্ঠ। অনুবাদেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন— মুসলমানের কাব্য সাধনা সম্বন্ধে তিনি যে একদা দীর্ঘ এক ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন তা যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট মূল্যবান ছিল আর তাতে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তাঁর রসবোধের। 'নূরী' এ ছদ্ম নামে শামসুদ্দীন সাহেব বই পুস্তকেরও রিভিউ করতেন— সে সবেও তাঁর বিচার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত— পাওয়া যেত সাহিত্য বোধের।

অপ্রত্যাশিতভাবে এ তিন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সঙ্গে আমার একবার সাপ্তাহিক সওগাতের পৃষ্ঠায় তুমুল বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তরুণ প্রবীণ সমস্যা, বিপ্লব, জ্ঞান, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে কয় সপ্তাহ ধরে কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে এঁদের বাদানুবাদ চলছিল। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মি: ফজলে আলী এ ছদ্মনামে আর শামসুদ্দীন সাহেব তাঁর পরিচিত ছদ্ম নাম মি: নূরী— এ নামেই আলোচনা প্রতিআলোচনা চালাচ্ছিলেন। পরে জনৈক মি: আজিজুর রহমান এসেও তাঁদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। আমার বিশ্বাস আজিজুর রহমান মানে মি: আবুল মনসুর আহমদ। এ তিন জনকে আক্রমণ করে কাজী আবদুল ওদুদের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলাম 'সাপ্তাহিক সওগাতে'— আমার পত্রের নাম দিয়েছিলাম 'দিশেহারা তারুণ্য' তখন ওয়াজেদ আলী সাহেবের উপর ভার ছিল 'সাপ্তাহিক সওগাতের'। আমার পত্রখানি ১৩৩৬-এর ২১ চৈত্র সংখ্যায় আমার দেয়া শিরোনামায় ছাপা হলো বটে তবে সম্পাদক নিচে অজস্র ফুটনোট দিয়ে লেখাটাকে কণ্টকিত না করে ছাড়েন নি। তাতে বানান ভুল থেকে আরম্ভ করে আমার ভাষার ভুল ত্রুটির উল্লেখ ছিল। এসব সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে কোনদিন আঁচড় লাগে নি।

ইত্যবসরে মৌলবী আবুল হাসেম খুলনা জেলা স্কুল থেকে বদলী হয়ে চলে গেলেন চাটগাঁ। এবার আমি হলাম মুসলিম হোস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট— হলাম একা একটা বড় রুমের মালিক। চাকর-বাকরগুলিও হলো আমার হুকুমের তাঁবেদার। প্রথম দিকে যাঁরা ছিলেন আমার বিরোধী এখন তাঁরা ধীরে ধীরে হয়ে পড়েছেন আমার অনুরাগী। বলেছি ছেলেদের আমি ভালোবেসেছি, বিনিময়ে তাদের ভালোবাসা পেয়েছি অকাতরে। হোলীর দিন হিন্দু ছেলেরা দল বেঁধে হোস্টেলে এসে পায়ে ফাগের গুঁড়া দিত— ছোটরা গায়ে দিতে চাইলে বড়রা ধমক দিয়ে বলে উঠত : গুরুজনদের পায়ে দিতে হয়, গায়ে দিতে নেই। মাঝে মাঝে খাঁন আবদুস সবুর (বর্তমানে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী) এসে বিছানায় ধপ্ করে বসে পড়ে বলতেন : একটা গল্প পড়ে শোনান। মনে পড়ে একবার তাঁকে আমার 'বিংশ শতাব্দী' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলাম। তখন তিনি বি. এ. পাস করে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভালো ফুটবল খেলোয়াড়— কলকাতায় গেলে এরিয়ানে আর খুলনায় এলে খুলনা টাউন ক্লাবে খেলতেন।

হঠাৎ একদিন হরিপ্রসাদ তথা ফজলুল করিম মল্লিক এসে ঢুকলেন আমার হোস্টেলের রুমে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম— জীর্ণ অস্থিসার দেহ, পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, সারা গায়ে প্রস্রাবের দুর্গন্ধ। কাছে ঘেঁষাই দুষ্কর।

: কি মল্লিক-দা, কোথা থেকে?


www.pathagar.com

: তোমার খোঁজ করে করে এলাম।

: প্রতিভাদি আর ছেলেমেয়েরা কোথায়? ওর স্ত্রীর নাম প্রতিভা; ওঁর কোন মুসলমানী নাম রাখা হয়েছিল কি না জানি না। রাখা নিশ্চয়ই হয়েছিল— আমরা কিন্তু তা কোনদিন শুনি নি। আমরা ওঁকে প্রতিভা-দিই ডাকতাম। তিনি চিঠিপত্রে লিখতেনও তাই।

অনেকদিন আগে বি. এ. পাস করে ল' পড়ার জন্য কলকাতা আসার পর পাবনা 'সৎসঙ্গ' থেকে প্রতিভা-দির একখানা পোস্টকার্ড পেয়েছিলাম। তাতে এ কয়টি কথা লেখা ছিল : 'তোমার মল্লিক-দা এখানে নেই, কলিকাতায় কোথায় আছেন ঠিক জানি না। কারণ গিয়ে অবধি একখানা চিঠি দিয়েছেন। তিনি আমাকে এখানে ফেলে রেখে গেছেন— একটি পয়সা কড়ি কিছুই দেন নি, এই ৩ মাস আশ্রমে থেকে ৪টি ছেলেমেয়ে নিয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। ভাই, আমার মতো হতভাগিনী দুনিয়ায় নাই। আমি যে কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছি ভগবান জানেন।

এ চিঠির প্রায় আট বছর পর মল্লিক-দার সঙ্গে আমার এ দেখা। আমার প্রশ্নের উত্তরে বল্লে :

: ওরা ফের খ্রিস্টান হয়ে গেছে, মিশনারীরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেছে কন্‌ভেন্টে।

: আর তুমি, তুমি হওনি...?

: আমি, আমি...? ফজলুল করিমের প্রেত মূর্তি এর বেশি কোন উত্তরই দিতে পারল না। মিনিটে মিনিটে পেস্রাব করতে যাচ্ছে, পাঁচ মিনিটও সুস্থির হয়ে পারছে না বসতে। আমি কথা বলছি নাকে কাপড় গুঁজে। বহুমূত্র বা ডায়াবিটিসের চরম অবস্থা— বোধ করি কোন চিকিৎসাই হয় নি।

সচ্ছল গৃহসন্তান হরিপ্রসাদ মল্লিক মনের কি জিজ্ঞাসার প্রেরণায় খ্রিস্টান হয়েছিলেন জানি না, আবার কোন্ জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে ফজলুল করিম হয়েছিলেন তাও আমার অজানা। কিন্তু ধর্মান্তরের এ প্রেতমূর্তি আজো আমার স্মৃতিকে বিচলিত করে তোলে।

হয়তো বলেছিলাম : তুমিও কেন খ্রিস্টান হলে না? এ প্রশ্নের উত্তর সে দেয় নি। সে রাত্রটা কোন রকমে আমার রুমে তাকে রেখেছিলাম— বলা বাহুল্য, সেও ঘুমায় নি আমিও ঘুমাতে পারি নি। সে ঘুমাতে পারে নি ঘড়ি ঘড়ি প্রেস্রাবের জন্য আর আমি পারি নি অসহ্য দুর্গন্ধের ফলে। আমার নিজের কোন অপরাধ ছিল না তবুও মানব নির্বুদ্ধিতার এ শিকারটির জৈব অস্তিত্ব আমাকে এক অসহ্য বেদনায় অস্থির করে রেখেছিল সারারাত। পরদিন কলকাতার ভাড়া আর কয়েকটা অতিরিক্ত টাকা দিয়ে তাকে বিদায় দিয়েছিলাম। এরপর তার আর কোন খবর পাই নি। বেঁচে আছে কি-না তাও জানি না।

মল্লিকদা যে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল সে ঠিকানায় গিয়ে একবার প্রতিভা-দির সঙ্গে দেখা করে মল্লিক-দার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে শুধু বলেছিলেন : জানি না। দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে আরো যে কয়েকটি কথা হয় নি তা নয়। জানতে চাইলাম— ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?


www.pathagar.com

: ভালো। বড় মেয়েটি এবার ম্যাট্রিক দেবে, ছেলে সেভেনে উঠেছে। ছোটরা থ্রী, ফোরে...। মল্লিক-দার কথা জিজ্ঞাসা করলেই নিরুত্তর থাকেন, না হয় শুধু বলেন : জানি না। এরপর মল্লিক পরিবারের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি— কোন খবরও পাইনি। দিদারুল আলম সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'যুগের আলোর' ১৩৩৩-এর শ্রাবণ সংখ্যায় মল্লিকের 'হিন্দু-মুসলমান' নামে এক চতুষ্পদী বেরিয়েছিল, সে চার লাইন দিয়েই হতভাগ্য মল্লিকদার স্মৃতি তর্পণ করলাম :

'ভ্রান্ত অন্ধ মত আর সংস্কার লাগি
হিন্দু আর মুসলমান উঠিয়াছে রাগি,
মূলে কিন্তু উভয়ের এক মহা ভুল,
সাগর যে মাঝখানে দু'ধারে দু'কূল॥'

বলেছি ১৯৩৬ এ আমার পদোন্নতি হয়েছে অর্থাৎ বি. এ. বি. টি. হিসেবে আমার যে চাকরি পাওয়ার তা পেয়েছি। চাকরিতে পাকা বা স্থায়ীও হয়েছি। দেশ থেকে অনেক দূরে, ঘন ঘন বাড়ি যাওয়া যায় না, এ মাইনেতে আলাদা বাসা করে পরিবার নিয়ে থাকাও সম্ভব নয়। ছেলে হওয়ার পর বাড়ির প্রতি টানও বেড়ে গেছে অনেক। অতএব দেশে বদলি হওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। কয়েক মাসের মধ্যেই খবর পেলাম চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পদ একটা খালি হয়েছে। দরখাস্ত করলাম বিনা রাহা খরচায় আমি যেতে রাজি। এর বছর খানেক আগে হেডমাস্টার হয়ে এসেছেন আবদুর রহমান সাহেব— তিনি আমার দেশের লোক, প্রায় আত্মীয়ের মতোই। আমার মামুদের বন্ধু সে হিসেবে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আদর করে ডাকেন জামাই, তাঁর বাসায় প্রায়ই দাওয়াত করে খাওয়ান। তাঁর মেজ ছেলে পাকিস্তানের অন্যতম সেরা অর্থনীতিবিদ ডঃ নূরুল ইসলাম তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। প্রায় প্রতি রবিবারেই দুপুরে এসে আমাকে ধরে টেনে নিয়ে যেত ওদের বাসায় খাওয়ার জন্য। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ড: ইসলামের খ্যাতি এখন দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। পরে ওকে আমি চট্টগ্রাম কলেজেও পেয়েছিলাম।

আবদুর রহমান সাহেব সম্প্রতি 'কোরআন ও জীবন দর্শন' নামে তিন খণ্ডে একটি মূল্যবান বই লিখেছেন। যাই হোক, তাঁর আনুকূল্যে বদলির হুকুম আমার সহজেই হয়ে গেলো। ছেলেরা প্রথমে হৈ চৈ করে উঠেছিল, পরে তাদের অনেক করে বুঝিয়ে বল্লাম— আমি দেশে যাচ্ছি, তোমরা আপত্তি করো না।

অগত্যা তারা আমাকে বিদায় জানাবার আয়োজন শুরু করল। সম্মিলিতভাবে সভা করে অভিনন্দন জানিয়েও তৃপ্তি পেল না, ক্লাসে ক্লাসে আলাদা আলাদাভাবেও সভা করল, ফটো তুল্লো, উপহার দিল হরেক রকম জিনিস। উপহার দিল জনে জনেও— নিচের ছেলেরা কেউ দিল দোওয়াতদানি, কেউ ফুলদানী, কেউ কলম, এমনকি পেন্সিল, ব্লটিং প্যড, পিনকুশন পর্যন্ত। আজ আটাশ বছর পরেও দেখছি তার কিছু কিছু নিদর্শন আমার ঘরে এখনো রয়ে গেছে। মাইকেল ভ্রাতুষ্পুত্রী কবি মানকুমারী বসু তখন খুলনায় থাকতেন, স্কুলে নিচের দিকে পড়ত তাঁর এক প্র-দৌহিত্র কি প্র-পৌত্র কিম্বা তস্য— সে বালক স্বয়ং


www.pathagar.com

বৃদ্ধা মানকুমারীকে দিয়ে এক বিদায়-কবিতা লিখিয়ে এনে তাই পাঠ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলে। যে নন্দলাল চক্রবর্তী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেরা আমায় নবম ও দশম শ্রেণীতে বাংলা সাহিত্য পড়াবার অধিকার দিয়েছিল সে নন্দলাল চক্রবর্তী আমার বিদায় সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে বল্লেন : 'এ পর্যন্ত ফজল সাহেবের মতো অজাতশত্রু কাকেও দেখিনি'। আমি ছাত্রদের উদ্দেশ করে এক লিখিত ভাষণ দিয়েছিলাম। 'বিদায় ভাষণ' নামে তা আমার 'বিচিত্র কথা' নামক বইতে ছাপা হয়েছে। শিক্ষক হিসেবে আমার আদর্শ ও উদ্দেশ্য তাতেই হয়েছে প্রতিফলিত।

## তেত্রিশ

খুলনায় থাকতেই কবি সুফিয়া কামালের সঙ্গে (বলা বাহুল্য, তখনো তিনি সুফিয়া এন, হোসেন) আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত— প্রথম দিকে এ বন্ধুত্ব চিঠিপত্রেই ছিল সীমিত। তখনো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় ঘটে নি। ১৯৩৬এ কলকাতার পি. সি. সরকার এন্ড সন্স নামক এক পুস্তক প্রকাশনী সংস্থা থেকে 'আলোকলতা' আর 'একটি সকাল' নামে আমার দুটি নাটিকা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। এও কবি বন্ধু আবদুল কাদিরেরই চেষ্টার ফল। এ দু'খানা বইর দু'কপি তাঁকে আমি বন্ধু খান মঈনুদ্দীনের মারফৎ পাঠিয়েছিলাম। পরে বোধ করি এ সম্পর্কে খুলনা থেকে তাঁকে চিঠিও লিখেছিলাম। তিনি তখন কলকাতায় ২৯ সি, রয়েড স্ট্রিটে থাকতেন। সেখান থেকে ৪। ১। ৩৭ তারিখে তিনি আমাকে যে চিঠি লেখেন তা নিচে উদ্ধৃত হলো। আমাকে লেখা এটি তাঁর প্রথম চিঠি কি-না বলতে পারব না তবে এর আগের লেখা কোন চিঠি খুঁজে পাই নি। তাই মনে হচ্ছে খুব সম্ভব এটিই তাঁর প্রথম চিঠি।

২৯ সি, রয়েড স্ট্রীট,
কলিকাতা
৪। ৯। ৩৭

"শ্রদ্ধেয় জনাব,

আপনার ২৬। ১২। ৩৬ তারিখের চিঠি আমি কলকাতা এসে ১ তারিখে পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হল, আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনার চিঠিখানা পেয়ে বাস্তবিক খুশি হয়েছি। আপনার সঙ্গেও পরিচয় চাক্ষুষভাবে নেই কিন্তু আপনার স্নেহের দান আমি আগেই পেয়েছি। আমারই উচিত ছিল আপনার কাছে প্রাপ্তি স্বীকার করে পত্র দেওয়া— তাও আমি দিই নি বলে লজ্জিতা। 'আলোক লতা' ও 'একটি সকাল' আমি পেয়েছি মঈনউদ্দীন সাহেবের মারফৎ, এতদিনে তার প্রাপ্তি সংবাদ দিলুম।

আপনার অনুরোধ আমি শুনলুম কিন্তু রাখবো কি করে ভেবে পাচ্ছি না। কবিতার বই বের করা আমার অনেক দিন থেকে আশা ছিল। সওগাত সম্পাদক 'সাঁজের মায়া'র ৪ ফর্মা ছেপেও ছিলেন, কিন্তু সে 'সাঁজের মায়া' আমারই দুর্ভাগ্য নিশীথের আঁধারে মিলিয়ে গেছে। আর তার অস্তিত্বও খুঁজে পাচ্ছি না। সওগাত সম্পাদক কিছু করবেন বলেও আশা করি না, তাঁর বাড়ি প্রতি রবিবারেই আমার যাওয়া হয়, ভরসাও দেন কিন্তু আরম্ভ আর হয়


www.pathagar.com

না। কবিতাগুলোর কোন কপি আমার কাছে নেই, তাঁর কাছেও নেই, পুরাতন সওগাত থেকে বেছে নিতে হবে, তার ভার কে নেয়? তাছাড়া টাকা আমার নেই, অন্য কোন প্রকাশকের সঙ্গেও জানাশোনা নেই, কেউ যে বেছে নিয়ে একটা বই বের করবেন সে রকম লোকও আমার নেই। রাধারাণী দেবীও আমাকে অনুযোগ করেছিলেন এ বিষয়ে, বলেছিলেন মুসলিম সমাজে কি কেউ এমন নেই যে, আপনার কবিতার বই বের করে? এর উত্তর আমি দিতে পারিনি। কারুর কাছে এ অনুরোধও আমি জানাতে পারিনি, কাজেই কবিতার বই বের করার আশা আমি আর করি না।

মাসিক পত্রিকার ক্ষুণ্নিবৃত্তির চেষ্টাও আমি করি না, পড়াশোনাও তেমন করবার সুযোগ পাচ্ছি না,— যত সাধ সাধ্য তত নয়। আপনারা যাঁরা আমার উপর দাবী রাখেন তাঁরা দূরে আছেন, কাছে কারুকে পাইনে, একাকী জগতে আমার শক্তি সামান্য। চারদিকের নিষ্পেষণে আমি ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছি, আমাদের সমাজের বিধবার অবস্থা আপনাকে কি বলতে হবে নতুন করে? বিধির বিধানের উপর মানুষের বিধান বড় ভয়ানক। আমি কিছুই করতে পারছি না।

একই বিরহের কবিতা বার বার লিখে আমারই বিরক্তি ধরে গেছে। যদি তখনও আপনি ঠিকানা জেনে চিঠি দিতেন একটুও দুঃখিত হতুম না,— কিন্তু সূর্যমুখীর একই ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ বিলাসই শুধু দেখবেন, তার বিকাশ-বেদনা কি দেখবেন না? ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আপনি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে খোঁজখবর নিলে খুশি হব, সাহস পাব— পত্রের উত্তর দেবেন তো? আমার নাকি মুখে 'ঝাল' বেশি তাই অনেক পরিচিত জন আমাকে 'বয়কট' করেছেন, আপনিও করবেন নাকি?— তা করবেন না, যদি সত্যই জানেন আমার উপর আপনাদের দাবী আছে, তা হলে ভুল ত্রুটি দেখিয়ে দিলে আনন্দিতা হব। আমার শ্রদ্ধাভরা সালাম গ্রহণ করুন। ইতি—

বিনীতা—

সুফিয়া

কবি সুফিয়ার উপর তখন থেকেই আমাদের একটা দাবী ছিল বই কি? আটাশ বছর আগে তিনি ছাড়া মুসলিম মহিলা কবিই বা আর ছিলেন কে? থাকলেও তাঁদের রচনার পরিমাণ এত কম ছিল যে, তাঁরা সহজেই আমাদের নজর এড়িয়ে যেতেন। সুফিয়া তখন থেকেই প্রচুর লিখতেন— তাঁর কবিতা তাঁর মতই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, তাঁর মনের ব্যথা বেদনাই তার উপজীব্য, পাঠক হিসেবে আমরাও ছিলাম তখন সরল, হই নি তখনো এত জটিল-মনা। ফলে তাঁর কবিতা আমাদের ভালো লাগত, তুলত আমাদের তরুণ মনকে অনুরণিত করে। তাই তাঁর কাছে দাবী জানিয়েছিলাম, সাহিত্যের দাবী। তাঁর চিঠিতে তাঁর তখনকার মনের অবস্থাও বিধৃত, সেদিক থেকেও এসব চিঠির মূল্য আছে বই কি!

পরে তিনি আর আমি একটা সম্পর্কও পাতিয়ে নিয়েছিলাম— ফলে বন্ধুত্বের সম্বন্ধটা আরো উপভোগ্য, আরো আন্তরিক হয়ে উঠেছিল। আমাদের সে প্রীতির সম্বন্ধ আজো অক্ষুণ্ন। এ সম্পর্কে তাঁর ৮। ১। ৩৭ এ লেখা চিঠির কিয়দংশ... "প্রথমে একটা কথা বলে নেই— আমার দাদার বাবা বহু যুগ আগে পর্যটক হিসেবে আরব হতে এ দেশে


www.pathagar.com

এসেছিলেন, সে যুগে যখন আমি জন্মাই নি। সে আরবি খেয়াল যখন আমার নেই তখন যদি বাঙালির মতই একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নেই আপনার সঙ্গে অপরাধ হবে না তো? কী সম্পর্ক পাতাই তাই ভাবছি— এটা আমার স্বভাব দোষ, কারুর সঙ্গে চেনা হলে অমনি একটা কিছু বলে না ডাকলে শুধু মাননীয়, মাননীয়া, শ্রদ্ধাস্পদেষু শ্রদ্ধাস্পদাসু বলে আমার মন ভরে না, তাই একটু প্রীতি মধুর সম্পর্ক করতে চাইছি। ছোট যদি হতেন, নাম ধরে পরম স্নেহে ডাক দিতে দ্বিধা থাকত না, সমবয়সী হয়েই মুস্কিল করেছেন, কেন না নারী ও পুরুষ, কাজেই খাটবে না।...বাংলাদেশে বা যেকোন দেশেই হোক দেবর ভাজ বা বেয়াই বেয়ান একটা স্নেহমধুর সম্পর্ক আছে— আপনার ছেলে ৭ মাসের আর আমার মেয়ে ১০ বছরের হোক কিছু যায় আসে না, যদি বলেন আপনার সঙ্গে বেয়াই সম্পর্ক পাতাতে আমি সম্মত, আপনি রাজি তো?"

এরপর থেকে আমাদের মধ্যে এ সম্পর্কটা এক রকম পাকা হয়ে গেছে।

সুফিয়া তখনো অবরোধবাসিনী। যে সুফিয়াকে আজ আমরা মুক্ত বিহঙ্গিনীর মতো দেখছি সে সুফিয়া যে একদিন কি দুর্বিসহ 'খাঁচার জীবন' যাপন করেছেন তা অনেকের অজানা। উপরের চিঠিখানির আরো কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হলো : — 'সমাজে বাস করি, অপ্রিয় কানাকানিও হবে, সাহিত্য-আলোচনা ও নিঃসঙ্গতাও দূর হবে না— আপনি সব জানেন, অভিজ্ঞতা বেশি। আমিও জানি এই সব, তাই আমার মন আরো হাহাকারে ভরে উঠে, যদি কখনো কেউ আসেন কথা কইব কিন্তু পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে, আমার মন এরই বিরুদ্ধে রুখে উঠে। কারুর বাড়ি গেলে আমার যাওয়াটার 'গভীর উদ্দেশ্য' কি তাই সন্ধান করতে পরিচিতেরা ব্যস্ত হয়ে উঠেন, এতে আমি দুঃখ বোধ করি। তাই আমার অনুযোগ, কেন আমাকে সহজ মনে এরা নেয় না? আর একটা কথা সত্যি বলব— কাজ করতে যদি কোন পুরুষের সঙ্গে নামি তা হলে সে পুরুষ, আমি নারী এ কথা আমার মনে হয় না। কিন্তু তার সন্ধান কে রাখবে বলুন?'

এ সময়ের আর একখানা চিঠির কয়েক পংক্তি— "আমার কবিতা লেখা হলে সম্পাদকের কাছে যায়, ছাপার হরফে ফিরে আসে মাসিকের বুকে। ভালো হলো কি মন্দ হলো, ভুল আছে কি-না আছে তাও জানবার উপায় আছে কই? লেখিকা আর পাঠিকা মাত্র আমিই, এতে লেখার উন্নতি না হয়ে অবনতি হওয়ারই তো কথা। টাকা দিয়ে, চাঁদা দিয়ে তালতলার লাইব্রেরির মেম্বার হয়েছি, কিন্তু বই আনিয়ে যে পড়ব তার মানুষ নেই, বলুন তো আমি হাঁপিয়ে উঠব না কেন? আমি ভালবাসি ধরণীকে, এই সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না ভরা ধরণীকে, তার শোভা, তার সম্ভার মুগ্ধ করে আমাকে, ভালোবাসি আপনাদেরকে, কিন্তু তা থেকেই আমি দূরে, বহু দূরে— স্কুল আর ঘর, ঘর আর স্কুল, মেসে আছি বল্লেই হয়'।

সুফিয়া তখন কলকাতা করপোরেশন স্কুলে মাস্টারি করতেন। পর্দা ঘেরা রিক্‌শায় করে করতেন যাতায়াত। জীবনের এক মূল্যবান অধ্যায় এভাবেই কেটেছে কবি সুফিয়ার। কিন্তু দুঃখ কখনো কবিকে কাবু করতে পারে না, সুফিয়াকেও পারে নি। ২৩। ১। ৩৭এ তিনি লিখছেন : "আজ ২৫ দিনের আলাপ আমাদের। উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে। ১৯৩৬ সালটা এত দুঃখে, এত কষ্টে, এত মর্মন্তুদভাবে কেটেছে যে তা বলবার নয়। ১৯৩৭টি কিন্তু প্রসন্ন হাসি হেসে আমাকে অনেক কিছুই মাত্র এ কয়টি দিনে দিল— বৃথা নয়, মিথ্যা


www.pathagar.com

নয়, তুচ্ছ নয় ধরণীর এ দান— অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করে আমি ধন্য হলাম। মনে হচ্ছে হারানো শৈশবের একটি দিন এই একটি মাসের রূপ ধরে শুধু আমারই জন্য ফিরে এসেছে— মনটার গ্লানি বেদনা অনেকটা কমল।

কিন্তু মাঘ মাসের ১৫ না পেরুতে আপনি কি বসন্তের দূত হয়ে এলেন নাকি? আপনার আবির্ভাবের সঙ্গে যে এবার অনেকেরই শুভাগমন— মানে শুভ পত্রাগমনের ঘটা দেখছি, কথাটা ভালো, লক্ষণটা ভালো নয়। তা যাক লেংটার আর বাটপাড়ের ভয় নেই, আমিও মানুষকে চিমটি কাটতে এবার শিখেছি। বসন্ত এলেও শিউলির রিক্ত শাখায় ফুল ফোটে না, সে সর্বনাশা শরতই শুধু পারে, কাজেই নির্ভয় আছি, মজার খবর পরে পাবেন আরো। এতদিন এটুকু জানাবারও মানুষ ছিল না, বেয়াই পেয়ে বেঁচে গেলাম।"

এ পেন্সিলে লেখা চিঠিখানিতে এ কথাগুলোও ছিল : 'সওগাতে আপনার 'চৌচির' পড়েছি, আবার তা নিয়ে একটি মহিলার সঙ্গে কিছু আলোচনাও হয়েছিল কিন্তু পরে দেখলাম বই পড়ার জন্যই তিনি 'চৌচির' পড়েছেন। অবশেষে আমিই হার মানলাম। নারীকে যে আপনি শ্রদ্ধা করতেন তা আমি জানতাম, ফাতেমা খানমের* কাছে আপনার কথা অনেক আগে শুনেছিও। তার পরেই আপনার লেখার ধারা বদলে যেতে দেখে আমি একটু দুঃখিত হয়েছিলাম। 'আলোক লতা' আর 'একটি সকাল' পড়ে আমার মনের আঁধার অনেকটা কেটেছিল। প্রথম আপনার একটি লেখা 'প্রাতিকা' পত্রিকায় বেরোয় সেই লেখাটাই+ আমাকে আপনার লেখার দিকে আকর্ষণ করে। তখন আমার স্বামী বেঁচে, আপনার লেখাটা পড়ে আমি হাসছিলুম, সেদিনও আলোচনা করবার কেউ ছিল না, উনি শুধু বলেছিলেন 'বইয়ের ভূত ঘাড়ে চেপেছে তাই হাসছো, রাগ করছো একলাই' তাই সই..."। দুঃখের বিষয় এ চিঠিখানির বাকি পৃষ্ঠাটা হারিয়ে গেছে।

আমাদের তরুণ বয়সের লেখা আমাদের সমবয়সী পাঠক-পাঠিকারা পড়ছেন, তাঁদের মনকেও তা নাড়া দিচ্ছে— এসব সংবাদ আমাদের শুধু আনন্দ দিত না, দিত নতুন প্রেরণাও। বলেছি আমার চাটগাঁ বদলির আদেশ হয়েছে। এবার খুলনা ছেড়ে দেশের দিকে পাড়ি দেব। কলকাতার বন্ধুদের চিঠি দিয়ে খবরটা জানিয়ে দিলাম। কবি সুফিয়াকেও জানালাম। আমার খুলনা ছেড়ে যাওয়ার খবরে অনেকেই দুঃখিত হলেন, বিশেষ করে আমার ছাত্র, সহকর্মী আর খুলনার বন্ধুরা। কিন্তু সবচেয়ে যেন বেশি বিচলিত হলেন কবি সুফিয়া। অথচ তখন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ দেখা একবার কি দু'বারের বেশি নয়, তাও সওগাত-সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেবের বাসায়। মনে হয় তখনকার তাঁর জীবনের নিঃসঙ্গতাই তাঁকে করে তুলেছিল এমন বিচলিত।

আমার বদলির খবর পেয়ে ৮। ৮। ৩৭ এর এক চিঠিতে তিনি লিখছেন : "কাল দুপুরে আপনার চিঠি পেয়ে কত খুশি হয়ে উঠেছিলাম। পড়ে আবার ততখানিই কষ্ট পেলাম। খামখাই আমার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ল। আপনি খুলনায় থাকলেও যা, চাটগাঁয়ে থাকলেও তাই। তবুও মনে হচ্ছে চিরদিনের মতই বুঝি আপনি দূরে চলে গেলেন। আর জীবনে কখনো দেখা হবে না। কী জানি এই কথাটাই আমার বার

* সপ্তর্ষি' নামক গ্রন্থের লেখিকা। এখন পরলোকগতা।

+ গল্পের নমুনা।



www.pathagar.com

বার মনে হচ্ছে— বোধ হয় আমি অতিমাত্রায় স্বার্থপর, তাই। এখানে থাকলে তবুও মনে হত একদিন আপনি আসবেন দেখা হবে। কথা কয়ে আমি বাঁচব, সত্যি বেয়াই একটুও এ অতিরঞ্জন নয়। দুর্ভাগ্যের দুয়ার দিয়ে আমি অনেকের বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ করলাম, এ আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়, কিন্তু মনে একটু কুণ্ঠা একটু দ্বিধা আজো তাদের কাছে রয়েছে। একেবারে অকপট হতে আমাকে দেয়নি। শুধু আপনারই কাছে অকপট বিনাদ্বিধায় আমি আমার মনের আবরণ উন্মোচন করতে পেরেছি। কথা- বলে আমি আনন্দ পেতাম, দেখা হলে খুশি হতাম, লজ্জা ভয় কুণ্ঠা আপনার কাছে আর এতটুকুও রাখিনি, বোধহয় দরদী মন দিয়ে তা আপনিও বুঝতে পেরেছিলেন। আজ আমি একেবারে নিঃসঙ্গ মনে করছি, কথা বলবার আর যেন লোক নেই। তাই ভারী কান্না পাচ্ছে।"

এ উদ্ধৃতিতে আমার চেয়েও কবির নিজের মনের পরিচয় রয়েছে অনেক বেশি। কবি-চিত্তের অহেতুক চোখের জলের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের কাছে এ কিছুমাত্র রহস্য নয়। কবির নিঃসঙ্গ জীবনের এ এক করুণ অধ্যায়। যাই হোক সুফিয়া শুধু এক বিশিষ্ট কবি নন— বাঙালি মুসলমান সমাজে এক বিশিষ্ট চরিত্রও। তাঁর চিঠি থেকে আমি যে কিছুটা বেশি উদ্ধৃতি দিলাম তার কারণ তাঁর কলকাতার জীবন তাঁর জীবনের এক মূল্যবান অধ্যায়— এ ছিল গঠন আর সংগ্রামের, ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার অধ্যায়, সে অধ্যায়ের একটুখানি আভাস দেওয়ার জন্যই। ঐ ছাড়া তাঁর জীবন অপূর্ণাঙ্গ, খণ্ডিত। সুফিয়ার কবিতা থেকে সুফিয়ার জীবন অনেক বড়। তাঁর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও তাঁর মনের দরজা-জানালা তখনো সব সময় খোলা ছিল আর তা ছিল তাঁর যুগের সব সাহিত্যিক শিল্পীদের জন্য অবারিত। অনেক কাল পরে, তিনি তখন সুফিয়া কামাল, তাঁর ঘরে যেন অসুস্থ আহসান হাবীবকেও একবার দেখেছিলাম। বলেছিলেন কলকাতায় ওর থাকার জায়গা নেই, দেখাশুনার নেই লোক তাই বলেছি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এখানে এসে থাকো। কোনদিন কোন রকম ক্ষুদ্রতা কি নোঙরামির শিকার তিনি হন নি। তাঁর বন্ধুত্ব আমার জীবনে এক দুর্লভ সম্পদ। তাঁর সঙ্গে কামালের বন্ধুত্ব সোনায় সোহাগা।

১৯৩৭-এর আগস্টের শেষের দিকে খুলনা ছেড়ে এসে আমি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে সহকারী ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিই। নিজের পুরোনো আস্তানাটা ঠিকঠাক করে নিয়ে দেশ থেকে স্ত্রী-পুত্রকে এনে ভালো করে এবার সুখের সংসার পাতলাম। মাঝে মাঝে এসে মাও থাকতেন। তবে এক লাগা বেশিদিন থাকতেন না তিনি। শহরের বাঁধা-ধরা জীবনে তিনি অনভ্যস্ত, অল্পদিনেই হাঁফিয়ে উঠতেন।

চট্টগ্রাম ছাড়ার আগে এখানে আমাদের একটি ঘরোয়া সাহিত্য সভা ছিল। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম— চট্টগ্রাম সাহিত্য মজলিস। গোড়ার দিকে আমি আর আবদুল হক ফরিদী ছিলাম এর মূল খুঁটি। মাঝে মাঝে মাহবুব-উল আলম সাহেব, তাঁর ছোট ভাই কবি ওহীদুল আলম, তাঁদের চাচাতো ভাই কবি আবদুস সালামও আসতেন। প্রথম দিকে সভা বসতো হয় আমার বাসায় না হয় আবদুল হক ফরিদীর ওখানে— ফরিদী তখন আলাদা বাসা করেছে। পরে জনাব সাদৎ আলী আখন্দ যখন এখানে দারোগা হয়ে আসেন তখন মজলিসের ভার


www.pathagar.com

গিয়ে পড়ে তাঁর উপর। সাদৎ আলী আখন্দ সাহেব তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুসলিম ইতিহাস ও সামাজিক সমস্যার উপর সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। 'তরুণ মুসলিম' নামে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন এর কিছুকাল পরেই বোধ করি প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি একাধারে সুলেখক ও সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন। ক্ষীণ-দেহ সাহিত্য মজলিসকে তিনি অতি দ্রুত তার ঘরোয়া খোলস ছাড়িয়ে প্রায় জেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে করেন পরিণত। আমি তখন চাটগাঁ ছেড়ে খুলনায় চলে গেছি। কিন্তু আমি চাটগাঁ ফিরে আসার পর সাদৎ আলী আখন্দ সাহেবের আমলের একটি বাঁধাই প্রসিডিংস্ বই আমার হাতে এসে পড়ে। কর্মব্যস্ত দারোগার জীবন যাপন করেও যে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি মজলিসের বিবরণ লিখে রেখেছেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন আর সুশ্রী তাঁর হাতের লেখা আর সাহিত্যের প্রতি কি অদ্ভুত আকর্ষণ, প্রত্যেকটি কথা এমনকি সভায় উপস্থিত প্রতিটি মানুষের নাম পর্যন্ত লিখে রেখেছেন নিজের হাতে। এমন মানুষ কি করে যে সে যুগে দারোগা হতে গেলেন বুঝি না, অথচ তিনি ছিলেন বি. এ. বি. এল. আর ছিলেন বিশিষ্ট ও বলিষ্ঠ এক রচনাশৈলীর অধিকারী। দেখে খুশি হলাম বহুকাল নীরব থাকার পর এখন তিনি 'যখন দারোগা ছিলাম' এ নামে তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করেছেন মাসিক 'পূবালীতে'। তাঁর লেখা কার্য বিবরণীতে দেখা যায় ২।৯।৩৪ ইংরেজিতে সাহিত্য মজলিসের এক সাধারণ সভা ডাকা হয়। সভা বসে স্থানীয় মুসলিম হলে। আজ অবশ্য মুসলিম হলের কোন চিহ্ন নেই, সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেমিসেন ম্যাটারনিটি হাসপাতাল। সে সভায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কলিমউদ্দীন আহমদ আর কোর্ট ইন্সপেক্টর সাদৎ আলী আখন্দ সাহেব যথাক্রমে সভাপতি আর সম্পাদক নির্বাচিত হন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মুন্সেফ সৈয়দ আমজাদ আলী, সহকারী রেজিস্ট্রার (সমবায় সমিতিসমূহের) মি: মীজানুর রহমান আর খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলম সাহেবের নামও উল্লেখিত হয়েছে।

সাহিত্য মজলিসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন বসে ১৪। ৬। ৩৫ ইংরাজিতে, তাতে সভাপতিত্ব করেন মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ। সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্টের সূচনায় এ কথা কয়টি লেখা হয়েছে : "সাহিত্য মজলিসের বয়স আজো পুরা এক বৎসর হয় নাই। একদিন শ্রাবণের বাদল ধারার মধ্য দিয়া যে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তাহা আজো চলিতেছে। সেই দিন সহকর্মীরূপে যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট কলিমউদ্দীন সাহেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট মীজানুর রহমান সাহেব, সহ-সম্পাদক ডাক্তার হাসেম ও তরুণ কবি আবদুস সালামের নাম আজ বার বার মনে পড়িতেছে। আমি তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি।

আর একখানি তরুণ হাসিমাখা মুখ আমার মনের কোণে বার বার উঁকিঝুঁকি দিতেছে। তিনি আমার পরম বন্ধুবর সাহিত্যিক আবুল ফজল সাহেব। চট্টগ্রাম সাহিত্য মজলিসের সৃষ্টি তাঁহারই পরিকল্পনার ফল।..."

১৯৩৭শের শেষার্ধে ফিরে এসে দেখি সাহিত্য মজলিসের কোন অস্তিত্বই নেই— মজলিসের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা সাদৎ আলী আখন্দ এখান থেকে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। মজলিসের অভাব আমি নিজে খুব যে বোধ করছিলাম তা নয়। কারণ আমার মন মেজাজ সভা সমিতি বা প্রতিষ্ঠানমুখী নয়। এখন কোন কোন সভা সমিতির সঙ্গে আমি যে


www.pathagar.com

জড়িয়ে পড়ি তা নেহাৎ বাধ্য হয়েই।

সে যাই হোক, আমি আসার কয়েক মাস পরে হঠাৎ কবি গোলাম মোস্তফা একবার তাঁর স্কুলের স্কাউট দল নিয়ে চট্টগ্রাম বেড়াতে আসেন। এ তাঁর প্রথম চট্টগ্রাম আগমন। তখন তিনি কোন এক জেলা স্কুলের হেডমাস্টার— এসে সদল বলে উঠেছেন আমাদের স্কুলের হোস্টেলে। তিনি এসেছেন শোনা মাত্র আমার ভেতরের সাহিত্যিকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এমন এক খ্যাতনামা কবি বিনা সম্বর্ধনায় চট্টগ্রাম থেকে ফিরে যাবেন। এ কি করে হয়? কেউ এগিয়ে আসছেন না— এমন কোন প্রতিষ্ঠানেরও খোঁজ পাচ্ছি না যে প্রতিষ্ঠান এ দায়িত্ব নেবে। কিন্তু সম্বর্ধনা দেওয়ার খেয়াল আমি কিছুতেই মন-ছাড়া করতে পারছিলাম না। এবার সাহিত্য মজলিসের অভাব বোধ করতে লাগলাম মনে মনে। হঠাৎ খেয়াল হলো সাহিত্য মজলিস না থাক নামটা তো আছে। ঐতো আমাদের হাতে গড়া মাল। ওটার নামেই সভা ডাকব কেউ প্রশ্ন করতে এলে তখন দেখা যাবে। কবি তো গানও করেন, দু'একটি ইসলামী সংগীত গাওয়া হলে সারা ইসলামাবাদই মেতে উঠবে। তাই করলাম, সভা ডাকলাম অস্তিত্বহীন চট্টগ্রাম সাহিত্য মজলিসের নামে। অভিনন্দনও দিলাম মজলিসের পক্ষ থেকে— নিজেই রচনা করলাম অভিনন্দন-পত্র আর ছাপালামও নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে, সভায় দাঁড়িয়ে পড়লামও নিজেই। আশ্চর্য, অপ্রত্যাশিত জনসমাগমে মুসলিম হলে সেদিন তিল ধারণের স্থান রইল না— বাইরের মাঠেও জমে গেল জনতা। কবি বক্তৃতা দিলেন, হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করলেন। সভা ভঙ্গ হলো অনেক রাতে। অভিনন্দন পত্রের নিচে লেখা আছে ৩রা চৈত্র ১৩৪৩ বাংলা। অর্থাৎ ঐ তারিখে তাঁকে চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল স্বাগত সম্ভাষণ। এরপর যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হত বলতেন ঐ তাঁর প্রথম জনসংবর্ধনা। আর বলতেন অভিনন্দন পত্রটা আজো তাঁর ঘরে টাঙ্গানো আছে। ঐ অভিনন্দন পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে লিখেছিলাম : "গত পঁচিশ বছরের ঊর্ধ্বকাল থেকে আপনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। আমাদের জাতীয় জীবন ও বাংলা সাহিত্যের এই পঁচিশ বছরের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ইতিহাস নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধতা, প্রতিকূল আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাত ও নানা অবাঞ্ছিত ঝড়-ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়েই আমাদের এ পঁচিশ বছরের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষে এটি আনন্দ ও গর্বের কথা যে, এই সহস্র বিক্ষুব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়েও আপনি কখনো আপনার আদর্শচ্যুত হন নি। সাহিত্যসেবা এখনো আমাদের দেশে গৌরব ও ঐশ্বর্যের বাহন হয় নি, তবুও জীবন প্রভাতে এই উপেক্ষিত বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং একাগ্রচিত্তে এখনো তার সেবা করে আসছেন। এই সেবা আর সাধনায় আপনি কতখানি সফলতা লাভ করেছেন, বঙ্গ সাহিত্যের অন্যান্য সেবক ও সাধকদের তুলনায় আপনার কৃতিত্ব কতখানি তার বিচার করবার দিন আজ নয়, আজ শুধু আপনার এই একনিষ্ঠ সাধনা ও স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের জন্য আপনাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাতেই আমরা সমবেত হয়েছি।" ইত্যাদি।

পাকিস্তান হওয়ার পর গোলাম মোস্তফা সাহেবের সঙ্গে আমার বহুবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার চাটগাঁর বাসায়ও তিনি বহুবার এসেছেন, সস্ত্রীক আর নাতি-নাতনী সহও।


www.pathagar.com

তাঁকে নিয়ে আমার বাসায় গানের মজলিস করেছি, খাওয়া-দাওয়া করেছি এক সাথে একাধিকবার। ১৯৬২ সনে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আমি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিলাম তখন গোলাম মোস্তফা সাহেব একাধিকবার তেতালার সিঁড়ি ভেঙ্গে আমাকে দেখতে এসেছেন, দিয়েছেন সান্ত্বনা। তখন তাঁর নিজের শরীর তেমন ভালো ছিল না, কষ্ট হত অতখানি উপরে উঠতে। তবুও এসে আমাকে দেখে যেতেন। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার কোন ব্যাপারেই মিল ছিল না। সাহিত্য আর জীবন উভয় ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভংগী ছিল আলাদা। প্রায় বিপরীতধর্মী। তবুও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। আজ গোলাম মোস্তফা সাহেব নেই— একদা আমাদের সাহিত্যের বহু শূন্যস্থান তিনি একা পূর্ণ করে রেখেছিলেন। আমার বিশ্বাস তাঁর যথাযথ মূল্য একদিন স্বীকৃত হবেই। কবি গোলাম মোস্তফার চেয়ে মানুষ গোলাম মোস্তফাও কম মহৎ ছিলেন না। যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই পেয়েছেন তার পরিচয়।

## চৌত্রিশ

এ সময় অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮এ খ্যাতনামা লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় আই. সি. এস. চট্টগ্রামে এ. ডি. এম. বা সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর কোর্ট বিল্ডিং সংলগ্ন সরকারি বাংলোয় মাঝে মাঝে আমাদের সাহিত্যিক বৈঠক বসত। অন্নদাশঙ্কর জীবনের সব ব্যাপারেই উদারপন্থী— প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র আর রবীন্দ্র পরিমণ্ডলেই গড়ে উঠেছে তাঁর দর্শন। সাহিত্য আর জীবনে সে উদার দর্শনের আজো তিনি অন্যতম উত্তর-সুরী। অন্নদাশঙ্কর মানুষটি দেখতে ছোটখাটো কিন্তু চোখ দু'টি প্রতিভাদীপ্ত। সে যুগের নামজাদা আই.সি.এস. অথচ ব্যবহারে ভদ্র আর চরম বিনয়ী। বিয়ে করেছেন এক বিদেশিনীকে কিন্তু গায়ের রঙটি ছাড়া তাঁর দেহে বা চালচলনে বিদেশের কোন চিহ্ন দেখি নি কোনদিন— হয়ে পড়েছেন বা অন্নদাশঙ্করই তাঁকে গড়ে তুলেছেন স্বদেশিয়া থেকেও স্বদেশিয়া করে। সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে আটপৌরে সাদা ধুতি আর খালি পা— বাসায় শ্রীমতি লীলা রায়কে এভাবেই দেখেছি সব সময়। অন্নদাশঙ্কর নিজেই একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : আই. সি. এসের চাকরি করলেও প্রথম সাত আট বছর কর্জ শোধের দায় ছিল বলে কোন বাবুর্চি তিনি পারেন নি রাখতে। রান্নাবান্নার কাজ দীর্ঘকাল ধরে এ বিদেশিনীই চুকিয়েছেন সানন্দে ও সাগ্রহে। দু'একবার এমনও দেখেছি— অন্নদাশঙ্কর আমাদের সঙ্গে কথায় মেতে রয়েছেন, শীতের সন্ধ্যা, গায়ে সূতী সার্ট খেয়ালই নেই সেদিকে। মিসেস রায় গরম একটা ফুল ওভার হাতে ঢুকে আলাপরত স্বামীকে মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে টেনেটুনে পরিয়ে দিলেন। আমরা এতগুলি লোককে করলেন না এতটুকুও সঙ্কোচ। একবার অন্নদাশঙ্কর নিজেই বোধ করি পড়ে শোনাচ্ছিলেন নিজের লেখা। তাঁর চশমার কাঁচ দুটি যে ঝাপসা হয়ে উঠেছে তা তিনি লক্ষ্য করেন নি, আমাদের তো লক্ষ্য করার কথা নয়। মিসেস রায়ও বসেছিলেন মজলিসের এক পাশে। হঠাৎ তিনি উঠে এসে স্বামীর চোখ থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে ঘষে ঘষে সাফ করে ফের লাগিয়ে দিলেন রায়ের চোখে। কাগজে ছাপা হওয়ার মতো বড় বড় ব্যাপারে নয় নিত্য দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তে ছোট ছোট যে নিবেদন তাই অধিকতর মনোহর ও


www.pathagar.com

মূল্যবান আর তাতেই পূর্ণ হয়ে ওঠে জীবনের মধু-ভাণ্ড। মনে হয় এ বিদেশিনীর এ তত্ত্বটুকু ভালো করেই জানা।

অন্নদাশঙ্করের বাসার এসব সাহিত্যিক আড্ডায় জনাব মাহবুব-উল আলম, আমাদের বন্ধু পরলোকগত আশুতোষ চৌধুরী, ওহীদুল আলম আর আমি নিয়মিত হাজির থাকতাম— আরো কিছু সংখ্যক লোকও যে না থাকত তা নয়। খুব সম্ভব ওঁরা গৃহকর্তারই নিমন্ত্রিত। প্রায় দিনই কিছু না কিছু খাবার পরিবেশন করা হত আর আমাদের হাত ধোয়ানো হত ছিলুমসিতে। জীবনে এ প্রথম এক হিন্দু বাড়িতে ছিলুমসি আর ছিলুমসির ব্যবহার দেখলাম। প্রথম কেন, হয়তো এ শেষ দেখা। এখন মুসলমান বাড়ি থেকেও ছিলুমসি অদৃশ্য।

এ রকম এক বৈঠকেই অন্নদাশঙ্কর আমাকে বলেছিলেন : আপনারা গল্প উপন্যাসে চট্টগ্রামের কথ্যভাষা ব্যবহার করেন না কেন? ইংরেজি সাহিত্যে এর দেদার নজির রয়েছে। তাঁর এ কথার জবাবেই আমি আমার 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' গল্পটি লিখেছিলাম এবং তাতে চেষ্টা করেছি চট্টগ্রামের উপভাষা প্রয়োগ করতে। এ গল্পটি সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্কর এক সময় খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। চট্টগ্রামের উপভাষা অন্যান্য জেলার পাঠকদের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য বলে পরে আমি এ চেষ্টা ছেড়ে দিই।

ব্যক্তিগতভাবে অন্নদাশঙ্কর আমার অন্যতম প্রিয় লেখক। তাঁর চিন্তার তীক্ষ্ণতা আর ভাষার দীপ্তি, বিশেষত জীবন আর সাহিত্যের প্রতি তাঁর সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভংগী আজো আমাকে মুগ্ধ করে।

১৯৩৮। আমার পারিবারিক জীবনে আবার নেমে এলো মহা দুর্যোগ। শহরের বাসায় আমার একলার সংসার, অন্য কোন মেয়েছেলে নেই। সাজেদা অন্তঃসত্ত্বা— একা প্রসবের ঝামেলা পোয়ানো, আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তার উপর এসব ব্যাপারে আমার নেই কোন অভিজ্ঞতা। তাই ও নিজেই গরজ করে বছরের মাঝামাঝি সময় চলে গেল হাশিমপুর মা আর নানির কাছে। শহরের বাসায় আমার রান্নাবান্নার ভার নিল আমার পুরোনো চাকর সিদ্দিক। ও ছোটকাল থেকেই আমার সঙ্গে আছে, ওর জানা আছে আমার অভ্যাস আর রুচি। প্রতি সপ্তাহে আমি হাশিমপুর গিয়ে ওদের দেখে আসি, নিজে যেতে না পারলে পাঠিয়ে দিই সিদ্দিককে, ওর বাড়িও হাশিমপুর— ও নিয়ে আসে খবরাখবর। ১৫ সেপ্টেম্বর। খুব সম্ভব স্কুলের দ্বিতীয় পিরিয়ডেই খবর পেলাম— সেদিনই ভোররাত্রে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে সাজেদা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র নিয়ে আমি যেন সামনের ট্রেনেই চলে যাই হাশিমপুর।

ট্রেন ধরার জন্য হন্তদন্ত হয়ে স্টেশনে পা দিতেই আমার এক মামাতো ভাই আমার হাতের দাগকাটা শিশিটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্নমুখে বল্লে : ঔষধ আর লাগবে না।

: তার মানে! আমার প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসার দশা। সে কাঁদো কাঁদো মুখে জানাল : সব শেষ হয়ে গেছে।

জীবনের গতি থামবার নয়। আমাকেও চলতে হবে। এগুতে হবে সামনে। এখন আমি আর একা নই। প্রথমা আমার জন্য কোন সমস্যাই রেখে যায় নি। সাজেদা দিয়ে


www.pathagar.com

গেছে আমাকে এক সন্তান যার বয়স মাত্র দু'বছর। এখন আমার সামনে একমাত্র সমস্যা দু'বছরের মোহসিন। আমার চোখের সামনে, আমার তত্ত্বাবধানে ছাড়া আমার ছেলে অন্যত্র বড় হবে এ চিন্তা আমার মনে আদৌ স্থান পায় নি। তাই বিকল্প সব প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে, মৃতার চতুর্থ দিনের ফাতেহা জেয়াফৎ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মের পর, বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে সাজেদাকে যেসব অলঙ্কারপত্র দেয়া হয়েছিল তা তাঁদের হাতে ফেরৎ দিয়ে মোহসিনকে নিয়ে শহরে ফিরে আসার জন্য আমি তৈরি হলাম।

যাত্রার মুহূর্তে আমার বৃদ্ধা নানি শাশুড়ি অর্থাৎ সাজেদার আপন নানি হঠাৎ বলে বসলেন : আমি রাজি থাকলে তিনি এসে আমার শহরের বাসায় মোহসিনকে নিয়ে থাকতে প্রস্তুত।

এ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে আমি যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। সারাদিন আমি থাকব স্কুলে, দু'বছরের একটা বাচ্চা ছেলেকে স্রেফ চাকর বাকরের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে— এ চিন্তায় ভেতরে ভেতরে আমিও কম বিব্রত ছিলাম না। বুড়ির বয়স ষাটের উপর, পেটে ছিল কলিক প্যেন, তবুও কি এক অমিত সাহসে ভর করে তিনি আমাদের সঙ্গে চলে এলেন শহরে। এর আগে জীবনে তিনি আর শহর দেখেননি। বুড়ির একমাত্র সন্তান আমার শাশুড়ি আর আমার শাশুড়িরও তখন পর্যন্ত একমাত্র মেয়ে সাজেদা আর সাজেদারও একমাত্র সন্তান মোহসিন— কাজেই একমুখী একটা স্নেহের ধারা বাচ্চা মোহসিনে নেমে এসে আশ্রয় পেতে চাওয়া হয়তো তেমন বিচিত্র কিছু নয়। যাই হোক, তিনি এসে মোহসিনের ভার নেওয়ায় আমি হতে পারলাম অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এওতো জোড়াতালি। এ ব্যবস্থা কখনো দীর্ঘকাল চলতে পারে না। প্রথমত বুড়ি নানি কখনো অনির্দিষ্টকাল এখানে এভাবে থাকবে না— থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত আমি ঘরকুনো মানুষ, আমার ঘর চাই।

তাই বিয়ে সম্বন্ধে আমার মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না, তবে কোথায় করব, কাকে করব এ হলো বড় প্রশ্ন। প্রথম বিয়ে করেছিলাম নিজের ইচ্ছা আর নিজের দায়িত্বে। দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল অভিভাবক তথা মা আর মামুদের ইচ্ছা আর পছন্দমতো। এবার বিয়ে করতে হবে আমাকে ছেলের দিকে তাকিয়ে, তার প্রতি দায়িত্বের কথা মনে করে। যে মেয়ের হাতে মোহসিনের শৈশব জীবনের সব স্বার্থ নিরাপদ থাকবে অর্থাৎ যার কাছে সে পাবে বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ, মন-মেজাজ, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি, এবার তেমন মেয়েকেই দিতে হবে অগ্রাধিকার, তেমন মেয়েরই করতে হবে সন্ধান। তাই কিছুতেই সাহস পাচ্ছিলাম না কোন অপরিচিতা বা অজানিতা সম্বন্ধে ভাবতে। শুধু নিজের স্বার্থ যেখানে জড়িত সেখানে হয়তো আঁধারে ঢিল ছোড়া যায় কিন্তু যেখানে একটা শিশুর স্বার্থ আর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সেখানে আঁধারে ঢিল ছুঁড়তে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।

পরিচিত মহলে একটি মাত্র মেয়ে সম্বন্ধেই আমি মনে মনে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ ছিলাম। তাই বারে বারে শুধু তার কথাই মনে পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে তার কথাটা আমাকে, আমার প্রায় সর্বসত্তাকেই পেয়ে বসল। কথাটা মন-ছাড়া করতে পারছিলাম না কিছুতেই।


www.pathagar.com

কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করি কি করে? কে কথাটা পৌঁছে দেবে কন্যাপক্ষের কাছে? প্রথমত মনে মনে যার কথা ভাবছিলাম তার সঙ্গে আমার বয়সের তারতম্যটা কিছু বেশি, দ্বিতীয়ত তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে আমার এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যে সেখানে এমন প্রস্তাব সহজেই একটা ভুল বুঝাবুঝির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং অনেকের কাছে কথাটা হয়তো খুব শোভনও ঠেকবে না।

এসব কারণে এক অসহ্য দ্বিধাদ্বন্দ্বে মন আমার দুলতে লাগল, ভেতরটা হতে লাগল তোলপাড়।

নানা যায়গা থেকে মেয়েটির বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে— এ খবর আমার অজানা ছিল না। আর এও জানতাম উপযুক্ত পাত্র পেলে ওর অভিভাবকদের ইচ্ছা ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়া। এ কারণে বেশি ভাববার কি গড়িমসি করারও সময় ছিল না হাতে, নিতে হবে ত্বরিত সিদ্ধান্ত। প্রস্তাবটা ওঁদের কানে পৌঁছাতে হবে অগৌণে। দিদারুল আলম নেই কিন্তু ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব প্রায় কিম্বদন্তী— বন্ধু আর পরিচিত মহল তো বটেই, এমনকি ওদের গ্রাম ফতেয়াবাদশুদ্ধ লোকেরও তা অজানা নয়। ওদের পরিবারে দিদারুলের যে আসন আমারও প্রায় সে আসন ছিল।

এ অবস্থায় দিদারুলের আপন ভাইজির সম্বন্ধে বিয়ের প্রস্তাব কি করে করা যায়? এতসব দ্বিধা দ্বন্দ্বের এ হচ্ছে একমাত্র কারণ। না হয় ওদের সঙ্গে কোনকালেই আমাদের কোনরকম রক্তসম্পর্ক ছিল না, নেইও— আমি দক্ষিণ চট্টগ্রামের আর ওরা উত্তর চট্টগ্রামের বাসিন্দা। তবে শুনেছি দিদারুলের বাপ-চাচা আর আমার বাবা এক সঙ্গে একই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন তাঁদের ছাত্রজীবনে। কিন্তু ঐ তো বাধা হওয়ার কারণ হতে পারে না।

মনের এ দোদুল্যমান অবস্থায় হঠাৎ একদিন নেহাত আকস্মিকভাবে দিদারুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি ওহীদুল আলমের সঙ্গে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে দেখা হয়ে গেল। মুহূর্তে মনের সব দ্বিধা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে, প্রায় মরিয়া হয়েই কথাটা তাঁকেই খুলে বল্লাম আগে। শুনে প্রথমে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন, পরে ধীরে ধীরে যেন গেঁড়ে যেতে লাগলেন মাটিতে। এতো অবাক হয়ে গেলেন যে আমাকে কোন কথাই বলতে পারলেন না তখন। নীরবে ভাবতে ভাবতে ট্রেনে গিয়ে উঠলেন— চট্টগ্রাম নাজিরহাট ট্রেনে, নামবেন ফতেয়াবাদ স্টেশনে। দিদারুলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার শ্বশুর জনাব মাহবুব-উল আলম তখন রাউজানে সাব্-রেজিস্ট্রার। ওহীদ বাড়ি গিয়েই পরদিন সেখানে ডাকে এক চিঠি লিখে আমার বক্তব্য তাঁকে জানিয়ে দিলেন। চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন ইংরেজিতে। সাধারণত ওহীদ বাংলাতেই চিঠিপত্র লিখেন, পারিবারিক ঐতিহ্যও তাই। এ চিঠিখানি ইংরেজিতে লেখার কারণ বিদেশী ভাষার আড়ালে হয়তো আমার বেয়াড়া কথাটার বেআব্রুতাকেই তিনি চেয়েছেন ঢাকা দিতে অথবা বাড়ির মেয়েরা যাতে চিঠিটা পড়তে আর পড়ে বুঝতে না পারে তার জন্যই নিয়েছেন এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা! মনে হয় অন্য সবারই মতো আমার শ্বশুরও প্রথমে প্রস্তাবটায় সরাসরি রাজি হতে পারেন নি। তবে বুঝতে পারা যায় তাঁর মনেও দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন, তিনি পেতে চান সেসব প্রশ্নের


www.pathagar.com

উত্তর। ওহীদের চিঠি পাওয়ার পর রাউজান থেকে তিনি ২৪। ৯। ৩৮ তারিখে সোজা আমাকেই এক চিঠি লিখে বসেন। সে চিঠির কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হলো :

"স্নেহাস্পদেষু,

মুহসিনের মার মৃত্যুর পর বিবেচনার মধ্যে প্রথমত আনিতে হইবে মুহসিনকে। কারণ ও বেচারীই সব চেয়ে বেশি affected। তাহার সমস্যা ২টি— (১) বড় হওয়া (২) মানুষ হওয়া। বড় করার জন্য উমু inexperienced হইবে। [উমু মানে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা উমরতুল আলম— যার সম্বন্ধে করা হয়েছে প্রস্তাব।]

দু'নম্বর সম্বন্ধে তাঁর নিজের মন্তব্য : "মানুষ হওয়া বরাবরই তোমার উপর নির্ভর করিবে— তাহার বিমাতা যিনিই হোন।"

এর পর লিখেছেন : "দ্বিতীয়ত বিবেচনায় আনিতে হইবে তোমার নিজেকে। এ সম্বন্ধে যেকোন প্রস্তাব করার তোমার অধিকার আছে। তৃতীয়ত বিবেচনায় আনিতে হইবে তোমার গার্হস্থ্য পরিস্থিতিকে।" এ সম্পর্কে তাঁর নিজের মত : "উমুকে দিয়া এ কাজ নিশ্চয়ই হইবে না।" এ ঝাড়া উত্তরের পরও কিন্তু তিনি লিখেছেন :

"এ সম্বন্ধে কি ভাবিয়াছ? এসব বুঝাইয়া উত্তর দিয়ো।"

কাজেই এ চিঠি আমার পক্ষে একেবারে নিরাশ হওয়ার মতো নয়।

আমার প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ আমার অজানা ছিল না; সে স্নেহের উপর আমার আস্থাও ছিল অটুট। তার উপর তাঁর সহজাত বিবেচনা শক্তির উপর আমার খুব একটা বড় রকমের বিশ্বাস না থাকলে অত সহজে বোধ করি তাঁর কাছে সরাসরি অমন একটা বেয়াড়া প্রস্তাব আমি পাঠাতে পারতাম না। তাঁর এক বড় গুণ তিনি অপরের সমস্যাকেও নিজের সমস্যার মতো করে দেখতে সক্ষম এবং দেখতে চানও। তাই আমার সমস্যাটাও তিনি নিজের দিক থেকে বুঝে দেখতে চাইলেন। আমার বক্তব্য বা দাবী আমার নিজের ভেতর নিয়েছিল অত্যন্ত স্পষ্ট আর দৃঢ় অবয়ব— তাই আমার দিকটা তাঁকে বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে কিছু মাত্র কঠিন হলো না।

এ বিয়ের ব্যাপারে আমার আগ্রহ আর ইচ্ছা যতই অদম্য হোক, আমার মনে কিন্তু একটা শর্ত ছিল— সে শর্ত হলো পাত্রীর নিজের সম্মতি থাকা চাই। মুরুব্বিদের অনুরোধে ঢেঁকি গিল্লে চলবে না। কারণ, পাত্রী সবে মাত্র ষোলো পেরিয়ে সতেরয় পড়েছে আর আমি পড়েছি চৌত্রিশ পেরিয়ে পঁয়ত্রিশে— এ অবস্থায় পাত্রীর মনে খটকা থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া একে একে মারা গেছে আমার দুই স্ত্রী— এটা মোটেও শুভ লক্ষণ নয়। এ সম্পর্কে মেয়ের আর মেয়ে পক্ষের আতঙ্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক। মেয়ের চাচা ওহীদুল আলম সাহেব এ বিষয়ে ইতিমধ্যে এমন মন্তব্যও করেছেন : "My objection was two fold, that he is aged and in the meantime he lost two wives. This is rather a bad sign." তার উপর আছে আমার দু'বছরের এক ছেলে। কাজেই পাত্র হিসেবে আমি কোনদিক দিয়েই কাম্য হওয়ার কথা নয়। কাজেই পাত্রীর সাগ্রহ সম্মতি ছাড়া এমন বিয়ে কিছুতেই সফল হতে পারে না। এ বিষয়ে আমি মনে মনে


www.pathagar.com

নিঃসন্দেহ ছিলাম। তাই আমার শ্বশুরকে আমি খোলাখুলি লিখে জানালাম : "আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে উমুর মত নেয়া আবশ্যক— ও হাঁ বল্লে হাঁ, না বল্লে না।"

দেখলাম এ বিষয়ে তিনিও আমার সঙ্গে একমত। মেয়ের মা নেই— তাই মেয়েকে নিরালায় ডেকে নিয়ে যা বলার তিনি নিজেই বল্লেন। দিলেন না অন্য কারো উপর এ ভার। তাঁরা বাপ-বেটিতে কি কি আলাপ হয়েছে তা আমার জানার কথা নয়। তবে ফতেয়াবাদ তথা তাঁদের বাড়ি থেকে ৬. ১০. ৩৮ এ আমার শ্বশুর আমাকে যে চিঠি লেখেন তার প্রথমাংশ এই :

স্নেহাস্পদেষু,

মেয়ে আমাদের গৌরব অক্ষুণ্ন রেখেছে। ভুল করে নি। তার dedication শুরু হয়ে গেছে। Gloom তো আসেই নি, বরং চোখেমুখে চলার ভেতরে একটা শক্তি কাজ কচ্ছে— সেটা ফুটে উঠছে। জীবনের সব ব্যাপারে আমি আল্লার রহমতের নিদর্শন দেখেছি, এটায়ও দেখতে পাচ্ছি। আমার নিকট এটা একটা খুব বড় সমস্যা থেকে মুক্তি— যে মুক্তি নূতন আলোকময় জীবনের স্বাদ নিয়ে এসেছে। মেয়ের idealism তৃপ্তি পাচ্ছে মনে হয়...। রহমতের কথা বিশেষভাবে বলছিলাম— কালকেই রাউজান থেকে গ্রাজুয়েট অবিবাহিত শিক্ষকের প্রস্তাব এসেছে। আমি এই মাত্র মেয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় আলাপ-আলোচনা করলাম। এ প্রস্তাবটিও পেশ করলাম। সুতরাং মেয়ে যদি পালাতে চাইত উপায় ছিল। আসল কথা, উমুর Thought-wave আমার মতোই— তার থেকেও উৎকৃষ্ট, তার মায়ের মতো। পবিত্রতায় নারী পুরুষের উপর কি-না। তার সে adoration আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে। মেয়ে যখন পথ ধরেছে আমরা এখন নির্বাচনী দ্বন্দ্ব পার হয়ে Oath নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হব। আ: তার মা আর আমি— আমরা পরস্পরকে যেভাবে পেয়েছিলাম তোমরা যদি সেভাবে পাও। ওদের একটা ধারাই আছে। উমুর নানী ছিলেন— এখনো আছেন আমার শ্বশুরের সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে।" ১৩। ১০। ৩৮-এ তিনি আবার লিখছেন : "আমি এখানকার প্রস্তাবটি অদ্যই জবাব দিয়া দিলাম। Medical-3rd year-এর বৃত্তিধারী একটি ছেলে— তাহার ভাই আমার বন্ধু ও দারোগা। এখানে একজন আবগারী ইন্‌সপেক্টর সম্পর্কে আমার ভাগিনেয়, তাহার জন্যও প্রস্তাব। ইহার Psychological দিকটা লক্ষ্য কর। যেই কেহ কিছু আবিষ্কার করিল অমনি সকলেরই উহার প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক মূল্য আছে।"

বিয়ের তারিখ ধার্য হলো ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৮। এ বিয়ের ব্যাপারে আমার শ্বশুর যে সহজ বিচার বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন তার কোন তুলনা হয় না। বিয়ের মাত্র চারদিন আগে ২৫। ১২। ৩৮ তারিখে তিনি আমাকে লিখছেন :

"কাবিনে আত্মসম্মানে বাধে এরূপ অনেক কথা থাকে। তুমি নিজে একখানি লিখিয়া আনিয়ো, ছাপানো ফরম হইতে draft খাড়া করিও। উহা একদিকে ভদ্রলোকের উপযোগী হওয়া চাই, অপর দিকে স্ত্রীকে effective-protection দেওয়া চাই।"

কাবিনের একটি খসড়া তৈরি করে বিয়ের দিন আমি পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিলাম আর বিবাহ মজলিসে নিজেই ওটা পড়ে শুনিয়েছিলাম সবাইকে। উপস্থিত জনৈক


www.pathagar.com

আইনজীবী নাকি বলেছিলেন : এ কাবিন মুসলিম আইন মতো হয় নি। অতএব অসিদ্ধ। এ আপত্তির প্রতি কান দেয়া আমার শ্বশুর প্রয়োজন মনে করেন নি। সে খসড়া কাবিনখানি নিয়ে উদ্ধৃত হলো :

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীদ্বয়, আবুল ফজল পিতা মরহুম মৌলবী ফজলুর রহমান, গ্রাম কেঁওচিয়া, থানা সাতকানিয়া, জেলা চট্টগ্রাম ও উমরতুল আলম পিতা মৌলবী মাহবুব-উল-আলম, গ্রাম ফতেয়াবাদ, থানা হাটহাজারী, জেলা চট্টগ্রাম, আজ ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে, হাজেরানে মজলিস ও নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের সাক্ষাতে স্ব-ইচ্ছায় ও আমাদের অভিভাবকদের সম্মতিতে ইসলাম শাস্ত্র ও দেশের প্রচলিত আইনানুসারে বিবাহবদ্ধ হইলাম। অদ্য হইতে ইসলাম ধর্ম শাস্ত্র ও দেশের প্রচলিত আইন স্বামীর উপর স্ত্রীর যে দাবী ও অধিকার এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর যে দাবী ও অধিকার স্বীকার করিয়াছে, আমরা পরস্পরকে সেই সমস্ত দাবী ও অধিকার প্রদান করিলাম। ভবিষ্যতে দাম্পত্য জীবন ও দাম্পত্য অধিকার সম্পর্কীয় কোন আইন যদি সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয় অথবা স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে যদি কোন নূতন আইন প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে সেই সব সংশোধিত ও নব প্রবর্তিত আইনের যাবতীয় অধিকার আমরা পরস্পর পরস্পরকে প্রদান করিব—প্রদান করিতে আইনানুসারে বাধ্য থাকিব। আমাদের কোন একজনের বা উভয়ের সম্মিলিত আয়ের দ্বারাই আমাদের পারিবারিক জীবন যাত্রার মান নির্ধারিত হইবে এবং স্ত্রী সব সময়ই ইচ্ছা করিলে স্বামীর আয় অনুসারে পৃথক খোরাকির দাবী করিতে পারিবেন। আমি (স্বামী) আবুল ফজল এই বিবাহ উপলক্ষে (স্ত্রী) উমরতুল আলমকে এক হাজার টাকা বা তদমূল্যের অলঙ্কার বা অন্য কোন সম্পত্তি যৌতুক স্বরূপ দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। অদ্য বিবাহ মজলিসে নগদ অলঙ্কার বাবদ সেই যৌতুকের ২২৫ (দুইশত পঁচিশ টাকা) পরিশোধ করিলাম, বাকি ৭৭৫ (সাতশত পঁচাত্তর টাকা) ভবিষ্যতে আমার স্ত্রীর দাবী অনুসারে আমি (আবুল ফজল) পরিশোধ করিতে আইনানুসারে বাধ্য থাকিব।

যদি কোন কারণ বশত আমাদের দাম্পত্য জীবন যাত্রায় অলঙ্ঘনীয় অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় অথবা আমরা যদি একে অপরের দৈহিক ও মানসিক অশান্তির কারণ হইয়া পড়ি তবে স্বামী বা স্ত্রী একজনের বা উভয়ের সম্মিলিত ইচ্ছানুসারে এই বিবাহ শাস্ত্র ও আইনানুসারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে। ঐ রকম অনিবার্য পরিস্থিতিতে পাঁচ বছরের উর্ধ্ব বয়স্ক সন্তান স্বামীর প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে। তদ্‌নিম্ন বয়স্ক সন্তান স্বামীর খরচে স্ত্রীর কাছে প্রতিপালিত হইবে। খরচ স্বামীর আয় অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

| | |
|---|---|
| উমরতুল আলম | আবুল ফজল |
| ২৯।১২।৩৮ | ২৯।১২।৩৮ |

বিয়ের পর এ খসড়া কাবিনখানি স্থানীয় কোন কোন কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। ডাক্তার এম. এ. হাশেম প্রভৃতি সে যুগের প্রগতিশীল বন্ধুরা এটি পড়ার পর মন্তব্য করেছিলেন : 'এ হচ্ছে আদর্শ কাবিন। ছেপে এর হাজার হাজার কপি সারা দেশে বিলি করা উচিত।' এ বিয়ে উপলক্ষে সুফিয়া কামাল চমৎকার একটি প্রীতি উপহার ছেপে কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিলেন। দুঃখ, অমন চমৎকার কবিতাটি আমরা হারিয়ে ফেলেছি।


www.pathagar.com

## পঁয়ত্রিশ

আবার নতুন করে ঘর বাঁধলাম। এবার ছেলে সম্বন্ধে আমি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেয়েছি। তাই আমার নিজের মনের দিক থেকেও আমি তুষ্ট। জীবন যেন ভরে উঠল এক অপূর্ব পূর্ণতায়। আমার শ্বশুর বাড়ির ছোট বড় সবাই আজ পর্যন্ত মোহসিনকে তাঁদের নিজের নাতি বা ভাগ্নে মনে করে সে রকম ব্যবহার করেই এসেছে। এমনকি সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার আগ পর্যন্ত সে জানতোই না যে, তার নিজের মা নেই।

নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় আছি বলেই হয়তো এবার মনে খেয়াল চাপল এম. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিই। স্কুলের খাটুনিতে আমি প্রায় হাঁপিয়ে উঠছিলাম। মনে হলো কোন রকমে এম. এ. টা পাশ করতে পারলে পেয়ে যাব কলেজে ঢোকার সুযোগ। কলেজে অঢেল অবসর— জুটবে প্রচুর সুযোগ সাহিত্যচর্চা করার। তাই পেয়ে বসল অধ্যাপক হওয়ার বাসনা। চিঠি লিখে সিলেবাস আনালাম কলকাতা, ঢাকা উভয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আমি ঢাকার গ্রেজুয়েট, কিন্তু দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস মিলিয়ে দেখার পর বুঝতে পারলাম, কলকাতার সিলেবাসই আমার পক্ষে অধিকতর অনুকূল। সিলেবাস ধরে এবার শুরু করলাম পড়াশোনা। কিছু বই কিনে নিলাম নিজে, কিছু বই ধার আনলাম চট্টগ্রাম কলেজ লাইব্রেরি থেকে। স্কুল লাইব্রেরিতেও কিনে নিলাম কয়েকটি দামী ও মূল্যবান বই। এ বিষয়ে হেডমাস্টার বিজয় ভট্টাচার্য, অজয় ভট্টাচার্য, আর সঞ্জয় ভট্টাচার্যের দাদা, আমার সহায় হয়েছিলেন। আমার পূর্বতন অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী তখন চট্টগ্রাম কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর কাছে পেলাম নানাভাবে সাহায্য, বিশেষ করে ভাষাতত্ত্বের ব্যাপারে। পালির ব্যাপারে সাহায্য পেলাম আমাদের স্কুলের পালি শিক্ষক পরলোকগত অনন্ত বড়ুয়ার কাছে। স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলাম পটিয়ায় আমার শ্বশুরের বাসায়। পড়াশোনায় অখণ্ড মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমি গিয়ে উঠলাম স্কুল হোস্টেলে, সাময়িকভাবে নিলাম হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্টের দায়িত্ব। ছুটি-ছাটায় স্কুলের চার্জে থেকে আয় করলাম পূর্ণ বেতনে প্রায় মাস দুয়েকের ছুটি। পরীক্ষার আগে ছুটি নিয়ে মাস দুই কলকাতায় গিয়ে থাকব— সুযোগ করে নেব পরীক্ষার্থী নিয়মিত ছাত্রদের আর বিষয় অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার— এ ছুটিটা না হলে তা হওয়ার জো নেই। বিনা মাইনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় থাকার সামর্থ ছিল না তখন আমার। উনচল্লিশ সালটা এক রকম বেশ আরামে আর সুখেই কাটল। চল্লিশ নিয়ে এলো আমার জন্য আর এক সুসংবাদ। ১৭ মার্চ ভূমিষ্ঠ হলো আমার দ্বিতীয় ছেলে আর উমুর প্রথম সন্তান আবুল মনজুরের— আমার শ্বশুরের পটিয়ার বাসায়। এ সময় সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম সাহেব আমাদের সবাইকে একবার তাঁর বাড়িতে দাওয়াত করেছিলেন। পটিয়ার লাগোয়া সুচক্রদণ্ডী গ্রামে তাঁর বাড়ি, আমার শ্বশুরের বাসা থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই। এ অমায়িক মাটির মানুষটির মেহমানদারী জীবনে ভুলবার নয়। জুলাই মাসেই শুরু হবে এম. এ. পরীক্ষা। তার আগে প্রকাশিত হলো আমার 'মাটির পৃথিবী', গল্প-গ্রন্থ আর প্রথম প্রবন্ধ সংগ্রহ 'বিচিত্র কথা'। দু'টিরই খরচ আমার নিজের। কলেজিয়েট স্কুলে তখন



www.pathagar.com

প্রাণবল্লভ বসাক নামে আমার এক সহকর্মী ছিলেন। ঢাকার সে যুগের বিখ্যাত আলবার্ট লাইব্রেরিটার ওঁরা ছিলেন মালিক, নিজস্ব প্রেসও ছিল তাঁদের। তাঁর সহায়তায় ডিমাই এন্টিকে ছেপে আলবার্ট লাইব্রেরির নামেই প্রকাশিত হল 'মাটির পৃথিবী'। 'বিচিত্র কথা' ছাপা হয়েছিল চাটগাঁর 'সেভয়' প্রেসে, ডাবল ক্রাউনে। এ দু'জায়গায় মাসিক কিস্তিতেই শোধ করতাম টাকা। পরিবার তখন আমার শ্বশুরের জিম্মায় ছিল বলে এভাবে এক সঙ্গে দুটি বই প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল আমার পক্ষে। পরীক্ষা দিতে কলকাতা যাওয়ার সময় এ দু'খানা বই আর পূর্ব প্রকাশিত 'চৌচিরের' কয়েকটি কপি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। কোন কোন সাহিত্যিক বন্ধুদের দিয়েছিলাম উপহার। 'মাটির পৃথিবী' নজরুল ইসলামকেই করেছিলাম উৎসর্গ— এক কপি বই নিজের হাতে তাঁকে উপহার দেওয়ার মতলবে কবি আবদুল কাদিরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর বাসায়। মনে পড়ে তাঁকে বাসায় না পেয়ে গ্রামোফোন কোম্পানির অফিসে গিয়ে করেছিলাম পাকড়াও। তখন তিনি কয়েকটি মেয়েকে সামনে বসিয়ে খাতা দেখে দেখে তাঁর সদ্যরচা গান শেখাচ্ছিলেন।

বইটা হাতে দিয়ে বল্লাম : কবি দা, আপনার অনুমতি না নিয়েই কিন্তু বইটা আপনাকে উৎসর্গ করেছি।

কবি তাঁর চির পরিচিত হাসি হেসে বল্লেন : বই উৎসর্গ করবে, তার জন্যও আমার অনুমতি কেন? তুমি দেখছি এখনো চাটগেঁয়ে ভূতই রয়ে গেলে!

আমার জীবনের এক বড় সম্পদ নজরুলের স্নেহ–সে স্নেহ ছিল অকাতর আর স্বতঃস্ফূর্ত। এর কয়েক বছর আগে চট্টগ্রাম, রাউজান থানায় কি এক সম্মেলন উপলক্ষে তাঁকে আনা হয়েছিল। স্টেশনে পৌঁছতে আমার কি করে দু'এক মিনিট দেরি হয়ে পড়ে। ট্রেন এসে গেছে। অন্য অভ্যর্থনাকারীরা তাঁকে মোটরে তুলে স্টার্ট দিয়েছে। ঠিক সে মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে আমি স্টেশন প্রাঙ্গণ দিয়ে ছুটে চলেছি প্লাটফরমে ঢোকার জন্য। ঘাড় ফিরিয়ে নজরুল কি করে যেন আমাকে দেখতে পেয়েছেন। গাড়ি থেকেই চেঁচিয়ে ডাক দিলেন :

এ ফজল্যা, এ ফজল্যা। ফজল্যা এসেছে...। দেখলাম তাঁর গাড়িতে তিল ধারণের স্থান নেই। আমি কোন রকমে ছুটে গিয়ে বল্লাম : আপনারা চলে যান। আমি বাসে আসছি।

আমার মতো ধোপদূরস্ত লোককে এমন প্রকাশ্যে আর স্টেশনের হরেক রকম মানুষের সামনে কবির এ অভিনব সম্বোধনে সবাই প্রায় হতভম্ব।

হঠাৎ কোথা থেকে মরহুম কাজেম আলী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র একরামুল হক সাহেব (কবি আইনুন নাহারের পিতা) এসে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বল্লেন : নজরুল ইসলাম আপনাকে এতখানি স্নেহ করেন এতো জানতাম না। পরম স্নেহভাজনকে ছাড়া চাটগাঁয় আমরা অন্য কাকেও তো এভাবে ডাকি না।

বলা বাহুল্য, চট্টগ্রামে আমরা সাধারণত স্নেহভাজন কনিষ্ঠদের নামের শেষে একটা য-ফলা আর আকার যোগ করে ডেকে থাকি। অবশ্য, তুচ্ছার্থেও এ করা হয়। নজরুল অনেকবার চাটগাঁ এসেছেন, একলাগা থেকেছেনও কয়েকবার। কাজেই চট্টগ্রামের এ


www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যটুকু তিনি জানতেন। আড্ডায় এ নিয়ে প্রায় ঠাট্টা-মসকারাও করতেন। নোয়াখালীবাসীদের 'ফ' কে 'হ' করা নিয়েও কম হাসাহাসি করতেন না। প্রায়ই বলতেন : ফেনী যদি হেনী হয়, হোটেল কেন ফোটেল হবে না? নোয়াখালীর লোকেরা নিশ্চয়ই হোটেলকে 'ফোটেল' বলে!

যাক্ সে কথা। তাঁর গানের খাতা থেকেই কিছুটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে সুন্দর গোট গোট হস্তাক্ষরে আমার বইটি সম্বন্ধে কয়েক লাইন মন্তব্য লিখে দিলেন। মন্তব্য মানে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

কপট বিনয় করে বল্লাম : কবি-দা বইটা আগে একবার পড়ে দেখলে ভালো হত না।

বল্লেন : সবই আমার আগে পড়া আছে। তোমার লেখা আবার পড়ে দেখে আমাকে মত দিতে হবে নাকি?

দুঃখের বিষয় তাঁর সে হাতের লেখাটাও আমি হারিয়ে ফেলেছি। অবশ্য বইটির সব গল্পই আগে কোন না কোন কাগজে প্রকাশিত হয়েছে— বেশির ভাগ প্রকাশিত হয়েছে 'সওগাতে'। কাজেই কবির পড়া থাকা অসম্ভব নয়।

কি জানি কেন কবি আমাদের প্রতি এক অহেতুক অন্ধ স্নেহ পোষণ করতেন— আমাদের লেখার প্রতিও তাঁর আবেগটা ছিল তেমনি অন্ধ। আগে একবার অন্যত্র বলেছি বিচার করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। কারো লেখা সম্বন্ধে তিনি কখনো বিচার করে কথা বলতেন না। সেদিন খাতা দেখে দেখে সদ্য লেখা, যে সবের এখনো কাটাকুটিই চলছে, এমন অনেকগুলি গান তিনি গেয়ে শোনালেন আমাদের। শ্রোতা কাদির আর আমি। গ্রামোফোন কোম্পানির আর একজন গায়কও বোধ করি উপস্থিত ছিলেন। মেয়েদের আগেই দিয়েছিলেন বিদায়।

এবার কবিকে আগের তুলনায় কিছুটা গম্ভীর মনে হলো। চটুলতার পরিবর্তে গানেও দেখা দিয়েছে অতীন্দ্রিয়তার সুর। এ ১৯৪০-এর কথা, '৪২ এ তিনি পুরোপুরি মৌন। এ দিনের পর কবিকে আর একবার মাত্র আমি দেখেছি। '৪১-এর শেষে কি '৪২-এর সূচনায় সঠিক মনে নেই। এস. ওয়াজেদ আলী সাহেবের বাসায় একটি গানের জলসা বসেছিল। কবিই একমাত্র গায়ক। আবুল মনসুর আহমদ, নবাবজাদা হাসান আলী এবং আরো অনেক তরুণ সাহিত্যিক সে জলসায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার আগে বোধ করি কিছু বৃষ্টি হয়েছিল— ওয়াজেদ আলী সাহেবের বাসার অদূরে কাদির আর আমি হঠাৎ পড়ে গেলাম কাদাভর্তি এক সড়ক গর্তে, জুতা তো জুতা, আমার পাজামা শুদ্ধ কাদায় একাকার। কাদিরের ধুতিরও চরম দুরবস্থা। কোন রকমে জমজমাট মজলিসের চোখ এড়িয়ে, চাকরের সাহায্যে ওয়াজেদ আলী সাহেবের উঠোনের কলটা খুঁজে নিয়ে নিজেদের কিছুটা সংশোধন করে ভিজে কাপড়েই বসে পড়লাম মজলিসের শেষ প্রান্তে। ঐ অবস্থায় নেহাৎ জড়োসড়ো হয়ে বসে থেকে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত নজরুলের গান শুনেছিলাম। সবই নতুন লেখা গান, খাতা সামনে রেখে কবি একের পর এক গেয়ে গেলেন। কবির কণ্ঠে এ আমার শেষ গান শোনা এবং এ পর্যন্ত ঐ শেষ দেখাও তাঁর সঙ্গে।

কলকাতায় এবার আমার সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে এসেছিলেন আমাদের পরলোকগত বন্ধু


www.pathagar.com

আশুতোষ চৌধুরী। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাঁথা-সংগ্রাহক, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের অন্যতম প্রিয়পাত্র। বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ— পূর্ববঙ্গ গীতিকা আর ময়মনসিংহ গীতিকা। এগুলির জন্য আমরা প্রধানত ঋণী ময়মনসিংহের চন্দ্রকুমার দে আর চট্টগ্রামের আশুতোষ চৌধুরীর কাছে। আশুবাবু সম্বন্ধে দীনেশ সেনের মন্তব্য : "সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এই ক্ষেত্রে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়।...তিনি পল্লী-গীতিকার উদ্ধারকল্পে জীবনপণ করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত বহু পালা গান বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ছাপাইতেছেন। এই সকল পল্লীগীতিকা সম্বন্ধে বিশিষ্ট য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তাহা গ্রন্থ শেষে প্রদত্ত 'মত' শীর্ষক নিবন্ধে দ্রষ্টব্য" [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৬১৪।] নিজাম ডাকাতের পালা, কাফনচোরা, ভেলুয়া, হাতী খেদার গান, কমল সাগরের পালা, সুজাতনয়ার বিলাপ, নসর মালুম, পরীবানুর হঁঅলা, নুরুন্নেছা ও কবরের কথা— এসব প্রসিদ্ধ লোকগাঁথা আশুতোষ চৌধুরীরই সংগ্রহ। তাঁর রচিত 'ছেলেদের চট্টলভূমি' এক সময় চট্টগ্রামে শিশু পাঠ্য বই হিসেবে খুব জনপ্রিয় ছিল। এ বইর আয় দিয়ে তিনি চট্টগ্রামের নন্দনকানন এলাকায় এক টিলার ঢালুতে একটি ছোট বাড়িও করেছিলেন— বাড়িটার নাম দিয়েছিলেন 'নিভৃত নিলয়'। আজ সে নামফলক নিশ্চিহ্ন ; কিন্তু বাড়িটার ভগ্নাবশেষ আজো তার সাবেকী অস্তিত্ব কোন রকমে বজায় রেখেছে। সেখান দিয়ে হেঁটে যেতে সে ভাঙ্গা বাড়ি থেকে আজো তাঁর পুত্র শিল্প ও সাহিত্যগত প্রাণ সুচরিত চৌধুরীর সুমধুর বাঁশীর সুর শোনা যায়। পরে আশুবাবু 'গীতিকা' নামে তাঁর স্বরচিত গান আর কাহিনীমূলক রচনার একটি সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন। এগুলি গ্রাম্য সুরে পল্লীগাঁথার ঢঙেই রচিত— ভাষাটাও তাই। 'গীতিকার' দু'টি গান সে যুগে হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ড করেছিলেন। আজ 'গীতিকা' আর সে রেকর্ড দুই-ই দুষ্প্রাপ্য। আশুবাবুর রচনার নমুনা হিসেবে সে গান দু'টির একটি এখানে উদ্ধৃত হলো। মনে হয় এ গানটি আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠেও শুনেছি।

কও কও কও গুরু
কও কও কও—
ধানেতে ধুয়ারা গুরু শস্যার মাঝে তেল,
ওরে ডিম্বার ভিতর বাচ্চা রৈল প্রাণি কেমতে গেল।
গুরু কও কও কও—
আসমান কালা, জমিন কালা, কালা নদীর পানি,
সকল থাইক্যা অধিক কালা আখের বেইমানি রে—
আখের বেইমানি।
হেঁন্দুভাই মইরা গেলে নিব গাঙের ভাটি,
মুছুলমান মইরা গেলে পাইতা দিব মাটি,
অসার দুনিয়ার শেষে আখেরের ইনছাপ রে—
আখেরের ইনছাপ।
জন্মাবধির গুনা গুরু তুমি কর মাপ॥

অন্য গানটির নাম 'মন পোবনার নাও।' তিনি 'মগ ফিরিঙ্গি' নামে একটি নাটকও


www.pathagar.com

লিখেছিলেন— সেটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল 'পূরবী' নামক মাসিকে। তিনি আর ওহীদুল আলম যুক্তভাবে সম্পাদনা করতেন 'পূরবী'। কাগজটি কিন্তু পরিচালিত হত আমার শ্বশুর মাহবুব-উল আলম সাহেবের অর্থানুকূল্যে আর ভাবাদর্শে। মাঝে মাঝে এর কিছু কিছু সম্পাদকীয় আমিও লিখে দিতাম— তার কোন কোনটা আমার 'বিচিত্র কথায়' স্থান পেয়েছে। কাগজটি টিকেছিল ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত। ছাপা কাগজ গেট আপে কাগজটির তেমন চাকচিক্য ছিল না— কিন্তু ছিল নিজস্বতা। চট্টল-সংস্কৃতির একটি বিশেষ সুর ছিল 'পূরবীর' বৈশিষ্ট। আশুবাবুর মতো চট্টগ্রামকে এমন দুর্দান্তভাবে ভালোবাসতে আমি আর কাকেও দেখিনি। চট্টগ্রামের ভাষা, লোক সংগীত আর সংস্কৃতির তিনি ছিলেন প্রতিনিধি। বিদ্যা আর মননে, জীবন আর আচরণে কোথাও তিনি পোশাকী ছিলেন না। চট্টগ্রামের জীবনে নানা দেশের নানা ধারা এসে মিশেছে। এসব ধারার সঙ্গে আশুবাবুর পরিচয় ছিল নিবিড়। জাত-ধর্ম সমাজ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে তিনি মিশতে পারতেন সমানে— তাঁর মনটি ছিল সব রকম সংস্কার থেকে মুক্ত। চট্টগ্রামের তদানীন্তন সমাজ জীবনে— বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝখানে তিনি ছিলেন মিলন সেতু। এ দেশের আনাচে-কানাচে কোথায় কোন্ গায়ক আছে, গায়েন আছে, পুঁথি পাঠক, কথক, সংগীতকার আছে— এসব খবর ছিল তাঁর নখ দর্পণে। চট্টল-সংস্কৃতির অমন ভক্ত আজ পর্যন্ত আমি আর দ্বিতীয়টি দেখি নি।

দীনেশচন্দ্র সেনের মত আলাওয়ালের জন্মস্থান ফরিদপুর আর আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতে চট্টগ্রাম। এ নিয়ে উভয় পণ্ডিতের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত ছিল না। একদিন আশুবাবু আমাকে বলে বসলেন : 'চলুন ফজলদা আমরা আলাওয়াল দীঘির পাড়ে একটা স্মৃতি-স্তম্ভ তুলে তার গায়ে আলাওয়ালের নাম খোদাই করে দিই। তা হলে ভবিষ্যতে আর কেউই আলাওয়ালকে দাবী করতে পারবে না। নিতে পারবে না চট্টগ্রামের বাইরে'। তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, তবুও ফজল-দাই বলতেন। আমরাও তাঁকে বলতাম আশু-দা। আমার শ্বশুরেরাও তাই বলতেন। জসীমউদ্দীন প্রসঙ্গে একদিন বল্লেন, 'আমি জসীমউদ্দীনকে বলেছি, জসিম, তুই যদি আমাদের চাটগাঁয়ে জন্মাতিস তা হলে তোকে আমরা জসীম্যা বলেই ডাকতাম।' বলেই চট্টগ্রামের গৌরবে গৌরবান্বিত হাসি হাসতে লাগলেন।

পর্তুগীজ জলদস্যু গঞ্জালিসের এক বংশাতবংশ নাকি এখনো চট্টগ্রাম শহরের কোথায় বাস করে, তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। তার এয়া বড় বড় গোঁফ আর রক্ত চক্ষুর বর্ণনা দিতে দিতে আশুদা'র উজ্জ্বল চক্ষু দু'টি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠত। চাটগাঁর সব নামজাদা লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল— আর সকলের সম্পর্কেই কিছু না কিছু চমকপ্রদ গল্প তিনি বলতে পারতেন। এ রকম বহু গল্পই তাঁর মুখে শুনেছি।

আশুদা'র এবার আমার সঙ্গে কলকাতা আসার এক কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া। বলা বাহুল্য, বাংলা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অধ্যাপকই তাঁর চেনা আর সবারই বাসস্থানের ঠিকানাও তাঁর জানা। একদিন নিয়ে গেলেন ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ওখানে। এ পণ্ডিত ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। দেখলাম তাঁর বৈঠকখানায় নানা ভাষার নানা


www.pathagar.com

বইপত্র যেমন এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে, তেমনি নানা ধর্মের নানা বাণী, মায় কোরান হাদিসের উদ্ধৃতিও রাখা হয়েছে বাঁধাই করে টাঙিয়ে। কোন কোনটা রাখা হয়েছে মার্বেল পাথরে খোদাই করে। আমার এক প্রস্থ বই তাঁকে উপহার দিলাম। আমি পরীক্ষা দিতে এসেছি শুনে কি কি পড়ব সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার পর বল্লেন : আপনি মাস্টার মানুষ, কোন প্রকারে একটা সেকেন্ড ক্লাস পান কি-না দেখেন। এখানে নাইন্‌থ পেপার না করলে ফার্স্ট ক্লাস মেলে না। আপনি তো আর তা করতে পারবেন না।

শুনে আমি তো অবাক। নাইন্‌থ পেপার আবার কি! এম. এ.-তে মোটমাট পেপারের সংখ্যা তো আট। তিনিই বুঝিয়ে বল্লেন— নাইন্‌থ পেপার মানে অধ্যাপক আর বিভাগীয় অধ্যক্ষদের বাসায় বাসায় ধন্না দেয়া, তোয়াজ করা, ফাই ফরমাস খাটা!

আমরা থাকতে থাকতেই এক সাধারণ মুসলমান — মুখে অল্প অল্প দাড়ি, মাথায় সাদা কিস্তি টুপি, পরনে তহবন্ধ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বাইরে গিয়ে সামান্য দু'এক কথা বলে লোকটাকে বিদায় করে দিলেন।

ভেতরে এসে আমাদের বল্লেন : আমার বাবার আমল থেকেই এ লোকটা আর তার বাবা আমাদের বাড়িতে কয়লা সাপ্লাই করে আসছে। এখন হিন্দু দোকানদারেরা এসে আমাকে অনবরত চাপ দিচ্ছে, বলছে ও মুসলমান এবার আমাদের থেকে কয়লা নিন, ওকে ছাড়িয়ে দিন। দেখুন দেখি কাণ্ড। দেখলাম বিরক্তিতে তাঁর চোখমুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। এর আগে কলকাতায় কয়েক দফা দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, তখন কিন্তু তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি। অবশ্য ওটা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর চাপ এড়াতে না পারারই ফল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা। আসলে সুনীতি বাবু পণ্ডিত মানুষ— রাজনীতি করতে গিয়েও পণ্ডিতের স্বভাব ছাড়তে পারেন নি কখনো। আশ্চর্য, এ স্বল্পক্ষণের পরিচয়টুকু সুনীতিকুমার কিন্তু অনেককাল মনে রেখেছিলেন, হয়তো আজো মনে রেখেছেন। পাকিস্তান হওয়ার বেশ কয়েক বছর পরে তাঁর পুত্রের বিয়ে— এ খবর আমার জানা কি রাখার কথা নয়। হঠাৎ দেখি চট্টগ্রাম কলেজের ঠিকানায় আমার নামে এক নিমন্ত্রণপত্র এসে হাজির। সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম সাহেবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ১৯৫৩-র ১৮ই নভেম্বর তিনি আমাকে যে চিঠি লেখেন তাতে আবদুল করিম সাহেব সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণীয় বলেই আমার বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, সুনীতিকুমার তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সভাপতি। তাঁর পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

"...শ্রদ্ধেয় আবদুল করিম সাহেবকে আমি আমার ছাত্রাবস্থা হইতে জানি। তিনি যে কেবল মাতৃভাষার একজন অক্লান্ত সেবক ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার মত এরূপ সংস্কৃতিপূর্ণ মানুষ সব সমাজেই দুর্লভ। আমার গৃহে তাঁহাকে বার দুই পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স সত্তরেরও উপর। আমার বাড়িতে প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির লেখা দেখিয়ে ঐ প্রাচীন বয়সেও উক্ত লিপি আয়ত্ত করিবার দিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম, সমগ্র লিপি আমি তাঁহার জন্য লিখিয়া দিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত লিপিতে তাঁহার নাম "আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ" লিখিয়া দেওয়াতে তিনি বড়ই খুশি হইলেন। পরে কতকগুলি পুঁথির পাতার পাঠোদ্ধারের জন্য তিনি আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার


www.pathagar.com

করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল এই— "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইবকেশেন মৃত্মনা ধর্মমাচরেৎ॥"— "প্রাজ্ঞ জন যখন বিদ্যা অর্জন বা অর্থোপার্জনে নিযুক্ত হইবেন, তখন মৃত্যুর কথা ভাবিবেন না— এমনভাবে তিনি বিদ্যার ও অর্থের সাধনা করিবেন যেন তাঁহার জরা ও মৃত্যু কখনও হইবে না; কিন্তু ধর্ম আচরণের বেলায় অতি দ্রুত তাঁহাকে কার্য করিয়া যাইতে হইবে যেন মৃত্যু আসিয়া তাঁহার মাথার চুল ধরিয়া টান দিতেছে আর সময় নাই।" হাদিসের দুইটা বড় বড় উক্তিও তিনি নিজের জীবনে সারবস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন— "উতলুব্ অল্ ইল্ম, ব্লব্ কান বি-স্ব্ স্বীন"— জ্ঞানের অন্বেষণ কর, এমন কি চীন দেশ পর্যন্ত গিয়া।" ও "আল্লাহুমা, জিদ্নী ইল্মন"— "হে ঈশ্বর, আমাদের জ্ঞান বাড়াও।" আমাদের বড় দুঃখ হয় আমরা পক্ষীরাজ ঘোড়াকে দিয়া মালগাড়ি টানাইয়া তাহার দুর্দশা করিলাম। অবিভক্ত বঙ্গ রাজ্যে বোধ হয় আবদুল করিম সাহেবকে সামান্য একটি সাহিত্যিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই সম্পর্কে যথাসাধ্য আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছিলাম। সারাজিবন আপিসের কেরাণীগিরি ছাড়িয়া যদি ইহার মন ও প্রাণ যাহা আকাঙ্ক্ষা করিত, সেই সাহিত্য সেবায় যদি ইনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কতকগুলি পুস্তক সম্পাদন করা ও প্রাচীন পুঁথির বর্ণনা লেখা ছাড়া সার্থক ভাবনা ও চিন্তার প্রকাশক উচ্চকোটির সৃজনীশক্তির পরিচায়ক সৎ-সাহিত্য দ্বারা তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যোদ্যানের আরও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তো হইল না। তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা ও পাণ্ডিত্য, তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতা, তাঁহার সারল্য ও সৌজন্য— এই সকল গুণ তাঁহার পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়াছে। আশাকরি চট্টগ্রামের অধিবাসীবর্গ তাঁহার স্মৃতির উপযুক্ত সমাদর করিবেন। তিনি আজকালকার অল্পায়ু মানবের যুগে যে পরিপক্ব বার্ধক্যে নিজ চরিত্রের উচিত ধামে গমন করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখিত হইবার কিছু নাই— তাঁহার দিক হইতে। আমাদের মধ্য হইতে একজন এরূপ সর্বজন সম্মানিত মুরুব্বি সাহিত্য জগৎ হইতে চলিয়া গেলেন, তাহা আমাদের পক্ষে দুঃখের বিষয়। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন।"

মূল মাতৃভাষা ছাড়া এম. এ.-তে তখন আর একটা অতিরিক্ত ভারতীয় ভাষাও নিতে হত। মুসলমান ছেলেরা সাধারণত উর্দুই নিতো— আমিও নিয়েছিলাম। পাঠ্য ছিল ইকবালের 'তারানা', আলতাফ হোসেইন হালীর 'রুবাইয়াৎ-ই হালী', সোলেমান নদভীর শ্রীকৃষ্ণের উর্দু জীবন-চরিত আর কার একটা উপন্যাসের অংশ বিশেষ। রুবাইয়াৎ-ই হালী আমার এত ভালো লেগেছিল যে, এটাকে আমি বাংলায় অনুবাদ করে বিভিন্ন কাগজে ছাপিয়ে ছিলাম তখন। এ অনুবাদ আমার 'সপ্তপর্ণা' নামক বইতে সম্পূর্ণটাই মুদ্রিত হয়েছে।

এ ছাড়া Basic Language-এর একটা পেপারও ছিল। পালি, পার্শি আর প্রাকৃত, এ তিনের যেকোন দু'টা নিতে হত। আমি পালি আর পার্শি নিয়েছিলাম।

উর্দুর ব্যাপারে আমি সাহায্য পেয়েছিলাম রশিদ আহমদ নদভীর, তিনি আমার দেশের লোক আর সীতাকুণ্ড মাদ্রাসায় ছিলেন আমার সহকর্মী। লক্ষ্ণৌর নদোওয়াতুল উলম থেকে পাশ করে এসেছেন বলে নামের শেষে লেখেন 'নদভী'। তখন সরকারি


www.pathagar.com

চাকরি উপলক্ষে থাকতেন কলকাতায়। ছুটির পর রোজ নদভী সাহেব আমার আস্তানায় এসে উর্দুটা আমাকে পড়িয়ে যেতেন। পার্শীর ব্যাপারেও করতেন সাহায্য।

এ যাত্রা কমরেড মুজাফফর আহমদের সঙ্গেও একবার দেখা হয়েছিল। এ শীর্ণকায় সুদর্শন আর অত্যন্ত অমায়িক ও কোমলস্বভাব লোকটিকে আমরা দূর থেকে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। বিশেষ করে আমি আর আমার বন্ধু দিদারুল আলম। তাঁর রাজনীতির স্বরূপ তখন আমাদের ভালো করে জানা ছিল না— হয়তো বুঝতামও না ; কিন্তু আমাদের তখন বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল তাঁর নিষ্ঠা আর চারিত্রিক সততা। অমন নিঃস্বার্থ কর্মী যে কোন দেশের ও সমাজের গৌরব। তিনি নিজের জন্য কোনদিন কিছু চান নি— সব সময় অনুবর্তীদের ঠেলে দিয়েছেন সামনের দিকে। নেপথ্যে থেকে নিজে যুগিয়েছেন শক্তি, পরামর্শ ও প্রেরণা। তাঁর সম্পাদিত 'গণবাণী' ও 'লাঙল' আমাদের প্রিয় পাঠ্য ছিল। নজরুলেরও দেদার লেখা বেরিয়েছে ঐ দুই পত্রিকায়। নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের মূল উৎসই মুজাফফর আহমদ। বোধ করি মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরই সুভাষচন্দ্র বসু একবার পূর্ব বঙ্গ সফরে এসেছিলেন। ঢাকায় এলে সলিমউল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও তাঁকে কিছু বলার জন্য করা হয়েছিল অনুরোধ। এ অনুরোধ তিনি রক্ষা করেছিলেন। কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমদ সাহেবকে (অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী) সঙ্গে নিয়ে হলে এসে এক সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে সে বক্তৃতার সূচনায় তিনি বলেছিলেন : "বাংলা দেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় অনেক বেশি, আমি চাই কংগ্রেসের নেতৃত্ব তাঁরা এসে গ্রহণ করুন। আমি আমার বন্ধু মুজাফফর আহমদকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হতে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে ব্যর্থ হয়েছি কোন প্রকারে তাঁকে শুধু সহ-সভাপতি হতেই রাজি করাতে পেরেছি।" এ হচ্ছে মুজাফফর আহমদের চরিত্রের একদিক— পদ আর পদবীকে তিনি সব সময় এড়িয়ে চলেছেন। তখন সুভাষচন্দ্র ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি আর অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন মুজাফফর আহমদ। বলা বাহুল্য, তখনো সমাজতন্ত্রী আর সাম্যবাদীরা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন নি। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তখনো শৈশব বলা যায়।

পরীক্ষার জন্য আমি উর্দু নিয়েছি শুনে মুজাফফর আহমদ সাহেব বল্লেন : উর্দু না নিয়ে আপনি হিন্দী নিলেই ভালো করতেন। উর্দুর তুলনায় হিন্দী অনেক সোজা—নম্বর উঠত অনেক বেশি। আসামী আর উড়িয়া ভাষার কথাও যেন বলেছিলেন। সর্বপ্রথম তাঁর মুখেই শুনলাম বাবুরাম সেক্সেনার The History of Urdu Literature-এর কথা। এ বইটি পড়ে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। বাংলা সাহিত্যে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের যে স্থান,' উর্দু ভাষায় সেক্সনার বইটিরও সে স্থান। এর পরে অবশ্য এ দুই সাহিত্যে যথেষ্ট নতুন গবেষণা হয়েছে, সংগৃহীত হয়েছে বহু নতুন তথ্য ও উপকরণ। লেখা হয়েছে আরো প্রামাণ্য ইতিহাস। কিন্তু এঁদের প্রাথমিক গবেষণা ও শ্রমের মূল্য না মেনে উপায় নেই।

মুজাফফর আহমদকে আমরা শুধু এক বিশেষ দলের রাজনীতিবিদ বলেই জানতাম; কিন্তু তিনি যে কতখানি পণ্ডিত আর ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা ও তার সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর পরিচয় যে কত ব্যাপক ও গভীর, সেদিনের স্বল্পকালীন আলাপ আলোচনায় তার কিছুটা আঁচ

www.pathagar.com

করতে পেরেছিলাম। যাই হোক, চল্লিশের জুলাইতে পরীক্ষার পালা শেষ করে চাটগাঁ ফিরে এলাম। যথা সময় রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল— সুনীতি বাবুর কথাই সত্য সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি। এখন স্কুলের সীমা ছাড়িয়ে তাকাতে লাগলাম কলেজের দিকে, প্রতীক্ষা করতে লাগলাম সুযোগের। এ সময় নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমি আমার তিন খানা বই— চৌচির, মাটির পৃথিবী আর বিচিত্র কথা, রবীন্দ্রনাথের নামে, শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় পাঠিয়ে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ, তবুও নিজের হাতে এক দীর্ঘপত্র তিনি আমাকে লিখেছিলেন। পত্রখানি আমার 'সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন' নামক বইতে ছাপা হয়েছে।

**ছয়ত্রিশ**

**পুত্র আবুল মনজুরের জন্ম, এক সঙ্গে দু'খানি বই প্রকাশ, এম. এ. পাস আর বিশ্ব কবির চিঠি— এ কয়টি কারণে ১৯৪০ আমার জীবনে স্মরণীয়। এসব কথা মনে করেই বোধ করি এ সময় আমার শ্বশুর নিম্নলিখিত চিঠিখানি আমাকে লেখেন :**

Patiya,

The 23rd Sept., '40

My dear Fazle,

Allah has been bountiful to you. This year promises to be one of the most memorable in your life. Your appreciation has come from High and you have been blessed with a son. In the world of thought one of the greatest leaders has acknowledged your worth. And now comes the university to put a fresh laurel on your head. All this bespeaks of a greater future. I feel proud of you.

You need not depressed over anything. Financial difficulties put up appearances which clear of themselves. Provided of course we are patient and straightforward.

You should not feel lonely.

Yours affectionately

Mahbubul Alam.

এ বোধ করি আমাকে লেখা তাঁর প্রথম ইংরেজি চিঠি। সাধারণত সব চিঠিপত্র তিনি বাংলাতেই লেখেন— অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের বেলায় যেন আশ্রয় নেন ইংরেজির। এর অনেককাল পরে ১৯৪৯ কি ৫০-এ খুলনা থেকে আমাকে আর একখানি ছোট্ট ইংরেজি চিঠি তিনি লিখেছিলেন। সেও এক উচ্ছ্বসিত মুহূর্তে। সে চিঠির কথা আগেই বলা হয়েছে।

তখন সরকারি সব কলেজে এক একটা করেই মাত্র বাংলার পদ ছিল, তাও


www.pathagar.com

লেকচারারের। পরে যে সব কলেজে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবেও বাংলা সাহিত্য পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেসব সরকারি কলেজে সৃষ্টি হয় দু'টা করে লেকচারারের পদ, প্রফেসার বা অধ্যাপকের কোন পদ কোথাও তখন ছিল না।

চল্লিশের মাঝামাঝি থেকেই বোধ করি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে বাংলা লেকচারারের পদ খালি পড়ে। আমার আগের বছর বাংলায় এম. এ. পাস করেছিলেন জনাব ইদ্রিস আলী আর পেয়েছিলেন ফার্স্ট ক্লাস। ঐ পদে অস্থায়ীভাবে তিনিই তখন কাজ করছিলেন। তাঁর নিয়োগকে বৈধ করার জন্যই বোধ করি একচল্লিশের গোড়ার দিকে এম. এ. পাস-করা আমরা কয়েকজনকে ডি. পি. আই. অফিসে ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হয়। পদটা ইসলামিয়া কলেজে বলেই বোধ করি ডাকা হয়েছিল শুধু মুসলমান প্রার্থীদেরই। ইন্টারভিউর দিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে হাজির হলাম দুরু দুরু বুকে। উপস্থিত প্রার্থীদের মধ্যে শুধু ইদ্রিস আলী সাহেবই আমার চেনা। বিশেষজ্ঞ হিসেবে এসেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর কাজী আবদুল ওদুদ। ভেকেন্সিটা ইসলামিয়া কলেজে তাই উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ জাকারিয়া সাহেবও ছিলেন উপস্থিত। বোধ করি তখন বটমলি ছিলেন ডি. পি. আই.— মুসলিম জন-শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর ছিলেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ। কাজী আবদুল ওদুদ প্রবেশ করলেন বগলে দুই বড় বড় কেতাব নিয়ে। দেখে সবাই আমরা ঘাবড়ে গেলাম। বইয়ের সব পরীক্ষা তো আমরা পাস করে সেরেছি— আবার বই কেন? ইন্টারভিউ মানে মামুলী মুখে মুখে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ এতো জানতাম। পাস করার পর বইয়ের পড়া তো একদম ভুলেই বসেছি। এখন বই ধরে প্রশ্ন করা মানে নির্ঘাত ফেল মারা। কাজেই বুকের ধুকধুকানি বেড়ে গেল সবারই।

যথা সময় আমার ডাক পড়তেই ফাঁসির আসামীর মতো গিয়ে ঢুকলাম। সামনে রক্ষিত শূন্য চেয়ারখানিতে বসতেই আমি মুহূর্তে কিন্তু ফিরে পেলাম আমার স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয়। পকেট থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা চিঠিখানি বের করে বাড়িয়ে দিলাম বিশেষজ্ঞদের দিকে। এক রকম ছোঁ মেরেই সুনীতি বাবু চিঠিখানি তুলে নিয়ে চেয়ারে ভালো করে গা এলিয়ে দিয়ে শুরু করলেন পড়তে। ওদুদ সাহেব 'মেঘনাদ বধের' একটা স্থান নির্দেশ করে বল্লেন : পড়ুন। পড়ার পর এবার রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' খুলে 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' নির্দেশ করে আবারও বল্লেন : পড়ুন। পড়লাম। খান বাহাদুর আবদুর রহমান আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ফালতু দু'একটি প্রশ্ন করলেন! তারও যথাযোগ্য উত্তর দিলাম! বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে খান বাহাদুর আমাকে জব্দ করতে পারার কথা নয়। ডি. পি. আই. সুনীতি বাবুর দিকে তাকিয়ে বল্লেন : আপনি কিছু প্রশ্ন করবেন? সুনীতি বাবু জানালেন : না। ওঁর বই আমি পড়েছি, ওঁকে আমার প্রশ্ন করার দরকার নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যায় বাসায় গিয়ে খান বাহাদুর রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলাম ফলাফল। তিনি কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বল্লেন : ফার্স্ট ক্লাস পেলেন না কেন? ফার্স্ট ক্লাস পেলে তো আপনার চাকরি কেউই ঠেকাতে পারতো না আজ!

ফার্স্ট ক্লাস পেলাম না কেন? পাইনি বলেই পাইনি— এ ছাড়া এ প্রশ্নের এখন আর কি জবাব দেওয়া যায়? এ জবাবও তো তাঁকে দেয়া যায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে


www.pathagar.com

বেরিয়ে এলাম তাঁর বাসা থেকে। ইন্টারভিউর রেজাল্ট সম্বন্ধে তাঁর থেকে এর বেশি কিছু জানা গেল না। ওখান থেকে সোজা ওদুদ সাহেবের বাসায় গিয়ে মারলাম ঢুঁ। তিনি কিছুটা খোলাসা করে বল্লেন : অন্যদের তুলনায় আপনার ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে। তবে একটা ফ্যাকড়া দেখা দিয়েছে। নির্বাচনী বোর্ডের এক পক্ষের মত হচ্ছে কলেজীয় শিক্ষার জন্য পাণ্ডিত্যই অধিকতর প্রয়োজন, অন্য পক্ষের মতে ডিগ্রীই অধিকতর মূল্যবান— এ পক্ষের প্রবল সমর্থক জাকারিয়া সাহেব। ফলে আপনার আর ইদ্রিস আলীর মধ্যে টাই হয়েছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়!

ফিরে এলাম চাটগাঁ। জাকারিয়া সাহেব সিনিয়র আই. ই. এস. আর ভেকেন্সিটা তাঁর কলেজে— ডিপার্টমেন্ট এমন লোকের কথা উড়িয়ে দেন কি করে? যথারীতি কারো নামে নিয়োগ পত্র অনেক দিন ইসু করা হল না বটে কিন্তু ইদ্রিস আলী সাহেব অস্থায়ীভাবে ইসলামিয়া কলেজে কাজ করে যেতে লাগলেন। আমি চুপ মেরে বসে রইলাম নতুন কোন ভেকেন্সির আশায়।

হঠাৎ এক চল্লিশের জুন মাসে আমি পেয়ে গেলাম ডি. পি. আইর এক নিয়োগপত্র— কৃষ্ণনগর কলেজে আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে লেকচারার। ২রা জুলাই কাজে হাজির হওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে কড়া নির্দেশ। বুঝতে পারলাম আগের ইন্টারভিউরই ফল— এতদিনে যেন গ্রন্থিমোচন ঘটল ইদ্রিস আলী সাহেবের সঙ্গে টাইয়ের। সরকারি কোন কলেজেই এতকাল বাংলা অনার্স ছিল না এমনকি প্রেসিডেন্সি কলেজেও না। কৃষ্ণনগর কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ মি: জে. এম. সেন অনেক লেখালেখি আর দেখাদেখি করে প্রথম অনার্স শিক্ষা প্রবর্তনের গৌরব তাঁর কলেজের জন্য মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন। ফলে অনার্স পড়াবার জন্য ঐ কলেজে একটা অধ্যাপকের আর একটি অতিরিক্ত লেকচারারের পদেরও হয়েছে সৃষ্টি। লেকচারারের এ নতুন পদেই আমার নিয়োগ।

১ জুলাই। রানাঘাটে ট্রেন বদলে কৃষ্ণনগরের ট্রেনে উঠতেই নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা পেয়ে গেলাম মি: মোফেস্বল উদ্দীন আহমদের (বর্তমানে প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য)। তাঁর সঙ্গে ঢাকা মুসলিম হলেই পরিচয়। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। কলকাতা থেকে ফিরছেন। এমন দূর দেশে, অপরিচিত পরিবেশে একজন পরিচিতের দেখা পেয়ে, বিশেষত কলেজে তাঁকে পাব সহকর্মী হিসেবে, মনটা খুশি হয়ে উঠল। লেখার মারফৎ কৃষ্ণনগরে আকবর উদ্দীন সাহেবকেই শুধু আমি জানতাম, সাহিত্য সমাজের এক বার্ষিক সম্মেলনে ঢাকায় তাঁর সঙ্গে একবার দেখাও হয়েছিল। আমরা উভয়ে দেদার লেখা লিখেছি সে যুগের সওগাতে। তিনি তখন কষে গল্প উপন্যাস লিখতেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম— কৃষ্ণনগরে অন্য কেউ জানাশোনা নেই বলে আমাকে প্রথমে তাঁর ওখানেই উঠতে হবে।

আকবর উদ্দীন সাহেব কৃষ্ণনগরে সুপরিচিত ব্যক্তি, কোর্টে কি এক কেরাণীর কাজ করলেও শহরে তাঁর যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিলো। ছিলেন তখন মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। মোফাস্বেল উদ্দীন সাহেব জানালেন— তাঁর বাসা খালি, পরিবার আসতে বেশ দেরি আছে ইচ্ছা করলে আমি তাঁর সঙ্গেও থাকতে পারি।

দিন দুই আকবর উদ্দীন সাহেবের বাসায় থেকে এবার এম. ইউ. আহমদ সাহেবের


www.pathagar.com

বাসায় গিয়েই উঠলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই মহীউদ্দীনও থাকতো। পড়ত কৃষ্ণনগর কলেজে। দেশের কাজ করতে গিয়ে মহীউদ্দীন, পরে বহুবার জেল খেটেছে। এখন ন্যাপের বিশিষ্ট কর্মী ও নেতা। জীবনে কখনো কৃষ্ণনগর আসতে হবে এ খেয়াল যখন মনের ত্রিসীমানায়ও স্থান পায় নি তখনই নজরুল পুতুল খেলার কৃষ্ণনগরের একটা ছবি আমাদের মনের পটে চিরকালের জন্য এঁকে দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে আজ সে পুতুলের দেশ কৃষ্ণনগরে এসে আমি হাজির। চারদিকে দেখতে পেলাম 'মৃত্যু ক্ষুধার' মানুষগুলিকে— দেখলাম দারিদ্র্য জর্জরিত হতভাগ্য ধর্মান্তরিত 'ওমান কাত্‌লি' আর ছিটেন পাড়ার মানুষদের। আজো তারা যাপন করছে তেমনি দীন ও হত-শ্রী জীবন। রাজপুরুষের ধর্ম তাদের জীবনে নিয়ে আসেনি কোন রকম রাজকীয় আরাম ঐশ্বর্য। গজালের মা, প্যাকাঁলে, হিড়িম্বা, পাঁচিরা আজো কলতলায় তেমনি ঝগড়া করেই চলছে। নজরুলের দেখা মিস জোন্সকে আমরা দেখিনি সত্য কিন্তু মিস্ এলেনকে দেখেছি। পূজার ছুটির পর আমি নিজেই বাসা করেছি— বাসাটার মালিকের দেওয়া নাম 'শান্তিকুটির'। খ্রিস্টান মিশনারীদের হাসপাতালের সামনে একতলা বাড়ি ভাড়া মাত্র দশ টাকা। মিস এলেন আর মিস গ্রাহামস্ ঐ হাসপাতালেই থাকতেন। মিস্ গ্রাহামস্ ডাক্তার, এলেন বুড়ো হয়ে অবসর জীবন যাপন করছেন। প্রায় আমাদের বাসায় আসতেন— সঙ্গে অনেকগুলি কালো কালো বাচ্চা মেয়ে। মিস্ এলেন আমার স্ত্রীকে ডাকতেন 'বৌ-মা'।

মিস্ এলেনকে দেখলে আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যেত 'মৃত্যু ক্ষুধার' মিস জোন্সের কথা, 'মিস জোন্স হেসে খুশিতে মেজ বৌর হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "আজই রাজি। বরো ডুখ্‌খু পাচ্ছো টুমি, মনও খুব খারাব আছে টোমার, এখন, এখন লেখাপড়া শিখলে টোমার মন এসব ভুলে ঠাকবে।"

মেজ-বৌ কি যেন ভাবলে খানিক। তার পর ম্লানস্বরে বলে উঠল, "আমার ছেলেমেয়েদের কি করব?" মিস্ জোন্স বল্লে, 'আরে, ওডেরেও সঙ্গে নিয়ে যাবে যাবার সময়। ওখানে ওরাও পড়ালেখা করবে। ওডের আমি বিস্কুট ডেবে, খাবার ডেবে, ওরা খুশি হয়ে ঠাকবে।"

কৃষ্ণনগরে এসে এদেশের ইতিহাসের এক খণ্ডপৃষ্ঠা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম। 'মৃত্যু ক্ষুধা'য় কবি আমাদের ইতিহাসের এ এক কালো পৃষ্ঠা নিখুঁত ভাবে এঁকে রেখেছেন। এটিও ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল মাসিক সওগাতে।

কলেজের কাজে যোগ দিলাম ২ জুলাই, ১৯৪১। জীবনের একটি স্বপ্ন আমার সফল হলো। সরকারি একটি কলেজে এ প্রথম বাংলা অনার্স প্রবর্তন। তখনো জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার চাহিদা তেমন বাড়ে নি। তাই অনার্স ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা কেমন হয়, আদৌও ভর্তি হয় কি-না এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মনে কিছুটা সংশয় যেন ছিল। পরে দেখা গেলো এ সংশয় অমূলক। দুটি মেয়েসহ প্রথমবারেই সাতজন ভর্তি হল। আকবর উদ্দীন সাহেবের বড় ছেলে বদর উদ্দীনও তার মধ্যে একজন। মুজিবর রহমান নামে কুষ্টিয়ার আরো একটি মুসলমান ছেলে বাংলায় অনার্স নিয়েছিল। অথচ সারা কলেজে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ছিল নগণ্য। অধ্যাপক মণ্ডলীতে আমরা ছিলাম চার কি পাঁচজনমাত্র। দর্শনে মি: এম. ইউ. আহমদ, আরবিতে মরহুম মৌলভী মেহের উদ্দিন,


www.pathagar.com

বাংলায় আমি আর কেমেস্ট্রিতে বোধ করি একজন ডিমোনেস্ট্রেটার। অর্থনীতিতে অল্পকালের জন্য জনাব আবদুস সোবান খান চৌধুরীও ছিলেন। পরে অবশ্য আরবি ফারসিতে আর একজন লেকচারার আর ইতিহাসে আবদুল ওহাব মাহমুদ ওরফে বাচ্চু মিয়াও এসে যোগ দিয়েছিলেন। বাচ্চু মিয়া সব রকম খেলাধুলায় ছিলেন ওস্তাদ। ফলে অল্প দিনেই ছাত্র মহলে হয়ে পড়েছিলেন খুব জনপ্রিয়। পাকিস্তান হওয়ার পরেও তিনি পাকিস্তানে আসেন নি। বর্তমানে বোধ করি পশ্চিম বঙ্গে জনশিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর। ঋজু ছিপছিপে গড়ন এম. ইউ. আহমদও সফল অধ্যাপক। তিনি আবার হিপনেটিজম তথা সম্মোহন বিদ্যায়ও বিশেষজ্ঞ। ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে একটি বইও লিখেছেন। সম্মোহনের সাহায্যে তিনি নাকি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে পারেন। তাঁকে পরে আমি চট্টগ্রাম কলেজেও সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম আবদুস সোবহান খান চৌধুরীকেও। খান চৌধুরী খুব সুদর্শন আর প্রিয় ভাষী। ভদ্র ও সজ্জন হিসেবে আজো তিনি সুপরিচিত। মেহেরুদ্দীন সাহেব ধার্মিক, নামাজী কালামী লোক। কিন্তু বে-নমাজীদের প্রতিও অসহিষ্ণু ছিলেন না মোটেও। ধর্মীয় ব্যাপারে গোঁড়া হলেও তাঁর মধ্যে যুগ চেতনার অভাব ছিল না। সে যুগেও তিনি তাঁর পর্দানসীন মেয়েদের সামনে উচ্চ শিক্ষার পথ খুলে দিয়েছিলেন। পূত চরিত্রের জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত— এমন কি স্থানীয় হিন্দু মহাসভার নেতারাও তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে দেখতে পেলে একটা সালাম না দিয়ে যেত না। শান্তিপুরের মুসলমানরা একবার ওখানকার মুসলিম ক্লাব ও লাইব্রেরির বার্ষিক সভা উপলক্ষে সভাপতিত্ব করার জন্য আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কবি মোজাম্মেল হক আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র স্যার আজিজুল হকের জন্মস্থান শান্তিপুরের খ্যাতি আর সুনাম বহু আগে থেকেই শোনা ছিল। মোজাম্মেল হক সাহেবের ছেলে স্বনামধন্য 'মোসলেম ভারত' মাসিকের কর্ণধার আফজলুল হকের সঙ্গেও দেখা হলো ওখানে। তিনিও অন্যতম কর্মকর্তা। লেখক আর অধ্যাপক হিসেবে এ বোধ করি আমার প্রথম জন-সম্মান লাভ। স্যার আজিজুল হক সাধারণত কৃষ্ণনগরেই থাকতেন— ওখানে পাকা বাড়ি করেছেন। আরো বড় হওয়ার পর চলে যান কলকাতা। শুনেছি তাঁর রাজনৈতিক বা জন জীবনের শুরু একেবারে গোড়া থেকে অর্থাৎ য়ুনিয়ন বোর্ড থেকেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, শিক্ষা মন্ত্রী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কৌন্সিলের সদস্য, বিলাতে ভারতীয় হাই কমিশনার একে একে এসব কয়টা উচ্চ পদই তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন অত্যন্ত যোগ্যতা ও মর্যাদার সঙ্গে। এর যে কোন একটা পদ সেকালে খুব সম্মানের বলে বিবেচিত হত। তাঁর Man Behind the Plough বইটিও সেদিন বিশেষজ্ঞ মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছিল। এ যুগের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে নিঃসন্দেহে স্যার আজিজুল হক এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর চালচলনেও দেখা যেত সে বিশিষ্টতা। বাইরে আসকান পাজামাই ছিল তাঁর পরিধেয়। শুনেছি তিনি খুব ভোজন বিলাসী ছিলেন তবে রসনাটি ছিল পুরোপুরি বাঙালি। হাই কমিশনার হয়ে বিলেত যাওয়ার পর সেখানকার রান্না নিয়ে অত্যন্ত বেকায়দায় পড়েছিলেন। দেশে খবর পাঠিয়েছিলেন ঝাল লঙ্কা আর খাঁটি সর্ষের তেল পাঠাতে। তাঁর বশংবদ এক মৌলবীকে তা পাঠাতেও দেখেছি। বলা বাহুল্য, হাই কমিশনারদের মালে কোন ফ্রেইট্ লাগত না। এখন লাগে কি-না জানি না।


www.pathagar.com

বাংলা দেশের সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলন আর সাম্প্রদায়িক তিক্ততার প্রাণ-কেন্দ্র ছিল কলকাতা। কৃষ্ণনগর কলকাতার খুব কাছে বলে সে সবের তরঙ্গাঘাত এখানে এসেও পৌঁছত। ছাত্ররাও ছিল নানা দলে বিভক্ত। দলীয় সংঘর্ষ অনেক সময় ক্লাসের পড়াশোনাকেও করে তুলত বিঘ্নিত। ৪০শে লাহোর প্রস্তাবের পর পাকিস্তান আন্দোলন হয়ে উঠেছে জোরদার ও অধিকতর মুখর। বিশ্বযুদ্ধও প্রায় মাথার উপর এসে গেছে। দেশীয় পত্রিকাগুলিতে ছড়ানো হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার হলাহল। আমাদের অধ্যাপক রুমে নেওয়া হত 'অমৃতবাজার', 'আনন্দবাজার' আর 'স্টেটসম্যান'। কাজেই হিন্দু আর সরকার পক্ষের বক্তব্য আর সংবাদ পুরোপুরিই আমরা পেতাম, কিন্তু মুসলমান পক্ষের খবর জানবার জন্য আমাদের নিতে হত ঘরে স্বতন্ত্র কাগজ। একদিন অধ্যাপক রুমে বলেই ফেল্লাম, মুসলমান পক্ষের বক্তব্য জানার জন্য 'আজাদ' পত্রিকাটাও নেওয়া দরকার। হিন্দু সহকর্মীরা এক বাক্যে আপত্তি করে উঠলেন। বল্লাম : আমরা যে কয়জন মুসলমান আছি আমাদের দেয় চাঁদা থেকেই না হয় নেওয়া হোক 'আজাদ'।

তখন 'আজাদ' ছাড়া মুসলমানদের অন্য কোন দৈনিক ছিল না আর তখন কাগজের দাম ছিল চার পয়সা মাত্র। বোধ করি তখন সংখ্যা আমাদের পাঁচ জনে দাঁড়িয়েছে— মাসে মাসে অধ্যাপক ক্লাবে আমরা চাঁদা দিতাম এক টাকা করে। কাজেই 'আজাদের' দাম দিয়েও সাধারণ ফান্ডে তিন টাকার মতো থেকে যেত। আমাদের সহকর্মীরা আমাদের এ প্রস্তাবেও রাজি হলেন না। তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি। সংখ্যার জোরে তাঁরা আমাদের ন্যায়-সঙ্গত দাবীও এভাবে অনেক সময় দাবিয়ে রাখতেন। নদীয়া মুসলিম প্রধান জেলা হলেও তার সদর কৃষ্ণনগরে মুসলমানের সংখ্যা ছিল কম— বলেছি কলেজে ছাত্র সংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য।

আকবর উদ্দীন সাহেব ছাড়া কৃষ্ণনগরে 'দীওয়ানে জেবুন্নেসা'র অনুবাদক কবি ফজলুর রহমানের সঙ্গেও আগের পরিচয়টা ঝালিয়ে নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি সে যুগেও গোঁড়া কংগ্রেস পন্থী ছিলেন— পরতেন সব সময় মোটা খদ্দর। ওকালতি করতেন কৃষ্ণনগর কোর্টে। এখন তিনি পশ্চিম বঙ্গের একমাত্র মুসলিম মন্ত্রী।

যুদ্ধের সীমারেখা দিন দিনই প্রসারিত হচ্ছে আর তা হয়ে উঠছে ভয়াবহ। রেঙ্গুনে জাপানি বোমায় আহত অনেকগুলো ভারতীয়কে কৃষ্ণনগর হাসপাতালেও করা হয়েছে স্থানান্তরিত। একদিন হাসপাতালে গিয়ে এসব আহত ও মুমূর্ষুদের দেখে যুদ্ধের যে নির্মম মূর্তি দেখলাম তা কখনো ভুলতে পারি নি।

বার্মা দখলের পর জাপানিদের লক্ষ্য হল পাক-ভারত। আসাম আর আরাকান সীমান্তে এমন কি চট্টগ্রামেও বোমা পড়তে শুরু করল। একদিন কলকাতার উপরও পরীক্ষামূলকভাবেই বোধ করি দু'একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হল। আগে থেকেই আতঙ্কে কলকাতা ছেড়ে লোক পালাতে শুরু করেছিল— এবার কলকাতা প্রায় শূন্য হওয়ার দশা। ট্রেনে, স্টিমারে, প্লেনে, মোটরে, বাসে যে যেদিকে পারল বালবাচ্চা নিয়ে পালাতে লাগল কলকাতা ছেড়ে। কৃষ্ণনগর ছোট শহর, সুযোগ-সুবিধা অনেক কম— তবুও আশ্রয়প্রার্থীরা এখানেও ভিড় জমিয়ে তুল্লো— জিনিষপত্রের, বিশেষ করে চাল, ডাল, মাছ, তরকারি ইত্যাদি দৈনিক খাদ্য বস্তুর দাম গেল হু হু করে বেড়ে। আমার 'উচ্চ ও তুচ্ছ' গল্পটি এ


www.pathagar.com

পরিবেশেই লেখা। কৃষ্ণনগরে লেখার দিকটা আমার তেমন অগ্রসর হয় নি। মনে হয় তার প্রধান কারণ— আপাতত দেখা যায় বটে স্কুল থেকে কলেজ একটি মাত্র ধাপ কিন্তু আসলে লেখাপড়ার মানের দিক দিয়ে ব্যবধানটা দুস্তর। আমি সোজা স্কুল থেকে এসেছি, এক চোটে বি. এ. পর্যন্ত পড়াতে হচ্ছে, তার উপর অনার্সও। নিজে অনার্স পড়িনি, উচ্চতর ক্লাসে কি করে অধ্যাপকরা পড়ান, তার মানের দৌড় কতখানি— এসব কিছুর সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। এম. এ. পাস করেছি তো প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে। আর অধ্যাপনা করতে হচ্ছে কৃষ্ণনগরের মতো জায়গায়— যার ভাষাকে মনে করা হয় সব চেয়ে আদর্শ, মার্জিত, সুন্দর আর উচ্চ মানের। রীতিমতো ঘাবড়াবার কথা বিশেষত আমার মতো মাদ্রাসায় পড়া 'বাঙ্গাল' দেশের এক নতুন অধ্যাপকের পক্ষে। এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলার জন্য আমাকে রোজই তৈরি হতে হতো, থাকতে হতো সম্ভাব্য সব প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত। প্রত্যেকটা শব্দের উচ্চারণ সম্বন্ধেও থাকতে হত সচেতন। কাজেই তখন সাহিত্য কর্মে মন দেওয়া সম্ভব হয় নি, মিলে নি তেমন অবসর। এ সময় 'লালসালুর' লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এসেও বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন— তাঁর আগমনের কারণও বোধ করি যুদ্ধ। তাঁর এক আত্মীয় তখন ওখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, খুব সম্ভব থাকতেন সে বাসায়। 'নব বসন্তের' কবি আবুল হোসেন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলেন না তবে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন ঐ সেন্টার থেকে। তাঁর সেন্টার বদলীর কারণও বোধ করি যুদ্ধ। কবি হেমচন্দ্র বাগচী তখন কৃষ্ণনগরে থাকতেন তাঁর সঙ্গেও দু'একবার দেখা হয়েছে।

১৯৪২-এর ১২ই জুলাই আমার তৃতীয় ছেলের জন্ম ওখানে কৃষ্ণনগরে আমার 'শান্তি কুটির' নামক বাসায়। ওর নাম রাখলাম আবুল মামুন।

৪৩-এ যুদ্ধের অবস্থা আরো সংগীন হয়ে উঠল। চট্টগ্রাম ঘোষিত হলো যুদ্ধ এলকা— বোমা পড়তে লাগল অনবরত। শহর ছেড়ে লোকজন আশ্রয় নিতে লাগল গ্রামে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো চট্টগ্রাম কলেজ ঢাকায় করা হবে স্থানান্তরিত— মালপত্র পাঠানো শুরু হল। সৈন্য বাহিনীর জন্য রিকুইজিশন করা হয়েছে কলেজ বিল্ডিং। বাইরের অধ্যাপকরা কেউ ছুটি নিয়ে, কেউ বা ছুটি না নিয়েই চলে গেছেন চট্টগ্রাম ছেড়ে। বাংলার অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী তাঁর পরিবার এনে রাখলেন কৃষ্ণনগরে। ওদের রেখে চট্টগ্রাম ফিরে যাওয়ার সময় তাঁকে মনে হলো যেন ফাঁসির আসামী। কম্পিত হাতখানি আমার কাঁধের উপর রেখে বল্লেন : তুমিও একটু ওদের দেখো।

চট্টগ্রাম কলেজ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা চলে যাবে— একবার চলে গেলে কখন ফিরে আসবে, আদৌ ফিরে আসে কি-না, এ রীতিমতো সন্দেহের কথা। চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দের মনে এ সম্পর্কে সংশয় দেখা দিল। খান বাহাদুর ফজলুল কাদির কমিশনার আর ম্যাজিস্ট্রেটকে গিয়ে বল্লেন, আমি জায়গা দিচ্ছি আমার বাড়ির বাইরের অংশটাও দিচ্ছি ছেড়ে। কলেজ এখানেই চলুক, প্রয়োজন মতো কাঁচা ঘর তুলে নিলেই কাজ চলে যাবে। কলেজের কাছেই তাঁর বাড়ি। তিনি উদ্যোগী লোক, সরকারি মহলে তাঁর যথেষ্ট সম্মান আর প্রতিপত্তি। শেষ পর্যন্ত সরকার তাঁর কথায় রাজি হল।

এদিকে বোমাবর্ষণ কিন্তু বেড়েই চল্লো। এ সময় হঠাৎ আমার কাছে জনার্দন বাবুর এক চিঠি এসে হাজির। তিনি লিখেছেন— আমি আর চাটগাঁ থাকছি না, বদলীর দরখাস্ত


www.pathagar.com

দিয়েছি, বদলী না হলে লম্বা ছুটি নেব, ছুটি না দেয় চাকরিই ছেড়ে দেব। তুমি যদি চাটগাঁ আসতে চাও এ সুযোগ।

সহকর্মী আর বন্ধুরা নিষেধ করলেন : সবাই চাটগাঁ ছেড়ে পালাচ্ছে, এ সময় আপনি চাটগাঁ যাবেন! বোমা পড়াটা একটু থামুক।

আমি কিন্তু মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি— এ সুযোগ হাত ছাড়া করা হবে না।

বন্ধুদের বল্লাম : চাটগাঁয় আমার মা আর আত্মীয় স্বজন সবাই রয়েছেন। যে দুঃখ তাঁরা সহ্য করছেন তা আমি সহ্য করতে পারব না কেন? আমার দেশের দুঃখের অংশ আমিও নিতে চাই। মার একমাত্র ছেলে আমি, এ দূর দেশ থেকে এ দুঃসময়েও তাঁর কোন রকম দেখাশোনা করতে পারছি না, মনের ভেতর এ ব্যথাটাও খচ খচ করছিল বহুদিন ধরে। শুধু যুদ্ধ নয় দেশের উপর নেমে এসেছে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কালোছায়া। মনটা দেশের জন্য উতলা হয়ে উঠল। দোহাজারীর কাছেই মেজ বোনের শ্বশুর বাড়ি, দোহাজারীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামরিক ছাউনি, বোমা পড়েছে বহুবার। বোনেরা আশ্রয় নিয়েছে আমাদের বাড়ি। ভগ্নিপতি দেওবন্দ পাশকরা মৌলবী আর হজ্ব করেছেন বার পাঁচ ছয়। মৌলবী মওলানার সনাতন পেশা ছেড়ে এবার ধরেছেন কন্ট্রাকটারি। থাকেন আমাদের বাড়ি। কাজেই মা এখন একা নন— দেখাশোনার লোকের অভাব নেই। তবুও সুযোগ দেখা দেওয়া মাত্র মনটা আমার উড়ু উড়ু হয়ে উঠল।

অধ্যক্ষকে কিছু না বলে এক চিঠি লিখে বসলাম কাজী আবদুল ওদুদকে। তিনি তখন রাইটার্স্ বিল্ডিংএ টেক্সট বুক বোর্ডের সেক্রেটারি। এ. ডি. পি. আই. খান বাহাদুর আবদুর রহমান যিনি এসব বদলীর মালিক, তিনি ওদুদ সাহেবকে সমীহ করেন যথেষ্ট। ওদুদ সাহেব বলতেই খান বাহাদুর রাজি হয়ে বদলীর চিঠি ইসু করে দিলেন। চাটগাঁ কেউই আসতে চায় না, থাকতে চায় না কোন অফিসার। এ অবস্থায় এ সুযোগ ডিপার্টমেন্টও ছাড়ল না।

শুনে প্রথমে অধ্যক্ষ কিছুটা নাখোশ হয়েছিলেন। তিনিও আমাকে পছন্দ করতেন, প্রবেশনারী পিরিয়ড এক বছর পার হতে না হতেই তিনি সুপারিশ করে আমার চাকরি পাকা করে দিয়েছেন। ছাত্র আন্দোলনের ফলে কলেজে তখন গোলমালের অন্ত ছিল না। গোলমালের জন্য কোন কোন অধ্যাপক ক্লাসই নিতে পারতেন না। বাংলার অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীকে বহুদিন ক্লাস ছেড়ে ম্লান মুখে ফিরে আসতে দেখেছি। আমি মোটামুটি এক রকম চালিয়ে নিচ্ছিলাম। আমার ক্লাসে তেমন গোলমাল কোনদিন ঘটে নি। এ জন্যও অধ্যক্ষ আমার উপর ছিলেন সন্তুষ্ট। এসব কারণে আমার বদলীতে তিনি মনে মনে দুঃখিত হয়েছিলেন। মার দোহাই দিয়ে আমি অবস্থাটা বুঝিয়ে বলার পর তিনি আর বিরুদ্ধতা করেন নি। বিশেষত সঙ্গে সঙ্গে আমার স্থলাভিষিক্ত মুহাম্মদ আবদুল হাই সাহেব (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ) যখন এসে পড়লেন কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তখন তাঁর আপত্তি করার পথও হয়ে গেল বন্ধ। হাই সাহেবের প্রথম চাকরি— কাজেই নিয়োগ পত্র পেয়ে তিনি আর দেরি করেন নি। ছুটে এসেছেন কাজে যোগ দিতে। চারদিকে যুদ্ধের ব্যস্ততা আর হট্টগোল। ট্রেনে তিল ধারণের স্থান নেই। কয়দিন আগে


www.pathagar.com

থেকে স্ত্রীর শরীর হয়ে পড়েছিল খুবই খারাপ। কৃষ্ণনগর থেকে চাটগাঁ দূরের পাড়ি— গোয়ালন্দ চাঁদপুরে আছে চড়াই-উৎরাই। এ দুই স্টিমার ঘাটে তখন পুরোপুরি কুলিদেরই রাজত্ব। চার কি পাঁচ আনার বদলে কুলি প্রতি দু'তিন টাকা দিয়ে দিয়ে কোন রকমে চাঁদপুর এসে তো পৌঁছলাম। চাঁদপুর স্টেশনে এসেই চক্ষুস্থির, লোকে-লোকারণ্য, কোন গাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই, সৈন্যে সৈন্যে সব গাড়ি ভর্তি। সবাই সশস্ত্র। সর্বত্র খাকির রাজত্ব। মেয়ে গাড়ি দূরে থাক কোথাও একটা মেয়ে যাত্রী পর্যন্ত নেই। স্টেশন মাস্টার, ট্রেনের গার্ড সবার প্রতি আবেদন জানালাম— গাড়িতে উঠতে না পারলে তিনটি অপোগণ্ড শিশু আর রুগ্‌ণা স্ত্রীকে নিয়ে আমি কোথায় রাত কাটাব? চারদিকে তো শুধু সৈন্য, সৈন্য, সৈন্য। বড়টি ভ্যাবাচেকা খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে, ছোটটা স্ত্রীর কোলে,— মেজটা ভ্যা করে সে যে কান্না শুরু করল তা আর থামেই না। আমি ট্রেনের এমাথা ওমাথা ছুটাছুটি করছি পাগলের মতো। একে বলছি, ওকে ধরছি— সে এক প্রাণান্ত ব্যাপার। গোরা সৈন্যরা ক্রন্দনরত শিশুর হাতে কেউ একটা আপেল, কেউ বা পনিরের টুকরা, কেউ বা মাখনের আধ খাওয়া টিন গুঁজে দিচ্ছে। কিন্তু শিশুর কান্না থামছে না কিছুতেই।

স্তূপীকৃত মালপত্রের পাশে যেখানে স্ত্রীকে বসিয়ে রেখেছিলাম, যার পাশে দাঁড়িয়ে মেজ ছেলে মঞ্জু অবিরাম সরবে কেঁদে চলেছে হঠাৎ তার সামনের কম্পার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে এক লাল মুখো সাহেব আমাকে ইসারায় ডেকে বল্লেন, ওদের সে গাড়িতে তুলে দিতে। মুহূর্তে হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেলাম। সারা গাড়িটা খালি ; শুধু উপরে বাঙ্কের উপর পায়োনিয়ার ফোর্সের কয়েকজন খাকি পরা মাদ্রাজী যুবক শুয়ে। নিচে সাহেব একাকী। কাজেই বসার বা শোয়ার স্থানের অভাব নেই। কিন্তু সাহেবটার চোখ মুখ আর হাবভাব দেখে আমরা ভয়ে আঁৎকে উঠলাম— চোখ দু'টি রক্তজবার মতো লাল, রুমের এমাথা ওমাথা এক অস্বাভাবিক অস্থির পায়ে দিচ্ছে টহল। আর কেউ ঢুকতে চেষ্টা করলে হাতে একটা ধারাল ছুরি নিয়ে করছে তাড়া। রুমটা খালি থাকার কারণ এবার বুঝতে পারলাম। বাঙ্কের উপর শায়িত একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বল্লো : সাহেব মেয়ে ছেলে নিয়ে এখানে উঠে ভালো করো নি, বেটা আজ অনেক টেনেছে। দেখছেন না ঢুলে ঢুলে পড়ছে। কি কাণ্ড করে বসে কে জানে! ভয়ে প্রাণ-পাখি খাঁচা ছাড়ার দশা কিন্তু অন্য উপায় নেই। নেমে পড়া মানে অকুল পাথারে ভাসা। তিনটা শিশু আর রুগ্‌ণা স্ত্রীকে নিয়ে এ রাত্রে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব— মালপত্র না হয় চুলোয় যাক! রেল এখন মিলিটারির জিম্মায়। তাদের হুকুমেই ট্রেন চলে, ছাড়ে আর পৌঁছে। কালকের ট্রেনেও যে আমরা উঠতে পারব তারও নিশ্চয়তা কি?

কাজেই নিচে এ মাতাল সাহেব আর উপরে আল্লার উপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া আর কোন গতিই দেখতে পেলাম না। সবিনয় ধন্যবাদী দু'একটা কথা বলে মাতালটার সঙ্গে একটু ভাব করার চেষ্টা করলাম। জানলাম সে কেনাডার অধিবাসী ফ্লাইট্ অফিসার। বুক পকেট থেকে এক মেমসাহেবের ছবি বের করে আমার চোখের সামনে ধরে বল্লে : My Sweet heart।

ভয়ে প্রাণটা ঢিপ্ ঢিপ্ করলেও ইংরেজি ভাষা উজাড় করে এবার আমি তার সুইট্-হার্টের রূপের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলাম।


www.pathagar.com

গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত কিন্তু সে হাতের ছুরিটা হাত ছাড়া করে নি। কোলের শিশুটাকে বুকে নিয়ে স্ত্রী শুয়ে পড়েছে, অন্য বাচ্চা দু'টিকেও শুইয়ে দিয়ে আমি অতন্দ্র প্রহরীর মতো ওদের মাঝখানে বসে। কি ভেবে সাহেবটা তার একটা কম্বল এনে আমার স্ত্রীর গায়ের উপর বিছিয়ে দিলে। ফেব্রুয়ারি মাস হলেও তখনো বেশ শীত ছিল। স্ত্রী ভয়ে, সঙ্কোচে জড়োসড়ো হয়ে ভেতরে ভেতরে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। কম্বলটা গায়ের উপর থেকে না পারছিল ফেলে দিতে, না পারছিল মুখ খুলে আপত্তি জানাতে। পরপুরুষের গায়ের কম্বল স্ত্রী সুলভ এ সংস্কারের আগুনে সে সারারাত ধরেই নাকি জ্বলেছে আর চোখ দু'টা বন্ধ করে শুধু করেছে আল্লাহ্ আল্লাহ্। গাড়ি কয়েক স্টেশন পার হওয়ার পর দেখলাম সাহেবটা এক এক করে তার কাপড় চোপড় সব খুলে ফেল্ল— স্রেফ আন্ডার ওয়েরটাই বাকি। সেটাও খুলে ফেলবে আশঙ্কা করে আমি এবার চোখ বন্ধ করলাম।

চোখ খোলার পর দেখলাম যে, আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে সে সটান শুয়ে পড়েছে আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে অচেতন। বসে বসে আমি আল্লাকেই শুধু ডাকতে লাগলাম, তাঁর কাছে স্রেফ এ প্রার্থনাটুকুই জানালাম : এ রাত্রে মাতালটার ঘুম যেন না ভাঙ্গে।

সত্য সত্যই ট্রেন পাহাড়তলী পৌঁছার আগে ঘুম তার ভাঙ্গে নি। পাহাড়তলী যখন পৌঁছেছি তখন তো রীতিমতো ফর্সা। ভোরের আলো দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। গাড়ি ইন্ করা মাত্র সাহেবটা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। দেখে মনে হল গভীর ঘুমের পর সে এখন পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ। সাত তাড়াতাড়ি নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে, আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে, হেন্ডশেক্ করে পাহাড়তলীতেই নেমে পড়লো ধপ্ করে। এবার আমাদের ধড়ে ফিরে এলো প্রাণ। যত ভয়ে ভয়েই রাত কাটাই না কেন এ অজ্ঞাত পরিচয় কেনাডিয়ানটার প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা বোধ না করেও পারি নি। তার অযাচিত সাহায্য না হলে কি দুঃসহ অবস্থায় না পড়তে হত আমাকে সে রাত!

ট্রেন চট্টগ্রাম স্টেশনে ঢুকতেই দেখতে পেলাম প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন আমার শ্বশুর আর অন্যান্য আত্মীয়রা। হাসি খুশিতে এবার সকলের মুখ উদ্ভাসিত— মুহূর্তে ভুলে গেলাম পথের দুঃখ গ্লানি। পা রাখলাম নিজের দেশের মাটিতে। নিজের দেশ কথাটার মধ্যেই যেন রয়েছে এক অনির্বচনীয় যাদু— মিশে রয়েছে তার সঙ্গে আত্মপ্রত্যয় আর অভয়, আশ্বাস আর আশ্রয়। মনে হলো সবই মধুময়।

যুদ্ধের ফলে পরিচিত স্টেশনটাই হয়ে পড়েছে অপরিচিত— চারদিকে শুধু খাকি, খাকি, এখানে ওখানে ট্রেঞ্চ, তাঁবু, বাঁশের অস্থায়ী সব আস্তানা, এন্টিএয়ারক্রেপ্ট গান, কোন কোনটা ডামি। আউটার সিগ্‌নেলের কাছেই দেখেছি সারা পোলো গ্রাউন্ডব্যাপী অসংখ্য বাঁশের ছাউনী— ঐ নাকি মিলিটারি হাসপাতাল। বুঝতে পারলাম যুদ্ধ সীমান্তে এসে পড়েছি। শহর নন-ফ্যামিলি এরিয়া, প্রায় সব ঘর বাড়ি রিকুইজিশন করা। আমার শহরের বাসার কি অবস্থা, কাজী বাড়ির কি দশা কিছুই জানি না। কয়েক মিনিট পরেই ছাড়বে দোহাজারী ট্রেন— এবার তাতেই সদলবলে চড়ে বসলাম। আমার শ্বশুর তখন পটিয়ার সাব্-রেজিস্ট্রার। উঠলাম তাঁর বাসায়। একদিকে নিজের দেশ আর আত্মীয় স্বজনের মাঝখানে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম বটে কিন্তু অন্যদিকে পরিণত হলাম

www.pathagar.com

বুড়ো সবাইকে ভাগাভাগি করে খেতে হচ্ছে কিছু ভাত, কিছু সিদ্ধ ছোলা, কিছু বজরা। বজরা কি চিজ তা চোখে দেখা দূরে থাক আগে কোনদিন নামও শুনিনি। দেখতে কালো ঘাসের বিচির মতো। এখন তাই আমাদের খাদ্য। পথে পথে দেখা যাচ্ছে হাড্ডি-সার মানুষের সারি। ঘরের দরজা খোলার উপায় নেই অভুক্ত মানুষের প্রেতমূর্তি দেখে আঁৎকে উঠতে হয়। এ অবস্থায়ও সাইরেনের শব্দ শুনে প্রাণের মায়ায় ভয়ার্ত সরীসৃপের মতো ঢুকতে হয় মাটির গর্তে যার সভ্য নাম ট্রেঞ্চ।

## সাঁইত্রিশ

ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। কৃষ্ণনগর থেকে এসে যোগ দিয়েছি চট্টগ্রাম কলেজে। নিজের দেশের কলেজে অধ্যাপনা করব এও আমার এক পুরোনো ইচ্ছা— এবার তাও পূরণ হলো। জনার্দন চক্রবর্তী ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় আর সফল অধ্যাপক— ছিলেন ছাত্রমহলে আদর্শ অধ্যাপকের প্রতীক। আমি এলাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে। কাজেই এও হয়ে দাঁড়াল আমার জন্য আর এক চ্যালেঞ্জ। অন্তত তাঁর কাছাকাছি আমাকে পৌঁছতেই হবে। কৃষ্ণনগরের শিক্ষানবিশি এবার আমার খুব কাজে এলো।

জনার্দন বাবু অল্পকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক ছিলেন— তাঁর সঙ্গে ছিল আমার বাংলা টিউটোরিয়াল ক্লাস। ফলে উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তখন থেকে। আগেই বলেছি আমার এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতির বেলায় তিনি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। আমার কলেজে প্রথম চাকরি কৃষ্ণনগর হওয়ায় তিনি খুশি হয়ে বলেছিলেন : এতে তোমার খুব ভালো হবে। কথাটার ইংগিত তখন ভালো করে না বুঝলেও এবার বুঝতে পারলাম।

কলেজের ধারে কাছেও সর্বত্র খোঁড়া হয়েছে ট্রেঞ্চ। সাইরেন বেজে উঠলেই ছাত্র অধ্যাপক সবাইকে ছুটে গিয়ে যে যেখানে পারে ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়তে হত পড়ি কি মরি হয়ে। প্রাণ বাঁচানোর সংগ্রামে ঘুচে যেত সব ব্যবধান। কলেজ নামে মাত্র কোন রকমে চালু রয়েছে সত্য, কিন্তু ছাত্র উপস্থিতি নেমে এসেছে প্রায় এক-চতুর্থাংশে। চাটগাঁর বাইরের ছেলেরা তো আগেই দিয়েছে পিঠটান। ছাত্র অধ্যাপক কারো মনে নেই এতটুকু শান্তি বা স্বস্তি। ঘরে বা কলেজে সব সময় থাকতে হয় প্রাণটা হাতে নিয়ে। এ অবস্থায় পড়শোনার মন মেজাজ থাকার কথা নয় কারো।

আমার বাসার চেহারাটা ছন্নছাড়া— ঘেরা বেড়া সব উধাও। দেওয়াল কয়টা পাকা বলেই ঘরটা এখনো আছে খাড়া। আমার প্রথম পক্ষের শ্যালক কাজী এনামুল হক যুদ্ধের সুযোগে দিয়ে বসেছে এক রেস্টুরেন্ট আর আমার খালি বাসাটাকে করেছে তার গুদাম। আমি আসার পর মালপত্র সরিয়ে আমাকে ছেড়ে দিল ও একটা রুম। তার কারবারে পার্টনার জুটেছে তারই সমবয়সী এক হিন্দু ছেলে। সে ছেলেটার একটা ফাউ কারবার ছিল মিলিটারিতে গরুর গোস্ত সরবরাহ করা। তাতেই ও রাতারাতি লাল। সে এক অদ্ভুত অবস্থা— ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, বিশ্বাস ধুলায় লুণ্ঠিত। টাকা— টাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে সব কিছুর মাপকাঠি। অনেকে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। কমল মাঝি এখন কমল


www.pathagar.com

কন্ট্রাক্টার। চাকর জোটে না— তাই এ যাবৎ আমি খাচ্ছিলাম কাজী বাড়ি। এমন যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের দিনে কাঁহাতক আর পরের অন্ন ধ্বংস করা যায়, হোক সে শ্বশুর বাড়ির। অনেক চেষ্টা তদ্‌বিরের পর পাওয়া গেল এক আধ-বয়সী আধ-পাগলীকে। এখন থেকে ঐ-ই রাঁধতে লাগল আমার জন্য। পটিয়ায়ও করে নিয়েছি আলাদা বাসা। আমার শ্বশুরের বাসার খুব কাছেই পাওয়া গেলো মাটির ঘর একটা। অসুবিধার মধ্যে কাছে ছিল এক চিতাখোলা। মাঝে মাঝে রাত্রে ওখান থেকে 'বল হরি বল' ভেসে এলে ভয়ে কারো আর ঘুমই হত না, বিশেষ করে যেদিন আমি থাকতাম না। তবুও পটিয়ার বাসায় আমরা বেশ আরামেই ছিলাম— দেখাশোনা, তত্ত্বাবধান যা করার আমার অবর্তমানে আমার শ্বশুরই করতেন। শহর থেকে আমি প্রতি শনিবার যেতাম রেশন নিয়ে, রবিবারটা ওখানে কাটিয়ে সোমবার সকালের ট্রেনে ফিরে এসে করতাম কলেজ।

মা দীর্ঘকাল ধরে ভুগছিলেন। '৪৩শের শেষের দিকে মা গেলেন মারা। গ্রামের বাড়িতে আমি এমনিই কম যেতাম, যেটুকু যেতাম তাও মার টানে। সে টান এবার ছিঁড়ে গেলো চিরতরে, জন্মস্থান কেঁওচিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কের শিকড় আলগা হতে শুরু হল এবার থেকে। আমি ছোটকাল থেকে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত— সকালে এক পেয়ালা চা আর দৈনিক কাগজটা না হলে আমার চলে না। তাই বাড়ি গিয়ে আমি একটানা বেশি দিন থাকতে পারতাম না কখনো।

মার মৃত্যু উপলক্ষে স্ত্রী আর ছেলেরা এসেছিল দেশের বাড়িতে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে তৃতীয় ছেলে আবুল মামুন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ধারে কাছে ভালো ডাক্তার নেই— নিকটবর্তী এক হোমিওপ্যাথই দিতে লাগল ঔষধ। জ্বর ছাড়ল, না, হলো না অবস্থার কোন উন্নতি। ছ'সাত মাইল দূরে থানার সদরে ডাক্তার হয়তো আছে কিন্তু যানবাহন নেই আসবে কি করে? জ্বরের সঙ্গে ক্রিমির উপদ্রব গেল বেড়ে। অবশেষে দেড় বছরের মামুন ২রা জানুয়ারি (১৯৪৪) আমার কোলের উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। সন্তান-শোক কি বস্তু এবার তা বুঝতে পারলাম মর্মে মর্মে আমি আর আমার স্ত্রী দু'জনেই।

এরপর উমু আর কিছুতেই কেঁওচিয়া থাকতে রাজি নয়— যথাযোগ্য চিকিৎসার অভাবে চোখের সামনে সন্তান মারা গেল এ দুঃখ সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তবুও থাকতে হলো— চারদিকে যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের হাহাকার। বাড়িতে অন্তত ধানচালটা আছে, পেট ভরে খাওয়াটা চলে। কিন্তু ছেলেদের কারো একটু জ্বরজারি হলেই ও হয়ে পড়ত উতলা। তাই মাস পাঁচ-ছয় পরে ৪৪শের মাঝামাঝি শহরের বাসাটা ঠিক করে নিয়ে এলাম ওদের নিজের কাছে। এর পর থেকে শহরে আমার একটানা জীবনের শুরু, অবসর গ্রহণ পর্যন্ত চাকরিরও সে একই দশা। চট্টগ্রামের বাইরে আর যাইনি। প্রোমোশনের প্রলোভনও আমাকে পারে নি সংকল্পচ্যুত করতে।

যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের যুগপৎ আক্রমণে শিক্ষিত সমাজই হলো সবচেয়ে নাজেহাল। চরম দুর্গতি নেমে এলো গরিব শিক্ষক আর বুদ্ধিজীবীদের জীবনে। আমাদের বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী ছাপোষা মানুষ। বাল-বাচ্চা অনেক। শুধু বড় মেয়েটিরই দিয়েছেন বিয়ে— বড় ছেলেটি মেট্রিক পাস করে সবেমাত্র রেলে পেয়েছে নিচের দিকে একটা কেরাণীর চাকরি। কয়েকটি ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে আবার কোন কোনটা এখনো কথা বলে


www.pathagar.com

মাটির সঙ্গে। অবিবাহিতা মেয়ের সংখ্যা কমপক্ষে আরো গোটা পাঁচ ছয়। কে এক দয়ালু রেশন অফিসার তাঁকেও একখানা রেশন-দোকানের লাইসেন্স দিয়েছেন। খাতা কলম রেখে এখন তিনি ধরেছেন দাড়ি পাল্লা। যাই হোক কায়ক্লেশে দু'বেলা ডাল ভাত জুটছিল এভাবে। একদিন সকাল বেলা তাঁর বাসার সামনে দিয়ে আন্দরকিল্লা থেকে ফিরছি— দেখি তাঁর রেশনের দোকান বন্ধ। খোঁজ নিতে উপরে উঠে দেখলাম তিনি শুয়ে আছেন, এপাশ ওপাশ করছেন রোগযন্ত্রণায়।

: কি আশু দা?

শীর্ণ হাতখানি তুলে বাইরের দিকে ইশারা করলেন। ভংগী দেখেই বুঝতে পারলাম মহাপ্রস্থানের ইশারা, বৌদি'কে জিজ্ঞাসা করলাম : কি হয়েছে?

: টাইফয়েড।

: কবে থেকে?

: আজ আটদিন।

: কে দেখছেন?

: ডাক্তার পূর্ণ চৌধুরী।

দেখলাম চোয়ালের দু'দিকে দু'টা গোটা বেরিয়েছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। লক্ষণ ভালো নয়, মনটা খারাপ হয়ে গেল, পকেটে দশ টাকার একখানি নোট ছিল বৌদির হাতে তা গুঁজে দিয়ে বিষণ্ন মনে বেরিয়ে আসার সময় বল্লাম : কাল একবার আসব।

পরদিন কলেজে গিয়েই শুনলাম গত সন্ধ্যায়ই তিনি মারা গেছেন আর রাত্রেই তাঁর দাহ-ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। মনে পড়ে দিনটা ছিল ২৮ মার্চ, ১৯৪৪।

আশুদার সঙ্গে আর দেখা হলো না— একজন সাহিত্য-পাগল বন্ধু আর অকৃত্রিম মানুষকে হারালাম। মনের এ পরিবেশে 'সাপ ও কেঁচো' নামে কবিতা জাতীয় একটি লেখা লিখেছিলাম। তখনকার 'সীমান্ত' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ওটা। এ লেখাটাও আমার 'সপ্তপর্ণা' নামক বইতে আছে।

কলেজ থেকে এসে বিকালে গেলাম আশুদার বাড়ি। যা শুনলাম তাতে জানা গেল আশুদা শুধু নিজে মরেন নি, এদেরেও মেরে গেছেন।

দুর্ভিক্ষের দিনে ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামে পর্যুদস্ত আশু-দা মাত্র আট শ' টাকার বিনিময়ে তাঁর সাধের 'নিভৃতনিলয়কে'ও মহাজনের কাছে বাঁধা দিয়ে রেখেছেন। হাতের নোয়া আর মাথার সিঁদুর তো ঘুচেছে এবার যে পায়ের তলার মাটিটুকুও খসে যাবে আশুদার হতভাগ্য বিধবাটির। এতগুলি নাবালক বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এবার বিধবা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন?

বিষণ্ন মনে ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলাম বাসায়। রাত্রেই মাথায় চট্ করে একটা প্ল্যান এসে গেল। আশুদা নেই আমরা তো আছি, আশুদার বন্ধু সংখ্যা তো কম নয়। আমরা থাকতে সামান্য আটশ' টাকার জন্য আশুদার ছেলেমেয়েরা রাস্তায় দাঁড়াবে? অথচ চারদিকে টাকার এমন ছড়াছড়ি।



www.pathagar.com

একখানা পোস্ট কার্ড লিখলাম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদকে তাঁর গ্রামের ঠিকানায়। লিখলাম আপনাকে সভাপতি হতে হবে— যা করার আমিই করব। কিছুই করতে হবে না আপনাকে এমন কি বাড়ি ছেড়ে একবার আসতেও হবে না শহরে। নিজে হলাম কমিটির স্বনির্বাচিত সম্পাদক। সভাপতি আর সম্পাদক তো হলো, অন্তত একজনও সদস্য না হলে কমিটি হয় কি করে? শুধু সভাপতি আর সম্পাদক নিয়ে কোন কমিটির নজির তখন জানা ছিল না, হয়তো তেমন কোন কমিটি কোনদিন হয়ও নি! শোনা ছিল ডাক্তার পূর্ণ চৌধুরী আশু বাবুর চিকিৎসা করেছিলেন। এবার সোজা তাঁকে গিয়ে আমার পরিকল্পনার কথা বলে অনুরোধ করলাম : আপনাকে আমাদের কমিটির সদস্য থাকতে হবে, স্রেফ নামকে ওয়াস্তে। এমন কি কোন চাঁদাও দিতে হবে না।

এবার কিছু রশিদ বই ছাপিয়ে নিলাম। চট্টগ্রাম কোহিনূর লাইব্রেরি আর কোহিনূর ইলেক্ট্রিক প্রেসের মালিক মরহুম আবদুল খালেক সাহেব আশুবাবুকে ভালো করে জানতেন— তিনি রশিদ বইগুলি ছেপে দিলেন বিনা পয়সায়। সব রশিদ বইর কভারের উপর 'আশুতোষ চৌধুরী সাহায্য তহবিল' আর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সভাপতি : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, সদস্য : ডা: পূর্ণ চৌধুরী, আর সম্পাদক : আবুল ফজল ছেপে নিলাম। আমার জীবনের এ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম কমিটি। এ কমিটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট— কোন কালেই এর কোন মিটিং বসেনি, আমরা তিনজন কখনো হই নি একত্রিত, করি নি কোন আলাপ আলোচনা। তখন আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন সহকারী টাউন রেশনিং অফিসার— পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন, এখন পরলোকে। তিনি নিজেও ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। বল্লেন : কিছু রশিদ বই নিয়ে আপনি একবার আমাদের অফিসে আসুন, রেশনিং অফিসারের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো। পরদিন কোর্ট বিল্ডিং-এ গিঁয়ে হাজির হলাম। রেশনিং অফিসার কয়েকটি রশিদ বই তাঁর ইন্সপেক্টরদের মধ্যে বিলি করে দিয়ে আমাকে বল্লেন : কয়েকদিন পরে এসে টাকা নিয়ে যাবেন।

যতদূর মনে পড়ে তাঁরা শ' তিনেক টাকা তুলে দিয়েছিলেন। আশুবাবুকে জানতেন এমন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকেও দিলাম চিঠি। অন্নদাশঙ্কর রায় একশ' টাকার একখানা চেক্ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেন জানি না তিনি চেকে নাম লিখেছিলেন আশুবাবুর বড় ছেলে শুভাশীষের; কিন্তু রেজেস্ট্রি করে চেক্টা পাঠিয়েছিলেন আমার নামে আমার ঠিকানায়! কাজী আবদুল ওদুদ আর ডক্টর এনামুল হকও কিছু পাঠিয়েছিলেন মনে পড়ে। চট্টগ্রামের সব মহলই আশুবাবুকে জানতেন কাজেই এ ব্যাপারে আমি কোথাও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হই নি। খান বাহাদুর ফরিদ আহমদকে গিয়ে বলতেই তিনি বল্লেন : আপনি যা বলেন।

আমি পঞ্চাশ টাকার কথা বল্লাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে কড়কড়ে পাঁচখানা নোট এনে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। তখন তিনি কন্ট্রাক্টরি করতেন।

আমার আট শ' টাকার দরকার। সুদ দেব না এ তো আমি মনে মনে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি— বিনা কোর্টকাছারিতে ও যে আসল টাকাটা পেয়ে যাচ্ছে এতেই তো মহাজনের খুশি থাকা উচিত।


www.pathagar.com

এক মাসও লাগল না প্রায় বারো শ' টাকার মতো পেয়ে গেলাম। সব টাকা নিয়ে দিয়ে দিলাম ওদের হাতে। ঘরের চেহারাটা এখন ভাঙ্গা-চোরা হলেও সেদিন সামান্য একটু খানি দুঃসাহস করেছিলাম বলেই আশুদার 'নিভৃত নিলয়' আজো টিকে আছে আর তাঁর বিধবার পক্ষে সম্ভব হয়েছে যে দু-একটি ছেলেমেয়ে এখনো পাকিস্তানে আছে তাদের নিয়ে মাথাগুঁজে থাকতে। জীবনে এ একটি ক্ষুদ্র সৎকাজ করেছিলাম— যার কথা মনে হলে এখনো মনে আত্মপ্রসাদ পেয়ে থাকি।

তখনো আমরা খান বাহাদুর ফজলুল কাদের চৌধুরীর ভিটায় লম্বা লম্বা বাঁশের ঘরে ক্লাস করছি। এক ক্লাসের অধ্যাপকের গলার আওয়াজ চাপা দেওয়ার জন্য অন্য ক্লাসের অধ্যাপককে চেঁচাতে হয় প্রাণপণে। এ সময় প্রিয়তোষ বাগচী নামে ইংরেজির এক নতুন লেক্চারার এসে যোগ দিলেন কাজে। পাস করে বের হয়েই নতুন চাকরি পেয়েছেন। প্রেমে পড়ে এক সহপাঠিনীকে বিয়েও করেছেন সবেমাত্র। পশ্চিম বঙ্গের মানুষ— চাকরির খাতিরে কলকাতা ছেড়ে নন-ফেমিলি এরিয়া চট্টগ্রামে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কয়েকদিনে তাঁর চেহারা যা হলো দেখে আমাদের কালিদাসের যক্ষের কথাই মনে পড়তে লাগলো। মাস খানেক যেতে না যেতে একদিন শুনলাম তাঁর সদ্য পরিণীতা একদম একলা কলকাতা থেকে, পথে পথে মিলিটারির এন্তার ঝামেলা সত্ত্বেও সব সংকট হেলায় কাটিয়ে চাটগাঁ এসে পড়েছেন আর উঠেছেন খুঁজে পেতে সোজা বাগচীদের মেসেই। আমি কবি নই, কিন্তু ঘটনাটি আমাকেও রাতারাতি কবি করে তুল্লো। লিখে ফেল্লাম গদ্যে-পদ্যে মিশিয়ে 'বীরাঙ্গনা' নামক এক সুদীর্ঘ কবিতা। শুধু লেখা নয় পরদিন কলেজের স্টাফ রুমে পড়ে সবাইকে শুনিয়েও দিলাম কবিতাটি। সে কি অট্টহাসির হট্টগোল আর টেবিল চাপড়ানি! সবচেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুস্ সোবহান খান চৌধুরী (চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ)— এখনো এ কবিতাটির ছাড়া ছাড়া দু'এক লাইন তিনি মুখস্থ বলতে পারেন। কবিতাটি কাজী আফসারউদ্দীন সম্পাদিত 'মৃত্তিকায়' ছাপা হয়েছিল তখন। কবি আবদুল কাদিরের উদ্যোগে প্রকাশিত 'কয়েকটি কবিতা' নামক গ্রন্থেও এটি সংকলিত হয়েছে পরে। লেখাটি আমার 'সপ্তপর্ণী' নামক বইতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এ সময় বিধুভূষণ ঘোষ নামেও এক তরুণ ইতিহাসের লেক্চারার হয়ে এসেছিলেন আমাদের কলেজে। লোকটি দেখতে কাঠখোট্টা কিন্তু ভেতরে ভেতরে হয়ে পড়েছিল প্রেমের শিকার। একে নিয়ে লিখেছি 'তিন বিয়ের এক ফল' গল্প— পরে এটির নাম হয়েছে 'তিনবার'। পাকিস্তান আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করছিল আর ভারতের এখানে ওখানে প্রায়ই লাগছিল হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা, বেড়ে চলেছিল সাম্প্রদায়িক বিরোধ। ছাত্র আর অধ্যাপকদের চালচলন, হাবভাব আর কথাবার্তায় অনিবার্যভাবে পড়ছিল তার প্রতিফলন। মনের দিক থেকে অবস্থাটা দিন দিন আমার জন্য হয়ে উঠছিল অস্বস্তিকর।

কলেজ গভর্নিং বডির নির্বাচন। দু'জন অধ্যাপক প্রতিনিধির একজন মুসলমান হতে হবে তখন এমন একটা আইন ছিল। সে যুগে সরকারি সব কলেজেই মুসলমান অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল নগণ্য— ফলে গভর্নিং বডিতে কোন মুসলমানই নির্বাচিত হতে পারত না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ করি এ আইন করা। যুদ্ধ ও অন্যান্য কারণে তখন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে হিন্দু অধ্যাপক বেশির ভাগ অন্যত্র বদলী হয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অগ্রগতিও হয়েছে দ্রুততর। দেশে কায়েম হয়েছে মুসলিম লীগ সরকার। এসব কারণে, এ সময় চট্টগ্রাম কলেজে মুসলমান অধ্যাপকের ঘটেছিল সংখ্যাধিক্য। অধ্যক্ষও মুসলমান। আমার পূর্বতন শিক্ষক খান সাহেব আবদুর রব চৌধুরী ছিলেন তখন অস্থায়ী অধ্যক্ষ। তার পরে অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন মি: আবু হেনা। হেনা সাহেব ছোটখাটো হ্যাংলা মানুষ, ইংরেজির প্রথম শ্রেণী আর সফল অধ্যাপক, কড়া শাসক— অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

গভর্ণিং বডির নির্বাচনের দিন কলেজে আমি ঢোকার আগে, পথে থাকতেই অধ্যাপক রায়হান শরিফ (তিনি তখন চট্টগ্রাম কলেজে অর্থনীতির লেক্‌চারার, বর্তমানে পরিকল্পনা দফতরের উচ্চপদে সমাসীন) ছুটে এসে আমাকে কানে কানে বল্লেন : আমরা ঠিক করেছি গভর্নিং বডিতে অধ্যাপক প্রতিনিধির দুজনই আমরা এবার মুসলমান পাঠাব। দু'জন মুসলমান অধ্যাপকের নাম করে যোগ করলেন : এঁদেরেই ভোট দেবেন।

আমি কিছুটা অবাক কণ্ঠে বল্লাম : তা কি করে হয়?

তিনি জানালেন : একজন নন্‌মুসলিম বা হিন্দু হতে হবে আইনে তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রিন্সিপালেরও এ মত।

আমি কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বল্লাম : তেমন কোন লিখিত আইন না থাকলেও আমি এ করতে রাজি নই। আমি নিজের জন্য যে অধিকার চাই সে অধিকার আমি অন্যকেও দিতে প্রস্তুত। আপনাদের কথা আমি রাখতে পারব না, প্রতিবারের মতো এ বারও আমি একজন মুসলমান আর একজন হিন্দুকেই ভোট দেব।

আমি সেভাবেই ভোট দিয়াছিলাম আর গিয়েছিলাম হেরে।

খুব সম্ভব ১৯৪৫-এ মাসিক মোহাম্মদী কায়েদে আজমের জন্ম দিবসে একটি বিশেষ সংখ্যা বের করবার সংকল্প নেয়। তখন মাসিক মোহাম্মদীর ভার ছিল 'মৃত্তিকা' সম্পাদক কাজী আফসার উদ্দীনের উপর। আমি যখন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক তখন আফসার উদ্দীন ছিলেন ঐ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তিনি তখন থেকেই দেদার লিখতেন আর এক ধার থেকে তা পাঠাতে থাকতেন বাংলা দেশের তাবৎ পত্র পত্রিকায়। কিছু ছাপা হত, অধিকাংশই হত না। তাতেও তিনি দমেন নি কিছুমাত্র। এখানে ওখানে লেখা পাঠাতে আর চিঠি লিখতে তাঁর নাকি সে সস্তার যুগেও মাসে চার পাঁচ টাকার ডাকটিকেট লাগত। একবার আমাকে তাঁদের বাসায় নিয়ে গিয়ে তাঁর লেখা আর বইপত্র দেখিয়েও ছিলেন। লেখার সে কি স্তূপ! পরে লেখার জন্য তিনি স্কুলের লেখাপড়াই দিয়েছিলেন ছেড়ে। কলকাতা গিয়ে বের করেছিলেন মাসিক 'মৃত্তিকা', পরে সম্পাদক হয়েছিলেন দ্বি-সাপ্তাহিক 'জিন্দেগীর'। পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকা থেকেও 'জিন্দেগী' চালিয়েছিলেন কিছু কাল। গল্প উপন্যাস লিখেছেন অনেকগুলো— কোন কোনটার ভাষা আর বর্ণনার বলিষ্ঠ গতিশীলতা সত্যই আকর্ষণীয়। এখন বোধ করি সরকারি প্রচার বিভাগে কর্মরত।

মোহাম্মদীর কায়েদে আজম সংখ্যার জন্য লেখা চেয়ে তিনিই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। আমি কায়েদে আজমের জীবন আর পাকিস্তান আন্দোলনকে কাঠামো করে তিন অঙ্কের এক নাটক লিখে পাঠিয়েছিলাম। লেখাটির অভিনবত্বে অনেকেই খুশি



www.pathagar.com

হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' আর 'বিদ্যাসাগর' এর অনেক পরে প্রকাশিত। কবি আবদুল কাদিরের উদ্যোগে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬শে। কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর ঘটনাকে ঐ পর্যন্ত টেনে এনে পরে ওটাকে করা হয়েছে পুরোপুরি পঞ্চাঙ্ক।

১৯৪৫শে যুদ্ধ শেষ হয়েছে— আমরা এবার বাঁশের অস্থায়ী 'বাসা' বাড়ি ছেড়ে কলেজের সাবেক বিল্ডিঙে ফিরে এসেছি। ১৯৪৬শে আবার কলেজ গভর্নিং বডির নির্বাচন। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে কয়েকজন তরুণ সহকর্মী আমাকে হঠাৎ পাকড়াও করে বল্লেন : এবার আপনাকে কলেজ গভার্ণিং বডিতে দাঁড়াতে হবে।

: কেন?

তাঁরা খুলে বল্লেন তাঁদের মতলব। আমি আবারও বল্লাম : এসব আমার ধাত আর মন মেজাজেব সঙ্গে খাপ খায় না। আপনারা অন্য কাকেও দাঁড় করান।

তবুও তাঁরা নাছোড়বান্দা। অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে বল্লেন : আমাদের ইজ্জৎ বাঁচান। আমরা ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছি এবার আমরা তাঁকে ভোট দেবই না— অন্য লোক পাঠাব গভর্নিং বডিতে। তিনিও আমাদের শাসিয়ে বলেছেন তিনি নাকি আমাদের দেখে নেবেন।

এ দলে আবদুস সোবহান খান চৌধুরীও ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরল, শান্তশিষ্ট আর শরিফ মেজাজের মানুষ। কৃষ্ণনগর থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা। দেখলাম তিনিও অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে আমাকে অনুরোধ করছেন।

রায়হান শরিফ সাহেবের সঙ্গে এখানেই পরিচয়। আশরাফউদ্দীন সাহেব (কয়েক বছর আগে ঢাকা কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন), আবুল কাসেম সিদ্দিকী (ঢাকা টিচারস ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক) আমার মুসলিম হলের বন্ধু। এ চারজন আমাকে কিছুতেই রেহাই দিলেন না।

আরবি পার্শির অধ্যাপক আর বিভাগীয় অধ্যক্ষ মরহুম ওয়ালীউল্লাহ সাহেব আর এঁরা এক বাড়িতেই থাকতেন। রিকুইজিশন করা বাড়ি, তবে এলটমেন্টটা ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের নামে। এঁরা সবাই আমার মতো তখনো লেকচারার আর ওয়ালীউল্লাহ সাহেব সিনিয়র প্রফেসার, বিভাগীয় অধ্যক্ষ। কাজেই স্বাভাবিক নিয়মেই বাড়িটা তাঁর নামে এলট হয়েছে। বাড়িটা দোতালা— তিনি উপরের সবটা ঘর জুড়ে থাকেন, নিচেরও বেশির ভাগ তাঁর দখলে। এঁদের ছেড়ে দিয়েছেন পথের দিকের একটিমাত্র রুম— থাকা-খাওয়া সবই ওখানে সারতে হয় এঁদের। মাটিতে পাটি বিছিয়ে এঁরা যখন খেতে বসেন তিনি নাকি তখন ঘন ঘন ঐ পথে আসা-যাওয়া করতে থাকেন, এমনকি জুতাশুদ্ধ পা দিয়ে নাকি ওঁদের ভাতের বাসনও যান ডিঙিয়ে।

মোটকথা তাঁর ইচ্ছা এঁরা অতিষ্ঠ হয়ে বাড়িটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাক। তাহলে তিনি ভোগ করতে পারবেন গোটা বাড়িটা।

এ নিয়ে দু' পক্ষের বচসা গড়াতে গড়াতে কলেজ গভর্নিং বডির নির্বাচনে এসে ঠেকেছে। বলা বাহুল্য ওয়ালীউল্লাহ সাহেব আগে থেকেই উক্ত বডির সদস্য ছিলেন।


www.pathagar.com

এবার এঁকে সদস্য হতে না দিয়ে কিছুটা জব্দ করবেন— স্রেফ এটুকুই আমার বন্ধুদের মতলব। ব্যক্তিগতভাবে ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ ছিল না। বিরোধ ঘটুক এ আমি চাইও না। তাই বল্লাম : এ যদি হয় অন্য কাকেও দাঁড় করানো যাক্। আমার ভোটও তাঁকেই দেব।

তাতেও তাঁরা রাজি নন্। তাঁদের যুক্তি— মুসলমান ভোট ভাগাভাগি হবেই, একমাত্র আমি দাঁড়ালেই নাকি হিন্দু সব কয়টি ভোট পাওয়া যাবে। অতএব আমার জয় সুনিশ্চিত।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের দাবী প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। জীবনে এ একবার ভোটে দাঁড়িয়েছিলাম আর করেছিলাম জয়লাভ। জয়লাভ করেই বিপদে পড়লাম। ছ'চল্লিশ-সাতচল্লিশ— দেশের এক মহাসংকটের কাল। ইংরেজ ঘর সামলাতেই প্রাণান্ত। ভারতকে যেভাবেই হোক স্বাধীনতা দিতেই হবে এ এক রকম বুঝাই যাচ্ছিল। তবে সে স্বাধীনতার চেহারা নিয়েই সারা দেশব্যাপী বিক্ষোভ, বাদানুবাদ আর রক্তাক্ত সংগ্রাম। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের পরস্পর বিরোধী সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে তখন। সম্প্রদায় অনুসারে ছাত্ররাও এক একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হয়ে উঠেছে মুখর আর মারমুখো। সকলের চোখে মুখে একটা জঙ্গীভাব। ক্লাস আর লেখাপড়া হয়ে পড়েছে গৌণ ব্যাপার— সবারই সংকল্প আগে চাই স্বাধীনতা— নিজস্ব স্বদেশভূমি। তরুণ বয়সের প্রধান ধর্ম অন্ধ আবেগ আর মাত্রা ছাড়া উৎসাহ। ফলে এটা ওটা নিয়ে ঠোকাঠুকি প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। গভর্নিং বডির স্থানীয় সদস্য হিসেবে অধ্যক্ষ সাহেব সব কিছুই আমার ঘাড়ে লাগলেন চাপাতে।

চট্টগ্রাম কলেজে এখন মুসলমান অধ্যাপকের সংখ্যা যেমন বেশি, তেমনি ছাত্রসংখ্যার বেলায়ও তাই। শুধু ছাত্রীর বেলায় ছিল এর বিপরীত।

সাতচল্লিশের প্রথম দিকে বোধ করি একদিন অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র সিংহ হন্তদন্ত হয়ে ক্লাস ছেড়ে দিয়ে ছুটে এসে সোজা অধ্যক্ষের ঘরে গিয়ে জানালেন : মুসলমান ছেলেরা ক্লাস রুমের চারদিকে মুসলিম লীগের পতাকা টাঙিয়ে রেখেছে আর নিজেরাও হাতে এক একটা পতাকা নিয়েই বসে রয়েছে যার যার সিটে। তাই হিন্দু ছেলেরা ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমার ক্লাস করা সম্ভব নয়।

অধ্যক্ষ হেনা সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি অধ্যক্ষের টেবিলের উপর চাঁদ-তারা আঁকা কয়েকখানি পতাকা পড়ে আছে আর যোগেশ বাবু দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপছেন। হেনা সাহেব বল্লেন : আপনি গিয়ে একটু ছাত্রদের বুঝিয়ে বলুন। তাঁরও গলার স্বর কম্পায়মান। আমি স্থানীয় লোক। অনেকের বাপ-চাচা আমার পরিচিত। আমি যাওয়ার পর অনেকে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ল। নেতৃস্থানীয় যারা তারাও আমার অচেনা নয়। তাদের ডেকে বল্লাম : তোমরা যেমন পাকিস্তান চাও, তেমনি আমিও চাই। আমি কায়েদে আজম সম্বন্ধে বই লিখেছি জানো?

: জানি।

: পড়েছ?

: পড়েছি স্যার। চমৎকার হয়েছে...।


www.pathagar.com

তা হলে বুঝতে পারো পাকিস্তান-বিরোধী আমি নই। তবে আমি চাই পাকিস্তান শিক্ষিত আর ভদ্র মানুষের বাসভূমি হোক। তোমরা ছাত্ররা যদি এখন লেখাপড়া না করো তা হলে পাকিস্তান কি একটা আকাট মূর্খের দেশে পরিণত হবে না? বিদ্যা যেখান থেকে যার হাত থেকেই হোক আমাদের উচিত তা দু'হাতে গ্রহণ করা। হজরতের সেই বিখ্যাত হাদিসটাও আর একবার শুনিয়ে দিলাম ওদের।

বল্লাম : ক্লাস রুম পতাকা টাঙাবার জায়গা নয়। তাতে পতাকার মর্যাদা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। কলেজে তোমাদের যে অধিকার, হিন্দু ছাত্রদেরও তো সে একই অধিকার। তারা যদি কংগ্রেস, কি হিন্দু মহাসভার পতাকা ক্লাসে টাঙায় তোমরা কি তা বরদাস্ত কররে? ইসলামের এক মহৎ আদর্শ ন্যায় বিচার, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখলাম সুড় সুড় করে সবাই ক্লাসে ঢুকে পড়লো এবার। দরজায় দাঁড়িয়ে বল্লাম— পতাকাগুলি খুলে বেঞ্চির নিচে নিচে রেখে দাও, যাওয়ার সময় না হয় হাতে করে নিয়ে যেয়ো। হিন্দু ছেলেরা বারান্দার এক পাশে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের বল্লাম এবার ক্লাসে যাও আমি যোগেশ বাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেদিনের হট্টগোল এর বেশি আর গড়ায় নি।

কয়েক মাস পরে যা ঘটল তা বেশ ঘাবড়াবার মতো। কলেজশুদ্ধ সবারই মনে দেখা দিল আতঙ্ক। ক্লাসটা কার ছিল মনে নেই। ঘণ্টা পড়তেই ছেলেমেয়েরা ক্লাস থেকে হুড়মুড় করে রোজকার মতো বেরিয়ে পড়েছে। রোজ, প্রতি ঘণ্টায় হরহামেশাই এ ঘটে থাকে— এ নতুন কিছু নয়। এদিন এরকম অবস্থায় এক ছেলে নাকি এক মেয়ের আঁচল ধরে দিয়েছে টান আর গায়ে দিয়েছে হাত। ছেলেটি মুসলমান, মেয়েটি হিন্দু। মুহূর্তে সমস্ত কলেজ ভাগ হয়ে গেল হিন্দু-মুসলমান দুই স্বতন্ত্র শিবিরে— চিৎকার হট্টগোল আর স্লোগানে সারা কলেজ কম্পাউন্ড পড়তে লাগল ফেটে। সব ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছে ছাত্র অধ্যাপক সবাই। সে এক এলাহি কাণ্ড! অধ্যাপক রুমেও কানাঘুষা, ফিসফাস। বাইরে এক শিবির থেকে আওয়াজ উঠছে : শাস্তি দিতে হবে, বিচার চাই। অন্য শিবির থেকে শোনা যাচ্ছে পাল্টা দাবী : শাস্তি দেয়া চলবে না, চলে যাও পাকিস্তান ছেড়ে হিন্দুস্তান।

স্টাফ রুমে সকলের মুখেই বিভীষিকার ছায়া। হেনা সাহেবের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কড়া শক্ত মানুষও ভয়ে থরহরি। ডাকা হলো জরুরি স্টাফ মিটিং। সকলেই একবাক্যে বল্লেন : কলেজে এমন একটা ঘটনা চেপে যাওয়া উচিত হবে না। তাহলে বাইরে কলেজের সুনাম নষ্ট হবে। বিচার করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই সঙ্গত। এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান সবাই একমত।

প্রশ্ন উঠল : কে বা কারা ইনকোয়ারী করবেন বা করবেন এর বিচার?

বুঝা গেল এমন অপ্রিয় দায়িত্ব কেউই নিতে রাজি নন। তাই সবাই বলে উঠলেন : গভর্নিং বডির নির্বাচিত সদস্যরাই করুন।

সেবার আমার সঙ্গে অন্যতম সদস্য ছিলেন পালির অধ্যাপক হীরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত। পাকিস্তান হবে এ বিষয়ে কারো মনে তখন আর কোন দ্বিধা নেই। আর যেভাবেই হোক


www.pathagar.com

চট্টগ্রাম পাকিস্তানের বাইরে পড়তে পারে না এও প্রায় স্থির নিশ্চিত। পাকিস্তান আন্দোলন এখন সূচিমুখে, আর ছাত্ররাই আন্দোলনের পুরোভাগে। তাদের যে এখন শুধু পোওয়াবারো তা নয়, তারা এখন পুরোপুরি বেপরওয়াও। ক্লাস চলে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায়— অধ্যাপকরাও চলে গা বাঁচিয়ে, ওদের ভয় বা সমীহ করে। কেউ চায় না ছাত্রদের বিরাগভাজন হতে— ওদের চটাতে কি ঘাঁটাতে।

অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়েই হীরেন বাবু আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বল্লেন : যা কিছু করার আপনিই করবেন— যখন যেখানে বলবেন আমি শুধু সই দিয়েই খালাস। ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ কি জেরাটেরা করা আমার দ্বারা হবে না।

ক্রিপ্‌স্ মিশন এসে ফিরে গেছে। সারাদেশ মাউন্টবেটেনের ঘোষণার প্রতীক্ষায়— সর্বত্র বিরাজ করছে একটা আতঙ্ক আর থমথমে ভাব। এ অঞ্চলের হিন্দুদের মুখের পানি গেছে শুকিয়ে। হীরেন বাবুর মনের অবস্থা আঁচ করা তাই অসম্ভব নয়।

অগত্যা পরদিন থেকে আমি একাই শুরু করলাম ইন্‌কোয়ারী, সাক্ষী সাবুদ নেওয়া। ছাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলাম— দু'পক্ষের ছাত্রদেরও নিলাম সাক্ষী-গোওয়া। কয়েকদিন ধরে চল্লো এসব শোনা আর রেকর্ড নেওয়ানেয়ি। যে ঘরে বসে আমি সাক্ষীদের জবানবন্দী নিচ্ছিলাম, করছিলাম জেরা সে ঘরের এক কোণে বসে ব্রজেন্দ্র সুর নামে আমাদের এক সহকর্মী পরীক্ষা-সংক্রান্ত কাজকর্ম করতেন। আমার জেরা ইত্যাদি দেখে তিনি একদিন হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন : উকিল হলে আপনি কিন্তু খুব ভালো উকিলই হতে পারতেন। কেন হলেন না? তখন একদিনেই মাস্টারির এক মাসের রোজগার হয়ে যেত...। উকিল হতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেন হতে পারিনি সে গল্প তাঁকে আবার নতুন করে শুনিয়ে দিলাম। যাই হোক, দোষীর দোষ প্রমাণে আমাকে বেশি বেগ পেতে হয়নি। মুসলমান ছেলেদের বেপরওয়া ভাবই এ প্রমাণে হয়েছিল সহায়ক। দোষী ছেলেটার সঙ্গীসাথীদের কেউ কেউ আমার কাছে এমন কথাও বলে ফেল্লো : ও অপরাধ করেছে সত্য, কিন্তু শাস্তি দিতে পারবেন না, স্যার!

## আটত্রিশ

চুয়াল্লিশে যুদ্ধের অবস্থা যখন খুব সংগীন তখন স্কুল-কলেজ চলছিল স্রেফ নামকে ওয়াস্তে। বইপুস্তক পাওয়া যাচ্ছিল না কোথাও— বিশেষ করে কক্সবাজার এলাকায়— যা যুদ্ধ ফ্রন্টের প্রায় মুখোমুখী। আমার মাদ্রাসা জীবনের বন্ধু জাফর আলম চৌধুরী (বর্তমানে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য) তখন কন্ট্রাকটারী করে প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন। তিনি কক্সবাজারের অন্তর্গত রামুর মানুষ। একদিন এসে আমাকে পাকড়াও করে বল্লেন : একটা লাইব্রেরি করো, আমি তার একটা শাখা করব কক্সবাজারে। আমাদের দিকে বই পত্র কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না — ছেলে পিলেদের লেখাপড়া শিকেয় উঠল। টাকা পয়সা যা দরকার আমিই দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে কয়েক হাজার টাকা গুঁজে দিলেন। তা দিয়ে আমি আন্দরকিল্লায় তাজ লাইব্রেরি নামে এক পুস্তক বিক্রয় সংস্থা খুলে বসলাম। কিন্তু দোকানে দিতে পারলাম না তিনি বা আমি কেউ-ই নিজের মানুষ। ফলে চুরি হতে


www.pathagar.com

লাগল। লাইব্রেরী করার জন্য কয়েক দফায় জাফর চৌধুরী আমার হাতে প্রায় বারো হাজারের মতো টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু চান নি আমার কাছ থেকে একটা মামুলি রশিদ বা স্লিপ পর্যন্ত— এমন কি নেন নি একটা সইও। আমি শিক্ষা আর বইয়ের জগতের মানুষ, লেখক আর ঢাকার লাইব্রেরি মালিকরা সবাই আমার পরিচিত— বইপত্র পেতে আমার কোন বেগ পেতে হল না। দেখতে দেখতে তাজ লাইব্রেরি জমে উঠল, কাটতি বেড়ে গেল দ্রুত। কিন্তু হিসেবের বেলায় দেখা গেলো লাভ দূরে থাক আসলের বেলায় পড়ছে ঘাটতি। বছর তিনেক পরে ফাইনেল হিসেবে দেখা গেল বারো হাজার পুঁজি এখন ন'হাজারে এসে নেমেছে। জাফর আলম চৌধুরীকে ডেকে বল্লাম : সব ডুববার ভয় থাকলে বুদ্ধিমানেরা নাকি আর্ধেক ছেড়ে দিয়ে আর আর্ধেক নিয়েই সরে পড়ে, তোমার তো মাত্র আর্ধেকের আর্ধেক মাত্র ডুবেছে, এখনো তিন ভাগ হাতে আছে— বুদ্ধিমানের মতো ঐ নিয়েই সরে পড়ো। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। এর ফলেই তাজ লাইব্রেরি হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হলাম।

কলেজের ঐ ঘটনার সময় রোজ বিকেলে একবার করে এসে আমি ঐ তাজ লাইব্রেরিতে বসতাম। তখন ছেলেদের ডেকে একা একাও ওখানে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি— জানতে চেয়েছি ঘটনাটির সত্যাসত্য। দোষী ছেলেটিকেও ডেকে জিজ্ঞাসা করেছি। সেও আমতা আমতা করে অপরাধ স্বীকার করল আমার কাছে। পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়েই আমি রিপোর্ট দিলাম। দেশের অস্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করে সুপারিশ করলাম নিম্নতম শাস্তি— ছেলেটা টি. সি. নিয়ে হয় কলেজ ছেড়ে চলে যাক, না হয় মেয়েটির কাছে চাউক ক্ষমা। গভার্নিং বডির মিটিং ডেকে অধ্যক্ষ রিপোর্টটা অন্যান্য সদস্যদের সামনেও অনুমোদনের জন্য পেশ করলেন। তখন গভার্ণিং বডির প্রেসিডেন্ট ছিলেন পদাধিকার বলে কমিশনার টাপ্‌নেল ব্যরেট— চট্টগ্রামের শেষ ইংরেজ কমিশনার। ইন্‌কোয়ারি আর আমাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি নিজেই। আমাদের সিদ্ধান্ত আর সুপারিশ ঐ মিটিঙে অনুমোদন লাভ করল সর্বসম্মতিক্রমে। এবার ছেলেরা গেল ক্ষেপে। স্ট্রাইক্ করলো, মিছিল করে শ্লোগান দিল। আমার বা কারো নাম করল না বটে কিন্তু শ্লোগান দিল : ইনকোয়ারি কমিটি ধ্বংস হোক। শ্লোগান দিয়ে প্রদক্ষিণ করলো কলেজ বিল্ডিং— ওদের গলার আওয়াজ সপ্তমে চড়তো মিছিল স্টাফ রুমের সামনে এলেই। আমি স্টাফ রুম থেকে একখানা চেয়ার খোলাবারান্দায় টেনে এনে সেখানে বসে বসে এদৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। অর্থনীতির অধ্যাপক মরহুম হাবীবর রহমান ছুটে এসে আমাকে বল্লেন : মামু, আপনাকে ওরা যতই দেখছে ততই ক্ষেপে যাচ্ছে, আপনি ভেতরে এসে বসুন। কখন কি করে বসে বলা যায় না!

হাবীবর রহমান সুফিয়া-কামালের কামাল উদ্দীন খাঁর ভাগনে— তাঁর বড় বোনের ছেলে। কামাল উদ্দীন আমার বন্ধু, সে সুবাদে হাবীব আমাকে মামু ডাকত, তার অন্যান্য ভাই বোনেরাও ডাকে।

আমি তার কথায় কান দিলাম না, গ্যাঁট্ হয়ে বসে রইলাম বারান্দায়। ছেলেদের মিছিল এবার যাত্রা করল কলেজ কম্পাউন্ড ছেড়ে শহর টহল দিতে দক্ষিণমুখো। পরে শুনলাম মিছিল শহরের নাভিকেন্দ্র আন্দরকিল্লা পর্যন্ত গিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে, সেখানে


www.pathagar.com

কোন সাড়া বা সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাক ক্ষেত্র বিশেষে বাধাও নাকি পেয়েছে ওরা। আমার বাবার আমল থেকেই আন্দরকিল্লা ইংরেজিতে যাকে বলে আমার Strong hold— সেখানকার ছোট বড় সবাই আমাকে চেনে। শিক্ষক আর লেখক হিসেবে এর মধ্যে আমি যথেষ্ট পরিচিতিও লাভ করেছি। আমার বিরুদ্ধে সেখানে ছাত্রদের তেমন সমর্থন পাওয়ার কথা নয়। তার উপর ব্যাপারটি এমন যে কারো কাছে তারা তা খুলে বলতে গেলেই লোকে ছি ছি করে ওঠে।

এ ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব নিয়েছিল তাদের মধ্যে সোলতান আহমদ, নুরুল ইসলাম (ও সাধারণত মওলানা বলেই পরিচিত) আর হেদায়েৎ হোসেনের নাম মনে পড়ছে। পরবর্তী জীবনে এরা তিন জনই এম. এ. পাশ করে নিজ নিজ পেশায় কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সোলতান হয়েছে ব্যারিস্টার, মওলানা নুরুল ইসলাম বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কলেজের অধ্যাপক আর হেদায়েৎ হয়েছে শিল্পপতি বা Industrialist।

ছেলেদের কলেজে বা পথেঘাটে যেখানে পাই বুঝাতে লাগলাম। ওদের কিন্তু সে এক রা : অপরাধ করেছে সত্য, কিন্ত শাস্তি দেওয়া চলবে না।

দোষী ছেলেকে আমার বাসায় ডেকে এনে বুঝালাম। বল্লাম : অধ্যক্ষের রুমে অধ্যক্ষ আর সে মেয়েটি ছাড়া আর কেউই থাকবে না তুমি শুধু মামুলী Regret করে 'I apologise' বলবে। আর কিছু বলতে হবে না।

ছেলেটা তা করতে রাজি; কিন্তু অন্য ছেলেরা কিছুতেই তা করতে দেবে না ওকে। ফলে ও আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল। একদিন ওদের ক্লাসে একটা আস্ত বক্তৃতাই দিয়ে দিলাম : তোমরা ইসলামের সুবিচারের নামে গর্ববোধ করে থাকো, মুসলমান সোলতানদের ন্যায় বিচারের কথা বলে বুক ফুলাও। আজ তোমরাই ন্যায় বিচারের পথে বাধা দিচ্ছো। আমাদের নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে— শৃঙ্খলাহীনতা আর অবিচার দিয়ে তার সূচনা হোক একি তোমরা চাও?

পরে কিছুটা পরিহাসের সুরে বল্লাম : তোমরা সবাইতো শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করতে চাও, চাও শিক্ষিতা জীবন সঙ্গিনী। আজ যদি আমরা এ ঘটনা চেপে যাই, স্রেফ মুসলমান বলেই যদি অপরাধীকে শাস্তি না দিই, তাহলে সামনে কোন মুসলমান অভিভাবকও এ কলেজে মেয়ে পাঠাতে চাইবে কি? আজ একটা হিন্দু মেয়ের প্রতি অশোভন ব্যবহার করা হয়েছে, কাল একটা মুসলমান মেয়ের প্রতি যে তেমন ব্যবহার করা হবে না, তা কে বলতে পারে? শিক্ষিতা পাত্রী তো আর আকাশ থেকে পড়বে না। এ রকম কলেজের চৌকাঠ মাড়িয়েই তবে তোমাদের অন্তঃপুরের চৌকাঠ মাড়াতে হবে শিক্ষিতা মেয়েদের। দেখলাম আমার এত বড় আবেগী বক্তৃতাটাও মাঠে মারা গেল। ঘটনার ইতর বিশেষ ঘটল না। হেনা সাহেব অস্থির, কি করবেন না করবেন বুঝতে পারছেন না। ঐ দিকে সারা দেশ ফুটন্ত জলের মতো টগবগ করছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে চলছে ভাঙ্গা গড়ার খেলা।

আর কোন উপায় না দেখে এবার প্রিন্সিপালকে পরামর্শ দিলাম— ছেলের বাপকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিন তিনি যদি এসে তাঁর ছেলের টি. সি. নিয়ে যান ভালো, না হয় ছেলেকে রাস্টিকেট করা হবে, তখন তার অন্যত্র পড়ার সুযোগও হবে নষ্ট। অভিভাবক


www.pathagar.com

বয়স্ক লোক— অবিবেচক না হওয়ারই কথা। হলোও তাই। চিঠি পেয়েই ছেলের বাপ নিজেই ছুটে এলেন। সব শুনে লজ্জাসঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই টি. সি. নিয়ে ছেলেকে সঙ্গে করে ছেড়ে গেলেন চাটগাঁ শহর। এভাবেই সেদিন সে অপ্রিয় পরিস্থিতির হাত থেকে আমরা সবাই পেয়েছিলাম নিষ্কৃতি। বন্ধুদের মান রক্ষা করতে গিয়ে এক কুক্ষণে কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য হতে রাজি হয়েই তো পোয়াতে হলো এত সব ঝামেলা। এরপর জীবনে এমন ভুল আর করি নি।

১৯৪৭-এর সবে কদরের রাত্রেই ঘোষিত হলো দেশের স্বাধীনতা— জন্ম নিল পাকিস্তান আর ভারত দুই স্বাধীন রাষ্ট্র। বহু বছরের শ্রম আর অর্থ ব্যয়ে তৈরি প্রাদেশিক রাজধানী কলকাতা থেকে আমরা হলাম বঞ্চিত। রাতারাতি পুরোনো ভাঙ্গাচোরা ঢাকাকেই করে নিতে হলো পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। কিন্তু সূচনায় সব দপ্তরের সংকুলান হলো না ঢাকায়। নতুন করে গড়তে হবে সব কিছু। তাই সাময়িকভাবে কোন কোন দপ্তর এলো চাটগাঁয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ডিরেক্টরেট। ডিরেক্টর হয়ে এসেছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর কুদরৎ-এ-খোদা।

কয়েকদিন পরেই উদ্‌যাপিত হলো প্রথম ঈদোৎসব। ছাত্ররা ঠিক করল ঈদ-রিয়ুনিয়ন করে নবাগত অফিসারদের জানাবে সম্বর্ধনা। হিন্দু অফিসারেরা চলে গিয়েছেন— নানাস্থান থেকে মুসলমান অফিসার আর কর্মচারীরা এসে জমায়েৎ হয়েছেন এখানে। ছাত্রদের ইচ্ছা এঁদের সবাইকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো।

আমাকে ধরে বসল তাদের কমিটির সভাপতি হওয়ার জন্য। বড় আকারের সভাসমিতির ব্যাপারে তখনো আমার মনে একটা ভীতি ছিল। আর সভা-সমিতিতে বলা কওয়ার ব্যাপারে আমি ছিলাম তখন নেহাৎ অপটু। তাই নানা অজুহাত দেখিয়ে অস্বীকার করলাম এ দায়িত্ব নিতে। তবুও ছাত্ররা ছাড়ে না কিছুতেই— রাজি হয় না আমাকে রেহাই দিতে। শেষে নিজেরাই খুলে বল্লে : আপনাকে ছাড়া অন্য কারো বেলায় আমরা একমত হতে পারছি না। জানেন তো স্যার আমাদের মধ্যেও অনেক দল আর অনেক মতের ছাত্র আছে।

অগত্যা রাজি হতে হলো। এভাবে আরো অনেকবার এ একই অজুহাতে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে আমাকে। '৫১ সালে চাটগাঁয় এক বিরাট বন্যা হয়েছিল। অনেক ঘরবাড়ি গিয়েছিল পড়ে— আমার নিজের ঘরবাড়িও রেহাই পায় নি। ছাত্ররাও নানা রিলিফ কমিটি করেছিল। এ রকম এক রিলিফ কমিটির মুখপাত্র শাহাবুদ্দীন খালেদ (বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কলেজের অধ্যাপক) এসে বল্লে : আপনাকে স্যার আমাদের কমিটির সভাপতি হতে হবে।

বল্লাম : আমি কেন? তোমাদের ছাত্রদের কমিটি, সিনিয়র কোন ছাত্রই তো সভাপতি হওয়া উচিত। আমার সঙ্গে তোমাদের কমিটির সম্পর্ক কি?

: সভাপতির ব্যাপারে আমরা কারো সম্বন্ধে একমত হতে পাচ্ছি না, স্যার। আপনি হলে কারো কোন আপত্তি থাকে না। তার উপর ইস্টবেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স (পাকিস্তানের সূচনার যুগে ঐ নামের একটি প্রতিষ্ঠান চাটগাঁয় ছিল) আমাদের কমিটিকে পাঁচ শ' টাকা চাঁদা দিবে বলেছে, কিন্তু চেনা-জানা সভাপতির হাতে ছাড়া তাঁরা টাকাটা দিতে রাজি নয়। অগত্যা এবারও রাজি হতে হল ওদের প্রস্তাবে।


www.pathagar.com

মাত্র গত বছরের (১৯৬৪) কথা। চার চারটা ছাত্র প্রতিষ্ঠান মিলে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করবে, সম্মিলিতভাবে বড় রকমের সভা করবে লাল দীঘির ময়দানে। চার প্রতিষ্ঠানের চার প্রতিনিধি এসে চেপে ধরল আমাকে নাকি সভাপতি হতে হবে ঐ সভায়।

এখন আমার বয়স হয়েছে, তার উপর আমি ব্লাড প্রেসার রুগী— যথাসম্ভব সভাসমিতি পরিহার করে চলতে চাই। ডাক্তারেরও নির্দেশ তাই, এসবই ছাত্রদের জানা, তারা নিজেরাও দেখেছে এ রকম সভাসমিতিতে প্রেসার বেড়ে যাওয়ায় কয়েক বারই আমার মাথায় পানি ঢালতে হয়েছে, বার কয়েক সভার কাজ অর্ধ সমাপ্ত রেখে আমাকে চলে আসতে হয়েছে সভা ছেড়ে।

এবার তাই কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বল্লাম : এ শহরে অন্তত চার-পাঁচটা কলেজ আছে। তার অধ্যক্ষরা আছেন। আছেন অধ্যাপকরা— তার মধ্যে সাহিত্য-সেবীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তবুও আমি বুড়ো মানুষকে নিয়ে টানাটানি কেন?

নেতা ছেলেটি তো আমার পায়ে হাত দিয়েই বসল।

সে সনাতন ধূয়া : আপনাকে ছাড়া সভাপতি সম্বন্ধে আমরা একমত হতে পারছি না। এক এক প্রতিষ্ঠান এক এক জনের দাবী জানায়— শুধু আপনার বেলায়...। আপনি না গেলে আমাদের এ ঐক্যটাই ভেঙ্গে যাবে স্যার।

অগত্যা আবারও ঢেঁকি গিলতে হল।

এসব সভা সমিতি আর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমার সবচেয়ে বড় আপত্তি— সভা বা অনুষ্ঠান শেষে কর্মকর্তা ছাত্রদের আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে তারা একদম বেপরোয়া। বহু প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে এসে এ ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন বার বারই আমাকে হতে হয়েছে। আমাদের তরুণদের প্রতি এ আমার এক বড় অভিযোগ।

বলেছি পাকিস্তান হওয়ার পর চট্টগ্রামের ছাত্ররা ঈদ-রিযুনিয়নের মারফৎ নবাগতদের অভ্যর্থনা জানাবে তার আয়োজনে উঠে পড়ে লেগেছে সবাই। আমাকে করেছে তাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। অনুষ্ঠানের আগের দিন অধ্যাপক হাবীবর রহমান আমাকে এসে বল্লো : মামু, এ কি কাণ্ড! মাত্র কয়েক মাস আগে এ ছেলেরাই আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, মিছিল করে শ্লোগান দিয়েছিল। আর আজ তারাই আপনাকে করেছে তাদের কমিটির সভাপতি!

বলা বাহুল্য, এ ঈদ-রিযুনিয়ন ব্যাপারেও সোলতান, মওলানা নূরুল ইসলাম প্রভৃতি সেসব ছাত্ররাই নেতৃত্ব নিয়েছিল, যারা একদিন আমার বিরুদ্ধে হয়েছিল প্রতিবাদমুখর। চট্টগ্রামে তখন তারাই ছিল মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে।

উত্তরে আমি বল্লাম : আমার সেদিনের সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল আর ন্যায়সঙ্গত ছিল এ তারই এক প্রমাণ। সেদিন আমি যেমন জানতাম তেমনি ছাত্ররাও মনে মনে জানতো আমার বিচার ঠিক ছিল। তবে আবেগ উত্তেজনার মুহূর্তে তারা সেদিন তা স্বীকার করে নিতে চায় নি। সেদিন তাদের চাপে পড়ে বা অন্য কারণে আমি যদি অন্যায় করতাম, দোষী ছাত্রটাকে কোন রকম শাস্তি না দিয়ে যদি দিতাম ছেড়ে তাহলে তারা খুশি হতো


www.pathagar.com

বটে, হয়তো আমার নামে জিন্দাবাদও দিত সেদিন। কিন্তু তাদের শ্রদ্ধা হারাতাম আমি চিরদিনের জন্য। শ্রদ্ধা যে হারাই নি, তা তো তোমরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ। যে মানুষ ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করে সাময়িকভাবে খুশি হয়ে ওঠে সেও মনে মনে ঘুষ গ্রহিতাকে ঘৃণা করে, এটা তো জানা কথাই।

চট্টগ্রামে তখন অন্য কোন হল ছিল না— সভার আয়োজন করা হয়েছিল ভাঙা-চোরা টেবিল-চেয়ার নিয়ে ভাঙা-চোরা জে. এম. সেন হলেই। আমার স্বাগতম ভাষণের পর নবাগতদের প্রতিনিধি হিসেবে ডক্টর কুদরৎ-এ-খোদা করেছিলেন সভাপতিত্ব। ডক্টর জুবেরীও ছিলেন উপস্থিত— মন্ত্রীদের রেষারেষির জন্য ইসলামিয়া কলেজটা পাকিস্তানে আনতে না পেরে তখন তিনি হয়ে পড়েছিলেন খুব মনমরা। সকলের অনুরোধে সভায় তিনিও কিছু বলেছিলেন। এর দু'একদিন আগে খাজা নাজিমউদ্দীন জনাব নুরুল আমিন আর হামিদুল হক চৌধুরীকে নিয়ে তাঁর প্রতীক মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। হঠাৎ সভার মাঝখানে সদলবলে নুরুল আমিন সাহেব আর হামিদুল হক চৌধুরী এসে ঢুকলেন। তাঁরা চাটগাঁ এসেছেন বা আসতে পারেন তা আমাদের জানা ছিল না। ভালো যে কয়খানা চেয়ার জোগাড় করা হয়েছিল তা সব আগে আসা নিমন্ত্রিতের দখলে। তাই কয়েকটি রং-ওঠা টিনের ভাঙা চেয়ার ছাড়া মন্ত্রীদের বসার জন্য আমরা আর কিছুই দিতে পারলাম না।

হাবীব উল্লাহ্ বাহার আর মোহন মিয়াও সঙ্গে এসেছিলেন। তাঁরা বসলেন এক চেয়ারে ঠাসাঠাসি হয়ে কোন রকমে পাছা ঠেকিয়ে। জনসাধারণকে সম্বোধন করার এ প্রথম সুযোগ মন্ত্রীরা হাতছাড়া করলেন না। সংক্ষেপে দুই মন্ত্রীই কিছু কিছু বল্লেন নতুন রাষ্ট্রের নতুন দায়িত্ব সম্বন্ধে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঠিক এগারো দিন পরে ২৫ আগস্ট হয়েছিল এ অভ্যর্থনার আয়োজন। আমার ভাষণের কয়েকটি কথা সে যুগের দৈনিক 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে এখানে উদ্ধৃত হলো :

স্বাধীন পাকিস্তানে এটি আমাদের প্রথম ঈদ সম্মেলন। আজ আমরা মিলেছি একটা স্বাধীন, আজাদ ও মুক্ত আবহাওয়ায়। রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক ঈর্ষা বিদ্বেষের কালো মেঘ আজ কেটে গেছে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাকিস্তান আজ যাঁদের স্বদেশ, তাঁরা যে ধর্মাবলম্বীই হোন, আচার বিচার ও মতামতে তাঁদের সঙ্গে আমাদের যত গরমিলই থাকুক, তাঁরা সবাই আজ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক। তাঁদের সবাইকে আমরা আজ অকুণ্ঠিত কণ্ঠে জানাচ্ছি— ঈদ মুবারক।

চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয় নি সত্য, কিন্তু চট্টগ্রাম হচ্ছে তার হৃদযন্ত্র। চট্টগ্রাম বন্দর হবে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত স্নায়ু আর অর্থনৈতিক জীবনধারার কেন্দ্র। হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়ার সঙ্গে মানবদেহের যে সম্পর্ক, বন্দরের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রেরও সে একই সম্পর্ক। পূর্ব পাকিস্তানের বহু প্রশাসনিক দফতর স্থানান্তরিত হয়েছে চট্টগ্রামে। ফলে বহু সরকারি কর্মচারীকে তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত শান্তিপূর্ণ গৃহ আর সুপরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আসতে হয়েছে এখানে। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন এ ভাগ্য, অনেককে হয়তো আসতে হয়েছে অনিচ্ছায়, অনেকে নিজের পরিবার পরিজন আর সন্তান সন্ততি থেকেও হয়ে পড়েছেন বিচ্ছিন্ন। তাঁদের অপরিমিত দুঃখ কষ্ট স্মরণীয় হয়ে থাকবে


www.pathagar.com

এদেশের ইতিহাসে, বিশেষ করে আমাদের স্বল্প বেতনভোগী কেরানি ভাইদের আনন্দিত চিত্তে এ দুঃখবরণ আমরা কখনো ভুলতে পারব না। পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের সবাইকে আমরা জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ— স্বাগতম ভাই সব!

উপস্থিত আপনাদের অনেকেই হয়তো এসেছেন কলকাতা মহানগরী থেকে। সেখানে নাগরিক জীবনে যে সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়োজন রয়েছে তার শতাংশও খুঁজে পাওয়া যাবে না এখানে। বাংলাদেশে বণিক সভ্যতার আওতায় যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তা সব সময় ও সর্বতোভাবে ছিল এক-নাগরিক আর এক কেন্দ্রিক। তাই এতদিন বাংলাদেশের সমস্ত ঐশ্বর্যের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে শুধু কলকাতার দিকেই। এমনকি সিলেট-ত্রিপুরা-যশোর-ফরিদপুর-খুলনার মাছ পর্যন্ত চালান হয়ে যেত কলকাতার বাজারে। অক্টোপাশের মতো এভাবে কলকাতা পূর্ব বঙ্গের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আর কাঁচামাল করেছে আত্মসাৎ। বাংলা সরকারের রাজস্বের প্রধানতম অংশ এতকাল ব্যয়িত হয়েছে কলকাতার জন্য। সমস্ত পূর্ব বঙ্গ রয়েছে চির-উপেক্ষিত। কলকাতার রাজনীতির কাছে পূর্ব বঙ্গের রাজনীতি শুধু নয়, অর্থনীতিও বার বার হয়েছে জবাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বঙ্গ যখন পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে, বিমুক্ত হয়েছে কলকাতার অশুভ প্রভাব থেকে, তখন স্বভাবতই আশা করা যায় এখন এ অন্যায়, অব্যবস্থা আর অসামঞ্জস্যের ঘটবে অবসান। অস্বাভাবিক আর অবৈজ্ঞানিক বণ্টন নীতি পাকিস্তানে যেন না পায় কোন রকম প্রশ্রয় আর স্বীকৃতি। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো পূর্ব পাকিস্তানের দূর আর নিকট সব অংশকে যেন মনে করা হয় সমান। রাষ্ট্রের সমান মনোযোগ ও যত্ন যেন সর্বত্র হয় সমভাবে প্রসারিত। মানবদেহের শিরা-উপশিরা ও স্নায়ুতন্ত্রের মতো রাষ্ট্রকেও তার সমস্ত সম্পদ আর ঐশ্বর্য তার ক্ষুদ্রতম অংশ পর্যন্ত রক্তধারার মতো দিতে হয় সঞ্চারিত করে। এখন থেকে আমাদের রাষ্ট্রের আদর্শ হোক তাই।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে রাষ্ট্র কাঠামো পেয়েছি তা হচ্ছে অত্যন্ত উপরভারী অর্থাৎ Topheavy। যাঁরা রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের বিভিন্ন দফতরের মেরুদণ্ড, যাঁদের দিনরাত্রির শ্রমের উপর রাষ্ট্র টিকে থাকে, তাঁরা অর্থাৎ নিম্নস্তরের কর্মচারীরা বেঁচে থাকার জীবিকা থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত। ঐসলামিক জীবন দর্শনেও এমন অস্বাভাবিক ও অন্যায় ধারণা আর ব্যবস্থার স্থান নেই। পূর্ব পাকিস্তানে এ অন্যায় আর অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র কাঠামোর আমরা আমূল পরিবর্তন দেখতে চাই। জীবনের একটা মান রক্ষা করে বেঁচে থাকার সুযোগ রাষ্ট্রের সব মানুষই যেন পায়। এ দৃষ্টিভংগী নিয়ে আমাদের নতুন রাষ্ট্রের নতুন শাসন কাঠামো হোক রচিত।'

ছাত্রদের সম্বোধন করেও এ ভাষণে বলেছিলাম :

'পাকিস্তান অর্জনের পর আজ ছাত্র সমাজের দায়িত্ব গেছে আরো বেড়ে— এ দায়িত্ব একই সঙ্গে নিজের প্রতি আর রাষ্ট্রের প্রতি। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ও আহ্বানে তাদের যেমন দিতে হবে সাড়া তেমনি রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হওয়ার জন্য নিজের জীবন আর চরিত্রকেও গড়ে তুলতে হবে দৃঢ় ভিত্তির উপর, সুষ্ঠুভাবে আর স্বাস্থ্যকর উপায়ে। এখানে যদি তাঁরা করেন আত্মবঞ্চনা তাহলে তা হবে একাধারে নিজের আর রাষ্ট্রের প্রতি প্রতারণা। আজ ধরে নিতে হবে, সাধু কি অসাধু যেকোন উপায়ে পরীক্ষা উত্তীর্ণের দিন গত হয়েছে। আমাদের এ নতুন ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য আমরা কে কিভাবে নিজেকে


www.pathagar.com

রাষ্ট্রের চাহিদা আর প্রয়োজনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে চাই, এ হবে আজ আমাদের সামনে ব্যক্তিগত আর সমষ্টিগত জিজ্ঞাসা। আজাদীর এ জন্ম মুহূর্তে সুকঠোর দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের হতে হবে আর থাকতে হবে সচেতন।'

এ ভাষণে আমার ব্যক্তিগত মতামত কিছু কিছু ব্যক্ত হয়েছে বলেই এখানে তার কিছুটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম।

## উনচল্লিশ

এর আগে ১৯৪৫শের ৬ ফেব্রুয়ারি আমরা লাভ করলাম একটি মেয়ে— আমাদের প্রথম আর একমাত্র মেয়ে। আমার শ্বশুর নাম দিলেন মমতাজ জাহান। একটা মেয়ে পেয়ে আমরা দুজনেই খুব খুশি। তৃতীয় পুত্রের (ওর অবশ্য দ্বিতীয়) মৃত্যুর পর উমু বেজায় শূন্যতাবোধ করছিল— এবার যেন তা কিছুটা দূর হল। ওতো প্রায়ই বলে থাকে ঋতুর মধ্যে যেমন বসন্ত সন্তানের মধ্যে তেমনি কন্যা। মেয়েকে যেমন ইচ্ছামতো এটা ওটা পরিয়ে কপালে টিপ, চোখে কাজল আর সুর্মা দিয়ে, পায়ে মল পরিয়ে, নখ পালিশ আর রুজ মেখে, চুলে রংবেরঙের ফিতা বেঁধে দিয়ে সাজানো যায় ছেলেদের তো আর তা করা যায় না। মনে হয় মেয়ে ছাড়া মেয়েদের মন তৃপ্তি পায় না।

সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পেলাম। ঐ বছরের শেষের দিকে কলকাতা থেকে হঠাৎ কমরেড মুজাফফর আহমদ এলেন চাটগাঁ। তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র কলকাতা কিন্তু জন্মস্থান তাঁর পূর্ব পাকিস্তানের সন্দ্বীপ। দেশ স্বাধীন হয়েছে— প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজের জন্মভূমিতে একটা নতুন রাষ্ট্র। এখন সাধারণ মানুষের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে তা দেখতেই বোধ করি এবার তাঁর এখানে আগমন। এ যাত্রা তাঁর কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি-না তা আমার অজানা। তাঁর অভ্যর্থনা উপলক্ষে স্থানীয় জে. এম. সেন হলে কারা যেন একটা জনসভা আহ্বান করেছিল। আগেই বলেছি, মুজাফফর সাহেবের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ আমার দীর্ঘদিনের তাই খবর পেয়ে আমিও গিয়ে হাজির হয়েছি সভায়। সরকারি কর্মচারীদের গতিবিধি সম্বন্ধে ব্রিটিশ আমলের আইন কানুন যে এখনো বহাল আর রয়েছে সক্রিয় তা সেদিন মোটেও আমার খেয়ালে আসেনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে— আমরাও স্বাধীন নাগরিক, এ বোধটাই ছিল তখন মনের ভেতর প্রবল। তাই সভায় গিয়ে হাজির হতে কোন দ্বিধাই বোধ করি নি মনে। কিন্তু গিয়েই পড়লাম বিপদে।

আমাকে আগে কিছুমাত্র আভাস মাত্র না দিয়েই উপস্থিত কে একজন আমার নামটাই প্রস্তাব করে বসলে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য— আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করে কে আর একজন ত্বরিত উঠে প্রস্তাবটা করে বসল সমর্থন। আমি পড়ে গেলাম দোটানায়— কি করা যায়? এখন অস্বীকার করা মানে মুজাফফর সাহেব আর সভার উদ্যোক্তাদের অত্যন্ত বেকায়দায় ফেলা। অন্যদিকে মুজাফফর সাহেব যে পাকাপোক্ত রাজনীতিবিদ তাও আমার অজানা নয়। বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পহেলা নম্বরের আসামী ছিলেন তিনি, কিছুদিন আগেও তাঁকে সরকার এক জেলা থেকে অন্য জেলায় তাড়া করে ফিরেছে, জেল, হাজত, নজরবন্দী, দীর্ঘ কারাবাস যাঁর ভাগ্যে বার বারই ঘটেছে আর যাঁর প্রধান পরিচয়


www.pathagar.com

'ভারতীয় কমিউনিজমের জনক' বলে, তেমন মানুষের সংবর্ধনা সভায় আমার মতো এক পাকা সরকারি চাকুরের পক্ষে সভাপতিত্ব করা সমীচীন কি-না এ দ্বিধা যে মনে মুহূর্তে জেগে ওঠে নি তা নয়। কিন্তু প্রস্তাবের পর ভাববার সময় কোথায়? বেঁকে বসলে আমার মুখই বা থাকে কি করে— হলভর্তি মানুষ সবাই তো আমাকে চেনে। অগত্যা কপাল টুকে সভাপতির আসনে গিয়ে বসে পড়লাম। সবাইর শেষে অতিথির গুণ কীর্তন করে বক্তৃতাও দিলাম। এ ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে, ১৯৪৮শের ২৫ ফেব্রুয়ারি আমি হঠাৎ কলেজ অধ্যক্ষের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম— চিঠি খানার উপরে লেখা ছিল Confidential বা 'গোপনীয়'। চিঠিখানি নিম্নরূপ :

The district Magistrate, Chittagong reports in his Confidential D. O. 13/C dated 8. 1. 48 and in his Memo No. 222/C dated 20. 2. 48. that you presided over a political meeting in the local J. M. Sen Hall on 15. 11. 47 and enlogised one of the speakers, Mr. Muzaffar Ahmed, who demanded the removal of European officers and points out this activity on your part is in violation of R 23 of Goverment Servants Conduct Rules, which lays down "No Govt. servant shall take part in or subscribe in aid of or assist in any way any political movement in India or any political movement relating to Indian affairs.

I am therefore to request you to be so good as to favour me with your statement in explanation at your earliest covenience."

বুঝতে পারলাম সরকারি আইনে ইন্ডিয়া মানে এখনো পাকিস্তান! যতদূর মনে পড়ে জবাবে আমি মুজাফফর আহমদের সাহিত্যকর্মের একটা খতিয়ান দিয়েছিলাম। তিনি কলকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহসম্পাদক ছিলেন। উক্ত নামের ত্রৈমাসিক পত্রিকার ও এ. কে. ফজলুল হকের দৈনিক নবযুগ প্রতিষ্ঠা আয় সম্পাদনায়ও তাঁর হাত ছিল। সর্বোপরি যুদ্ধ ফেরৎ নজরুলকে তিনিই সর্বাগ্রে দিয়েছিলেন আশ্রয়, দীর্ঘকাল ধরে করেছেন কবির পৃষ্ঠপোষকতা আর নানাভাবে সাহিত্য ব্যাপারে তাঁকে করেছেন উদ্বুদ্ধ ইত্যাদি। এসঙ্গে আমার সাহিত্যকর্মেরও একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছিলাম— বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলাম 'কায়েদে আজম' আর 'মোসলেম জীবন' লেখা দু'টির কথা। শেষোক্ত লেখাটি স্বাধীনতার আগে দু'বছর ধরে মাসিক সওগাতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১৯৪৯শে 'কোরানের বাণী' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আমার জবাবের উপসংহারে বলেছিলাম সাহিত্য ক্ষেত্রে মুজাফফর আহমদের যেটুকু অবদান তার জন্যই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আমি সভায় গিয়েছিলাম। আর সভা-সমিতিতে কোন বক্তা কি বলবে তা পূর্বাহ্নে আঁচ করা কোন সভাপতির পক্ষেই সম্ভব নয়।

খুব সম্ভব অধ্যক্ষ আবু হেনা সাহেবও আমার অনুকূলেই মত দিয়েছিলেন। কারণ এর পর এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হয় নি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামীদের বেশির


www.pathagar.com

ভাগই জেলে আর আন্দামানে থাকতেই কমিউনিস্ট হয়ে পড়েছিলেন। ছাড়া পাওয়ার পর পাক-ভারতে তাঁরাই জোরদার করে তুলেছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনকে। বোধকরি ১৯৪৮শের মাঝামাঝি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক পরলোকগত অম্বিকা চক্রবর্তী একদিন আমার বাসায় এসে বল্লেন— আমাদের গ্রাম নোয়াপাড়ায় একটা কৃষক শ্রমিক সমাবেশ হবে তাতে আপনাকে করতে হবে সভাপতিত্ব। কলকাতা থেকে কমরেড ইসমাইলও এসেছেন— তিনি হবেন প্রধান অতিথি। এ ইসমাইলই পরে এক নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে প্রায় ঘোল খাইয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা করে তুলেছিলেন। এঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে সেবার সামান্য ভোটের ব্যবধানে বিধান রায় কোন রকমে মান আর গদী রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বাধীনতার ফলে আমরা এত উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলাম যে, সরকারি চাকরির বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের কথা প্রায়ই ভুলে যেতাম। আমাদের দেশের কৃষক-শ্রমিকরা বড় অসহায়— তাদের হয়ে কথা বলার, কি তাদের সংঘবদ্ধ করে তোলার কেউ নেই। 'ম্লান মূকমুখে' সব রকম অত্যাচারই এরা নীরবে সয়ে যায়। কবির এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ইসমাইলের নাম আগেও শোনা ছিল। দেখা এ প্রথম— হিন্দীভাষী, বাংলা বলেন কলকাতার মুসলমানদের মতো ভাঙ্গা ভাঙ্গা। দেহে ছোটখাটো, ময়লা রঙ, কাপড়-চোপড়ও তেমন ধোপদোরস্ত নয়। চেহারা শ্রমিক নেতা হওয়ার মতোই। কি জানি কেন সংবাদপত্রের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই কৃষকশ্রমিক কর্মীদের প্রতিও আমি একটা অহেতুক টান বোধ করতাম। ইসমাইলের নাম শুনে অম্বিকা চক্রবর্তীর প্রস্তাবে কিছুমাত্র ইতস্তত না করে আমি রাজি হয়ে গেলাম। কর্ণফুলির অপর পাড়ে আমাদের এ গ্রামগুলি আগে আমার কখনো দেখা হয় নি— মনে মনে তা দেখার সখও যে একটু না ছিল তা নয়। কালুর ঘাটের পোলের ওখান থেকে সাম্পানে চড়ে, নদী তীরের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা একদিন যাত্রা করলাম নোয়াপাড়ার দিকে। নদীর পাড়েই অম্বিকা বাবুদের বাড়ি— আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তাঁর বাড়িতেই হলো। অম্বিকা বাবু ছিলেন অবিবাহিত, ওঁর বড় ভাই এক স্কুলপণ্ডিতই গৃহকর্তা। এ পণ্ডিতের স্ত্রীই রান্না বান্না আর পরিবেশন করলেন। কাঁসার থালা গ্লাসে জীবনে এ বোধ করি আমার প্রথম খাওয়া। বিশ্রামের পর বিকালে সভা ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলাম সদলবলে। কদ্দুর যেতে না যেতেই দেখি মাঝারি রকমের মিছিল। আমরা এগিয়ে যাওয়া মাত্রই মিছিল গর্জে উঠল— কমরেড আবুল ফজল জিন্দাবাদ, কমরেড মুহাম্মদ ইসমাইল জিন্দাবাদ। শুনে আমি তো অবাক, ইসমাইল না হয় নির্ভেজাল কমরেড আমি কমরেড হতে গেলাম কবে? আমি এক সরকারি চাকুরে, সারাজিবন শিক্ষকতা করেছি আর অবসর সময় করেছি কিছু কিছু সাহিত্য চর্চা— মিছিল, শ্লোগান, জিন্দাবাদের সঙ্গে কস্মিনকালেও আমার কোন সম্পর্ক ছিলো না আর এ সব আমার ধাত কি মন মেজাজের সঙ্গেও খাপ খায় না। ওরা গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিয়েই চল্লো মেহমান হয়ে এসে কানে আঙ্গুল দেওয়াও সম্ভব নয়। কি কুক্ষণে অম্বিকা বাবুর কথায় রাজি হয়েছিলাম সে কথা ভেবে এখন বিনা হাতে কপাল চাপড়াতে লাগলাম। পণ্ডিতি ভাষায় যাকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলা হয় দেখলাম আজ আমি হয়ে পড়েছি তার এক জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। ভাগ্যে এমন অজ পাড়াগাঁয়ে পুলিসের গতিবিধি নেই— থানাও বহু


www.pathagar.com

যোজন দূরে! ধরণী দ্বিধা হও— কথাটা এত অন্তর দিয়ে জীবনে আর কখনো উচ্চারণ করিনি। কিন্তু করলে কি হবে আমার মতো প্রক্ষিপ্ত এক কমরেডের আবেদনে ধরণী অত সহজে দ্বিধা হয় না। অতএব সভায়ও যেতে হলো, তুমুল কমরেড আবুল ফজল জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে পতাকাও তুলতে হলো, করতে হলো সভাপতিত্বও। মনের সে অবস্থায় সভায় কি বলেছিলাম তা আজ আর কিছুই মনে নেই।

মুসলমান বাড়িতে অতিথি এলে মুরগি জবাই করা হয়। এ বোধ করি অম্বিকা বাবু আর অম্বিকা বাবুর বৌদির জানা ছিল। কাজেই এমন দু'জন আস্ত মুসলমান অতিথিকে এক বেলাও মুরগি না খাইয়ে তাঁরা বিদায় দেন কি করে? তবে মুরগিটা জবাই, না পাঁঠার মতো এক কোপে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে কাটা সে এক আল্লাহ আর অম্বিকা বাবুর বৌদি নির্ভেজাল ব্রাহ্মণ-জায়াই বলতে পারেন। তিনিই নিজের হাতে পরিবেশন করলেন, মনে হলো রান্নাটাও তিনি স্বহস্তেই করেছেন। অম্বিকা বাবুর সন্ত্রাসবাদ কি তা হলে এ পরিবারের মন থেকে খাওয়া-দাওয়ার সংস্কারটুকুও নির্মূল করে দিতে পেরেছে? না কি এ স্রেফ একদিনের ব্যাপার সুযোগমতো পরে তিনি বৌদিকে নিজেই একদিন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনবেন? এমন একটা প্রশ্ন সেদিন আমার মনে ক্ষণিকের জন্য জেগে উঠেছিল বইকি। আমি নিজে আজো পুরোপুরি সংস্কার-মুক্ত হতে পারি নি। মুরগিটা যথারীতি কোন মুসলমান প্রতিবেশীকে দিয়ে জবাই করা হয়েছে কিনা এ প্রশ্নটা তো আমি আমার মন থেকে দূর করতে পারছি না কিছুতেই। মুরগির মাংস মুখে দিতেই চোখ নাক দিয়ে যে ভাবে দরদর করে পানি পড়তে শুরু করল তাতে মুহূর্তে সব প্রশ্নই গেল তলিয়ে। সম্মানিত অতিথি— হা হু করারও নেই উপায়। মুসলমানেরা মাংসে গরম মসলা খায়— এ বোধ করি মহামান্যা ব্রাহ্মণ-জায়াটির শোনা ছিল। মনে হয় ঐ অঞ্চলের যত দোকানে যত গোল মরিচ, দারুচিনি আর লবঙ্গ মৌজুদ ছিল সবই ঐ একটা মুরগিতেই প্রয়োগ করে অম্বিকা বাবুর বৌদি তাঁর মুসলমানী রান্নার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছেড়েছেন। হয়তো ঐ তাঁর জীবনে প্রথম মুরগি রান্না। অত বড় সন্ত্রাসবাদী বীর দেবরের অনুরোধ তিনি হয়তো কিছুতেই ঠেলতে পারেন নি। সেদিন আমরাও কম বীরত্বের পরিচয় দিই নি কোন রকম হা হু না করেই স্রেফ পকেটের একখানা রুমাল দিয়ে চোখ নাক মুছে মুছে অমন ভূত-তাড়ানো ঝাল নির্বিবাদে আর পরম ধৈর্যের সাথে খেয়ে যাওয়া আমার বিশ্বাস কোন হেলালে জুরাত সনদ প্রাপ্তও পারবে না!

রাত্রে কয়েকবারই আমাকে ঘটি হাতে বাইরে আনাগোনা করতে হলো। মনে হলো ইসমাইলের অমন শ্রমিক পেটও বিচলিত হয়ে পড়েছে। তিনিও বার কয়েক আনাগোনা করলেন ঘর-বাইর। একবার বিরক্ত কণ্ঠে বলেও ফেল্লেন : মুরগি খাওয়াবার কি দরকারটাই বা ছিল? সকালে মাছ তরকারি আর ডাল চচ্চড়ি দিয়ে তো বেশ খাওয়া হয়েছিল!

বল্লাম : এ মুসিবৎ স্রেফ আপকা লিয়ে, আপ কলকাত্তাকা মেহমান হে মুরগি নে হোনেছে কিসতরে আপকা...। দেখ্‌লাম দুঃখের দিনেও মুখে হিন্দী এসে যায়।

ভোরে উঠেই অম্বিকা বাবুকে বল্লাম : এখন রওয়ানা না দিলে আমার আজ কলেজ


www.pathagar.com

করাই হবেনা। একটা সাম্পান ডাকুন। ইসমাইলও বলে উঠলেন— শহরে তাঁর জরুরি কাজ আছে তিনিও চলে যাবেন আমার সাথে। আমার কয়েক ঘণ্টার কমরেড জীবনকে একটা 'লাল সেলাম' জানিয়ে এবার চড়ে বসলাম চট্টগ্রামগামী সাম্পানে। জীবনে এ একবার কমরেড্ হওয়ার আর নিজের নামের জিন্দাবাদ শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম; বাসায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই লাল সেলামই যেন অক্ষরে অক্ষরে লাল হয়ে দেখা দিল। শুরু হয়ে গেল রক্তামাশয়। সাত আট দিন সাগু বার্লি ছাড়া আর কিছুই খেতে দিল না ডাক্তার।

রাষ্ট্রের আয়ু মাত্র বছর দেড়েক— আই. বি. বিভাগ তখনো বোধ করি তেমন শক্ত আর ডালপালা মেলে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। হয়তো এ কারণেই এ সভা আর মিছিল সম্পর্কে আমাকে কোন রকম কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হয় নি। না হয় ইসমাইল আর অম্বিকা চক্রবর্তী ঐ সভায় যা গরম গরম মারমুখো বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা অনায়াসে তাঁদের আর তাঁদের সঙ্গে আমাকেও জেলে নিয়ে হাজির করতে পারত।

১৯৫০শের জানুয়ারিতে একটা বড় রকমের এক্সিবিশন বা প্রদর্শনী হয়েছিল চাটগাঁয়। এমন সফল প্রদর্শনী এর আগে বা পরে আর হয়নি। এ এক্সিবিশনের পর থেকেই নেয়াজ স্টেডিয়ামের মাঠটাকে এক্সিবিশন মাঠ বলা হতে থাকে। তখন মি: এন্. এম্. খাঁ চট্টগ্রামের কমিশনার, প্রদর্শনী কমিটির তিনিই চেয়ারম্যান আর প্রধান উদ্যোক্তা। আমাদের বন্ধু সৈয়দ মর্তজা আলী সাহেব তখন চাটগাঁর এ. ডি. এম. আর টি. হোসেন ওর্ফে তফাজ্জল হোসেন সদর এস. ডি. ও.। এস. ডি. ও. এক্সিবিশন কমিটির সম্পাদক। কমিটির বাঙালি অফিসারেরা সংকল্প করেছেন এ সঙ্গে বাংলা পুঁথি পত্রেরও একটা এক্সিবিশন আর বড় করে একটা সাহিত্য সম্মেলনও ডাকবেন। এন. এম. খাঁও এঁদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হয়েছেন সম্মত। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের ভাণ্ডার উজাড় করে নিয়ে আসা হলো পুঁথিপত্র, বিলি করার জন্য তার একটা তালিকাও হলো ছাপানো। এ সময় মর্তজা আলী সাহেব আমাকে ডেকে একদিন বল্লেন : আমরা অফিসারদের ডাকে সাহিত্যিকরা সাড়া দেয়ার কথা নয়। ফলে সমস্ত আয়োজনটাই হয়তো পণ্ড হয়ে যাবে। সাহিত্য সম্মেলনের সবটা ভার আপনাকেই নিতে হবে। এ সম্পর্কে আমরা প্রিন্সিপালের সঙ্গেও আলাপ করেছি, তিনিও আপনার কথা বলেছেন। সরকারি অফিসারদের তত্ত্বাবধানে সাহিত্য সভা— শুনে আমি মনের ভেতর তেমন উৎসাহ বোধ করলাম না। আমিও সরকারি চাকুরে কিন্তু আমার চাকরি জীবন আর সাহিত্য জীবন সব সময় আলাদা খাতে চলেছে। আমি ইতস্তত করছি দেখে মর্তজা আলী সাহেব ব্যাপারটি খুলে বল্লেন : সাহিত্য সভার পরিকল্পনা মূল প্রোগ্রামে ছিল না, ছিল শুধু একটি উর্দু মুশায়েরার কথা। আমাদের এটা পাল্টা ব্যবস্থা। এখন আপনি যদি ভার না নেন তা হলে আমাদের প্লেনটাই যাবে ভেস্তে। বাংলাদেশে উর্দু মুশায়েরা হবে অথচ বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের কিছুই হবে না এতে কি আমাদের মান থাকে? অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ভার আমাকে নিতে হলো। ঢাকার সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে চিঠিপত্র লিখলাম— কমিটি যাতায়াতের ভাড়া দেবেন। কাজেই অনেকেই এলেন। এন. এম. খাঁ দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসার, স্কুল-কলেজে হুকুম জারি করেছেন সভায় উপস্থিত থাকার জন্য। ফলে বিরাট


www.pathagar.com

প্যান্ডেল ভর্তি হয়ে জমজমাট সভা বসে গেল। মীজানুর রহমান সাহেব তো বক্তৃতা দিতে উঠে বলেই ফেল্লেন : এত বড় সাহিত্য সভা আমি আর কোথাও দেখি নি, এমনকি ঢাকায়ও না। গোলাম মোস্তফা সাহেব বক্তৃতা দিলেন, কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন, গানও করলেন। আব্বাস উদ্দীন এসেছিলেন তাঁর বড় ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে— ওরা তখন কিশোর-কিশোরী, স্কুলে পড়ে। তাঁরা বাপ বেটা-মেয়ে তিনজনে গানের পর গান গেয়ে সভাকে মাতিয়ে তুল্লেন। সন্ধ্যায় সে একই স্টেজে বুলবুল চৌধুরীর নৃত্য— কাজেই নির্দিষ্ট সময়ে সভা শেষ করে স্টেজ্ দিতে হবে ছেড়ে কিন্তু লোক জনসভা ছেড়ে উঠে যেতে রাজি নয় মোটেও। অনেক আবেদন নিবেদনেও ফল হচ্ছে না দেখে শেষকালে প্রায় জোর করেই ভেঙ্গে দিতে হলো সভা। হাবীবউল্লাহ বাহার তখন মন্ত্রী। তিনিই এ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন। এ ব্যবস্থা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছিল। আহ্বায়ক হিসেবে তাঁকে এ সম্পর্কে আমি কোন চিঠি দিইনি, করিনি কোন অনুরোধ। অফিসারদের কারসাজি— তাঁরা মন্ত্রীকে খুশি করতে চান। বাহার আমার এক রকম আকৈশোরের বন্ধু, সাহিত্য পথেরও সহযাত্রী। তবুও মন্ত্রী হিসেবে এসে তিনি সাহিত্য সভার উদ্বোধন করুক এ আমি চাই নি। যে কোন রকম ক্ষমতা থেকে সাহিত্যের দূরে থাকা উচিত— এ বিশ্বাস আমার মনে আজো অটুট। বাহার ছাড়াও আমার বন্ধুদের আরো কেউ কেউ মন্ত্রী হয়েছেন— মন্ত্রী থাকা অবস্থায় তাঁদের কারো সঙ্গে আমার কোন রকম দহরম মহরম হয় নি। কারো কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গতা থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রী থাকাকালে তাঁদের সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ ঘটে নি কোনদিন।

আমাকে আহ্বায়ক করা হয়েছে অথচ আমাকে ডিঙিয়েই মন্ত্রীকে আহবান করা হয়েছে সাহিত্য সভার উদ্বোধন করার জন্য। মনে মনে দুঃখিত হলাম আর বুঝতে পারলাম আমার ভুল। কমিটির সব সভ্যই যেখানে অফিসার সেখানে আমার আহ্বায়ক হতে যাওয়াই হয়েছে বোকামি।

বাহারের সঙ্গে সেদিন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদও এসেছিলেন, তিনিও দিলেন সভায় বক্তৃতা। মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। আমার বাসা থেকে সভার স্থান খুব নিকটে বলে সেবার তিনি ছিলেন আমার বাসায় আমাদের মেহমান হয়ে। তখন তিনি খুব বুড়ো আর দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁর অভিভাষণটাও মোটামুটি আমাকেই খাড়া করে দিতে হয়েছিল, সভায় তিনি প্রথম দু'এক লাইন পড়ে দেওয়ার পর বাকিটা পড়তেও হয়েছিল আমাকে।

এ ছাড়া শেষের দিকে আমাকে আরো কোন কোন অভিভাষণ রচনায় তাঁকে সাহায্য করতে হয়েছে। তিনি বহুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নকর্তা ছিলেন। গ্রাম দেশে থাকতেন হাতের কাছে প্রয়োজনীয় বইপত্র ছিল না— তাই এসব ব্যাপারেও মাঝে মাঝে তাঁকে আমার সাহায্য করতে হত। তাঁর মুখে শুনেছি এসব ব্যাপারে ডক্টর এনামুল হকও তাঁকে কোন কোন সময় সাহায্য করেছেন। এসব সাহায্য তাঁর নিতে হত যখন তিনি বয়সের ভারে প্রায় অক্ষম হয়ে পড়েছেন তখন।

এখানে এসব ব্যাপার যে উল্লেখ করছি তা বড়াই করার মতলবে নয়, করছি জীবনের ঘটনা হিসেবেই শুধু। আর হয়তো আমাদের সময় মুরুব্বি স্থানীয় সাহিত্যিকদের এক


www.pathagar.com

আধটুকু কাজে লাগতে পারলে আমরা মনে মনে যে কত আনন্দ পেতাম তা জানাবার জন্যই। শুনি বয়স্ক সাহিত্যিকদের প্রতি সে শ্রদ্ধাটুকু নাকি আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। (এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের কোন অভিযোগ নেই।)

এ সম্মেলন হয়েছিল জানুয়ারিতে, ডিসেম্বরে চট্টগ্রামের প্রগতিশীল তরুণরা সিদ্ধান্ত নিল একটা সাংস্কৃতিক সম্মেলন করার। তাঁরাও আমাকে করলেন তাঁদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তাঁদের ইচ্ছা ঢাকা-কলকাতা থেকেও আনাবেন বাছা বাছা শিল্পী আর সাহিত্যিক। বলা বাহুল্য, তখনো পাসপোর্ট ভিসার প্রবর্তন হয় নি। সাহিত্য আর সংগীত ছাড়া এ সঙ্গে একটা চিত্র প্রদর্শনীরও করা হয়েছিল আয়োজন। ঢাকার শিল্পীবন্ধুরা এগিয়ে এলেন এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করতে। কে বা কার প্ররোচনায় জানি না হঠাৎ 'আজাদ' আর 'মর্নিং নিউজে' শুরু হয়ে গেল সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকমের প্রচারণা। ঢাকার যেসব অধ্যাপক আর পণ্ডিত ব্যক্তি সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়তে আর সভাপতিত্ব করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন তাঁরা সবাই ভয় পেয়ে বেঁকে বসলেন। এমনকি শেষ মুহূর্তে আসতেও করলেন অস্বীকার। ধূয়া তোলা হয়েছে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সবাই কমিউনিস্ট। কর্মীদের মুখের পানি শুকিয়ে গেল। দমে গেলেন কর্মকর্তারাও। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন সম্মেলন মুলতবী রাখার জন্য। আমি বেঁকে বসলাম এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কি জানি কেন ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম সেদিন। জেদ চাপল মনে। বল্লাম : মাত্র তিন জনকে নিয়েও যদি সম্মেলন করতে হয় তা হলেও সম্মেলন আমরা করবোই। পেছনে হটা চলবে না। ভবিষ্যতে যা ঘটে ঘটুক। কর্মীরা এবার হৃত উৎসাহ যেন ফিরে পেলো। নবোদ্যম শুরু হল প্রস্তুতির কাজ। আমাকে বলা হল : ঢাকা থেকে কেউ না এলে তো মুখ থাকে না।

আমি বল্লাম : আর কেউ যদি নাও আসেন সুফিয়া কামাল নিশ্চয়ই আসবেন। তাঁকে আমি নিয়ে আসতে পারব। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ হবেন মূল সভাপতি আর সুফিয়া কামাল হবেন প্রধান অতিথি। এ দু'জনের কেউই ভয় পাওয়ার পাত্র নয়। দু'জনেই এসব ব্যাপারে অকুতোভয়।

সবাই এবার আমাকে ধরে বললেন : আপনি প্লেনে ঢাকা চলে যান। যদি সুফিয়া কামালও কোন কারণে না আসেন তাহলে মুখ থাকবে না আমাদের, সম্মেলন হয়ে পড়বে ঘরোয়া ব্যাপার। বলেছি তখন আমারও জেদ চেপে গেছে। পরদিন রওয়ানা দিলাম ঢাকা প্লেনে চড়ে। জীবনে ঐ আমার প্রথম হাওয়াই জাহাজ চড়া তাও সম্মেলনের পয়সায়।

সুফিয়া কামাল সব শুনে বল্লেন : ঠিক আছে আমি যাব। আপনারা আহবান করছেন আমি না যেয়ে পারি? এ সুযোগে আমার শ্বশুরের দেশও দেখা হবে। বলাবাহুল্য, এর আগে তিনি আর চাটগাঁ আসেন নি।

কর্মীদের কারো কারো মনে তখনো ভয় ছিল। কারণ 'আজাদ' আর 'মর্নিং নিউজ' তখনো অনবরত সম্মেলনের বিরুদ্ধে লিখেই চলেছে। আর সরকারি মহলে এ দুই পত্রিকার প্রতাপ তখন অসীম। এবার কেউ কেউ প্রস্তাব দিলেন আঘাত যদি আসেই তা ঠেকাবার একটা বর্ম হাতে থাকা ভালো।

: কি রকম?


www.pathagar.com

: এন্. এম. খাঁকে দিয়ে চিত্রপ্রদর্শনীটার উদ্বোধন করা যাক। তাহলে আজাদ-মর্নিং নিউজের হাতের কমিউনিস্ট গদাটা একদম ঘুণে খাওয়া লাঠির মতো অকেজো হয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত কমিটি তাই সাব্যস্ত করল। আমি আমার কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রকে ডেকে বলে দিলাম : দেখিস কেউ যেন ঢিলঢিল না ছোঁড়ে। তোরা রাস্তাটা টহল দিয়ে বেড়াবি যতক্ষণ সভার কাজ চলতে থাকে। কদম মুবারক এতিম খানার সামনে হরিখোলার মাঠে বাঁধা হলো বিরাট প্যান্ডেল আর স্টেজ। কলকাতা থেকেও অনেক গায়ক-গায়িকা এলেন— এসেছিলেন 'আমার দেখা রাশিয়া'র লেখক সত্যেন মজুমদারও। ঢাকা থেকে তরুণ দল এসেছিলেন ঝাঁক বেঁধে। পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সম্মেলনেই কলিম শরাফিরও প্রথম আবির্ভাব। দু'দিন ধরে সম্মেলনে এত অভূতপূর্ব লোক সমাগম হলো যে, পাশের সড়কেও তিলধারণের জায়গা থাকত না।

## চল্লিশ

আটচল্লিশের শেষের দিকে বোধ করি— ডি. পি. আই. অফিস তখনো চাটগাঁয়, পদোন্নতির যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য আমাদের কয়েকজনকে ডাকা হলো বিভাগীয় নির্বাচনী বোর্ডের সামনে হাজির হতে। উর্দুভাষী মরহুম ফজলুর রহমান তখন এ. ডি. পি. আই. পরে তিনি ডি. পি. আইও হয়েছিলেন। তিনিও বোর্ডের অন্যতম সদস্য। তথাকথিত হরূফুল কোরার্ন নিয়ে দেশে তখন তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলছে। মরহুম মৌলবী জুলফিকর আলী চট্টগ্রামে ঐ নামে একটি পত্রিকাই চালাতেন— বাংলা পত্রিকা তবে ছাপা হতো আরবী হরফে। বাংলা ভাষা বাংলাই থাকবে তবে তা লিখতে হবে আরবি হরফে, এ ছিল এঁদের ধুয়া। সরকারি এক গুরুত্বপূর্ণ মহল ছিল এর সমর্থক— মূল উস্কানিটা আসত সেখান থেকে। নাটের গুরু ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের তখনকার শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি মি: এফ. এ. করিম।

নির্বাচনী বোর্ডের সভায় হঠাৎ ফজলুর রহমান সাহেব হরূফুল কোরান সম্বন্ধেই আমাকে এক প্রশ্ন করে বসলেন— জিজ্ঞাসা করলেন এ সম্পর্কে আমার মতামত।

উত্তরে আমি বল্লাম : 'হরূফুল কোরান' কথাটাই ভুল। কারণ কোরাণ হরফ নিয়ে নাজেল হয়নি। আল্লার যেমন অজুদ নেই তেমনি আল্লার কালামেরও অজুদ থাকতে পারে না। ওহী নাজেল হওয়ার অনেককাল পরে তা আরবি হরফে লেখা হয়েছে মাত্র। তাই আরবি হরফ বলাই সঙ্গত।

আমার উত্তর শুনে সবাই উচ্ছ্বসিত। এমন কি হরূফুল কোরানের সমর্থক ফজলুর রহমান সাহেবও বলে উঠলেন : তাই তো, আমরা তো কথাটা ঐভাবে ভেবেই দেখি নি।

মনসুরউদ্দীন আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র, প্রথমশ্রেণী আর গুণীও— তিনিই পেলেন প্রথম নমিনেশন আমি দ্বিতীয়। পদও দু'টি— রাজশাহী আর সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজে। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, এম. এ. পি. এইচ. ডি., বি. টি. তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার।

অত বড় একজন ডক্টর আর পণ্ডিত মানুষ স্কুলে পড়ে থেকে পঁচতে থাকবেন এ বোধ করি ডি. পি. আই. কুদরৎ-এ খোদা সাহেবের মনঃপুত ছিল না— হয়তো এনামুল হক


www.pathagar.com

সাহেবও চেয়েছিলেন কলেজে আসতে। এতকাল কোন কলেজেই বাংলার অধ্যাপকের কোন পদ ছিল না। এবার সুযোগ পেয়ে তাঁকে নিয়োগ করা হলো রাজশাহী কলেজে আর প্রথম নমিনি হিসেবে সিলেটের পদটা পেলেন মনসুর উদ্দীন সাহেব। অতএব আমি বাদ পড়লাম।

এর মধ্যে আমি করে বসলাম এক বোকামি। পাকিস্তান হয়েছে অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ঘটে নি কোন রদবদল। পাকিস্তানের মুসলমানরা স্বভাবতই এখন নিজেদের জীবনের কিছুটা প্রতিফলন পাঠ্যতালিকায়ও দেখতে চায়। কিন্তু তা হয় নি, উল্টো নতুন করে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' আর ঐ গ্রন্থের এমন সব রচনাগুলোও যাতে লেখক মুসলমান আর মুসলিম ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট কটুকথা বলেছেন— এ ব্যাপারে মুসলমান সমাজের মনোভাব কারো অজানা থাকার কথা নয়। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তখন বাংলা বিভাগে সুপারনোমারি অধ্যাপক (পাকা-পাকি অধ্যাপকও হতে পারেন), তাঁকে এ সম্পর্কে আমি একখানা ব্যক্তিগত চিঠি লিখে অনুরোধ জানালাম— মুসলমানের আবেগ অনুভূতি, ধ্যানধারণা আর রুচিতে যেসব রচনা আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে তা এখন পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দেওয়াই উচিত। আর উচিত এখন থেকে মুসলমান লেখকদের কিছু কিছু বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা। তা হলেই পাকিস্তান হাসিলের সঙ্গে রক্ষিত হবে সংগতি আর মুসলমানদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনাও পাবে কিছুটা তৃপ্তি।

পরের বৎসরও যখন পাঠ্য তালিকায় কোন রদবদল দেখা গেল না তখন আমি 'জিন্দেগী' পত্রিকায় লিখে বসলাম বেনামিতে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। 'জিন্দেগী' তখন কাজী আফসার উদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। উক্ত প্রবন্ধে আমার বক্তব্যের সপক্ষে দিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বই থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি। মনে করলাম আমার কর্তব্য এখানেই শেষ।

বেশ কিছুকাল কেটে গেল চুপচাপ। আমিও ভুলে বসেছি ঐসব কথা। প্রায় মাস ছয় পরে হঠাৎ একদিন দেখতে পেলাম 'জিন্দেগী'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটাকে ভিত্তি করে করাচির 'ডন' পত্রিকায় 'Believe it or not' এ শিরোনামায় দারুণ কড়া ভাষায় এক প্রধান সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। শুধু সম্পাদকীয় নয় পাশাপাশি আমার পুরো লেখাটার অনুবাদও হয়েছে প্রকাশিত।

এবার ঢাকার উচ্চ মহলে শুরু হলো তোলপাড়। কে এ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম? তখন সিলেটের মরহুম আবদুল হামিদ শিক্ষামন্ত্রী, ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন আর শিক্ষা-দফতরের সেক্রেটারি সে স্বনামধন্য এফ. এ. করিম। 'ডন' সম্পাদক আলতাফ হোসেনের ইংরেজি ভাষায় কলমের জোর অনেকেরই জানা— মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি তুলোধুনো করে ছেড়েছেন।

কাজী আফসার উদ্দীন আর আলতাফ সাহেব আত্মীয়। সে সুযোগেই বোধ করি এক কপি করে 'জিন্দেগী' আলতাফ সাহেবের নামে করাচি পাঠানো হত। এর ফলেই নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার বেনামি লেখাটার উপর তাঁর নজর পড়ে। 'Believe it or not' এরই নতিজা। এবার শিক্ষা দফতর আর বিশ্ববিদ্যালয় মহলে একমাত্র প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল : কে এই অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম? এমনভাবে আমাদের সকলের চোখের ঘুম আর চাকরির শান্তি নষ্ট করল কে এ পাষণ্ড? বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়


www.pathagar.com

আছে ঐ নামের কোন অধ্যাপককে পাওয়া গেল না কোথাও খুঁজে।

হঠাৎ এ সময় ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব থলের মুখটা দিলেন খুলে— বেরিয়ে পড়ল বিড়াল ছানা! তিনি বলে দিলেন : কয়েক মাস আগে আবুল ফজল এ মর্মে আমাকে এক চিঠি লিখেছিল, এ প্রবন্ধের অনেক কথাই সে চিঠির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এমন কি কোন কোন উদ্ধৃতিও। এ ওর লেখা ছাড়া আর কারো হতে পারে না।

এভাবে সেদিন অন্ধকারে ভূত তালাসের সমাপ্তি ঘটেছিল।

ভাইস্-চ্যান্সেলার ডক্টর মোয়াজ্জেম হোসেন আমার বন্ধু আবদুল হক ফরিদীকে নাকি দুঃখ করে বলেছিলেন : আবুল ফজল সাহেব এমন কাণ্ড করে বসবেন এ তো আমরা ভাবতেই পারি নি। তাঁকে তো আমরা খুব ভালো মানুষ বলেই জানতাম।

আশ্চর্য খারাপ কাজটা আমি কি করলাম তা আর কেউ একটু ভেবেও দেখলেন না।

আমার এ লেখার পর, না, আমার লেখার জন্য নয়, 'ডনে'র সম্পাদকীয়ের ফলেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় এবার কিছু কিছু রদবদল শুরু হলো। আপত্তিকর লেখাগুলো ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত হলো আর স্থান দেওয়া হলো কায়কোবাদ, নজরুল ইসলাম, শাহাদত হোসেন, জসীমউদ্দীনকে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় নজরুলেরও ছিল না পাত্তা। জাতীয় মানস গঠনের যুগে বিদেশী ভাবধারার চেয়ে স্বদেশী ভাবধারায় পুষ্ট মাঝারি রচনাও অনেক মূল্যবান। এ বিশ্বাস আমার মনে আজো অটুট।

চাটগাঁ বসে আমি সব খবরই পাচ্ছিলাম। ভাবলাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার আর কতটুকু ক্ষতিই বা করতে পারবে। বড় জোর পরীক্ষকের তালিকা থেকে আমার নামটাই না হয় বাদ দেবেন। আমি বি. এ-র পরীক্ষক ছিলাম। সত্য সত্যই দেখলাম পর বৎসর আমি আর পরীক্ষক নেই। আবদুল হাই সাহেব হেড হওয়ার পর অবশ্য এ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল।

এর কিছুকাল পরে চাটগাঁ কলেজেও বাংলা ভাষায় অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হলো। আমি বিভাগীয় বোর্ড কর্তৃক আগেই মনোনীত। কাজেই এ পদে আমারই নিয়োগ হবে এ প্রায় সবাই ধরে নিয়েছিল। কলেজ অধ্যক্ষ ডি. পি. আইর অনুমোদনক্রমে অস্থায়ীভাবে ঐ পদে আমাকে কাজ করে যাওয়ার অনুমতিও দিয়েছেন।

কয়েক মাস কাজ করার পর হঠাৎ জানা গেল পদটা আমাকে দেওয়া হয় নি। অন্য একজনকে এ পদে নিয়োগ করা হয়ে গেছে চিঠিটা শুধু ইসু হতেই বাকি। ডি. পি. আই. অফিস এর আগেই ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। তখনো ডক্টর কুদরৎ-এ খোদাই ডি. পি. আই. আছেন। গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। যে সিলেক্সন বোর্ড আমাকে নমিনেসন দিয়েছিল তিনি ছিলেন পদাধিকার বলে তার চেয়ারম্যান। তাঁদের সিলেকসন উপর থেকে হস্তক্ষেপ করে এভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, কথায় বুঝতে পারলাম তাতে তিনিও বিরক্ত হয়ে আছেন। আমাকে বল্লেন : আপনি গিয়ে সোজা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন।

অগত্যা ঐ পর্যন্ত আমার যেসব বই-পত্র বেরিয়েছে সব বগলদাবা করে পরদিন সকালে মন্ত্রী সাহেবের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

আবদুল হামিদ সাহেব পাশে বসে আমার লেখা বইগুলো সব উল্টে পাল্টে দেখলেন।


www.pathagar.com

'বিদ্রোহী কবি নজরুল' বইটাতে নজরুলের কিশোর বয়সের আর তাঁর স্ত্রীর ছবি ছিল। মনোযোগ দিয়ে ছবি দু'টাও দেখলেন তিনি।

দেখার পর বল্লেন : আপনি তো অনেক ভালো ভালো বই লিখেছেন দেখছি। পরে যোগ করলেন : আপনি সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করুন। যা বলার তিনিই আপনাকে বলবেন।

ইডেন বিল্ডিঙে গিয়ে এবার দেখা করলাম সেক্রেটারির সঙ্গে অর্থাৎ আরবি হরফে বাংলা লেখার অত্যুৎসাহী প্রবক্তা এফ. এ. করিম সাহেবের সঙ্গে।

সেক্রেটারি সোজা জানিয়ে দিলেন : বিভাগীয় সিলেকসন আমরা মানি না। যাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে তিনি চাকরিতে আপনার চেয়ে সিনিয়র। কাজেই আপনার আপত্তির কোন কারণ নেই। বাইরে আসার পর শিক্ষা বিভাগের এক বন্ধুর মুখে শুনলাম— এ হল বাহ্য, সব বাজে কথা। আসলে এ হচ্ছে আপনার জিন্দেগীর লেখা আর ডনের সম্পাদকীয়ের জের, জবর, পেশ। ভাবলাম ব্যাপারটা আর একটু তলিয়েই না হয় দেখা যাক। গেলাম শিক্ষা বিভাগের এসিস্টেন্ট সেক্রেটারির কাছে। এবার সবটা তিনিই খুলে বল্লেন : 'ডনে'র লেখার জন্য মন্ত্রী সাহেব আজো আপনাকে ক্ষমা করতে পারেন নি। আলতাফ সাহেবই বা মন্ত্রীকে গালাগাল দিতে গেলেন কেন? মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা তৈরি হয় না ইত্যাদি। এ দেখছি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে! আমার লেখায় তো মন্ত্রী বা ভাইস্-চেন্সেলার কারো নামগন্ধও ছিল না। আর আলতাফ সাহেবের সঙ্গেও তো নেই আমার কোন যোগাযোগ। আমার লেখা করাচি যাবে আর তা আলতাফ সাহেবের চোখে পড়বে তা তো আমি কোনদিন ভাবিই নি! যাই হোক, এবারও আমার অধ্যাপক হওয়া হল না। অধ্যাপক হয়ে এলেন আমার পুরোনো বন্ধু ইদ্রিস আলী সাহেব। আমার অস্থায়ী পদের চার্জ এবার তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি আবার ফিরে গেলাম আমার সাবেক পদ লেক্চারারে।

এর আগে ১৯৪৭শে 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' নামে আমি একটি ছোট বই লিখেছিলাম— খুব গভীর আর নজরুল সাহিত্যের বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় না গিয়ে মোটামুটি সহজপাঠ্য করেই বইটা লেখা। বইটি সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট্রিকের দ্রুত পঠন হিসেবে ঢাকা সেকেন্ডারি বোর্ডের অনুমোদনও লাভ করেছিল এবং একটানা প্রায় পাঁচ ছয় বছর পাঠ্য ছিল। বাংলা ভাষায় নজরুল সম্বন্ধে ঐটি আদি বই— হয়তো ঐ কারণেই বইটি হয়েছিল খুবই জনপ্রিয়।

'৪৮-'৪৯শে 'সাহিত্য চয়নিকা' নামে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর উপযোগী দুটি সাহিত্য বইও আমি সংকলন করেছিলাম। ঐ দুটি বইও টেক্সট্ বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল পাঠ্য বই হিসেবে। প্রচলিত সংকলনগুলির উপর নির্ভর না করে আমি লেখকদের মূল বই থেকে আমার এ দুটি বইর লেখাগুলি, বিশেষ করে গদ্যাংশের নিবন্ধগুলি নির্বাচন করেছিলাম। পাঠ্য বই হিসেবে আমার এ দু'টা সংকলনও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ তিনটি বই থেকে আমি বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলাম। এ টাকা দিয়েই আমি আমার বর্তমান বাড়িটার ভিতপত্তন করি। এ ব্যাপারে আমি অনেকের অযাচিত সাহায্য পেয়েছি। ইঞ্জিনিয়ার ফখরুল ইসলাম প্লেন করে দেওয়া থেকে ইট-কাঠ জোগাড় করে দেওয়া পর্যন্ত অনেক ব্যাপারে সাহায্য করেছেন আমাকে। বইর টাকায় অবশ্য বাড়ির সিকিটুকুও হয় নি। সরকারি


www.pathagar.com

গৃহনির্মাণ করপোরেশন থেকে মোটা ঋণ, প্রভিডেন্ট ফান্ডের সব সঞ্চয়, আর্ধেক পেনশন আর তিনটা বইর কপিরাইট বিক্রির টাকাও দিতে হয়েছে এ সঙ্গে জোগান। গৃহনির্মাণ করপোরেশনের ঋণের ব্যাপারে অকাতরে সব শ্রম আর ঝামেলার ভার নিয়েছিলেন আমার তরুণ বন্ধু মি: এ. সামাদ। তিনি সিলেটের লোক, তাঁর স্ত্রী ফৌজিয়া সামাদ স্বল্পকালের জন্য চট্টগ্রাম কলেজে আমার ছাত্রী ছিলেন। আমার বাড়ির কাজ বন্ধ হয়ে আছে দেখে একদিন নিজ থেকেই এসে বল্লেন : আমার গাড়ি আছে, হাঁটাহাঁটি দৌড়োদৌড়ি যা করতে হয় আমিই করব আপনি ঋণ নিয়ে বাড়িটা শেষ করে ফেলুন। আমিও নিয়েছি, কাজেই ঋণ নেওয়ার অন্ধিসন্ধি আমার জানা। যা করার সবই আমি করে করব।

ঋণ সম্বন্ধে আমার আতঙ্ক প্রায় মৌরসী। আমরা এযাবৎ মোটামুটিভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছি, কোনদিন ঋণ করি নি, পূর্ব পুরুষও কেউ ঋণ করেছেন কি ঋণ রেখে গেছেন শুনিনি। ছেলেরা সব ছোট স্কুল-কলেজে পড়ে। আমি ব্লাড্‌প্রেসারের রোগী, কোন দিন মারা যাই ঠিক নেই। এ অবস্থায় অত বড় একটা ঋণের বোঝা ওদের মাথায় চাপিয়ে যাব! সামাদ সাহেবের প্রস্তাবে তাই সহজে রাজি হতে পারলাম না।

তিনি আশ্বাস দিয়ে বল্লেন : ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে বাড়িটা এমনভাবে করতে হবে যাতে এক অংশে নিজেরা থেকে অন্য অংশ ভাড়া দেওয়া যায়। সে ভাড়া থেকেই ঋণের কিস্তি অনায়াসে শোধ করা যাবে। সেভাবে আমিও করেছি আরো অনেকে করেছেন। তখন কিস্তির বোঝা আপনার বা ছেলেদের কারো উপর বর্তাবে না। আর আপনার রাস্তার ধারের বাড়ি একদিনও পড়ে থাকবে না খালি।

তথাস্তু। রাজি হয়ে দলিলপত্র সামাদ সাহেবের হাওলা করে দিলাম। কিন্তু ফ্যাকরা দেখা দিল একজন জামিন চাই। বিশেষত অল্পদিনের মধ্যেই আমি রিটায়ার করতে যাচ্ছি সরকারি চাকরি থেকে। আমার মত অসুস্থ (ব্লাড্‌পেসারে তখন আমার খুবই কাহিল অবস্থা) লোকের জন্য কুড়ি হাজার টাকার জামিন কে হতে যাবে? মনে মনে চোখ বুলিয়ে দেখলাম আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি এত বড় ঝুঁকি নিতে রাজি হবেন। সামাদ সাহেব বল্লেন : তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য জামিন আছেন। দ্বিতীয়বার তাঁর জামিন গ্রাহ্য হবে না। না হয় তিনিই হতেন।

বাংলা একাডেমির বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক আহমদ হোসেন তখন চট্টগ্রাম কলেজে আমার সহকর্মী। আমার সমস্যার কথা শুনে তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে বল্লেন : আমিই হব।

ব্লাড্‌প্রেসারের ফলে চাকরি জীবনের শেষের দিকে আমি খুব কাবু হয়ে পড়েছিলাম— বড় রকমের কোন ক্লাসই নিতে পারতাম না। আমার ক্লাসগুলি স্বেচ্ছায় আহমদ হোসেন সাহেবই নিতেন। বিভাগীয় অধ্যক্ষের যাবতীয় ঝামেলাও তিনিই পোয়াতেন। আজ আমার ঋণের সমস্যাটাও তিনি এগিয়ে এসে সমাধান করে দিলেন। শেষের দিকে আহমদ হোসেনকে সহকর্মী হিসেবে না পেলে আমার পক্ষে পুরো মেয়াদ চাকরি করাই সম্ভব হত না। তখন ক্লাসে গিয়েও ক্লাসের প্রতি সুবিচার করতে পারতাম না— লজ্জায় মরে যেতাম। অনেকদিন এ অবস্থা থেকে আহমদ হোসেনই আমাকে উদ্ধার করেছেন।

আর একবার, সেও এ বাড়ি তৈরির ব্যাপারেই বোধ করি আমি খুব অর্থ সংকটে পড়েছিলাম। শুনে আহমদ হোসেন তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর অলঙ্কার বন্ধক দিয়ে আমাকে


www.pathagar.com

টাকা দিতে চেয়েছিলেন। সেদিন কিন্তু আমি অতখানি স্বার্থপর হতে পারি নি।

গৃহনির্মাণ করপোরেশনের ঋণ নিয়মমাফিক মাসে মাসে শোধ হচ্ছে— একদিন হয়তো সবটাই শোধ হয়ে যাবে কিন্তু এসব বন্ধুদের ঋণ কি কখনো শোধ হওয়ার?

যাই হোক কিছু পরের কথা আগে বলে নিলাম।

পুঁজির জোর ছিল না বলে আমি অংশ অংশ ভাবেই বাড়িটা তৈরি করছিলাম। সামনের অংশটা যখন ছাদ পর্যন্ত উঠেছে তখন খবর পেলাম আমাকে রাজশাহী কলেজে বদলী করা হচ্ছে প্রফেসারের পদে প্রমোশন দিয়ে। ফাইনেল অর্ডার হয়ে গেছে— চিঠি ইসুই বাকি। ভেবে দেখলাম চাটগাঁর বাইরে পদোন্নতিতে আমার কোন লাভ নেই— পনরো বিশ টাকা মাইনে বাড়লেও ঘর-ভাড়া লেগে যাবে ষাট সত্তর কি আরো বেশি। এখানে তো আমি নিজের বাড়িতেই থাকি। অর্ধ-সমাপ্ত বাড়ির দোহাই দিয়ে আপত্তি জানালাম ডি. পি. আই-র কাছে। তখন ডক্টর মমতাজ উদ্দীন ডি. পি. আই. আর খান বাহাদুর আবদুল হাকিম এ. ডি. পি. আই। আমার বদলীর ব্যাপারে ডি. পি. আই. নাছোড়বান্দা, তিনি নাকি বলে দিয়েছেন : ওকে আর চাটগাঁ রাখা হবে না, ও এখানে ওখানে সভা সমিতিতে শুধু বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ওর উপর অসন্তুষ্ট।

হাকিম সাহেব এর কিছুদিন আগে একবার চাটগাঁ সফরে এসেছিলেন। তিনি আমার অর্ধ-সমাপ্ত বাড়িটা দেখে গেছেন। তিনি সজ্জন আর আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। তিনি আমার বদলী সম্বন্ধে আপত্তি জানালেন কিন্তু ডি. পি. আই. তা শুনতে রাজি নন।

অগত্যা নিজে গিয়েই ডি. পি. আই-র সঙ্গে দেখা করে আমার অসুবিধার কথা জানালাম। মমতাজ সাহেব কিছুটা তোয়াজের সুরে বল্লেন : আপনি ভাল পড়ান, ভাল লেখেন, ভালো বলেন, আপনার কত প্রশংসা শুনি আমরা। দেশে তো যথেষ্ট সুনাম করেছেন এবার রাজশাহী গিয়ে সেখানেও কিছু নাম করুন না ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষে বল্লেন : আমার কোন হাত নেই, উপরওয়ালাদের কথা না শুনে তো পারা যায় না।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম দেশে।

দিন কাটতে লাগল উৎকণ্ঠায়। অর্ডারও আসে না— অর্ডারটা বাতিল হয়েছে তেমন কোন খবরও পাই না। এসব বদলী টদলীর অর্ডারগুলো সাধারণত এ. ডি. পি. আই-র সইতে ইসু হয়। একদিন শুনলাম ডি. পি. আই. যখন আমার বদলীর অর্ডারটা ইসু করে দেওয়ার জন্য খুব তাগাদা দিলেন তখন হাকিম সাহেব নাকি ডি. পি. আই-র মুখের উপরই বলে দিয়েছেন : আবুল ফজল আমার বন্ধু মানুষ, ওর অসুবিধার কথাটা আমার জানা, এ অবস্থায় ওর বদলীর অর্ডারে আমি সই করতে পারব না। দরকার মনে করেন আপনি নিজেই সই করে পাঠিয়ে দিন।

তখন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব জহুরুল ইসলাম। কথাটা আমি তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি, তিনি নাকি তখন ডি. পি. আই-র সামনে বসা ছিলেন।

যে কারণেই হোক বদলীর অর্ডার আমি আর জীবনে পাই নি। ডি. পি. আই-র পরেই এ. ডি. পি. আই-র স্থান। ডি. পি. আইকে অনেক ব্যাপারে এ. ডি. পি. আইর উপর নির্ভর করতে হয়। এসব ভেবেচিন্তেই বোধ করি ডি. পি. আই. নিজের সহকারীকে আর চটাতে চান নি।

খুব সম্ভব ১৯৫৬য় ইদ্রিস আলী সাহেব ঢাকা কি রাজশাহী বদলী হয়ে গেলেন। এবার


www.pathagar.com

আমাকে তাঁর জায়গায় করা হলো প্রফেসার। বলা বাহুল্য তখন মমতাজউদ্দীন সাহেব 'শিক্ষা উপদেষ্টা' হয়ে চলে গেছেন কেন্দ্রীয় সরকারে আর হাকিম সাহেব হয়েছেন ডি. পি. আই। ১৯৫৮'র ৩১ ডিসেম্বর আমি ঐ পদ তথা সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। অবশ্য অবসর নেওয়ার কথা ৩০শে জুন অর্থাৎ ছ'মাস আগে। আমার পঞ্চান্ন বছর পূর্ণ হয়েছে ঐ তারিখে। আমি কিছুটা বেশি বয়সে চাকরিতে ঢুকেছি তাই দেখা গেল ঠিক পঞ্চান্ন বছরে রিটায়ার করতে গেলে আমার চাকরি হয় চব্বিশ বছর ছ'মাস। ঐদিকে পঁচিশ বছর চাকরি না হলে হওয়া যায় না পুরো পেনশনের হকদার। তাই ছ'মাস এক্সটেনশন চেয়ে দরখাস্ত করতে হল। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন সিলেটের জনাব শামসুজ্জামান চৌধুরী, তিনিও জোর সুপারিশ করলেন আমার অনুকূলে। ডি. পি. আই হাকিম সাহেব এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল— তবুও তাঁকে চিঠি লিখে বিষয়টি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

তখন সামরিক শাসনের আমল। অফিসে অফিসে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক, বিশেষ করে উপর মহলে। স্ক্রিনের তালিকা তৈরি হয়ে গেছে, দু'একদিনের মধ্যেই হবে প্রকাশিত। কারো মুখে হাসি নেই, সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। স্ক্রিনের খড়্গ কার ঘাড়ের উপর পড়ে কে জানে! সবাই উৎকণ্ঠিত, অনেকের ঠোঁট যাচ্ছে বারে বারে শুকিয়ে।

এ সময় এক্সটেনশনের তদ্বির করতে একবার ঢাকা এলাম। অফিসে গিয়ে দেখা করলাম হাকিম সাহেবের সঙ্গে। তাঁকেও দেখাল অস্বাভাবিক গম্ভীর আর বিষণ্ন। অন্যদিনের মতো সামনে কোন ফাইল পড়ে নেই— যেখানে যা সই করার তা করে বিভিন্ন বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি গিয়ে বসতেই সংশ্লিষ্ট কেরানিকে ডেকে বলে দিলেন সব তৈরি করে এখনি আমার ফাইলটা নিয়ে আসতে।

আমার সামনেই আমার আবেদন মঞ্জুর করে অর্ডার দিয়ে দিলেন। আরো ছ'মাস চাকরি করে চাকরির মেয়াদ পঁচিশ বছর পূর্ণ করার অধিকার পেলাম।

পরদিন ভোরে কাগজ খুলেই চক্ষু চড়কগাছ। দেখলাম চির-ভদ্র, মার্জিত রুচি ও বন্ধুবৎসল খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের নামও রয়েছে স্ক্রিন-করা অফিসারদের নামের তালিকায়। আমার ফাইলের সইটিই বোধ করি ডি. পি. আই. হিসেবে হাকিম সাহেবের শেষ কাজ, হয়তো শেষ বন্ধুকৃত্যও। আশ্চর্য, আমাদের বন্ধু নাজির উদ্দীনও হয়েছেন স্ক্রিন— ডি. সি. ছিলেন, যখন স্ক্রিন হন তখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের স্পেসাল অফিসার। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে আমরা একসঙ্গে মুসলিম সাহিত্য সমাজ, আল-মামুন ক্লাব আর 'পর্দা-বিরোধী লীগ' করেছি, ভালো ছাত্র আর নির্মল চরিত্র বলে যার খ্যাতি ছিল তখন সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরা কোন রকম দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারে এদের বন্ধুরা তা কোন কালেই বিশ্বাস করবে না।

যাক ১৯৫৮-র ৩১ ডিসেম্বর পুরোনো বছরের সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরি জীবনও খতম হলো। নববর্ষের পয়লা (১৯৫৯) থেকে আমি পুরোপুরি স্বাধীন-রুটিন বাঁধা কাজ থেকে দায়মুক্ত চিরকালের জন্য। ধরতে গেলে খাঁটি অর্থে এখন থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের শুরু। তবে মনে যত সাধই থাক্ ছাপ্পান্ন বছর বয়সে সাধ্য তত থাকার কথা নয়। তার উপর তখন পর্যন্ত আমার ছেলে মেয়ে কারো লেখা পড়া শেষ হয়নি। কাজেই দুর্ভাবনা আর দায়িত্ব দুই-ই রয়ে গেছে সমানে মাথার উপর। এসব কারণে চাকরির জোয়াল মুক্ত হয়েও সাহিত্যের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে।


www.pathagar.com

## একচল্লিশ

১৯৫৪-র ২৩ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকার কার্জন হলে পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নামে এক বড় রকমের সম্মেলন হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও অনেক সাহিত্যিক এসেছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ, মনোজ বসু, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নরেন দেব, রাধারাণী দেবী প্রভৃতির নাম মনে পড়ছে। মূল সভাপতি ছিলেন ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, উদ্বোধন করেছিলেন ডাক্তার শহীদুল্লাহ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁন আর সম্পাদক ছিলেন আবদুল গনি হাজারী— আমাকে করা হয়েছিল কথা-সাহিত্য শাখার সভাপতি। আমার অভিভাষণটি পরে 'কথা-সাহিত্যের কথা' নামে আমার প্রবন্ধ গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য চাটগাঁ থেকে ছেলে আর মেয়ে মিলে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো একটা দল গিয়েছিলাম। ঢাকার পরে আমাদের দলই ছিল সব চেয়ে বড়। বিভিন্ন ধরনের গায়ক-গায়িকা, নৃত্যশিল্পী, কবিয়াল ছাড়া আমরা একটা পুরো নাটকের দলও নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে। ঐ সম্মেলনেই সর্বপ্রথম আমি একটা বড় রকম রোগের সূচনা অনুভব করতে পারলাম। অভিভাষণের মাঝখানেই আমার মাথা ঘুরতে লাগলো— বাকি অংশটার পড়া শেষ করতে হল বসে বসে। যাক্ এর বেশি আর গড়ালো না সেদিন।

সম্মেলন শেষে সদলবলে ফিরে এলাম চাটগাঁ। সঙ্গে সঙ্গে 'আজাদে' শুরু হল আমাদের উপর আর এক দফা আক্রমণ। আমার অভিভাষণের এক জায়গায় ছিল— 'আমার কাছে আরফাতের ময়দান থেকে পল্টনের মাঠ অধিকতর প্রত্যক্ষ।' আজাদ 'প্রত্যক্ষের' বদলে 'পবিত্র' বসিয়ে আমার উপর খুব চোটপাট চালিয়েছিল কয়েকদিন। বেশ কিছুকাল ধরে এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কাগজে কাগজে যথেষ্ট বাদানুবাদ, আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণ চলেছিল।

তখন গালের বাড়া গাল ছিল 'কমিউনিস্ট'। বিপক্ষদল আমাদের এ গাল দিয়েই মনের ঝাল মিটাত।

এর কয়েকমাস পরে এক মিলাদ মাহফিলে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আবার সে রোগ-লক্ষণ অনুভব করলাম— বক্তৃতা শুরু করলেই মাথা ঘুরতে থাকে। সেদিন কিছুই বলতে পারলাম না।

চরম সংকট দেখা দিল ১১ অক্টোবর (১৯৫৪)— এদিন রাত্রি এগারো কি সাড়ে এগারোর দিকে একটা স্ট্রোক হল তার সব লক্ষণ নিয়ে। মৃত্যুর যেন মুখোমুখী হলাম এবার— হতাশা জাগল জীবন সম্বন্ধে। দারুণ অস্বস্তিতে কাটলো রাতটা। সকালে ডাকা হলো অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জন রায় বাহাদুর কেশব সেনকে। তিনি আমার পুরোনো আলাপী আর থাকেনও কাছে। তিনি এসে ঘোষণা করলেন হাই ব্লাড্‌প্রেসার।

এবার মৃত্যুভয় যেন আরো বেশি করে পেয়ে বসলো। এর কিছুকাল আগে আমাদের এক আত্মীয় মারা গেছেন এ রোগে— স্ট্রোকের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সে কথা মনে করে আমিও আশু মৃত্যু সম্বন্ধে হয়ে পড়লাম স্থিরনিশ্চিত। রোগের চেয়েও ভবিষ্যৎ কল্পনা করে আমি আরো বেশি দিশেহারা। বড় ছেলেটি সবে মাত্র আই. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে, আরগুলি সব ছোট, কনিষ্ঠতমটি তো এখনো জন্মায়ও নি— মাতৃউদরে। বড় ছেলেটি



www.pathagar.com

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় রোজই আমার ভয় হত— ওর বুঝি আজকের পেপারটা দেওয়া হবে না, হয়তো পরীক্ষার হলেই খবর যাবে...।

আরো ভয় পাইয়ে দিলেন ডাক্তার আবদুল জব্বার। এ রোগের সময় অনেক ডাক্তারই আমাকে দেখেছেন— একদিন তাঁকেও ডেকে আনা হল। আমাকে দেখে গম্ভীর মুখে বিদায় নিলেন— ফি নিলেন না। ১৫ তারিখ অর্থাৎ স্ট্রোকের চারদিন পরে আমার শ্বশুর এসে বিষণ্ন মুখে বল্লেন : কাল বিকালে ডাক্তার আবদুল জব্বারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বলেছেন— তুমি যেন তোমার দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ যা করার করে ফেলো আর যদি কিছু বলার থাকে তাও যেন এখনি বলে নাও...।

ডাক্তারের মুখ থেকে এমন কথা শুনলে কারো কি ধড়ে প্রাণ থাকার কথা? বেদনার্ত মুখে আমার শ্বশুর তো উঠে চলে গেলেন। মনে হল এ মুহূর্তেই বুঝি আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়বে। নিজের মৃত্যুর জন্য নিজেই কাঁদলাম, এমন সুযোগ কেউ বড় একটা পায় না। চোখের জল মুছতে মুছতে স্ত্রী আর বড় ছেলেকে সম্বোধন করে দু'খানা চিঠি লিখে ড্রয়ারে রেখে দিলাম। অত্যন্ত ব্যক্তিগত আর খুব আবেগী মুহূর্তে লেখা চিঠি। তাই এখানে উদ্ধৃত হলো না।

অবধারিত মৃত্যুর সামনেও মানুষ চিকিৎসা চালিয়ে যায়। আমারও চিকিৎসা চলতে লাগলো— কেশব বাবুই করতে লাগলেন। তিনি গোঁড়া প্রাতঃভ্রমণকারী— ঝড় বাদল তুফান সব তুচ্ছ করে রুটিন মতো সব ঋতুতে একই সময় তিনি বের হন বেড়াতে। আমার বাসস্থান তাঁর ভ্রমণ এলাকায়। রোজ সকালে তিনি একবার করে এসে আমাকে দেখে যেতেন, দিতেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ।

রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে 'রচনা লেখার হাতে খড়ি' নামে ছোটদের উপযোগী একটা ছোট বই লিখেছিলাম। ওটা বিক্রি করে হাজার খানেক টাকা পেয়েছিলাম— তা দিয়েই চল্লো চিকিৎসা। স্ত্রী করতে লাগলো প্রাণপণ সেবা। উপরে তখন পানি ছিল না— বালতি ভরে ওকেই নিয়ে আসতে হতো নিচের টিউবওয়েল থেকে পানি। তাতে চলতো আমার মাথা ধোওয়া আর গোসল ইত্যাদি। স্ট্রোকের ফলে পা দু'খানি প্রায় অচল— দিনরাত তাতে মালিস করতে হতো ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ আর তেল-ঘি-নুন-মরিচ না দিয়ে করতে হতো আলাদা রান্না। নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ ছিল না ওর। এভাবে চল্লো অনেকদিন। মৃত্যুর দুয়ার থেকেও অনেক সময় মানুষ ফিরে আসে— মনে হল আমিও যেন এবারকার মতো ফেরৎ টিকেট পেলাম। ধীরে ধীরে ফিরে এলো জীবনের উপর আস্থা। মনে হল এক অজ্ঞাত উৎস থেকে এক করুণাধারা যেন সর্বত্র প্রবাহিত হয়ে চলেছে— প্রচলিত কোন নামেই যার প্রকাশ সম্ভব নয়। তারই স্পর্শে যেন ঘটলো আমার পুনর্জন্ম।

চট্টগ্রামের বইঘর আমার 'রাঙ্গাপ্রভাত' নামক উপন্যাসটি প্রকাশ করল ১৯৫৭'য়। বইটির প্রথম কয়েক অধ্যায় লেখা হয়েছিল পাকিস্তান হওয়ার অনেক আগে আর তা 'জীবন তীর্থ' নামে ছাপা হয়েছিল হাবীবউল্লাহ বাহার আর শামসুন্নাহার সম্পাদিত 'বুলবুলে'। তারো আগে কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'জয়তী'তে 'মরাতারা' নামে আমি একটি উপন্যাসের তিন কিস্তি প্রকাশ করেছিলাম। এ দুই পত্রিকা অকালে বন্ধ হয়ে যায় আর আমার এ অসমাপ্ত লেখা দুটি সে অবস্থায় পড়ে থাকে দীর্ঘকাল। তারপর তো যথাসময়ে দেশ স্বাধীন হল— কায়েম হল পাকিস্তান।


www.pathagar.com

'মাহেনও' সরকারি পত্রিকা। কোনকালেই আমি সরকারি কোন পত্রিকায় লেখার তেমন তাগাদা বোধ করি নি (পরে অবশ্য অনুরুদ্ধ হয়ে অনেক সরকারি কাগজে অনেক লেখা আমাকে লিখতে হয়েছে) তাই পাঁচ ছয় বছর পর্যন্ত 'মাহেনও'-এ আমি কোন লেখা পাঠাইনি। হঠাৎ এ সময় 'মাহেনও'র তখনকার সহকারী সম্পাদক আলী আহমদ সাহেব আমাকে পত্র মারফৎ অনুরোধ জানালেন— আমরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব লেখকেরই লেখা ছেপেছি কিন্তু এযাবত আপনার কাছ থেকে কোন লেখা পাই নি। যেকোন লেখা পেলে আমরা খুশি হবো।

তখন আমার হাতে অন্য কোন লেখাই ছিল না। তাই উত্তরে আমি তাঁকে আমার এ অসমাপ্ত উপন্যাসটার কথাই জানালাম, বল্লাম যদি চান এটা ছাপাতে পারেন তবে কোন রকম রদবদল করা চলবে না। তিনি তাতেই রাজি। এবার 'মরাতারা' আর 'জীবন তীর্থ' দুই মিলে নাম নিলো 'রাঙ্গা প্রভাত'। এর আগে (পরেও বোধ করি) 'মাহেনও'-এ ধারাবাহিক কোন উপন্যাস ছাপা হয়নি। বলা বাহুল্য তখনো আবদুল কাদির 'মাহেনও'র সম্পাদক হয়ে আসেননি।

উক্ত উপন্যাসের নায়ক কামালের দাদুর মৃত্যুর পর ঘটনাস্রোত যখন স্বাদেশিকতার দিকে মোড় নিলো তখন বুঝতে পারলাম এ লেখা আর 'মাহেনও'-এ চলবে না। অনর্থক ওঁদের সমালোচনার সম্মুখীন করে লাভ নেই। নিজে থেকেই তখন আমি লেখাটা বন্ধ করে দিলাম। ওঁরাও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তত দিনে অবশ্য কাদির এসে সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এবার বাকি অংশটা '৫৫-'৫৬য় লিখে শেষ করলাম। ইচ্ছা ছিল এ বইটার আরো খণ্ড লেখার— এখনো মনের কোণে সে ইচ্ছাটা যে উঁকি দেয় না তা নয়। তবে প্রবন্ধের হামলায় তা আজো হয়ে ওঠে নি। তার উপর আছে বয়সের ভার।

যাই হোক বইটা প্রকাশের পর অনেকে বইটার তারিফ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তা অনার্সে পাঠ্যও হল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন কলেজে যাঁরা বইটি পড়াতেন তেমন অধ্যাপকদের কেউ কেউ বইটার প্রশংসা করে আমাকে চিঠিও লিখেছেন। বইটা পড়ে মনে হয় সব চেয়ে খুশি হয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ।

তিনি ১৩. ১৩. ৫৭ তারিখে আমাকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লেখেন :

'আপনার রাঙ্গাপ্রভাত' এই মাত্র শেষ করলাম। পড়ে খুশি হয়েছি। নানক কবীরকে দেখে বলেছিলেন : একখানা চ্যালা পুড়ে শেষ হবার আগে আর একখানা চ্যালায় আগুন ধরেছে দেখে তিনি খুশি হয়েছেন। আমিও তেমনি খুশি হয়েছি। অবশ্য আগুনের অভাব কোনদিন আপনার ভিতর ছিল না। কিন্তু এইবার যে আভা নিয়ে জ্বলে উঠেছে তা দেখে খুশি হওয়া যায়। এটি একটি সার্থক উপন্যাস হয়েছে— এর সব চরিত্রই সুষ্ঠু ও মানবিক হয়েছে। পরিবেশ সুন্দর ফুটে উঠেছে আর বিশেষ দীপ্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে এর লেখকের হৃদয় বল। দেশ বিভাগের ফলে মানবতার যে লাঞ্ছনা ঘটে সেই লাঞ্ছনায় একান্ত ব্যথিত কিন্তু অপরাজিত সেই হৃদয় বল। মুসলিম সাহিত্য সমাজে যে আলো জ্বলেছিল দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে তা সৈয়দ মোতাহার হোসেনের আর আপনার সাহিত্য রচনায় এতখানি সার্থকতা লাভ করলো— এ ঘটনা অর্থপূর্ণ। দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে আমার আশালতায় আর এক


www.pathagar.com

পোঁচ সবুজের ছোঁওয়া লাগলো। মনে হচ্ছে আমরা বাঁচব— যে সমাজে, যে দেশে আমরা জন্মেছি সে সমাজ সে দেশ বাঁচবে। আমার প্রীতি আলিঙ্গন গ্রহণ করুন।...শরীরের যত্ন নিন। আরো অন্তত বিশ বৎসর অক্লান্তভাবে সাহিত্য সাধনা করে যাওয়া চাই।'

১৯৫৮র অক্টোবরে দেশের উপর নেমে এলো সামরিক শাসন। বেসামরিক সব ক্ষমতা ন্যস্ত হলো গভর্নরের হাতে— মন্ত্রিসভা আর আইন পরিষদ ইত্যাদি সব বাতিল। এ প্রদেশে গভর্নর নিযুক্ত হলেন পুলিশের এক প্রাক্তন আই. জি. মিঃ জাকির হোসেন। সামরিক শাসন জারির অনেক আগে আমি 'সাহিত্যের সংকট' নামে এক প্রবন্ধ লিখে ছাপতে পাঠিয়েছিলাম 'সমকাল' নামক মাসিকে। লেখাটি ছাপা হয়ে বেরুল সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর— উক্ত কাগজের ১৩৬৫র মাঘ সংখ্যায়। কিছুকাল পরে হঠাৎ কাগজে দেখা গেলো সরকার সমকালের ঐ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করেছে। কেন, কোন্ লেখার জন্য ঘোষণায় তার কোন উল্লেখ নেই। তবে সবাই বুঝলো আমার লেখাটাই টার্গেট। স্বয়ং সম্পাদকও আমাকে তাই জানালেন।

বলেছি ১৯৫৯-এর ১ জানুয়ারি থেকে আমি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। সব রেকর্ডপত্র মিলিয়ে দেখে পেনসন মঞ্জুর হতে স্বভাবতই সময় লাগে। আমার বেলায়ও সে কারণেই দেরি হচ্ছিল। এদিকে কিন্তু গুজব রটে গেছে সরকার আমার পেনসন আটক করেছে— আমাকে পেনসন দেওয়া হবে না ইত্যাদি। গুজবটা ঢাকাতেই ছড়িয়েছিল সব চেয়ে বেশি। বন্ধুরা আমার জন্য উৎকণ্ঠিত। সামরিক শাসনের আমল সর্বত্র একটা চুপ চুপ আর থমথমে ভাব।

পেনসন বন্ধ করার কথাটা যে স্রেফ গুজব এ আমি জানতাম। পেনসন যেখানে চূড়ান্ত রূপ নেয় অর্থাৎ এ. জি. অফিসে আমার অনেক ছাত্র— সে রকম কিছু একটা আশঙ্কা দেখা দিলে আমি খবর পেতাম। লেখার ব্যাপারে আমি সব সময় ভেতরে ভেতরে কিছুটা বেপরওয়া। লেখার জন্য মূল্য দিতে হয় দেব— আগাগোড়া এ ছিল আমার মনোভাব।

এ সময় 'উত্তরণ' নামেও একটি প্রগতিশীল মাসিক বেরিয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন এনামুল হক নামে এক তরুণ ছাত্র (বর্তমানে ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটার)— ঐ পত্রিকার ১৩৬৬-এর ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় 'শিল্পীর স্বাধীনতা' নামে আমার একটি কড়া প্রবন্ধ ছাপা হয়। সে প্রবন্ধ পড়ে কাজী আবদুল ওদুদ লিখে জানালেন :

আপনার লেখাটি পড়েছি। চমৎকার হয়েছে— আগাগোড়া যুক্তিতে ও নজিরে ঠাসা আর ব্যঞ্জনায় দীপ্ত। "পোষা বাঘ যেমন পুরোপুরি বাঘ নয়, তেমনি পোষা শিল্পীও খাঁটি শিল্পী নয়"— বহুদিন মনে থাকবে এ লাইনটি। ১৫. ১০. ৫৯।

এদিকে আবার বন্ধুরা আমার জন্য ভেবে অস্থির। সামরিক শাসনের ভরা জোয়ার— ভয় ভাবনায় সারা দেশের এক মুমূর্ষু অবস্থা। এ প্রবন্ধ বের হওয়ার পর ব্যস্তসমস্ত হয়ে অধ্যাপক আহমদ শরিফ লিখে পাঠালেন : 'আপনি দেশের উঁচু স্তরের বুদ্ধিজীবীদের মনের কথাই বলেছেন। কিন্তু এসব কথা বলা বা লেখায় আইনের বাধা দুস্তর। এ বয়সে সে দায় আপনার দেহ-মনের অনুকূল নয়। কথায় বলে 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার' (ভারতচন্দ্র)। আমাদের তো তার চাইতেও জঘন্য অবস্থা। জানি, বক্তব্য প্রকাশের একটা বেদনা-মধুর আকুতি রয়েছে। আপনি আপনার বক্তব্য লিখে রাখুন কিন্তু কাগজে দেবেন


www.pathagar.com

না। উত্তর পুরুষ বা ভাবী কাল আমাদের ভাব-ভাবনার বিচার করবে। তারা উপলব্ধি করবে আমরা পাথুরে প্রতিমা নই, বুদ্ধি আমাদেরও ছিল, অনুভব করবার মতো একখানা হৃদয়ও ছিল।' ১৮. ১০. ৫৯।

তবুও চট্টগ্রামের ছাত্র আর বুদ্ধিজীবীরা মিলে ১৯৫৯-এর ২২ নভেম্বর— আমার চাকরি-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে আমাকে বড় রকমের এক সংবর্ধনা জানালেন। সভাপতিত্ব করলেন ঢাকা থেকে এসে ডক্টর মুহাম্মদ এনামুলক হক— অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তা ছিলেন আমার পুরোনো বন্ধু অধ্যক্ষ আবদুল সোবহান খান চৌধুরী। আমার লেখা সম্বন্ধে আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, শামসুন্নাহার মাহমুদ, অধ্যাপক আহমদ শরিফ, খান মঈনউদ্দীন, জনাব আবদুল মওদুদ প্রভৃতি অনেকে। আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের অনেকে পাঠিয়েছিলেন বাণী আর কবিতা। এসব দিয়ে কমিটি একটি চমৎকার স্মরণিকাও করেছিলেন প্রকাশ। এ স্মরণিকা পেয়ে কাজী আবদুল ওদুদ লিখে পাঠালেন : 'আপনার চিঠি ও স্মরণিকা খানি পেলুম। পড়ে ভালো লাগলো, কেননা, সবাই খুব আন্তরিকতা দিয়ে লিখেছেন। এটি আনন্দ সংবাদ। আপনার ছবিটিও ভালো উঠেছে বিশেষ করে চোখ দুটি।...আপনার প্রতি এ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শুধু ব্যক্তির প্রতিই নয়, একটি বীর্য্যবন্ত ও আনন্দময় আদর্শের প্রতি, এইটেই বড় কথা আর খুব অর্থপূর্ণ।...যাক একটি আনন্দময় অনুষ্ঠান হলো। কিন্তু আমি বেশি করে ভাবছি এর অর্থপূর্ণতারই কথা। বোঝা যাচ্ছে ধীরে ধীরে সমাজ এগুচ্ছে— ঠিক স্থবির হয়ে নেই, শরীরটা ভালো রাখুন আর লিখে যান। বুঝতে পারছেন যে পথে আপনি দাঁড়িয়েছেন তা সার্থকতার পথ। আলাউদ্দীন আল আজাদের একটি কথা বেশ ভালো হয়েছে— "আমাদের সংস্কৃতির বিবেকীধারা।" ৩. ১২. ৫৯।

## বিয়াল্লিশ

এদিকে আমার প্রতি বন্ধু আর অনুরাগীদের প্রীতি-শ্রদ্ধা যেমন বেড়ে যাচ্ছিল তেমনি আর একটি ক্ষুদ্র উপদল আমার প্রতি হয়ে উঠেছিল কিছুটা ঈর্ষান্বিত। ঢাকায় এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত এক বন্ধু আমার কিঞ্চিৎ উপকার করতে বা আমাকে কিছুটা স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন বোধ করি। তাঁর দুঃখ আর অসহায়তার কথা তাঁর চিঠিতেই প্রকাশ— একটা দুষ্টগ্রহ যে আমার পেছনে লেগেছে এ প্রথম পেলাম তার আভাস : ".....অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখিতেছি যে, আপনার গ্রহদোষ এখনো কাটে নাই।...চাকরি দিতে পারিলাম না, — শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক হিসেবে Co-opt করিতে চেষ্টা করিয়াও ভোটে পরাজিত হইলাম। আপনাকে কাউন্সিলের (মন্ত্রণা-সভার) সভ্যও করিতে পারিলাম না। আমার জীবনে ইহা একটি বড় আক্ষেপ। স্পষ্টই দেখিতেছি reactionary বা প্রতিক্রিয়াশীলরাই শেষ পর্যন্ত...সর্বনাশ সাধন করিবে।" ২৫. ৮. ৫৮।

বন্ধুটি এখনো কর্মরত তাই নাম প্রকাশ করা গেল না।

ঈর্ষা দীর্ঘজীবী। প্রতিক্রিয়াশীলদের ঈর্ষা পরেও আমাকে অনুসরণ করেছে— বারে বারে চেষ্টা হয়েছে আমার ক্ষতি সাধনের।

আরবিতে একটি প্রবাদ আছে যার বাংলা অনুবাদ : 'কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে যে থেমে পড়ে তার পক্ষে পথ চলা বা গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।' সাহিত্যে শিল্পে গন্তব্যে


www.pathagar.com

পৌঁছানো কথাটা অর্থহীন, চলাটাই বড় কথা। আমি মাঝপথে থেমে পড়ি নি আমার দিক দিয়ে এটিই সান্ত্বনা। সীমিত শক্তি আর তার চেয়েও সীমিত প্রস্তুতি নিয়ে আমি আমার পথ ধরে চলতে চেষ্টা করেছি। এ পথ চলার ফলে আমি আশাতিরিক্তভাবে পুরস্কৃতও হয়েছি— আমার সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে ১৯৬২ সনে বাংলা একাডেমি পুরস্কার আর ১৯৬৩ সনে প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড। এসবই আমার জন্য অপ্রত্যাশিত— কারণ সাহিত্য ব্যাপারে আমি কখনো মনের সঙ্গে আপস করে কথা বলিনি, বলিনি সরকার বা কোন সংস্থার মুখ চেয়ে। বরং আমার লেখা বিশেষের জন্য একটি সাময়িকীর একটি সংখ্যাই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। এসব খবর কারো অজানা নয়। এতে বুঝতে পারা যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আর সরকারি ভেতর মহলেও এমন কিছু যোগ্য আর গুণগ্রাহী লোক আছেন যাঁরা নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্য-শিল্পের বিচার করতে সক্ষম।

যে ঈর্ষাটা আমাকে অকারণে অনুসরণ করছে তার একটা বিস্ফোরণ দেখা গেল ১৯৬৩র, ৭ ডিসেম্বরের 'আজাদে'। জনৈক লেখক 'জাতীয় আদর্শের বিরোধিতা : রাঙ্গাপ্রভাত' এ নামে এক প্রবন্ধ লিখে আমাকে পাকিস্তান বিরোধী, ইসলাম বিরোধী ইত্যাকার বিশেষণে ভূষিত করে জিজ্ঞাসা করেছেন— এমন লোককে কি করে বাংলা একাডেমি পুরস্কার আর প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড দেওয়া যায়? আমার উক্ত নামের বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৭য়, বইটি বছর ছয় ধরে রাজশাহীতে পাঠ্য ছিল, পাঠ্য বই তন্ন তন্ন করে ক্লাসে পড়ানো হয় বিশেষ করে অনার্স ক্লাসে। বইটিতে ধর্ম বা জাতীয় আদর্শের বরখেলাপ কোন কথা থাকলে তা ছাত্র-অধ্যাপক কারো চোখে না পড়ার কথা নয়। তবুও বইটির বিরুদ্ধে কোন মহল থেকেই কোন আপত্তি এ দীর্ঘ ছয় বছরে শোনা যায় নি (শোনা যে যায় নি তার লিখিত দলিল অর্থাৎ বিভাগীয় অধ্যক্ষের চিঠি আমার হাতে আছে) আর এখন বইটি প্রকাশের সাত বছর পরে হঠাৎ কি-না আবিষ্কৃত হলো বইটি জাতীয় আদর্শের বিরোধী!

এ আবিষ্কার যে উদ্দেশ্যমূলক আর উক্ত গ্রন্থের লেখকের কিছু ক্ষতিসাধন করে কিঞ্চিৎ আত্মতৃপ্তি লাভ, তার প্রমাণ অচিরে পাওয়া গেল। কে বা কারা আজাদে প্রকাশিত প্রবন্ধটির কর্তৃকা (কাটিংস্) প্রদেশের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে রাউয়ালপিণ্ডি প্রেসিডেন্ট দফতর পর্যন্ত সর্বত্র পাঠিয়েছিলেন। কাজেই জাতীয় আদর্শ রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে যে ঐ প্রবন্ধটি লেখা হয় নি তা বুঝতে কারো আর বাকি রইল না।

একটি নতুন কেনা 'রাঙ্গাপ্রভাত' বাংলা একাডেমিকে পাঠিয়ে স্বরাষ্ট্র বিভাগ এ সম্পর্কে একাডেমি কর্তৃপক্ষের মতামতও নাকি জানতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কি মতামত দিয়েছিলেন তা আমার অজ্ঞাত। তবে এ নিয়ে সরকারি ঊর্ধ্বতন মহলে কিছুকাল ধরে খুব যে তোলপাড় চলেছিল তা বুঝতে পারা যায়।

চায়ের পেয়ালায় এ তুফান তোলার ফলে আমার লাভ লোকসান দুই-ই হল। লাভের কোঠায় দেখা গেল বইটার বিক্রি বেড়ে গেছে, শিগ্‌গীরই বের করতে হল নতুন সংস্করণ। আর ক্ষতির বেলায় দেখা গেল পরের বছর থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা থেকে বইটি বাদ পড়েছে।

প্রদেশের দিক থেকে ক্ষতিটা আরো বেশি হলো। পর বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৪তে উর্দুর জন্য দেওয়া হল অথচ বাংলার জন্য কাকেও দেওয়া হলো না প্রেসিডেন্ট সাহিত্য পুরস্কার। ওয়াকিবহালদের মুখে শুনেছি— প্রেসিডেন্ট নাকি বলেছেন পূর্ব পাকিস্তানি কাকেও পুরস্কার


www.pathagar.com

দেওয়া হলে ওখানকার অনেকে তার পেছনে ওঠে পড়ে লাগে। অতএব এবার ওখানকার কাকেও সাহিত্য-এওয়ার্ড দেওয়া হবে না। একেই বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ!

আমাদের দেশে স্রেফ সাহিত্য করায়ও কত বিপদ আর কত ঝামেলা এ তার এক নজির। এ অবস্থায় মনের ভেতর যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়েছিল তাই ফেটে পড়েছে 'মানবতন্ত্র' নামক প্রবন্ধে।

গত ১০। ১। ৬৫ তারিখে ঢাকা থেকে ফিরে এসে আমার এক প্রাক্তন ছাত্র বল্লে : ঢাকায় অমুক....সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আপনাকে এ খবরটুকু বলতে বলেছেন : আপনার অনেক শত্রু, তাই তিনি আপনার জন্য কিছু বলতে পারেন নি।

: তার মানে?

ছাত্রটি বল্লে : তিনি এর বেশি আর কিছুই খুলে বলেন নি।

শুনে খুব অবাক হলাম। আমি তো এর মধ্যে তাঁকে আমার জন্য কিছু করতে বলিনি— দিই নি কোথাও কোন দরখাস্তও। এমন কি গত কয়েক মাস ধরে তাঁর সঙ্গে আমার নেই পত্রালাপও।

আর আমি থাকি চাটগাঁয়, ঢাকায় আমার শত্রু থাকার তো কথা নয়।

পরে অবশ্য ব্যাপারটি আগাগোড়া শুনেছিলাম : কোন একটি অসমাপ্ত সাহিত্য-কর্মের জন্য আমার নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। কাজটি করে দিতে পারলে আমার কয়েক হাজার টাকা প্রাপ্তি ঘটতো। জনৈক প্রবীণ সদস্যের বিরোধিতার ফলে তা হয়নি। সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অপ্রবীণ ও অখ্যাত জনকেও তিনি ঐ কাজ দিতে রাজি কিন্তু আমাকে নয়।

অনেক বছর আগে কি এক সাহিত্য ব্যাপার নিয়ে সংবাদপত্রে তাঁর সঙ্গে আমার কিছু বাদানুবাদ হয়েছিল। স্বভাবতই এসব ব্যাপারে আমার ভাষা আর ভংগীটা কিছু কড়া আর তির্যক হয়ে ওঠে। তাঁর ব্যাপারেও হয়তো তা হয়েছিল। এ ব্যাপারটি তিনি ভুলতে পারেন নি। একবার কোন এক বৈঠকে তিনি নাকি এমন মন্তব্যও করেছেন : আমি বেঁচে থাকতে আবুল ফজলকে আমি কিছুই পেতে দেব না!

শুনে শুধু মনে মনে নয় প্রকাশ্যেও আমি হেসেছি। দেখেছি ঈর্ষা-প্রতিহিংসার ব্যাপারে তরুণে-প্রবীণে, পণ্ডিতে-মূর্খে, কোন ভেদ নেই, এক্ষেত্রে কাঁচা আর পাকা, পণ্ডিত আর মূর্খ ভাই ভাই! কবির কথা মিথ্যা নয় : 'ক্ষুদ্র ঈর্ষা বিষময়ী ভুজঙ্গিনী'।

১৯৩৭-এ আমি যখন খুলনা ছেড়ে আসি তখন আমার বিদায় সভায় এক সহকর্মী আমাকে 'অজাতশত্রু' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন আজ তার আটাশ বছর পরে এ প্রবীণ বয়সে এক বন্ধু বলে পাঠিয়েছেন— 'আমার অনেক শত্রু'!

ক্ষুদ্রতা আর মহত্ত্বের প্রকাশ যেখানে যেভাবেই ঘটুক ইতিহাস তা টুকে রাখে— ইতিহাসের পাতা থেকে কিছুই হারায় না।

জীবনের এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যতিক্রমে সাময়িকভাবে বিচলিত হলেও আমি কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নি— কৌতুকবোধ করেছি আর স্মরণ করেছি উপরে উদ্ধৃত আরবির প্রবাদ বাক্যটি।

তবে এহ্ বাহ্য— তার চেয়েও বড় কথা আমি পরিচিত অপরিচিত অনেকের এত বেশি অযাচিত বন্ধুত্ব আর প্রীতি ভালোবাসা পেয়েছি যে নিক্তির ওজনে তার পাল্লাটা অনেক বেশি ভারী। জন কয়েকের তুচ্ছ ঈর্ষা তার কাছে সমুদ্রে বিন্দুর মতো।


www.pathagar.com

## তেতাল্লিশ

১৯৬২-এর ২৪, ২৫, ২৬ মার্চ ঢাকায় বাংলা আর উর্দু সাহিত্যের উপর একটি সেমিনার— বাংলা একাডেমি আর জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর যুক্ত ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেমিনার উদ্বোধন করেছিলেন গভর্নর আজম খাঁ। আমন্ত্রিত হয়ে এ সেমিনারে সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমিও একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। ২৬ সেমিনার শেষ হয়ে যাবে, ২৭ গ্রীন এরোতে আমি চাটগাঁ ফিরে আসব এ ছিল আমার সংকল্প। শেষ দিন হঠাৎ বহুকাল পরে তরুণ সাহিত্যিক আলাউদ্দীন আল আজাদের সঙ্গে সেমিনারেই দেখা।

কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন : সরকারি কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য পাব্লিক সার্ভিস কমিশন তাঁকে প্রথম নমিনেশন দিয়েছে কিন্তু সরকার গড়িমসি করে আজো নিয়োগপত্রটা ইসু করছে না।

সরকারি গড়িমসির এক কারণ বোধ করি— এর কিছু আগে তাঁকে নিরাপত্তা আইনে ছ'মাসের জন্য আটক রাখা হয়েছিল।

আজাদ জানালেন : আত্মসম্মান বজায় রেখে তাঁর পক্ষে জগন্নাথ কলেজে তাঁর সাবেক চাকরিতে ফিরে যাওয়াও এখন সম্ভব নয়। ফিরে যেতে হলে কিছু অসম্মানজনক শর্ত মেনে নিতে হয়। জীবিকা তথা স্রেফ দু'বেলা অন্নের জন্য এমন একজন প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীকে আত্মসম্মান খোয়াতে হবে! শুনে মনটা বিচলিত হয়ে উঠল। আজাদ একাধারে কৃতী ছাত্র, কৃতী অধ্যাপক আর কৃতী সাহিত্যিক। সাহিত্যের এক বড় কাজ তো মানুষের মনে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলা। এ কাজে আত্মনিবিষ্ট এমন একজনকে আজ আত্মসম্মান হারাতে হচ্ছে শুধু জীবিকার খাতিরে। দু'দিন আগে এ সেমিনারে আমি নিজেও তো অনেক বড় বড় কথা বলেছি। আত্মমর্যাদার চেয়ে সাহিত্যের বড় ঐতিহ্য আর কি? এ ধরনের এলোমেলো চিন্তায় মনটা আলোড়িত হতে লাগল।

আজাদের দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়েছে, অনুমতি দেওয়া হয়েছে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে— সে প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান দখল করেছেন। দেশের প্রচলিত কোন আইন ভঙ্গের জন্যও তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় নি, হাজির করা হয় নি কোন বিচারকের সামনে, দণ্ডিতও হন নি কোন অপরাধে। তবুও তাঁর নিয়োগে এ গড়িমসি কেন? বল্লাম : পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে আমার কিছু জানাশোনা আছে। তাঁকে একবার বলে দেখতে পারি তিনি কিছু সাহায্য করতে পারেন কি-না!

পরদিন বাংলা একাডেমির সম্পাদক আহমদ হোসেন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আমি চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা করলাম। অন্য আলাপ আলোচনার পর আজাদের কথাটা তুল্লাম।

তিনি বল্লেন : আমরা শুধু নির্বাচনের মালিক, নিয়োগের ভার সরকারের হাতে। আমরা প্রার্থীদের মধ্যে ওঁকে যোগ্যতম পেয়েছি তাই ওঁকে দিয়েছি প্রথম নমিনেশন। আমাদের তো আর কিছু করার নেই। আপনারা সরকারে খোঁজ নিন।

তাই তো।



www.pathagar.com

তাঁর সঙ্গে আলাপ সেরে বাসায় ফিরতে ফিরতে গ্রীনএরোর সময় পার হয়ে গেল। কাজেই ঐদিন ঢাকায় থেকে যেতে হলো। রাত্রির সফর আমার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় বলে রাত্রে ট্রেন ভ্রমণ আমি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলি।

সাধারণত যখনই আমি ঢাকায় যাই কবি আবদুল কাদিরের বাসায় উঠে থাকি এবার কিন্তু উঠেছিলাম ঢাকা টিচারস্ ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শামসুল হুদার ধানমণ্ডী লেকের পাড়ের বাসায়। হুদা আর হুদা-পত্নী বুলি ওর্ফে জেবুন্নিসা আমার দীর্ঘ দিনের আলাপী। বুলি কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের একমাত্র মেয়ে ছোটকাল থেকেই আমার চেনা। আগে থেকেই ওরা অনুরোধ জানিয়েছিল এবার যেন আমি ওদের ওখানেই উঠি।

সন্ধ্যায় হুদাকে বল্লাম : এদিকে কোথায় কবি সুফিয়া কামালেরা নাকি বাড়ি করেছেন, দেখা হলে প্রায় বলেন : আমরা ছোটখাটো একটা বাড়ি করেছি আপনি তো একবারও দেখতে এলেন না।

হুদা বল্লে : এ তো কাছেই ওঁদের বাড়ি, অন্ধকারেও বোধ করি খুঁজে নিতে পারব, খেয়ে দেয়ে চলুন ঘুরে আসব।

কাজেই সুফিয়া কামালদের বাড়ি পৌঁছতে কিছুটা রাত হলো। গল্প গুজবে কেটে গেল আরো অনেকক্ষণ ফেরার পথে পাওয়া গেল না রিক্সা কি বেবি টেক্সি। একটা স্টেট্ বাস ফিরে যাচ্ছিল ডিপোতে। অগত্যা তাতেই উঠতে হলো। হুদাদের বাসার সামনে দিয়েই বাস-রাস্তা। বাসটা ওদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই কে একজন হঠাৎ বলে উঠল আমরা এসে গেছি। হুদা বসেছিল আমার থেকে কয়েক সীট্ পেছনে। 'এসে গেছি' শুনেই আমি উঠে বাসের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কণ্ডাক্টার বা অন্য কেউই কিছু বল্লেনা হুদাও বোধ করি লক্ষ্য করেনি। নির্মীয়মান রাস্তা তখনো লাইট বসেনি, বাইরে অন্ধকার, হয়তো কিছুটা আনমনা ছিলাম, ঠাহর হলো না গাড়ির গতি। পা বাড়াতেই আমি ছিঁটকে হুঁচট খেতে খেতে বাস থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে গেলাম। কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলাম জোরে।

সবাই হৈ হৈ করে উঠল, ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি থেমে পড়ল। হুদা লাফ দিয়ে এসে আমাকে ধরল। আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। বড় রকমের কিছু ঘটেছে বলে তখনো আমার মনে হয় নি। পায়ের সেন্ডেল জোড়া নিকটেই খুঁজে পেলাম। চশমাটাও পাওয়া গেল তবে একটা কাঁচ নিখোঁজ। দেখা গেল পাঞ্জাবির এখানে ওখানে সামান্য সামান্য রক্তের দাগ। হুদার কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেই ওদের বাসায় এলাম। বিছানায় বসতেই শুরু হলো ডান কাঁধে অসহ্য যন্ত্রনা— ডান হাত নাড়াতে চাই নাড়াতে পারি না, কিছু ধরতে চাই ধরতে পারি না। বুলি ব্যান্ডেজের কাপড় খুঁজে পেতে বের করে তা দিয়ে ডান হাতটা বেঁধে ঝুঁলিয়ে দিলে গলার সঙ্গে।

এবার ওদের সন্দেহ হলো কিছু একটা অঘটন ঘটেছে, হয়তো ফ্রেক্সার হয়েছে, অতএব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানো দরকার। অনেক খোঁজাখুঁজি করে হুদা কোথা থেকে নিয়ে এলো এক স্কুটার। রাত তখন প্রায় বারোটা। ওর কলেজের সামনে স্কুটারে আমাকে রেখে লোহার গেট টপকে ও হোস্টেল থেকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডেকে নিয়ে এলো চাটগাঁর কয়েকজন ছাত্রকে। কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না— দু'এক জন ছাত্র সঙ্গে থাকা ভালো। শিক্ষক বা অধ্যাপকদের সব বিপদে ভরসাই তো ছাত্র। বর্ষা-বাদলে


www.pathagar.com

শিক্ষকদের মাথার উপর ছত্র ধরে বলেই তো তারা ছাত্র!

হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গেই এক্স-রে হলো। ফলাফল আমাকে জানানো হলো না। কিছু ইন্‌জেকশন দিল আর বড়ি খাওয়াল কয়েকটা। তার পর ঠেলা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিয়ে এলো ওয়ার্ডে। পরে জানা গেলো ডান কাঁধ আর বাহুর সঙ্গম স্থলে ফ্রেক্সার হয়েছে— ভেঙ্গে গেছে হাড়। এ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটানা ছাব্বিশ দিন কাটাতে হয়েছিল। দুর্ঘটনার পরদিনই ঢাকায় কেন্দ্রীয় লেখক সঙ্ঘের সভা ছিল— সে উপলক্ষে সঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুদরৎ উল্লাহ্ শাহাবও এসেছেন। সভায় কবি জসীমউদ্দিন আমার দুর্ঘটনার কথা উত্থাপন করতেই লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সেক্রেটারি জেনারেল আমার চিকিৎসার জন্য পাঁচশ' টাকা ঘোষণা করে তক্ষুণি অর্ধেক টাকা আহমদ হোসেন সাহেবের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত প্রায় ন'টার সময়— হাসপাতাল বেডে শুইয়ে শুইয়ে আমি যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছি তখন জসীমউদ্দীন এসে খবরটা আমাকে জানিয়ে গেল। এ টাকাটা পাওয়ার পর আমার আর আমার বন্ধুদের নৈতিক দায়িত্ব হলো যে কোন প্রকারে কেবিন একটার ব্যবস্থা করা। এবার তার জন্য চালানো হলো জোর তদ্বির। কেবিন খালি নেই একটাও।

একদিন হাসপাতালে কর্মরত এক তরুণ ডাক্তার এসে বল্লেন : মুনীর ভাই টাকা একশ' (সংখ্যাটা দেড়শ'ও হতে পারে) আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছেন যে কোন প্রকারে আপনার জন্য কেবিন জোগাড় করতে, এ টাকায় না কুলোয় আমার নিজের থেকে দিতে বলেছেন। কেবিন তো একটাও খালি পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তারটি মুনীরের খালাতো ভাই বা এধরনের আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।

কথাটা শুনে কিছুটা অবাক হলাম— এদের সঙ্গে আমার কোন আত্মীয়তা নেই, নেই তেমন ঘনিষ্টতাও। তবুও আমার বিপদে আজ এঁরা লোভের বস্তুকেও লোভনীয় মনে করছে না! ক্ষণিকের জন্য হলেও মুহূর্তে ভুলে গেলাম দেহের সব দুঃসহ যন্ত্রণা।

ইতিপূর্বে মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে আমার কয়দিনই বা দেখা?

১৯৪৭-এ যখন পাকিস্তান প্রায় হবে হবে অবস্থা, তখন একদিন মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান আর গোলাম কুদ্দুস এ তিনজন এক সঙ্গে চাটগাঁ এসে হাজির। মুনীর বোধ করি সেবারই শেষ এম. এ. পরীক্ষা দেবে। হ্যাংলা লিকলিকে চেহারা। শওকত ওসমান পাশ করে সবেমাত্র চাকরি পেয়েছে কলকাতার কমার্সিয়াল ইনস্‌টিটিউটে আর লিখছেন দুই হাতে। কুদ্দুস কি করত মনে নেই তবে কবিতা লিখত, সংগ্রামী কবিতা— এ জানতাম। প্রাণবন্ত আর সাহিত্য শিল্পে উৎসাহী তরুণদের পেলে তখন আমি প্রায় হাতে আসমান পেয়ে যেতাম। তখন আমি একটা ছোট্ট কাঁচা ঘরে থাকি— তিন জনকে ডেকে এনে মাটিতে মাদুর বিছিয়ে ওদের নিয়ে একবেলা ভালো করে খেলাম। তারপর বিকেলে ওদের নিয়ে জে. এম. সেন হলে সভাও করলাম। তিনজনেই তখন তরুণ, প্রাণের ঔজ্জ্বল্যে যেন জ্বলন্ত দীপ-শিখা। বক্তৃতা দিলেন— সে বক্তৃতায় উৎসাহ উদ্দীপনা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সংকল্পই ছিল প্রধান কথা। মনে পড়ে মুনীর চৌধুরী বক্তৃতা দিয়েছিলেন নাটক সম্বন্ধে— বলা বাহুল্য এটি তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি নাটক লিখবেন— নাটকের মাধ্যমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাত হেনে হেনে সমাজকে শোধরাবেন এরকম একটা আশা যেন তিনি প্রকাশ করেছিলেন সেদিন। অন্য দু'জনের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুলে গেছি।


www.pathagar.com

যাই হোক বর্তমান কথায় ফিরে আসা যাক। বন্ধুদের সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও কেবিন পেতে দশ বার দিন লেগে গেল। হাড়-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আলম প্রথমে ভাঙ্গা হাড়টা বসাতে চেষ্টা করেছিলেন। পরে এক্স-রে করে দেখা গেল টুকরাটা ঠিক মতো বসে নি। তখন তিনি বুঝতে পারলেন অপারেশন অনিবার্য। অপারেশনের আগে একদিন তাঁর বাসায় আমার কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে তিনি তাঁদের পরামর্শও নিলেন— নিজে বুঝিয়ে বল্লেন বিপদের আশঙ্কা কোথায় এবং কতটুকু। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমি নিজেই বার বার তাগাদা দিচ্ছিলাম অপারেশনের জন্য। চাটগাঁ থেকে আমার শ্বশুর এসেছিলেন আমাকে দেখতে, তিনিও অপারেশনের সপক্ষেই মত দিলেন। Risk-bond-এ সই করল আমার বড় ছেলে। সংজ্ঞা লোপ করার মধ্যেই নাকি রয়েছে জীবনের ঝুঁকি— এ বয়সে অনেকের নাকি তা আর ইহলোকে ফিরে আসে না!

৯ এপ্রিল (১৯৬২) আমার অপারেশন হলো। অপারেশন টেবিলে শোয়ানোর পর যে ডাক্তার এনেস্তেনেসিয়ার ব্যবস্থা করছিলেন তিনি জানালেন— তিনি অধ্যাপক মেহেরুদ্দীন সাহেবের জামাই। আগেই বলেছি মেহেরুদ্দীন সাহেব কৃষ্ণনগরে আমার সহকর্মী ছিলেন। কিছুটা যেন আশ্বস্ত বোধ করলাম। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি— অনেক পরিচিত মুখ, সবাই সজল চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম আর তাঁর স্বামী ডাক্তার ইব্রাহীমকেও যেন দেখলাম। তাঁদের চোখে মুখেও উৎকণ্ঠা। একটু পরেই সব অন্ধকার।

পরদিন বেলা তিনটা কি চারটা পর্যন্ত আমার আর কিছুই মনে নেই। অপারেশনের বারো দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম।

ছাব্বিশ দিনের হাসপাতাল জীবনে মানুষকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম— বিশেষ করে ঢাকার সাহিত্যিক বন্ধুদের। আমার প্রতি এঁদের যে এতখানি গভীর ভালোবাসা রয়েছে হাসপাতালে না এলে এ বোধ করি আমার কাছে অজানাই থেকে যেত। অশীতিপর জ্ঞান-বৃদ্ধ ডক্টর শহীদুল্লাহ্, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসীমউদ্দীন ও মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা থেকে তরুণতর সৈয়দ আলী আহসান, শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী, আহমদ শরিফ প্রভৃতি অনেকেই খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন আমার শয্যা পার্শ্বে, বাড়িয়ে দিয়েছেন সমবেদনার হাত। হাতে করে অনেকে নিয়ে এসেছেন ফল ফলারের ঠোঙা। অন্তরঙ্গরা তো দু'বেলাই আসতেন। আমার দেখাশোনা আর প্রয়োজন মিটাবার সব দায়িত্ব স্বেচ্ছায় হাতে তুলে নিয়েছিলেন বাংলা একাডেমির সম্পাদক আহমদ হোসেন— আবদুল কাদির এসে পরামর্শ দিতেন এটা ওটার। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারমেন বারি সাহেব সুযোগ পেলেই আসতেন দেখতে। তাঁর ছোট মেয়ে তখন মেডিকেল কলেজে পড়ত— বল্লেন, মেয়েকে বলে দিয়েছি আপনার খবর রোজ আমাকে জানাতে।

ইঞ্জিনিয়ার কলেজের অধ্যাপক আবদুল কাদের— চট্টগ্রাম কলেজে কিছুকাল আমার সহকর্মীও ছিলেন, তিনি একদিন দেখতে এসে বল্লেন : এসবে কিছু হবে না, আপনি হাসপাতাল ছেড়ে এসে হোমিওপ্যাথি খান। একদিন কিছু হোমিওপ্যাথি ঔষধ তিনি তাঁর এক আত্মীয় ছাত্রের হাতে গোপনে আমার কাছে পাঠিয়েও ছিলেন। বালিসের নিচে লুকিয়ে রেখে সকলের চোখের আড়ালে তাও খেয়েছি আমি। আর একদিন তো সুফিয়া কামাল আস্ত এক হোমিওপ্যাথকেই ডেকে নিয়ে এলেন! মনে হল লোকটি বুদ্ধিমান— ঔষধ দেন নি। এমন কাটাকাটি আর ঘড়ি ঘড়ি ইন্‌জেক্‌শন আর কড়া কড়া বড়ির মাঝখানে


www.pathagar.com

হোমিওপ্যাথির মতো নাজুক ঔষধ যে হালে পানি পাবে না এ যেন তিনি বুঝতে পারলেন।

মেয়েদের মধ্যে শামসুন্নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল আর আমার হোস্টেজ বুলির (মিসেস শামসুল হুদার) কথা কোনদিন ভুলবার নয়। পরের জন্য এমন সেবা হয়তো একমাত্র মেয়েরাই করতে পারে। হাসপাতালের নাস্তা আমি খেতে পারি না। সকালে কিছু ছানা আর রাতের বেলা রুটি খাওয়াই আমার অভ্যাস— বুলির তা জানা। সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে ও নিজের হাতে দুধ দুইয়ে, সে দুধের ছানা করে আর রুটি বানিয়ে তা নিয়ে বাসে চড়ে ধানমণ্ডীর লেকের পাড় থেকে ছুটে আসত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। হাসপাতালে তখন ঢোকার নিয়ম নয়— আর বাইর থেকে খাবার আনাও নিষেধ। বাইর থেকে খাবার সরবরাহের অনুমতি আদায়ের জন্য অধ্যাপক আহমদ হোসেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। অগত্যা বাধ্য হয়ে মেয়েরা স্মাগলিঙের আশ্রয় নিল। তাঁদের সহায় হল শাড়ির আঁচল আর ভ্যানিটিব্যাগ্ (বোরকা হলে আরো সুবিধা হত কিন্তু আমাকে যাঁরা দেখতে আসতেন তাঁরা কেউই বোরকাওয়ালী ছিলেন না)। সুখের বিষয় একবারও তাঁরা ধরা পড়েন নি। সুফিয়া কামাল প্রায়ই জিয়ল মাছ রেঁধে তা হর্লিক্সের খালি বৈয়ামে ভরে সে বৈয়ামটা ভ্যানিটিব্যাগে গায়েব করে নিয়ে আসতেন। হাসপাতালের দারোয়ানের কেন কোন গোয়েন্দার বাবারও সাধ্য নেই যে ভ্যানিটি ব্যাগে জিয়লমাছ কল্পনা করতে পারে! যন্ত্রণায় অস্থির, নিজের হাতে পারি না খেতে— তাই বে- আইনীভাবে আনা মাছ আর মাছের ঝোল নিজের হাতে চামচ কেটে কেটে খাইয়ে দিতেন তিনি। দুর্ভোগ পোয়াতে হত বুলিকে বেশি। ধানমণ্ডী থেকে বাসের ধকল সয়ে সয়ে এসে পরিচিত সিনিয়র কোন ছাত্র বা ডাক্তারের অপেক্ষায় ওকে ওৎপেতে থাকতে হত হাসপাতালের প্রবেশ পথে। ঢুকতে হত ওদের কারো সাহায্যে। এ ব্যাপারে বুলিকে খুব সাহায্য করেছিল আমার দেশের সুব্রত বড়ুয়া নামে ফাইনাল এম. বি. বি. এসের একটি ছাত্র। ও আর ওর ভাই বোনেরা চট্টগ্রাম কলেজে আমার কাছে পড়েছে। দিনের পর দিন বুলিকে এ দুঃসহ সংকট পার হয়ে আমার জন্য খাবার আনতে হত, খাইয়ে দিতে হতো নিজের হাতে। আবার ফিরতি পথে নিউ মার্কেট থেকে বাজার করে, ঘরে গিয়ে তা রান্না করতে হত স্বামী-পুত্রের জন্য! এমন আশ্চর্য মনোবল আর সেবাপরায়ণতা ও কোথায় পেল ভেবে অবাক হতে হয়। হয়তো প্রথমটি পেয়েছে বাপের কাছে আর দ্বিতীয়টি মায়ের কাছ থেকে।

শামসুন্নাহার মাহমুদ ডাক্তার আলমের বাসায় দু'বেলা ফোন করে আমার খবর জেনে নিতেন। নিজে আসতেন প্রায়দিন দুপুরে। ওঁর পরলোকগত স্বামী ডাক্তার ওয়াহিদুদ্দীন মাহমুদ এক সময় সার্জেন জেনারেল ছিলেন— হাসপাতালের অনেকে তাঁকে চেনে আর করে কিছুটা সমীহও। ফলে অসময়েও তাঁর ঢুকতে কোন অসুবিধা হত না। এসেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করতেন— মাথা ধোওয়া হয়েছে?

হয়নি শুনলে তখনি হাঁক ডাক দিয়ে বেয়ারা আর নার্সদের সন্ত্রস্ত করে তুলতেন। পানি আনিয়ে নিয়ে তখনই তাঁর সামনে ধোওয়াবার নির্দেশ দিতেন। দক্ষ নার্সের মতো দেখিয়ে দিতেন মাথার কোন দিকে আগে আর কোথায় বেশি ঢালতে হবে পানি, কি করে মোছাতে হবে মাথা আর হাত পা ইত্যাদি। এ দুর্ঘটনার কিছু আগে 'সংবাদে' আমি একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম। ওটা ছাপা হয় ওদের পহেলা বৈশাখ সংখ্যায়। তখন আমি হাসপাতালে। হাসপাতালে কাগজ আমার চোখে না পড়ারই কথা। সে কথা ভেবেই বোধ করি শামসুন্নাহার সেদিনই এককপি 'সংবাদ' তাঁর ছোট ছেলেকে দিয়ে আমাকে


www.pathagar.com

হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ক্ষুদে শত বার্ষিকী সংস্করণের এক কপি। সেটিতে লিখেছিলেন : "ভাই আবুল ফজল সাহেব, রোগকাতর দিনগুলির সঙ্গে ছোট্ট গীতাঞ্জলি দিয়ে জড়িয়ে দিলাম বোনের মমতার স্মৃতি।" নাহার ১৪. ৪. ৬২। ১ বৈশাখ।

আমার জন্য যেখানে এত প্রীতি-স্নেহ-ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে সেখানে দু'একটি ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্রতা আমাকে বিচলিত করবে কেন? তাই উপরে বলেছি— এসবের তুলনায় ওদের ক্ষুদ্র ঈর্ষা সমুদ্রে বিন্দু বই তো নয়।

এ দুর্ঘটনার পর অনেক কাল আমি কিছু লিখতে পারিনি। মাস তিনেক তো অসহ্য যন্ত্রণায় পারিনি ঘুমাতে। চেষ্টা করেছি বাম হাতে লেখার অভ্যাস করতে। দেখলাম কোন রকমে দু'একখানা চিঠিই শুধু লেখা যায় কিন্তু একখানা শেষ করতেই লেগে যায় প্রায় এক ঘণ্টা। তবুও দু' একখানা চিঠি ঐভাবে লিখেছি বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। আমার ঐ রকম এক চিঠি পেয়ে ডক্টর এনামুল হক কি রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তার কিছুটা নমুনা নিচে উদ্ধৃত হলো :

"পত্রখানা সামনে রয়েছে, বার বার দেখছি আর ভাবছি এ কি সত্যিই ফজল সাহেবের বাম হাতের লেখা। এ যে তাঁর ডান হাতের লেখার চেয়ে সুপাঠ্য, আর আমার আন্-লেখা আন্-পড়া স্ত্রীর লেখা প্রথম পত্রের চেয়েও রোমাঞ্চকর। হায়, হায়, এ হতভাগাটি এতকাল বাম হাতে না লিখে ডান হাতে লিখলেন কেন? আমাদের মনে কষ্ট ও চোখে পীড়া দেওয়ার জন্যই কি? এর থেকে যে চোখও উঠতে চায় না, মনও ফিরতে রাজি হয় না।"

"সত্যিই বলছি, আপনি বাম হাতে লেখা অভ্যাস করুন। ডান হাতে লেখার ক্ষোভ থাকবে না। তবে, কায়মনোবাক্যে এটাও দোয়া করছি, যেন পরম করুণাময় খোদা আপনাকে ডান হাতের পূর্ণ সামর্থ ফিরিয়ে দেন,— আপনি মসীযুদ্ধে সব্যসাচী হোন। আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে আপনার হাত ভেঙ্গেছে বটে, মন ও মনীষা— এ দুয়ের কোনটিই ভাঙ্গেনি। তবে, মচকিয়েছে। তার হাত থেকে রেহাই পেতে সময় নেবে। নিক্ না। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আপনি শীঘ্রই লিখতে পারবেন।" ইত্যাদি

এ চিঠি লিখেছেন তিনি রাজশাহী থেকে, ২৯ জুন, ১৯৬২।

বাম হাতে লিখতে অনেক সময় লেগে যায় তাই ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ছ' সাত মাস পরে আবার আমি একটু একটু করে শুরু করলাম ডান হাতে লিখতে। এ সময় শওকত ওসমান লিখে পাঠান :

"...আপনি যে আবার ডান হাতে লিখতে পারছেন তা শুনে খুব খুশি হয়েছি। কারণ, লেখকের ডান হাত গেলে আর থাকে কি? অমর হোক আপনার দুই বাহু। তা মনে প্রাণে কামনা করি। যখন অবিবেকের সাধনায় আমাদের বেশির ভাগই অহোরাত্র ঝোপ খুঁজেছে নিজেকে পেঁচার মত কোন রকমে লুকিয়ে রাখার চেষ্টায় তখন আপনি বেরিয়ে এসেছেন কলমের মর্যাদা রাখতে। হাতে তরবারি থাকলে. হয়ত নেপোলিয়নের মতো আপনিও হেঁকে উঠতেন "যদি আকাশ নেমে আসে তলোয়ারের ডগা দিয়েই আমি তা নিবৃত্ত করব"। আত্মার সফরে আপনার পরিব্রজনা এই জন্যে দুর্মূল্য মনে হয়, যেহেতু ভজা সমাজে ভজনা তো মুখ হাত ধোওয়ার মত একটি বাড়তি কাজ মাত্র। তার প্রাপনায় কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, কোন পরিশ্রম তো লাগেই না। বাজারে পেটেন্ট ঔষধের মতো


www.pathagar.com

কিছু পয়সা খরচ করলেই পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে তা আবার সত্তরগুণ হয়ে ফিরে আসে। সোজা হিসাব। এমন খরচ তেরিজের অভ্যেস, আমাদের বহু অগ্রজকে করতে দেখি, তখন আপনার কথা মনে পড়ে। একজন অন্তত আছেন, যিনি এ প্রলোভনকে পার হয়ে নিজের মুখোমুখী দাঁড়াতে চেয়েছেন। নচেৎ আমাদের মুরুব্বি বলতে আর কাউকে দেখি না। আমরা বে-মুরুব্বির ছেলে বলে পরবর্তী যুগে নিন্দিত হতাম। আপনার এ প্রদত্ত ঋণের জন্য আপনার কাছে আমার মত বহুজনই কৃতজ্ঞ থাকবে।

...আপনার শুভেচ্ছা চাইছি, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে। তা মুরুব্বিদের কাছ থেকেই নিতে হয়। আপনি ছাড়া কে আর তেমন আছে? চটি-পরা, টিকিধারী বিদ্যাসাগর হালে চালে সাহেব মদ্যপায়ী মাইকেলকে ভালোবাসতেন। আমাদের সমাজে কেন তা হয় না?" ২১. ১. ৬৩।

শওকত ওসমান পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। পাকিস্তান হওয়ার পর স্থায়ীভাবে এখানে চলে এসেছেন— চট্টগ্রাম সরকারি বাণিজ্য কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক হয়ে। সে থেকে একটানা অনেক দিন ছিলেন চাটগাঁ। ফলে আমার সঙ্গে গড়ে ওঠে আন্তরিকতা আর বন্ধুত্ব। তাই আমার সম্বন্ধে তাঁর মতামত কিছুটা অতিরঞ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের উত্তরসুরীদের মধ্যে যে কয়জন সাহিত্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন আর তাতে আত্মনিবিষ্ট তার মধ্যে শওকত ওসমান অন্যতম। তাঁর প্রতিভা আর রচনার বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য— বিশেষ করে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে।

১৯৬৩-তে আমাকেও সাহিত্যের জন্য প্রেসিডেন্ট পুরস্কার দেওয়া হয়। এ ঘোষণার পর শওকত ওসমান এক পত্রে লিখেছিলেন :

"সংবাদপত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার— ঘোষণার তালিকায় আপনার নাম দেখে কী যে আনন্দিত, তা লিখে আমার পক্ষে জানানো অসম্ভব, যদিও লেখাই আমার নেশা।

আপনার সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাধনার এত বিলম্বে স্বীকৃতি আজ প্রায় দুরপনেয় কলংক-অপসারণের প্রয়াস বল্লেই চলে। তবু এই শুভবুদ্ধি জাতির পক্ষে এক নূতন সূচনা। আপনার গৌরবে আমরা সত্যিই গৌরবান্বিত বোধ করছি। আর গর্ব বোধ করছি এই জন্যে যে আপনি আপনার শর্তেই প্রাপ্য আদায় করেন।

মর্মশক্তির পূজারীরূপে আপনার অমিততেজ প্রাণ বিশ্বাসের অটলতায়, দেশপ্রেমে হোক আরো হিমাদ্রি-প্রাংশু— যার ছায়ানির্ঝরিণীর সিঞ্চনে আমরা জুড়োব দহন-ক্লান্তি, খুঁজে পাবো ক্লিন্ন আত্মার শ্যামলিমা। সুদীর্ঘ হোক আপনার জীবন এবং কর্মশক্তি।" ১৪. ৮. ৬৩।

এ উপলক্ষে বন্ধুদের কাছ থেকে এর চেয়েও উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি আমি পেয়েছি তবে সেসব প্রকাশ করতে আমার নিজেরই সঙ্কোচ হচ্ছে। নমুনা হিসেবে শুধু ডক্টর এনামুল হকের চিঠির কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হল :

"আজকের স্বাধীনতা দিবস আমার কাছে শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব-মুক্তির অমর বাণী ও স্বাপ্নিক স্মৃতি বহন করে আনে নি, এনেছে তার সাথে কদরদানীর এক নতুন সওগাত— সাহিত্য-সাধক আবুল ফজলের 'কৃতিত্ব-গৌরব' (Pride of performance)। এ সওগাত আমার পুরোনো স্মৃতির জীর্ণ কোঠায় এক নতুন মহিমার সবুজ প্রলেপ মেখে দিয়ে আমাকে নব-নবীনের মন-ভুলানো আমেজে সবুজ করে তুলেছে। এ চিঠি তারই এক


www.pathagar.com

নগণ্য অভিব্যক্তি।...তোমার এ অপ্রত্যাশিত অথচ অত্যন্ত সমীচীন গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত।" ১৪ই আগস্ট, ১৯৬৩।

বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর অগ্রজ সৈয়দ মোস্তফা আলীর চিঠির এক টুকরা :

"...আর একটু এগিয়ে গেলে পাই 'সমকালে' আপনার বহু বিতর্কিত প্রবন্ধ। কেবলই পড়া শেষ করেছি, তখনই তার উপর নেমে আসল রাষ্ট্রের খড়্গ ও সেই সংখ্যা কাগজ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।...আপনার বন্ধুরা আতঙ্কিত হয়েছিলেন এইবার বুঝি আপনার পেন্‌সন ঘচাং করে কাটা যায়। দেখুন, আবার অদৃষ্টের পরিহাস— ঐখান থেকেই আসলো রাজ সম্মান— তাই কবি বলেছেন : বড়র পিরিতি বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" ১৮. ৮. ৬৩।

## চুয়াল্লিশ

আমার এ বিশৃঙ্খল লেখাটিতে অনেক ক্ষেত্রে আগের কথা পরে আর পরের কথা আগে এসে গেছে। কোন রকম দিন-পঞ্জী না রাখার আর স্রেফ স্মৃতির উপর নির্ভর করার ফলেই ঘটেছে এ ত্রুটি। ১৯৬১'র ৫, ৬ আর ৭ জুন পি. ই. এন., পাকিস্তান শাখার উদ্যোগে একটি সেমিনার হয়েছিল ঢাকায়। উদ্বোধন করেছিলেন তখনকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী হাবিবর রহমান। উদ্বোধনী অধিবেশনটি ছাড়া সেমিনারের আর সব অধিবেশনগুলি বসেছিল ঢাকা রেডিও অফিসের অডিটরিয়ামে। আমিও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম প্রবন্ধ পড়ার জন্য— আমার বিষয়বস্তু ছিল 'লেখক ও তাঁর সামাজিক দায়িত্ব'।

পাকিস্তান শাখা পি. ই. এনের তখন সভাপতি ছিলেন মরহুম অধ্যাপক শাহেদ সোহরওয়ার্দী। তাঁর পাণ্ডিত্য আর ললিতকলা সম্বন্ধে জ্ঞানের খ্যাতি প্রায় আন্তর্জাতিক। তখন তিনি জীবন সায়াহ্নে, শরীর ভেঙ্গে নুইয়ে পড়েছে, একটা মোটা লাঠির উপর ভর দিয়ে হাঁটেন। আলাপ-আলোচনায় মনে হল মনটি এখনো সতেজ— নাতিদীর্ঘ যে অভিভাষণ দিলেন তাতেও ফুটে উঠেছে তাঁর বিদগ্ধ ও পরিণত মনের পরিচয়। তাঁর মতো শিল্প-সচেতন পরিণত-মনা মানুষ আজকের দিনে আমাদের দেশে বিরল বল্লেই চলে।

এসব সেমিনারে বক্তৃতা-আলোচনা সব কিছুই ইংরেজিতেই হয়ে থাকে— এটা সব সময় আমার কাছে খুব লজ্জা ও দুঃখের মনে হত। পাকিস্তানে সেমিনার হচ্ছে, অংশ গ্রহণকারীরাও সবাই পাকিস্তানি, শ্রোতারাও তাই। তবুও আমাদের দুই স্বীকৃত রাষ্ট্র ভাষায় আমরা একটা সেমিনারও চালাতে পারব না কেন? দ্বিভাষায় কাজ চালানো আজকের দিনে এমন কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়েও বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এসব সেমিনারে এলে এ কথাটা বার বার আমার মনে পড়ে।

এ সেমিনারেও এযাবৎ যেসব প্রবন্ধ পঠিত আর আলোচিত হয়েছে তাও ইংরেজিতেই হয়েছে। তবুও আমার প্রবন্ধটি আমি বাংলাতেই লিখেছিলাম এবং বাংলাতেই পড়লাম। অনেকেই খুশি হলেন। আলোচনা করতে উঠে গোলাম মোস্তফা সাহেবও বাংলাতেই বল্লেন।

পরদিন মি: জমিল জলিবিও তাঁর প্রবন্ধ পড়লেন উর্দুতে। যদিও তিনি প্রথমে লিখে এনেছিলেন ইংরেজিতে। বল্লেন : গত রাত্রে বসে বসে তিনি তাঁর প্রবন্ধটি উর্দুতে অনুবাদ করে নিয়েছেন।



www.pathagar.com

আলোচনা হচ্ছে নিজেদের সাহিত্য আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে আর নিজের দেশে বসেই— তাতেও নিজেদের ভাষার স্থান নেই, একথা মনে করে অনেকে যেন দুঃখ ও লজ্জাবোধ করলেন। মি: জি. আল্লানা প্রস্তাব করলেন সেমিনারে পঠিত সব প্রবন্ধগুলি যেন বাংলা আর উর্দুতে অনুবাদ করে নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। এ প্রস্তাব কাজে পরিণত হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং পঠিত প্রবন্ধগুলি বই আকারে ইংরেজিতেই প্রকাশিত হয়েছে— আমার প্রবন্ধটারও করে নেওয়া হয়েছে ইংরেজি অনুবাদ।

৭ তারিখের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল— 'Social Responsibility of the writer vis-a-vis Art for Art's sake'। এদিন সভাপতিত্ব করার পালা ছিল আমার। মূল প্রবন্ধ পড়লেন অধ্যাপক আহমদ আলী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন শাহেদ সোহরওয়ার্দী, বেগম শায়েস্তা একরামুল্লাহ্, বেগম জেবুন্নিসা হামিদউল্লাহ, মি. জি. আল্লানা, অধ্যাপক আফতাব আহমদ, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন, অধ্যক্ষ কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা প্রভৃতি। এ দিনের সভায় অনেক বুদ্ধিজীবীর সমাবেশ ঘটেছিল। অধ্যাপক আহমদ আলী এক সময় কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। 'Twilight in Delhi' তাঁর এক প্রসিদ্ধ বই। টি. এস. ইলিয়ট সম্বন্ধেও তাঁর একটি বই আছে। বেগম শায়েস্তা একরামুল্লাহ বাংলা দেশের মেয়ে তবে বাংলা জানেন না— বেগম জেবুন্নেসা হামিদ উল্লারও একই দশা। বেগম একরামুল্লাহ্ শহীদ সোহরওয়ার্দীর মামাতো বোন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলার স্যার হাসান সোহরওয়ার্দীর একমাত্র মেয়ে আর দ্বিতীয়জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলীর মেয়ে। বেগম একরামউল্লাহ ইংরেজি আর উর্দুতে একাধিক বই লিখেছেন— 'From Purdah to Parliament' তাঁর এক সুপরিচিত বই। তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী আর বাক-চতুরা, ত্বরিৎ জবাবে পটু আর বলতেও পারেন অনর্গল। সেমিনারে তিনি উর্দু সাহিত্য পরিক্রমা করলেন চমৎকারভাবে।

বেগম জেবুন্নেসার মা ছিলেন ইংরেজ। মেয়ের উপর মায়ের প্রভাব সব সময় বেশি— এখানেও বোধকরি তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি দেখতে আকারে ছোটখাটো কিন্তু রঙটি পেয়েছেন মায়ের। দীর্ঘকাল ধরে যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করছেন 'Mirror' নামক বিখ্যাত সোসাইটি মাসিক। খুব ভদ্র ও স্বাধীনচেতা, চাল-চলন আর কথাবার্তায় একটা শালীন আত্মমর্যাদা যেন তাঁর সহজাত। প্রবন্ধ পড়লেন, আলোচনায়ও অংশগ্রহণ করলেন— বেশ গম্ভীর আর সংযত-বাক। বেগম একরামুল্লাহ যেন এঁর কিছুটা বিপরীত— তিনি আরো চঞ্চল ও মুখর। যেসব মেয়েরা পেশা বা সমাজের প্রয়োজনে কিছুটা উন্মুক্ত জীবনযাপন করেন তাঁদের সম্বন্ধে অনেকের মনে কিছু কিছু ভুল ধারণা গড়ে ওঠে— এ অনেকখানি সামাজিক সংস্কারেরই ফল। কাছাকাছি এলে বা জানাজানি হলে অনেক ক্ষেত্রে এসব ভুল ধারণার অপনোদন ঘটে। এ তিন দিন ধরে দেশের এ দুই খ্যাতনামা মহিলাকে দেখে তাঁদের যোগ্যতা আর আন্তরিকতা সম্বন্ধে যেমন আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে তেমনি সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁদের সার্বিক চেতনাও আমাকে কম আনন্দ দেয়নি।

মি: জি. আল্লানা তুখোড় মানুষ, চমৎকার তাঁর বলার ভংগী আর সব বিষয় যেন তাঁর নখদর্পণে। বলতে পারেন সব বিষয়ে আর তখন তখনি। আশ্চর্য নয় যে তিনি ইউনেস্কোর কোন এক শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। অথচ ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষ, গোত্রে


www.pathagar.com

খোজা। বল্লেন প্রিন্স আলী খাঁর একটি জীবনী লেখার তাঁর ইচ্ছা।

এবার ঢাকায় কোন বন্ধুর বাসায় উঠিনি। পি. ই. এনের মেহমান, তাঁরাই নিয়ে ওঠালেন হোটেল শাহবাগে। যোগাড় হয়েছিল এক সিটের রুম— কাজেই নির্বিবাদে আরামেই কাটল এ কয়দিন। পি. ই. এনের প্রধান কর্মকর্তা সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন সব ব্যবস্থাপনার পেছনে— এসব ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা আর দক্ষতা সবারই জানা।

করাচিতে নজরুল একাডেমি নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। জনাব মীজানুর রহমান যখন করাচি ছিলেন তখন তাঁর উদ্যোগেই এটির প্রতিষ্ঠা। এ একাডেমি বছর বছর ঘটা করে নজরুল জন্মবার্ষিকী পালন করে থাকে। ১৯৬৩র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে (২০-২৪. ৫. ৬৩) কবি আবদুল কাদির আর ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীমের সঙ্গে নজরুল একাডেমি আমাকেও দাওয়াৎ দিয়ে করাচি নিয়ে গিয়েছিলেন। করাচিতে একই হোটেলে আমরা পাশাপাশি ঘরে ছিলাম— নাস্তা আর খাওয়া-দাওয়া করতাম একই সঙ্গে। নীলিমা ইব্রাহীম খুলনার মেয়ে— বহুকাল আগে খুলনা জেলা স্কুলে আমি মাস্টারি করেছি। বছর কয় আগে নীলিমা ইব্রাহীম এক ছুটিতে কক্সবাজার বেড়াতে যাওয়ার পথে অনেক খুঁজে পেতে আমার বাসায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নিজের পরিচয় আর আমাকে প্রায় অবাক করে দিয়ে তিনি আমার পা ছুঁয়ে সালাম জানালেন।

আমার তো প্রায় মাটিতে মিশে যাওয়ার দশা। দেখা না থাকলেও তাঁর নাম আর গুণপনা তো আমার জানাই ছিল।

বল্লেন : আমার ভাইরা খুলনা জিলা স্কুলে আপনার ছাত্র ছিল, সে হিসেবে আপনি আমারও....।

বলে কি মেয়েটি? এ সেদিনও যাদের পড়িয়েছি তারা পর্যন্ত পা ছুঁয়ে সালাম করা দূরে থাক অনেকে হাতটা তুলেও সালাম করে না, একটা বক্র দৃষ্টি হেনে সিগারেটের ধুয়া উড়িয়ে সামনে দিয়ে গট্ গট্ করে চলে যায়। কেউ কেউ কাগজে কেউ কেউ বা সভা সমিতিতে চোখের সামনে দাঁড়িয়েই প্রমাণ করে ছাড়ে যে আমি একটা মন্দ লোক।

আর এঁকে আমি জীবনে দেখিনি, তাঁর ভাইদের কথাও এতদিনে সব ভুলে গেছি। তার উপর অত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা— আস্ত এম. এ., পি. এচ্. ডি.। বয়সও তো নেহাত কম নয়, বইপত্র ও তো আমার চেয়ে কম লিখেন নি।

সে থেকে এঁকে দেখলে আমি কিছুটা সঙ্কোচ বোধ না করে পারি না। সঙ্কোচের প্রধান কারণ আমি মনে মনে জানি এতখানি ভক্তির যোগ্য আমি নই। ভক্তিটা হয়তো এঁদের মজ্জাগত কিন্তু গ্রহীতার অধিকার থাকা চাই তো। অধিকারীভেদ কথাটা একেবারে অর্থহীন নয়।

করাচির হোটেলেও নীলিমা ইব্রাহীম আমার সুখ সুবিধার প্রতি যথেষ্ট নজর রাখতেন। সব সময় সতর্ক থাকতেন আমার যেন কোন অসুবিধা না হয়। সেবার এক সঙ্গে কয়েকদিন থেকে তাঁর মার্জিত রুচি আর বিদগ্ধ মনের যে পরিচয় পেলাম তাতে আমি আরো মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। আমার বাংলা বক্তৃতার ইংরেজি সংক্ষিপ্ত-সার বা সিনপসিসও তিনি করে দিয়ে ছিলেন। দেখলাম বাংলার মতো ইংরেজিও তিনি চমৎকার


www.pathagar.com

লেখেন। নারীসুলভ একটা সহজ সারল্য তাঁর রচনার এক বিশেষ গুণ— তিনি পণ্ডিত কম নন্ কিন্তু পাণ্ডিত্যের হামলায় রচনাকে কখনো ভারাক্রান্ত করে তোলেন না।

ঐ পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে একদিন আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। অন্য এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস্-চ্যান্সেলার ডক্টর মাহমুদ হোসেন। ঐ অধিবেশনে আমি 'The Basis of Pakistani Nationhood' এ নামে ছোট একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। ঐ অধিবেশনে প্রদেশের বর্তমান অর্থমন্ত্রী ডক্টর এম. এন. হুদাও পড়েছিলেন একটি প্রবন্ধ। আমার লেখাটার স্পষ্টবাদিতায় ডক্টর হুদা আর উপস্থিত পূর্ব পাকিস্তানি বন্ধুরা খুব খুশি হয়েছিলেন। এটির সংক্ষিপ্ত-সার 'পাকিস্তান অবজারভারে' ছাপা হয়েছিল পরে।

১৯৬৩ ১ জুলাই আমার বয়স ষাট পার হল। এ উপলক্ষে চট্টগ্রামের বন্ধু আর অনুরাগীরা মিলে আমার এক সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা এ সংবর্ধনার নাম দিয়েছিলেন 'হীরক জয়ন্তী'। আমি আমার ভাষণের প্রথমেই এ সম্পর্কে আমার আপত্তি আবারো জানিয়ে দিলাম।

বলেছিলাম : 'এসব আমাদের মতো সাধারণ লেখকদের জন্য নয়, খুব বড় প্রতিভা আর কৃতী মানুষের বেলায় শুধু 'হীরক জয়ন্তী', 'স্বর্ণ জয়ন্তী' ইত্যাদি কথা মানায়। আমাদের বেলায় এসব কথা বিদ্রূপের মতো শোনায়'।

এ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সাহিত্যিক আবু রুশদ্ মতিনউদ্দিন আর উদ্বোধন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্টের তখনকার প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী। এ উপলক্ষে শিল্পী জয়নুল আবেদিনও এসেছিলেন আর নিজের আঁকা একটি বড় ছবি আমাকে দিয়েছিলেন উপহার। এটি আমার জীবনে একটি বড় সম্পদ— কারণ জয়নুল আবেদিনের মতো শিল্পীর স্বীকৃতি আমার মতো লেখকের পক্ষে সামান্য কথা নয়। এ দিনের সংবর্ধনা এ কারণেও আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এ সংবর্ধনা সভায় আমি যে ভাষণ দিয়েছিলাম তা 'সাহিত্যের পথ' নামে আমার 'সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন' নামক বইতে ছাপা হয়েছে।

গত ১৭ মে (১৯৬৫) বুলবুল ললিতকলা একাডেমি আমার বন্ধু হাবীবউল্লাহ্ বাহারের সঙ্গে আমাকেও অভিনন্দিত করেছেন। মানপত্রে তাঁরা আমাকে 'মুক্ত বুদ্ধির চির সজাগ প্রহরী' বলে অভিহিত করেছেন। কথাটা আংশিক সত্য হলেও আমার পক্ষে খুশির কথা।

এ রচনাটির এখানেই সমাপ্তি টানতে চাই। মোটামুটি এটি ব্যক্তি জীবনেরই ঘটনা পরম্পরা। আমার কাছে ব্যক্তি তুচ্ছ নয়। জীবন এক অমূল্য সম্পদ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ এক তীর্থ-পরিক্রমা। তবে তার জন্য প্রয়োজন সচেতন উপলব্ধির। দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও যে সচেতনতা ছিল তা নয়— অন্তত পঞ্চাশ বছর লেগেছে এ উপলব্ধিতে পৌঁছতে।

এ শুধু এক সাধারণ জীবনেরই রেখা-চিত্র এতে অসাধারণত্বের কোন চমক নেই। সামান্য শিশির বিন্দুতেও যেমন সূর্যালোক প্রতিবিম্বিত হয় তেমনি আমার এ সামান্য জীবন-পাত্রেও যুগ-চিত্তের কিছু প্রতিফলন ঘটেছে কি-না সে বিচারের ভার পাঠকদের উপর।


www.pathagar.com

# পরিশিষ্ট

## ক. কয়েকটি লেখা সম্বন্ধে টুকিটাকি খবর

একদা আল্লামা য়ূসুফ আলী আর মার্মাডিউক পিকথলের ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে আমি কোরান শরীফটা ভালো করে অর্থাৎ বুঝে অধ্যয়ন করতে চেষ্টা করেছিলাম। সে অধ্যয়ন আমি পরে কাজে লাগিয়েছি আমার 'কোরানের বাণী' নামক বইতে। ঐটির প্রথম নাম ছিল 'মোসলেম জীবন'— সওগাত যখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত তখন দীর্ঘ দু'বছর ধরে তাতে ঐটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। পরে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৯শে আর নাম দেয়া হয় 'কোরানের বাণী'।

ডক্টর আবদুল্লাহ সোহরওয়ার্দীর 'Sayings of Muhammed' নামে একটি বই আছে— এ বই এখন দুষ্প্রাপ্য, এর একটা কপি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন সোহরওয়ার্দীর আত্মীয় মি: আবুল কাসেম। এ বইটিতে পাঁচ শ' সুনির্বাচিত হাদিস আছে— বইটা টলস্টয়েরও প্রিয় ছিল। সংকলিত হাদিসগুলি আমাকে খুব মুগ্ধ করে, তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করতে শুরু করি। এ পাঁচ শ' হাদিসের সঙ্গে বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থ থেকে আরো পাঁচ শ' হাদিস সংগ্রহ করে— মোট এক হাজার হাদিস দিয়ে 'হাদিসের বাণী' নামে আমি 'কোরানের বাণী'র পরিপূরক হিসেবে আর একটা বই সংকলন করি। এটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬১তে। এ দুটি বই এখন ঢাকা ইসলামিয়া লাইব্রেরির সম্পত্তি। এ দুই বইতে, বিশেষ করে প্রথমটিতে ধর্ম সম্বন্ধে আমার মতামত কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে।

আর নিজের রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমার ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে 'কায়েদে আজম' নামক নাটকে এবং কোন কোন প্রবন্ধেও। 'রাঙ্গাপ্রভাত' নামক উপন্যাসেও হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে তার কিছু আভাস।

১৯৬১র জানুয়ারি মাসে আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধ সংকলন 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা' প্রকাশিত হয়েছে। এ বই পড়ে কাজী আবদুল ওদুদ এ চিঠিখানি লেখেন :

'আপনার বইখানি পেয়েছি। গেট্ আপ বেশ হয়েছে, অনেকগুলো পড়ে ফেলেছি। ভাল লাগছে তা না বল্লেও চলে। এর বিশেষ মূল্য যেটি সেটিও অপূর্ব, বিস্তারিত সমালোচনা করার ইচ্ছা আমার আছে। কায়েদে আজম জিন্নাহ্ সম্বন্ধে আপনার লেখাটি বেশ লাগল। এতে যে দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলেছেন পাকিস্তানে সে দায়িত্ব গ্রহণ আপনি নিজে করেছেন। সবল কাণ্ডজ্ঞানের সাধনা আর মানবপ্রীতির সাধনা দুয়েরই এক চিত্তাকর্ষক রূপ দেখছি আপনার এ লেখাগুলোয়। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে আপনি সব চাইতে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নাগরিকের ভূমিকা নিয়েছেন, কাল হয়তো এই সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু কেমন লাগছে বইখানি ওখানকার সমজদারদের কাছে? জানাবেন, উদগ্রীব রইলাম।' ২৭। ১। ৬১।



www.pathagar.com

'প্রেম ও মৃত্যু' গল্পটির আদি নাম ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার লাইন— 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে', পরে এর নাম দাঁড়ায় 'আজরাইল নাজেহাল', তারও পরে 'প্রেম ও মৃত্যু'। গল্পটি প্রথমে সরকারি অর্থে পরিচালিত এমন একটি কাগজে আদি নামে ছাপা হয়েছিল। গল্পটির পরিবেশ আর পরিণতি প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধতার কারণ হয়ে পড়তে পারে এ ভয়ে মুদ্রিত ফর্মাগুলি বাতিল করে দিয়ে অন্য 'নিরীহ' লেখা দিয়ে সে শূন্যস্থানটা পূরণ করা হয়। গল্পটিতে একদিকে আজরাইল অন্যদিকে মদন বা পঞ্চশরের আবির্ভাব ঘটেছে। আজরাইল মুসলমানের ফেরেস্তা আর মদন হিন্দুর দেবতা— একজন মৃত্যুর অন্যজন প্রেমের প্রতীক। গল্পকার স্বভাবতই সাহিত্যের চিরন্তন ধর্মানুসারে প্রেমের তথা মদনের জয় দেখিয়েছে। নিছক কাল্পনিক গল্পে হলেও ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দু দেবতার কাছে মুসলমানী ফেরেস্তার পরাজয় দেখানোটা হয়তো নিরাপত্তা আইনের আওতায় পড়ে যেতেও পারে, মনে হয় এমন একটা অহেতুক ভয় সম্পাদকের মনে জেগেছিল। তার উপর উক্ত পত্রিকাটির সম্পাদকীয় গদিটার চারদিকে যাঁদের লুব্ধ-দৃষ্টি দীর্ঘকাল ধরে মৌমাছির মতো গুন্ গুন্ করে ফিরছিল তাঁরা যে তিলকে তাল করে এ সুযোগটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করবেন না তারই বা নিশ্চয়তা কি? অতএব সম্পাদক কোন রকম ঝুঁকিতে যেতে রাজি নন্।

লেখক হিসেবে আমাদের যে কত রকম কৌতুককর ঝামেলা পার হতে হয়েছে, এ তারই এক নজির!

যাই হোক লেখাটি পরে 'দিলরুবা', 'উদয়ন' আর কলকাতার 'সংকল্পে' প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শতদল' নামক গল্প সংকলনেও এটি পুর্ণমুদ্রিত হয়েছে।

জনাব নুরুল আমিন যখন 'সংবাদের' পরিচালক আর আবদুল গণি হাজারী কর্ম-কর্তা বা সম্পাদক তখন ঐ পত্রিকার কোন এক ঈদ সংখ্যার জন্য হাজারীর অনুরোধে আমি একটি গল্প লিখে পাঠিয়েছিলাম। কি কারণে জানি না লেখাটি তাঁরা ছাপেন নি— দীর্ঘকাল পরে লেখাটি যখন আমাকে ফেরৎ পাঠানো হয় তখনো কোন কারণ দর্শাননি। পরে এটি 'উদয়ন' নামক মাসিকে 'পুণর্জন্ম' নামে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে ওটি রুহুল আমিন নিজামী সম্পাদিত 'পূর্ব বাংলার সমকালীন সেরা গল্প' নামক সংকলনে মুখপাত্রের গল্প হিসেবে পুণর্মুদ্রিত হয়েছে। এখন এটি 'বিবর্তন' নামে আমার 'শ্রেষ্ঠগল্পে' স্থান পেয়েছে।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এক সময় স্কুল-ছাত্রদের মধ্যেও কেমন এক নির্বুদ্ধিতার রূপ নিয়েছিল তার এক ঘটনা রাঙ্গাপ্রভাতে উল্লেখিত হয়েছে। ঘটনাটি আমি নীরদ চৌধুরীর বিখ্যাত বই An Autobiography of An Unknown Indian থেকে নিয়েছি।

'রহস্যময়ী প্রকৃতি' গল্পের হাঁপানী-রুগিনীটিকে আমি ছোটকালে আমাদের গ্রামে দেখেছি। তার বিয়ের গল্পটা মার মুখে শোনা। গল্পে যাকে তার স্বামী করা হয়েছে সেও আমার দেখা। 'বিবর্তনের' নুলা মেয়েটিও আমার চেনা, আজও সে বেঁচে। তবে গল্প গল্পই, তার পনরো আনাই কল্পনা। দেশলাইর সামান্য একটা কাঠি যেনম অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে পারে তেমনি কোন একটা বিশেষ মানুষ বা ঘটনার সামান্য ইংগিত থেকে জন্ম নিতে পারে এক একটা আস্ত গল্প কি উপন্যাস। 'মাটির পৃথিবী' গল্পের মানুষগুলি এক


www.pathagar.com

সময় আমার বাসার পেছনেই থাকত— রোজ আমাকে শুনতে হত শাশুড়ি-বৌয়ের ঝগড়াঝাটি। কোন কোন দিন ওদের গাল পাল্টা গাল অবিকল আমি খাতায় টুকে রাখতাম। চুলোচুলির দৃশ্যটাও জানালা পথে আমার স্বচক্ষে দেখা।

ছোটকালে মাদ্রাসায় আমাদের এক বন্ধু ছিল, শহুরে ছেলে— বখাটের একশেষ। ক্লাসে একদিন হাজির থাকে তো সাতদিন গর হাজির। কোন রকমে বোধ করি ফাইভ্ সিক্স পর্যন্ত উঠেছিল। অনেক কাল পরে আমি যখন মাস্টারি শুরু করেছি তখন শুনতে পেলাম ও ডাক্তার হয়েছে— হোমিও ডাক্তার।

চাটগাঁ শহরে এখানে ওখানে ছাড়া ভাবে দরিদ্র দেশী খ্রিস্টানদের কয়েকটি পাড়া আছে। ঐ রকম এক পাড়ায় আমাদের ডাক্তার-বন্ধুটি চিকিৎসা করতে বা চিকিৎসার নামে যাতায়াত করতেন। আবার সে পাড়ার একটি মেয়ে সপ্তম অষ্টম মান পর্যন্ত পড়াশোনা করে ডাক্তারদের পাড়ার প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করত। মেয়েটি সুন্দরী না হলেও পরিপূর্ণ যুবতী— মাথার কেশ আলুথালুভাবে ছেড়ে দিয়ে সারা অঙ্গে যৌবনের ঢেউ তুলে সে যখন রাস্তা দো-ফাঁক করে স্কুলে যাতায়াত করত তখন পথচারিরা হা করে তাকিয়ে না থেকে থাকতে পারতো না। মাইকেল মধুসূদনের ভাষায়— 'যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা।' বলা যায় যৌবনই সৌন্দর্য, সৌন্দর্যই যৌবন। কাজেই পথচারিদের দোষ দেওয়া যায় না।

এমন দুই তুখড় যুবক-যুবতীর পরিচয়, মেলামেশা আর তার ফলে তা গভীর প্রণয়ে রূপান্তরিত হতে দেরি লাগার কথা নয়। মেয়েটি ছেলেটির চেয়েও বেপরওয়া— স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে আর দুপুর ছুটিতে সোজা ডাক্তারের ঘরে এসে চড়াও করত। পাড়াপড়শীদের নিন্দায় সে কানই দিত না। নিজের মাস্টারির টাকা দিয়ে ডাক্তারকে কিনে দিত দামি স্যুট, ঘড়ি, জামাকাপড় এটা ওটা সৌখিন জিনিস। দেখে আমাদের তো রীতিমতো ঈর্ষা হতে লাগল। বাল্য-বন্ধু দেখা হলে মাঝে মাঝে ঈর্ষাটা প্রকাশ না করেও ছাড়তাম না। বলতামঃ ভাই, কি কপালটা নিয়েই না তুই জন্মেছিস!

হঠাৎ একদিন ডাক্তারকে বিমর্ষ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম : কি ডাক্তার, কেমন চলছে?

কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে খাস আমাদের দেশী ভাষায় বল্লে : আর ন খইছ ভাই, মাইরতে মাইরতে হাতর বেত উড়াই ফেলাই, তঅ, পঁঅৎ পড়ি তায়। সইৎ ন পাইরলে যা গই, মনে গইল্লাম আপদ গেল্। ওমা, তার পরদিন আবার আইয়েরে আজির, তেইরে বলে আঁই বিয়া গইত্তাম। আঁই মুছলমানের বাইচ্চা না? বলতে বলতে ডাক্তারের সিনাটা টান হয়ে উঠল!

ডাক্তারের হাতের মার খেতে খেতে মেয়েটির পিঠে দাগ দাগ হয়ে গেছে, তবুও ফাঁক পেলেই মেয়েটি তার কাছে ছুটে আসে, পড়ে থাকে ধন্না দিয়ে। মার খায়, কেঁদে কেঁদে ফিরে যায় আবারও মার খাওয়ার জন্যই যেন ফিরে আসে পরদিন। এ ভাবে চলে মাসের পর মাস। এ অসহ্য নির্যাতনেও সে যেন পায় কি এক অনির্বচনীয় স্বাদ। মারের চোটে পিঠে ক্ষতবিক্ষত তবুও মেয়েটির চোখে মুখে বিদ্যুৎ ঝলক দেখে রীতিমতো অবাক হতে হয়। সত্যই মানব-চরিত্র, বিশেষ করে নারী-চরিত্র অতল রহস্যময়।

একদিন ডাক্তার বন্ধুটি একগাদা চিঠি নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির। বল্লে : সব ওর চিঠি। তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি পড়ে আমাদের নিয়ে একটা গল্প লিখবে— সব পড়তে হবে কিন্তু।


www.pathagar.com

সে চিঠির বান্ডিল ও আর জীবনে ফেরৎ নেয় নি। অতগুলি চিঠি পড়ার আমারই বা ফুরসুৎ কোথায়? মনে হয় চিঠিগুলি শেষ পর্যন্ত আমাদের উনুনের আগুনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে পুড়ে ছাই হয়েছে। দুঃখের বিষয় এদের নিয়ে কোন গল্পই আমি লিখতে পারি নি। তবে তাদের ব্যাপারটির কোন কোন ঘটনা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে আমার 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' আর 'গল্পের নায়িকা'র কিছু কিছু উপাদান জুগিয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা সহজেই ধরতে পারবেন।

কিছুকাল পরের কথা। মেয়েটির আর্ত-কান্না বুঝি পাড়া-পড়শীরা আর সহ্য করতে পারল না। একদিন সবাই মিলে মেয়েটিকে জুমা মসজিদে নিয়ে, তৌবা করিয়ে, কলমা পড়িয়ে, ডাক্তারের সঙ্গে 'শাদীয়ে মুবারেক' করিয়ে দিলে। সত্যই বিয়েটা মুবারেক হয়েছিল— এখন তারা সুখী, সুখী দম্পতি, সুখী মা-বাপ হয়তো সুখী শ্বশুর-শাশুড়িও!

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা আমাদের দেশে এক ফ্যশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন তখন যেখানে সেখানে সব ব্যাপারে টেনে আনা হয় ধর্মকে। কেউ কেউ ধর্মকে করে নিয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার। ধর্ম ব্যবহারিক জীবনে পালনের বিষয়, বহ্বারম্ভের বস্তু নয়। আশ্চর্য জীবনে যারা ধর্মের কিছুমাত্র ধারও ধারে না তারাই বেশি করে আউড়ায় ধর্মের বুলি। এসব দেখে শুনে কোন লেখকের পক্ষেই মনের স্বাভাবিক স্থৈর্য আর স্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই আমার অনেক লেখায়, বিশেষ করে কোন কোন প্রবন্ধে মনের ঝাল ও উত্তাপ খুব কড়া ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'ধর্ম ও রাষ্ট্র' আর 'মানবতন্ত্র' নামক প্রবন্ধ দু'টি স্মরণীয়। খুব চড়া সুরে লেখা হলেও এসব প্রবন্ধে অনেকে নিজেদের মনের প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেয়েছেন। ঢাকায় 'মিলন সংঘ' নামে একটি ক্ষুদ্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে, এর সদস্যরা সবাই বয়স্ক আর মনে হয় যুক্তিবাদী। এঁদের প্রধান কর্ম-কর্তা জনাব আবুল হাসনাত একদিন আমাকে ইংরেজিতে লিখে পাঠান।

: In our meeting yesterday, your learned and thoughtful article entitled, 'Dharmo-o-Rashtra' published in Samakal-Baisak issue was read over and discussed. It was so highly appreciated that all unanimously proposed it should be published in pamphlet form by our society and discriminately circulated....your bold and rational outlook is simply charming. ২৭. ১. ৬৪


www.pathagar.com

## খ : ডায়রির কয়েকটি ছেঁড়া পাতা

### এক

২১-১২-৫৭ 'সাহিত্য নিকেতন'কে কিছুটা সম্প্রসারণের কাজে হাত দিয়েছি, কিছু সিমেন্ট আর লোহার দরকার। পারমিট ছাড়া এ সব কেনার উপায় নেই। পারমিট দেওয়ার মালিক ডি. এম. (বর্তমান ডি. সি.)। ডি. এম. আমার পরিচিত ছাত্রাবস্থা থেকেই জানা। তাই কোন অসুবিধা হবে না এ আশা নিয়েই গেলাম। পিয়নের মুখে শুনলাম ডি. এম. আজ কারো সঙ্গে দেখা করবেন না এমনকি স্লিপ্ নিতেও বারণ করেছেন। দেখলাম আমার চোখের সামনে দু'একজনকে ডেকে তিনি দেখা করলেন, কেউ কেউ তাঁর 'মঞ্জুরী পত্র' হাতে নিয়ে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দেখা করলেন তিনি আমার ছাত্র স্থানীয় এক তরুণের সঙ্গেও। তখন রাজনীতির যুগ— তরুণটি বোধ করি জেলা...পার্টির সম্পাদক বা সহ সম্পাদক।

পিয়নকে আর এক দফা অনুরোধ করে বল্লাম : ডি. এম.কে অন্তত আমার নামটা গিয়ে বলে এসো। পিয়ন জানাল : সে আমাকে চেনে এবং আমার নাম ডি. এম. কে আমি আসার সঙ্গে সঙ্গেই বলেছে। প্রমাণস্বরূপ সে আমাকে আমার নামটা শুনিয়েও দিল। ফের যোগ করল : তবুও ডি. এম. দেখা করতে রাজি নন্।

অগত্যা ফিরে এলাম। আরো দশ বারোজন দর্শন-প্রার্থী ফিরে গেলো আমার পেছনে পেছনে। সারা পথেই মনটা ভার হয়ে রইলো— দংশন করতে লাগল এক অসহ্য গ্লানি। বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করা পরও মনটা হাল্কা হল না। মনে হল অকারণে আমি অপমানিত হয়েছি। আমি তো ডি. এমের. দেখা করার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গেছি আর আজ তিনি কারো সঙ্গে দেখা করবেন না এমনতরো কোন নোটিশও বাইরে দেননি। আমার দিক থেকে কোন ত্রুটিই তো দেখতে পাচ্ছি না— অনাবশ্যক বা অন্যায় কোন অনুগ্রহ চাইতেও আমি তাঁর কাছে যাই নি। কিছুতেই মন প্রবোধ মানছিল না।

সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ ছাঁৎ করে মনে হলো আমি তো একা অপমানিত হইনি— আমার মতো আরো বহু লোক তো প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে। আমি তাদের থেকে আলাদা কিসে? আমি অকারণে নিজেকে আলাদা করে ভেবেছি— ভেবেছি আমি লেখক, আমি অধ্যাপক আমাকে প্রত্যাখ্যান! তাই অপমানটা আমার গায়ে বেশি লেগেছে। আসলে আমিও তো ওদেরই মতো নাগরিক। লেখক হিসেবে আমার আসনটা তো ওদেরই সঙ্গে। ওরাই আমার উপকরণ— ওরাই আমার পাঠক। আমার পাঠকরা যদি এ অপমান সইতে পারে আমি পারব না কেন? আমি কেন এক অকারণ দুশ্চিন্তায় যার প্রতিকার আমার এক্তেয়ারের বাইরে তা নিয়ে আমার 'রক্তের চাপ' বাড়িয়ে তুলছি। জেলার কর্তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমার দেশের আরো দশজন যদি প্রত্যাখ্যাত হতে পারে আমি কেন বিপরীত ব্যবহার প্রত্যাশা করব? আমার মনের এক আত্মম্ভর অভিমান আর অহমিকাবোধ ছাড়া এ আর কিছুই না। আমিও সাধারণ আর সাধারণের পঙক্তিতেই আমারো স্থান।



www.pathagar.com

মুহূর্তে মনটা হাল্কা হয়ে গেল। ডি. এম. বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমার মনে রইল না আর কোন ক্ষোভ।

আর একবার এক সাব্-ডেপুটি (তখনো ডেপুটি সাব্ ডেপুটি এক হয়ে যায় নি) এ সিমেন্টের ব্যাপারে আমাকে তাঁর বাসা থেকে— মুখের উপর খুব কড়া কড়া কথা বলে, বের করেই দিয়েছিলেন।

আমার মতো এক সিমেন্ট সন্ধানী বন্ধুই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন : ইনি খুব মার্জিতরুচি ভদ্রলোক, দেখা করে বল্লে তিনি হয়তো আপনার আশু প্রয়োজনের যৌক্তিকতা বুঝতে পারবেন। এ অপমানটা নিজে ডেকে আনার এটিই কারণ।

কিন্তু এ অপমানটা ভুলে যেতে আমার বেশি দেরি লাগেনি। ভেবে দেখলাম— অপরাধটা আমারই, তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর অবসর সময়ে তাঁকে বিরক্ত করার আমার কি অধিকার? তিনি গলায় হাত দিলেও আমার তো সাফাই দেওয়ার কারণ জুটত না। এ অপমানটুকু করার পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে আর আমারও হয়তো এটি প্রাপ্য। এ শিক্ষাটুকুও আমার জীবনে কাজে লেগেছে।

## দুই

৩. ৫. ৫৮

মনে হয় ব্যক্তিগত সততা যে কোন 'আদর্শ' আর 'নীতিশিক্ষা' থেকে বড়ো। বাইরের পোশাকী ধর্ম বা তথাকথিত আদর্শবাদ কোন মানুষকেই সৎমানুষে পরিণত করতে পারে না যদি অন্তরে সততার বীজ না হয় অঙ্কুরিত।

গতকাল কলেজের পিয়ন গুরা মিয়া এসে আমার মাইনে দিয়ে গেল। মাইনে আমরা সাধারণত কোন সময় গুনে নিই না— গুরা মিয়া বিল দেখে গুনে সেভাবে আমাদের নামে এক একটা আলাদা খামে টাকা ভরে রাখে। কোন ভুল কোনদিন ধরা পড়ে নি। গতকালও সেভাবেই সে টাকা দিয়ে গেছে। আমি মাইনে পাই তখন কুল্লে ৪৯৬৷৷০। গুরা মিয়াকে বাড়ি এসে মাইনে দিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতি মাসে এক টাকা করে দিয়ে থাকি বখশিস। এবারও তাই দিয়ে দিলাম। গুরা মিয়া বল্লে : মিয়া ঈদের বখশিস তো পেলাম না। ফলে খুচরা আট আনাও ওকে দিলাম। এখন আমার কাছে ৪৯৫ টাকাই থাকা উচিত। গুরা মিয়া বিদায় নিল। উপরে গিয়ে আলমারিতে টাকা রাখার সময় আমার মনে হলো অন্য মাসের তুলনায় এবার দশ টাকার নোটের তাড়াটা যেন বেশি মোটা মনে হচ্ছে। গুনতে শুরু করলাম— দেখি আমার মাইনের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেদিন আবার তিনটার সময় জে. এম. সেন হলে এক সাহিত্য সম্মেলন ছিল— ঢাকা থেকে অনেক জ্ঞানী গুণী এসেছেন— মওলানা আকরম খাঁ, বরকৎ উল্লাহ, ইব্রাহীম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, খাঁন মঈনউদ্দীন ইত্যাদি আরো অনেকে। সভা আরম্ভের সময় হয়ে এসেছে— আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি অনবরত ভোঁ ভোঁ করছে। কাজেই টাকাটা আর ভালো করে গনা হয়ে উঠল না— বান্ডিলশুদ্ধ আলমারিতে রেখে দিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বল্লাম : গুরা মিয়া যদি ফিরে আসে তাকে বলবে সে যেন রাত্রে বা কাল সকালে আসে।


www.pathagar.com

রাত্রে সভা থেকে ফিরে শুনলাম গুরা মিয়া আসেনি। ভাবলাম সকালে নিশ্চয়ই আসবে। এবার টাকাটা গুনে দেখলাম— একবার, দু'বার, তিনবার— ৮৯৫ টাকা। স্ত্রীকেও দিলাম গুনে দেখতে— সংখ্যার ইতর বিশেষ হল না। সকালেও গুরা মিয়ার দেখা নেই। এতগুলি টাকা তার হিসেবে কম পড়লে সে নিশ্চয়ই ছুটে আসতো। কোথাও না কোথাও টাকাটার ঘাটতি ধরা পড়বেই তখন শুরু হবে তার উল্টো যাত্রা যাদের দিয়ে এসেছে তাদেরে বেশি দিয়েছে কি-না তার সন্ধানে। কিন্তু দশটা পর্যন্ত গুরা মিয়া এলো না। অথচ টাকা আমাদের খরচ না করে উপায় নেই।

স্ত্রী বল্লে : তোমার মাইনের টাকাটা আলাদা করে নিয়ে তা থেকে আমরা খরচ করতে থাকি। বাকিটা আলগা করে রেখে দাও গুরা মিয়া এলে তার হিল্লা হবে।

সারা সকাল বেলাটা গুরা মিয়া এলো না। তা হলে কি কম পড়েনি? তা যদি হয় অতিরিক্ত এ চারশ টাকা এলো কোথা থেকে?

বিকালে কলেজে আমার পরীক্ষার ডিউটি ছিল। যাওয়ার সময় পকেটে করে উদ্বৃত্ত চারশ' টাকা নিয়ে গেলাম। অধ্যক্ষের রুমে ঢুকে দেখলাম অন্যান্য অধ্যাপকরাও প্রশ্ন-পত্র নেওয়ার জন্য সেখানে জড়ো হয়েছেন। আমাকে দেখে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না— হারানো টাকা সম্বন্ধে কোন আলোচনাই নেই কারো মুখে। তারপর অফিস রুমে— যেখানে কেরানি আর পিয়নরা বসে বসে কাজ করে সেখানে ঢুকলাম। সেখানেও কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না আমাকে। কিছুটা অবাক হলাম। দশ বিশ টাকা হারা গেলে কত হৈ চৈ পড়ে যায় আর এতো চার শ' টাকার ব্যাপার!

গুরা মিয়া দেখলাম উপুড় হয়ে এক মনে একটা খাতায় রুল টেনে যাচ্ছে। সে এমনি কালো— উপুড় হয়ে আছে বলে আজ মুখটা অধিকতর কালো কি-না বুঝা গেল না। এবার আমিই অস্থির হয়ে উঠলাম— পকেটের চার শ' টাকা আমাকে আর স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম : গুরা মিয়া কেমন আছ?

তখন কেরানি পিয়নরা সমস্বরে বলে উঠল : ওর তো হুজুর সর্বনাশ হয়ে গেছে, অনেক টাকার হিসেব মিলাতে পারছেনা, নিজাম স্যারের বিল ক্যাশ করেছে মাইনে দিতে পারে নি— সারারাত ঘুমোয় নি শুধু কেঁদেছে।

এবার আমি হেসে বলে উঠলাম : হিসাব মিলিয়ে দেখো, যা কম পড়ে তা আমিই দিয়ে দেবো। এবার ওর ধরে প্রাণ এলো। ছুটে এসে আমার পায়ের উপর পড়ে আর কি!

কোন আদর্শবাদ বা নীতি শিক্ষার ফলে এ টাকা আমি যথাস্থানে ফিরিয়ে দিই নি। ধর্ম বা ধর্ম-গ্রন্থের শিক্ষার ফলও এ নয়। ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থে এর বিপরীত কথা লেখা থাকলেও আমি যা করেছি তাই করতাম। যা আমার নয় তা আমি কখনো নিজের বলে রাখতাম না— ব্যবহার করতাম না নিজের প্রয়োজনে। আমার বিশ্বাস এ ব্যক্তিগত সততারই ফল— যার শিকড় ভিতরে। আমার বেলায় এর বীজ বপন ঘটেছে পিতা-মাতার হাতে আর সাহিত্যের সামুদ্রিক হাওয়ায় হয়েছে এ অঙ্কুরিত।

এখানে যে সাহিত্য সম্মেলনের কথা উল্লেখ করলাম তাতে দ্বিতীয় দিন হলের দরজায় আবুল মনসুর সাহেবকে দেখতে পেয়ে কি জানি কি মনে করে আমি হঠাৎ বলে ফেল্লাম :


www.pathagar.com

মনসুর সাহেব এবার আমরাই 'আয়না' লিখব।' রাজনীতিতে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হওয়া আর তা চলে যাওয়ার পর এ প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। বুদ্ধিমান লোক। কি বুঝলেন জানি না। বল্লেন : চল তোমার বাসায় যাব। অদূরে খান মঈনউদ্দীন বসা ছিল, তাকে ডেকে বাইরে নিয়ে এসে বল্লেন : চল আবুল ফজলের বাসায় গিয়ে চা খেয়ে আসি। তখন বেলা এগারোটার মতো। আমি বল্লাম : আমাদের চাটগাঁয় এত বেলায় কেউ চা খায় না।

তিনি এক হাতে মঈনুকে আর এক হাতে আমাকে টানতে টানতে বলে চল্লেন : না না, চা খাওয়াতেই হবে চল, আজ কোন কথাই শুনব না তোমার।

তিনি এবার প্রাক্তন মন্ত্রী এ. কে. খাঁর বাসায় উঠেছিলেন। ওঁদের গাড়ি করেই সভায় এসেছেন। অগত্যা সে দামি গাড়ি চড়েই আমার বাসায় মঈনউদ্দীনসহ এলেন— চা খেলেন। খেয়ে বল্লেন : এবার মাহবুব-উল আলম আর শওকত ওসমানের সঙ্গে দেখা করবো। চলো.....।

সাহিত্য থেকে তিনি রাজনীতিতে গিয়েছিলেন। মন্ত্রী হওয়ার পর সাহিত্য আর সাহিত্যিকের কথা তাঁর মনে পড়ার কথা নয়— পড়েওনি। এবার কি রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্যের দিকে মুখ ফেরাবেন? না কি 'আয়নাকে' তিনিও ভয় করেন? আগের দিনে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে মানুষ খুশি হত। ক্ষমতালক্ষ্য রাজনীতি আজ কারো কারো কাছ থেকে সে সুখটাও যেন কেড়ে নিয়েছে!

## তিন

২. ৩. ৬২

আজ মনটা সারাদিন ধরে ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। সপ্তাহ খানেক পরে ঈদ— রমজানের খুশির ঈদ। হাতে পয়সা নেই। একটিও। বড় ছেলের বিয়ে উপলক্ষে বেশ কিছুটা ধার হয়ে গেছে। হাত টানলেই যাদের কাছে পাওয়া যেত তাদের কাছ থেকে ধার নেওয়া শেষ আর সে ধার এখনো শোধ করতে বাকি।

এর মধ্যে কয়েক জায়গায় ধার চেয়ে ব্যর্থকাম হয়েছি। ঈদের জন্য ছেলেমেয়েদের কাপড় চোপড় কিছুই কেনা হয় নি। বাড়িতে সবাইর মুখ কালো। জীবনে এমন অবস্থায় সম্মুখীন বোধ হয় আর কখনো হই নি। লেখা-পড়ায় মন বসাতে পারছি না কিছুতেই— বইর কপিরাইট বিক্রির চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। অলঙ্কারের মধ্যে স্ত্রীর দু'হাতে দু'ভরির দু'গাছি চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। সে দু'গাছি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য স্ত্রী রোজই আমাকে তাগাদা দিচ্ছে কয়দিন ধরে। বিয়ের সময় ওকে যেসব অলঙ্কার দেওয়া হয়েছিল পরেও দু'এক পদ যাও বানিয়েছিল তার সবই একদিন চুরি হয়ে গেছে। তারপর ওকে আর কোন অলঙ্কারই দেওয়া হয়নি বা দিতে পারি নি। ওর দিক থেকেও এসব ব্যাপারে কোন তাগাদা ছিল না।

এ সবেধন নীলমণি দু'খানা চুড়ি বিক্রি করতে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। কারো না কারো কাছে ধার পেয়ে যাব— এ আশ্বাস দিয়ে ওকে এতদিন থামিয়ে রেখেছিলাম। আজ আর পারা গেল না। আমিও যেন তেমন জোরের সঙ্গে আর পারলাম না বাধা দিতে।


www.pathagar.com

ও নিজে গিয়েই স্বর্ণকারের দোকানে চুড়ি দু'খানা বিক্রি করে ছেলে-মেয়েদের জন্য সওদা করে সন্ধ্যায় ফিরে এলো হাসি-মুখে। যাওয়ার সময় মুখখানা ম্লান দেখেছিলাম— এখন দেখছি হাসি খুশীতে ঝলমল। ছেলেমেয়েদের মুখের হাসি দেখেই যে এ হাসি তা বুঝতে পারলাম। আমি কিন্তু কিছুতেই স্বস্তিবোধ করতে পারছি না। নিজের অক্ষমতাটা যেন আজ বড্ড সোচ্চার হয়েই বাজল মনে। নিজে বড় বাড়ি করেছি (অবশ্য লোনের টাকার সঙ্গে নিজের অর্ধেক পেনসন বিক্রি আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের সবটা যোগ করে) তার সঙ্গে তুলনায় দৈনন্দিন জীবনের অভাবটা বড্ড অবিশ্বাস্য মনে হয়। বাইরের লোকের পক্ষে এ বিশ্বাস করা আরো অসম্ভব— এমন কি আত্মীয় স্বজনেরাও বিশ্বাস করতে চায় না। অনেক লেখকেরই হয়তো জীবনের এ একটা দিক আছে যার সঙ্গে তাঁদের বাইরের জীবনের কোন সম্পর্ক নেই।

## চার

করাচি : ২০. ৫. ৬৩ (বক্তৃতার সংকেত) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সাহিত্যের উপকরণ। পশ্চিম পাকিস্তানের জনজীবন এক বিরাট ক্ষেত্র— অধিকতর শিল্পায়িত বলে সাহিত্যের উপকরণও এখানে অনেক বেশি। এখানকার মানুষ অধিকতর পাশ্চাত্যমুখীন আর পশ্চিমী সভ্যতার আক্রমণও এখানে বেশি। ফলে দেশি আর বিদেশী জীবন যাত্রার দ্বন্দ্ব-সংকটও এখানে বেশি লক্ষ্যগোচর। এসবই সাহিত্যের চমৎকার উপকরণ।

পূর্ব পাকিস্তান কৃষিভিত্তিক। চাষীজীবন অনেকটা সহজ সরল— জীবনের দ্বন্দ্ব সমস্যাও এখানে সীমিত। পশ্চিমী সভ্যতার আওতা থেকে অনেকটা দূরে বলে এখনো সভ্যতার সংকট এখানে অতটা প্রকট হয়ে ওঠে নি।

একটা প্রচণ্ড বেদনা বোধই কবিত্বের মূল প্রেরণা। যাঁকে আদি কবি বলা হয় সে বাল্মীকিরও কবিত্বের উন্মেষ এক নির্মম বেদনার আঘাতে। বেদনাবোধ ছাড়া যত চটুল, বুদ্ধিদীপ্ত আর জটিল পণ্ডিতী কবিতাই লেখা হোক না, তা মানুষের হৃদয়ে দোলা দিতে পারবে না। তুলনীয় আধুনিক কবিতা। নজরুলে এ বেদনাবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল তাই জনচিত্তকে আলোড়িত করে তোলা তাঁর পক্ষে ছিল সহজ। পাণ্ডিত্য বদ্ধকূপ— বেদনাবোধ প্রবহমান স্রোতস্বতী।

## পাঁচ

১৯. ৩. ৬৪ গ্রামের বাড়ি গিয়েছিলাম একদিনের জন্য। অজ পাড়াগাঁ, শহর থেকে প্রায় বত্রিশ মাইল দূরে। যেখানে সাধারণত হাটের দিন হাটের কাছাকাছি ছাড়া কোন কোলাহলই শোনা যায় না। গাছপালার ছায়াঘেরা গ্রাম— এখানে ওখানে দূরে দূরে দেখা যায় গুচ্ছ গুচ্ছ কুঁড়েঘর। আশে পাশে গরু বাছুর আর হাঁস মুরগি নিয়ে যাদের জীবন— যাদের দেখা যায় ঘরের দাওয়ায় উঠোনে, ভিটে বাড়ি কি ক্ষেত খামারে বা পুকুর ঘাটে তারাও ঐ কুঁড়ে ঘরের মতই সাদামাটা। এখানে কোথাও উচ্চরোল নয় জীবন— চারদিকের স্তব্ধ প্রকৃতির সঙ্গে এদের জীবন এক সুরে বাঁধা।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই আচমকা দূর থেকে কানে ভেসে এলো মাইকের কর্কশ


www.pathagar.com

আওয়াজ। মনে মনে যে সুন্দর কবিতাটি অবয়বিত হচ্ছিল মুহূর্তে তারই যেন ঘটল অপমৃত্যু — মনের প্রশান্তি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো। মনটা বিষিয়ে উঠল অপ্রত্যাশিত ছন্দপতনে।

এখানেও সে কান-ফাটা গর্জন? যার হাত থেকে শহরে এক মুহূর্তেও নেই রেহাই!

শহরে আমার বাসা এক বড় রাস্তার উপর কাজেই মাইক যে কি এক নরক-যন্ত্রণা তা আমার হাড়ে হাড়েই জানা।

অনেক সময় এ নরকের দুয়ারটা খুলে দেওয়া হয় রাত্রে, এমন কি গভীর রাত্রে— যখন দিন শেষে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন। কতবার রাত্রি তিনটার সময় আঁৎকে উঠেছি কোন না কোন 'চট্টল-গৌরবের' মৃত্যু সংবাদে। অভ্যাস দোষে মৃত্যু বল্লাম বটে আসলে এঁরা এন্তেকাল করেন, মরেন না। জীপ্ আর মাইকের জোগাড় করতে পারলে সাধারণ মৃত্যুও এন্তেকাল হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য মরে সাধারণরা আর এন্তেকাল করে অসাধারণরা। যেমন সাধারণরা হয় হাজী আর অসাধারণরা আল্‌হজ্ব।

ইন্তেকালের খবর দিয়েও মাইক কিন্তু থামে না— বেলা ন' ঘটিকায় লালদীঘির ময়দানে দলে দলে জানাজায় হাজির হয়ে অশেষ সোয়াবের ভাগী হওয়ার হুঙ্কারটাও বারে বারে ধ্বনিতে হতে থাকে মাইকের মুখে। এভাবে শেষ রাত্রির শান্তি আর নিস্তব্ধতা টুক্‌রো টুক্‌রো করে মাইক আপনার যে নাজুক ঘুমটা ভাঙলো সে ঘুম সে রাত্রে আর ফিরে আসার কথা নয়। আর 'চট্টল গৌরব' তো এক আধটা নয়— অসংখ্য। এসব গৌরব'রা করাচি কি রাউয়ালপিণ্ডি থেকে ঘুরে এলেই তা হয় 'শুভাগমন' এমন কি মা-বাপের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এলেও— তখন আবার মাইক আপনার মনের, আপনার কানের শান্তিভঙ্গ করে গর্জাতে শুরু করবে। কোন কোন সময় এ 'শুভাগমনের' ফলে আপনার সারা রাত্রির ঘুমটাই কতল। এ শাস্তির বিনিময়ে আপনি জানতে পারলেন— কাল ভোরে উঠে আপনাকে যেতে হবে স্টেশনে বা এয়ার পোর্টে কোন এক 'চট্টল-গৌরবকে' সংবর্ধনা জানাতে। একা গেলে চলবে না, যেতে হবে দলে দলে!

'শান্তির নীড় স্তব্ধ নিবিড়'— সে গ্রামেও এখন শুরু হয়েছে মাইকের হামলা। বাড়ির দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে মনটা সত্যই বিগড়ে গেল।

## ছয়

৩১. ১২. ৬৪। আজ বৎসর-শেষ। এ বছরটা যাকে জাতীয় নির্বাচন বলা হয়েছে, সে নির্বাচনের জন্য স্মরণীয়। কিন্তু নির্বাচনে জাতির যে চেহারা দেখলাম তাতে সাল তামাদির দিন শুধু এ প্রশ্নই জাগছে : জাতি আজ কোন পথে? নিম্নতম স্তরেও নির্বাচনে যাঁরা জয় লাভ করলেন তাঁদের যে সংবর্ধনা লাভ হল তেমন সংবর্ধনা আমি নজরুলকেও পেতে দেখি নি। জসীমউদ্দীন, জয়নাল আবেদিনকে তো নয়ই। চট্টগ্রামে বেশ বড় বড় কয়েকটা সাহিত্য সম্মেলন হতে দেখেছি— তাতে মওলানা আকরম খাঁ, ডক্টর শহীদুল্লাহ প্রভৃতির ন্যায় বহু জ্ঞান-প্রবীণ ও স্বনামখ্যাত লোকও উপস্থিত থেকেছেন, কিন্তু কারো ভাগ্যে এক গাছি ফুলের মালাও জোটে নি! এ অবস্থায় দেশের উদীয়মান তরুণ সমাজও যে রাজনীতিকেই চরম মোক্ষ মনে করবে তা তো খুবই স্বাভাবিক। কেন তারা ভালো


www.pathagar.com

সাহিত্যিক বা শিল্পী হতে যাবে? কেন হবে তারা ভালো শিক্ষক বা কর্মী? ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য বা এম. পি. এ., এম. এন. এ. হতে পারলে যেখানে পাওয়া যায় চরম সম্মান?

মনে হয় দেশের মানুষের সামনে এখন একমাত্র স্বপ্ন : রাজনীতি, রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাওয়া। এ নির্বাচনের পর সবাই এক বাক্যে বলছে— কে ভোটার? কে দিচ্ছে ভোট? যারা ভোট দিচ্ছে তারা আদৌ এ এলাকার মানুষ কি-না? অথবা কেউ কেউ আদৌ বেঁচে আছে কি-না? এসব প্রশ্ন এ নির্বাচনে একদম অবান্তর প্রমাণিত হয়েছে। আর বোরকার যে ভেল্কিবাজি দেখা গেছে তা কল্পনার বাইরে। কোন কোন বোরকা বা বোরকা পরিহিতা একা পনরো ষোলবারও ভোট দিয়েছে এ নিয়ে বড়াই করতেও স্বকর্ণে শুনেছি!

এ ভোট যুদ্ধে যাঁরা জিতেছেন আর যাঁরা হেরেছেন— দু'পক্ষই অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন, তাঁদের ভাগ্যের এচ্‌পার কি ওচ্‌পার ঘটেছে স্রেফ জাল ভোটের কেরামতিতে। মজার ব্যাপার এ যে যাঁরা এভাবে এ নির্বাচনী পোলসেরাৎ পার হয়েছেন তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এঁদের জয়লাভের রহস্য সংবর্ধনার উদ্যোক্তারা কারো থেকে কম জানে না কিন্তু তার চেয়েও বেশি জানে যে ভাবেই হোক— সত্য-মিথ্যা, জাল-জুয়াচুরি, পাঁচিল টপকে কি সিঁদ কেটে যেখানে এঁরা ঢুকেছেন সেখান থেকে সহজেই সমর্থকদের অনুকূলে ক্ষমতার চাবিকাঠি ঘোরাতে পারবেন। সমর্থক প্রমাণের একটা বড় উপায় সংবর্ধনা আর ফুলের মালা। কাজেই মহল্লার সব চালাক লোকেরাই আগে মেতে উঠেছেন আর নিয়েছেন নেতৃত্ব এসব সংবর্ধনা ব্যাপারে। আশ্চর্য, যে এলেকায় যত বেশি জাল ভোটের গুজব সে এলেকায় সংবর্ধনার বহর আর বাহারও অনেক বেশি। সংবর্ধনা দানের এক উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় সবাই যেন ছাড়িয়ে যেতে চায় সব মাত্রা!

নাগরিকদের তথা জাতির নীতিবোধ কিভাবে দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এ তারই এক নিদর্শন। দশ বছর আগেও দেশে এমন দৃশ্য দেখা যায়নি। সামাজিক নীতিবোধ যদি এভাবে পাতালের দিকে নামতে থাকে তা হলে সেদিন সুদূর নয় যেদিন বড় চোর, বড় ডাকাত আর বড় খুনীকেও সংবর্ধনা দেওয়ার লোকের অভাব হবে না। আর চোর-ডাকাত-খুনীর জিন্দাবাদে সেদিন সাধু-সজ্জন আর জ্ঞানী-গুণীদের ক্ষীণকণ্ঠ ডুবে যাবেই। এমন নৈতিক দুর্গতি আর মূল্যবোধের চরম লাঞ্ছনার দিনে জিন্দাবাদ দেওয়ার জন্য ভাড়াটে লোকেরও পড়বে না অভাব। ভাড়াটে লোকদের গলার জোরেই এরা রাতারাতি হয়ে পড়বে 'চট্টল-গৌরব', 'নির্যাতিত বিপ্লবী বীর', কেউ বা 'আদিল-এ আজম' বা 'জনদরদী' অথবা 'নিঃস্বার্থ সমাজ সেবক' আবার কেউবা 'গরিবের বন্ধু', কেউবা 'কায়েদে আজমের বিশ্বস্ত সহকর্মী'। ভাড়া করা মাইক আর ভাড়াটে সমর্থকদের গলার জোরে এভাবে আজ অনেক ভোট-তস্কর দেশ সেবার লস্কর হয়ে উঠেছে।

বার্ট্র্যান্ড রাসেলের স্মরণীয় উক্তি : No society can be great without great individuals. সত্য, ন্যায়, মার্জিত রুচি আর নৈতিকতাবোধ ছাড়া বড়ত্ব বা মহত্ত্ব অর্জনের অন্য কোন পথ নেই। যৎসামান্য নাগরিক কর্তৃত্ব আর রাজনৈতিক ক্ষমতা


www.pathagar.com

যদি আমাদের এমনি উন্মত্ত করে তোলে, সততা আর সুরুচিকে যদি আমরা এভাবে কর্ণফুলির জলে বিসর্জন দিই, যেকোন উপায়ে জয়ী হওয়ার জন্য যদি এভাবে মরীয়া হয়ে উঠি তা হলে আমাদের মধ্যে great individual বা মহৎ মানুষের আবির্ভাবের কোন সম্ভাবনাই নেই।

মিথ্যা আর জাল-জুয়াড়ির আশ্রয় নিয়েও জয়ী হলে যদি সমাজের কাছ থেকে সম্মান আর সংবর্ধনা মেলে, পাওয়া যায় জিন্দাবাদ আর ফুলের মালা তা হলে কে করতে যাবে মহত্ত্বের সাধনা? ন্যায় আর নীতি রক্ষার প্রয়োজনই তো যাবে তখন ফুরিয়ে। এমন সমাজ বড় হবে কি করে? রাজনৈতিক দল বিশেষ বা কোন বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কোন লাভ নেই। কারণ গোটা সমাজ-দেহেই শুরু হয়েছে পচন। না হয় এমন ব্যাপক জালিয়াতির গুজব ছড়িয়ে পড়ত না সারা দেশে, বিশ্বাসও করত না লোকে আর বিশ্বাস করে, জেনে শুনে এভাবে সংবর্ধনা আর ফুলের মালারও করতো না অবমাননা! কয়েকজন সুবিধা সন্ধানীর সুবিধাভোগের ক্ষেত্রটাকে প্রসারিত আর মজবুত করার জন্য গোটা একটা সমাজ এভাবে নিজের নৈতিকবোধ আর বিবেককে খোয়াতে পারে এ ভাবা যায় না। আর এও ভাবা যায় না নীতি-ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে, নিজের বিবেক খুইয়ে কোন সমাজ বা জাতি বড় কিম্বা মহৎ হতে পারে। যদি কেউ বলে আমরা মহৎ হতে কি বড় হতে চাই না, আমরা স্রেফ বাঁচতে চাই আর নিজে বাঁচলেই বাপের নাম তা হলে আর কোন বক্তব্য থাকে না। এ অবস্থায় আমার মতো লোক ভেতরে মুখর হলেও বাইরে চুপ না থেকে উপায় নেই। সাহিত্য মানে বিবেকের চর্চা সে চর্চাই আজ আমার মতো মানুষকে করে তুলেছে অশান্ত।

---


www.pathagar.com

# নাম-সূচি

## অ


অবনীন্দ্রনাথ (ঠাকুর) ৭৫
অপূর্ব কুমার (চন্দ) ১০১, ১০২, ১০৬
অন্নদাশঙ্কর (রায়) ১৭৪, ১৭৫, ২০২
অজয় ভট্টাচার্য ১৮১
অনন্ত বড়ুয়া ১৮১
'অমৃত বাজার' (পত্রিকা) ১৩৪
অম্বিকা চক্রবর্তী (সন্ত্রাসবাদী নেতা) ২১৭, ২১৯


## আ


আবু নছর ওয়াহিদ (শামসুল ওলেমা) ১৭
আলওয়াল ২৩
আবদুস্ সোবহান (মওলানা) ২০৩
আবদুল ওদুদ (কাজী) ২৫, ৬০, ৬১, ৬৩, ৯৩, ১০১, ১০৬, ১০৭, ১১০, ১৪১, ১৯০, ১৯৬, ২০২, ২২৯, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৭, ২৪৭
আকরম হোসেন (কাজী) ১১৪
আবুল কাসেম (কাজী) ২৫, ৮৪, ৯৯, ২০৫, ২৪৭
আবদুল্লাহ্ (হাফেজ) ৩৮
আমিনর রহমান (ব্যারিস্টার) ৫৮
আবদুর রউফ (চৌধুরী) ৪৩, ৭৯
আমান আলী (খান বাহাদুর) ৫৪, ৬৮, ৬৯, ৭০
আকরম খাঁ (মওলানা) ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৯২, ১১৮, ২৫২, ২৫৬
আবদুল্লাহেল বাকী (মওলানা) ৫৪
আবদুল আজিজ (খান বাহাদুর) ৫৬, ৫৭
আবদুল কাদের (অধ্যাপক) ২৩৯, ৯৫
আবদুস্ সত্তার (খান বাহাদুর) ৫৮
আবদুল করিম (সাহিত্য বিশারদ) ৫৯, ১২৪, ১৭২, ১৮১, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ২০২ ২১৯, ২২০, ২২১
আনওয়ারুল কাদির (কাজী) ৯৩, ১০৭
আক্কাস আলী খাঁ ১০৯
আনোয়ারুল হক (কাজী) ১০৯
আবদুল হাকিম (খান সাহেব, অধ্যাপক) ১০৯, ১৫৭, ২২৭




www.pathagar.com

আকবর উদ্দীন ১১১, ১৯১, ১৯২, ১৯৪
আতাউর রহমান খাঁ ১১১
আবদুস্ সালাম খাঁ ১১১
আলী আহমদ (ভূতপূর্ব বিভাগীয় কমিশনার) ১১২, ২৩১
আলম (ডাক্তার) ২৩৯
আজিজ উদ্দীন (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) ১১৩
আফতাব আহমদ (উর্দু লেখক, অধ্যাপক) ২৪৪
আলতাফ হোসেন ('ডন' সম্পাদক, বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) ১১৩, ১১৪, ১৪৬
আবুবকর (মওলানা) ১১৮
আবদুর রহিম (স্যার) ১২০
আবদুল করিম (রীফ সরদার) ৫৯, ১২৪, ১৭২
আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১২৭, ১৩১, ১৬২, ১৬৩
আবুল মনসুর আহমদ ১২৭, ১৬৩, ১৬৪, ১৮৩, ২৫২
আয়নুল হক খাঁ ১৩০
আব্বাস ১৩৩, ১৮৪, ২২০
আবদুস্ সালাম (কবি) ১১১
আবুল হাসনাৎ (প্রাক্তন আই. জি.) ২৫০
আসাদ সাহেব (খান বাহাদুর) ১৪৫
আবদুল ওদুদ (সূফি) ৬০, ৬৩
আবদুল গণি (সওদাগর) ৬৬, ৯৭, ২৪৮
আবদুর রহমান খাঁ (খান বাহাদুর) ১৯০, ২২৯
আবদুল কাদির (কবি) ৮১, ৯৬, ৯৭, ১০৭, ২৩১, ২৩৯, ২৪৫
আবদুল হক (ফরিদী) ৮৩, ৮৪, ১০০
আবদুল্লাহ সোহরওয়ার্দী (ডক্টর) ২৪৭
আবদুর রব চৌধুরী (প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ৮৪, ২০৪
আবুল কাসেম (মরহুম, অধ্যাপক) ২৫, ৮৪, ৯৯, ২০৫
আবুল কাসেম (রেল কর্মচারী) ৮৪, ৯৯
আবুল হোসেন (মরহুম) ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০৫, ১০৭
আলাউদ্দীন আল আজাদ ২৩৩
আবদুল মজিদ (সাহিত্য রত্ন) ৯৭, ৯৮
আনওয়ার হোসেন (হেড্ মাস্টার) ১০৭
আজিম উদ্দীন (মরহুম) ১৪৫
আবুল খায়ের (মরহুম) ১৪৬
আবুল হাশেম (মৌলবী) ১৫৩
আবদুল হাকিম (এডভোকেট, প্রাক্তন স্পীকার প্রাদেশিক আইন পরিষদ) ১০৯, ১৫৭,



www.pathagar.com

আবুল মুহসিন ১৭৮
আজিজর রহমান ১৬৪
আবদুস্ সবুর খাঁন (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) ১৬৪
আবদুর রহমান (ভূতপূর্ব স্কুল ইন্স্পেক্টার) ১৬৬
আশুতোষ চৌধুরী ১৭৫, ১৮৪, ২০১, ২০২
আবুল মন্জুর ১৮১
আহমদ আলী (অধ্যাপক) ২৪৪
আইনুন নাহার ১৮২
আলী খাঁ (প্রিন্স) ২৪৫
আব্বাস উদ্দীন ২২০
আবদুস্ সোবহান (খান চৌধুরী) ২০৩
আবদুল ওহাব মাহমুদ (বাচ্চু মিয়া) ১৯৩
আজিজুল হক (স্যার) ১৯৩
আফজলুল হক ১৯৩
'আজাদ' (পত্রিকা) ১৬৩, ১৯৪
'আনন্দ বাজার' (পত্রিকা) ১৩৪
আবুল হোসেন (কবি) ৮৭
আবুল মামুন ১৯৭
আবদুল হাই (মুহাম্মদ) ১৯৬, ২২৪
আবদুল খালেক (ইঞ্জিনিয়ার, দৈনিক আজাদীর প্রতিষ্ঠাতা) ২০২
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী (মরহুম) ২০২
আফসারউদ্দীন (কাজী) ২০৩
আবু হেনা (প্রাক্তন অধ্যক্ষ) ২০৪, ২১৭
আশরাফউদ্দীন (অধ্যাপক) ২০৫
আবুল কাসেম সিদ্দিকী (অধ্যাপক) ২০৫
আবদুল হামিদ (প্রাক্তন মন্ত্রী, মরহুম) ২২৩
আহমদ হোসেন (অধ্যাপক, বাংলা একাডেমির সম্পাদক) ২২৬
আবদুল হাকিম (খান বাহাদুর) ২২৭
আজম খাঁ (প্রাক্তন গভর্নর) ২৩৬
আবদুল গফুর সিদ্দিকী (মরহুম) ২২৯
আবদুল গণি হাজারী ২৪৮
আবদুল জব্বার (ডাক্তার) ২৩০
আলী আহমদ (সাংবাদিক) ১১২
আহমদ শরীফ (অধ্যাপক) ২৩৩
আবদুল মওদুদ (জেলা জজ) ২৩৩



www.pathagar.com

## ই


ইমদাদুল হক (কাজী) ২৫, ৯৪
ইয়াসিন ৪৬
ইসলামাবাদী ৫৪
ইসমাইল হোসেন (শিরাজী) ৫৫
ইসহাক (মওলানা) ৮৪
ইকবাল (কবি) ১৩৬
ইদ্রিস (আই. জি. পুলিস) ১৪৫
ইদ্রিস আলী (অধ্যাপক) ১২৮
ইসমাইল (কমরেড) ২১৭
ইব্রাহীম (ডাক্তার) ২৩৯
ইমাম হোসেন চৌধুরী (প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) ২৪৬


## উ


উত্তম কুমার ৭৪
উমু (উম্‌রতুল আলম) ১৭৮


## এ


এ. এফ. রহমান (ডক্টর, স্যার) ১০৫
এফ. এ. করিম (প্রাক্তন অফিসার) ২২২
এ. জেড্. নুর আহমদ ১০৭
এ. গনি ১২১
এ. রশিদ ১২১
এম. এ. হাশেম (ডাক্তার) ১৮০
একরামুল হক ১৮২
এম. এন. রায় ৬৬
এনামুল হক (কাজী) ১৯৯
এনামুল হক (মুহাম্মদ, ডক্টর) ২০২, ২২২, ২২৩
এ. কে. ফজলুল হক ২১৬
এন. এম. খাঁ (কমিশনার) ২১৯
এ. সামাদ ২২৬
এনামুল হক (উত্তরণ সম্পাদক) ২৩২


## ও


ওবায়দুল হক (মওলানা) ৫৪, ৫৫, ১৪৯




www.pathagar.com

ওয়াজেদ আলী (এস) ৮১, ১৮৩
ওয়াজেদ আলী (মোহাম্মদ) ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৬৩
ওহীদ উদ্দীন মাহমুদ ১৩২
'ওবেদি-বিয়োগ' ১৩৩
ওবায়েদুল্লাহ্ আল্ ওবেদি (মওলানা) ১৩৩
ওহীদুল আলম ১৭১, ১৭৫, ১৭৮, ১৮৫
ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব (মরহুম) ২০৫

ক

কাজেম আলী ১৬, ৩৬, ৫৩, ৬৬, ১৪৬, ১৪৯, ১৮২
কামালউদ্দীন (শামসুল ওলেমা) ১৭, ১৮, ১৯
কাদের সরদার ৮০
কেঁওচিয়া ২৩, ৪৩, ১৮০
কে. সি. দে ৬৫
কামাল উদ্দীন খাঁ ১৫৬, ২০৯
'কল্লোল' ১৪১
কুমার মিত্র ১৫৯
কুমুদ ঘোষ ১৫৯
'কায়েদে আজম' ১৬৩, ২১৬, ২৪৭
কলিম উদ্দীন আহমদ ১৭১
কমল মাঝি ২০০
কুদরৎ-এ খোদা (ডক্টর) ২২৪
কলিম শরাফি (গায়ক) ২২২
কায়কোবাদ ২২৪
কেশব সেন (ডাক্তার, রায় বাহাদুর) ২২৯
কুদরৎ উল্লাহ্ শাহাব ২৩৮
কবীর চৌধুরী (অধ্যক্ষ) ২৪৪

খ

খায়রুল বসর (শাহজাদা) ৭৭
খলিলর রহমান ১৬১

গ

গুলশান আরা ৪২
গোলাম কাদের চৌধুরী ৫৮



www.pathagar.com

গান্ধী (মহাত্মা) ৬৪, ৬৫, ৬৭, ১০২
গোলাম মোস্তফা (কবি) ১১৮, ১৭৩, ১৭৪, ২৩৯
গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য ১৩৬
'গীতিকা' ৯৭, ১৮৪
গঞ্জালিস ১৮৫
'গণবাণী' ১৮৮
গোলাম কুদ্দুস ২৩৮

চ

'চৌচির' ১৬
চিত্তরঞ্জন দাস ১১৪
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৯, ১০০, ১০১, ১৪১
চন্দ্র কুমার দে ১৮৪
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ১৯৬

ছ

'ছেলেদের চট্টলভূমি' ১৮৪

জ

জুলফক্কর (মওলানা) ১৭
জান আলী (মুন্সী) ৪২
জরাসন্ধ (লেখক) ৭৪
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (ডক্টর, স্যার) ৮৮
জহুরুল ইসলাম (ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ) ৮৮, ২২৭
জসীমউদ্দীন (কবি) ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১১৬, ১৮৫, ২২৪, ২৩৮
জি-আল্লানা ২৪৫
জি. এচ. লেঙলি ১০৩
'জাগরণ' (পত্রিকা) ১১৭
জয়নুল আবেদিন (শিল্পী) ২৪৬
জিন্নাহ্ (কায়েদে আজম) ২৪৭
জেবুন্নেসা ১২৭, ১২৯, ১৯৪
জহুর হোসেন (চৌধুরী, সম্পাদক) ১৩৩
'জয়তী' (মাসিক) ১৪১, ২৩১
জীবনানন্দ দাশ (কবি) ১৬৩
জনার্দ্দন চক্রবর্তী (অধ্যাপক) ১৯৫



www.pathagar.com

জাকারিয়া সাহেব (অধ্যক্ষ) ১৯০, ১৯১
জে. এম. সেন (অধ্যক্ষ) ১৯১
'জিন্দেগী' ২০৪, ২২৩, ২২৫
জাফর আলম চৌধুরী ২০৮, ২০৯
জুবেরী (ডক্টর) ২১৩
জুলফিকর আলী (মরহুম) ২২২
জহুরুল ইসলাম (অধ্যক্ষ) ৮৮, ২২৭
জাকির হোসেন (প্রাক্তন গভর্নর) ২৩২
জমিল জলিবি (উর্দু লেখক) ২৪৪
জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (অধ্যাপক) ২৪৪
জেবুন্নেসা হামিদ উল্লাহ্ (বেগম) ২৪৪

ট

টুসি (অধ্যাপক) ১০৩
টাপ্‌নেল ব্যারেট (কমিশনার) ২০৯
টি. হোসেন (তফাজ্জল হোসেন) ২১৯
টি. এস. ইলিয়ট ২৪৪

ড

ডেবিস ১২৩, ১২৪

ঢ

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ ১৬, ৮৯

ত

তসদ্দুক আহমদ (খান বাহাদুর) ৮৯, ৯৪. ১০৭
তোফায়েল আহমদ (অধ্যক্ষ) ১৪৫
'তাজ লাইব্রেরি' ২০৯

দ

দিদারুল (আলম) ১৯, ২০, ২১, ৫৯, ৭১, ৭৮. ৭৯. ৯৬. ১১৯. ১৩৭, ১৩৮
দীনেশচন্দ্র সেন (ডক্টর) ৯৫
দীনেশ দাশ ১০০
দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৬
দিলীপ কুমার রায় ১৬২
দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২২৯



www.pathagar.com

## ন


নজরুল ইসলাম ২০, ২৫, ৭৪, ৯৮, ১০০, ১০১, ১১৬, ১১৯, ১৩৪, ১৮২, ২২৪
নূরজাহান ৫০
নবাব আলী (নবাব) ৮০
নন্দিতা, নন্দিনী ১০৭
নাজির উদ্দীন (প্রাক্তন অফিসার) ২২৮
নাজির উদ্দীন (খান বাহাদুর) ১১২
নজির আহমদ (মওলানা) ১১৮
নৃপেন চাটার্জী (সাংবাদিক) ১১৮
নন্দলাল চক্রবর্তী (শিক্ষক) ১৫৮
নূরী (ছদ্মনাম) ১৬৪
নুরুল ইসলাম (ডক্টর, অর্থনীতিবিদ) ১৬৬
নাসির উদ্দীন (মোহাম্মদ, সওগাত সম্পাদক) ১২৭
'নিভৃত-নিলয়' ১৮৪
নুরুল ইসলাম (মৌলানা, অধ্যাপক) ২১০
নাজিম উদ্দীন (খাজা) ২১৩
নুরুল আমিন (প্রাক্তন মন্ত্রী) ২১৩
নরেন দেব ২২৯
নীলিমা ইব্রাহীম (ডক্টর) ২৩৯, ২৪৫
নীরদ চৌধুরী (লেখক) ২৪৮


## প


'প্রাচী' (পত্রিকা) ১৪, ৮৪
প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ৯৫
প্রতিমা দেবী ১০০, ১০৫
'প্রবাসী' (পত্রিকা) ১২০, ১৩৪
প্রেমেন্দ্র মিত্র (সাহিত্যিক) ১২৯
প্রাণবল্লভ বসাক (শিক্ষক) ১৮২
'পূরবী' (মাসিক) ১৮৫
পূর্ণ চৌধুরী (ডাক্তার) ২০১, ২০২
প্রিয়তোষ বাগচী ২০৩


## ফ


ফজলর রহমান (মৌলবী) ৩৫
ফজলুল কাদের (খান বাহাদুর) ২০৩




www.pathagar.com

ফৌজুল কবীর (শিক্ষক) ৭২
ফজলুল হক (শেরে বাংলা) ৮১, ১২৬
ফরিদী (আবদুল হক) ৮২, ১১৪, ১৪৯, ১৭১
ফজলুল করিম মল্লিক ১৬৪
ফরমোকি (অধ্যাপক) ১০৩
ফজলর রহমান (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) ৩৫
ফখরউদ্দীন (খান বাহাদুর) ১১৪
ফজিলতুন্নেছা ১১৫, ১১৬, ১১৭
ফজলুর রহমান (কবি) ১১৩, ১২৭
ফররুখ আহমদ (কবি) ১৫৪
ফজলে আলী ১৬৪
প্রতিভা-দি ১৬৫
ফাতেমা খানম ১৭০
ফরিদ আহমদ (খান বাহাদুর) ২০২
ফজলুর রহমান (মরহুম, ডি. পি. আই.) ২২২
ফখরুল ইসলাম (ইঞ্জিনিয়ার) ২২৬
ফৌজিয়া সামাদ ২২৬

## ব

বিদ্যুৎময়ী (নটী) ৮১
বীরেন্দ্র গাঙ্গুলী (অধ্যাপক) ১০৯
'বৈভব' (মাসিক) ১১৭
বেলায়েৎ আলী খাঁ ১২৫
'বুলবুলিস্তান' ১৩২
বি. বি. সরকার (আই. সি. এস.) ১৫৭
বিজয় ভট্টাচার্য ১৮১
বাবুরাম সেক্সেনা ১৮৮
'বীরাঙ্গনা' ২০৩
বিধুভূষণ ঘোষ ২০৩
'বিদ্যাসাগর' ২০৫, ২৪২
ব্রজেন্দ্র সুর ২০৮
বিধানচন্দ্র রায় ২১৭
বুলবুল চৌধুরী ২২০
'বইঘর' ২৩০
বারি সাহেব ২৩৯



www.pathagar.com

## ভ

ভারতচন্দ্র ২৩৩

## ম

মোতাহার হোসেন (কাজী, ডক্টর) ২৫, ৬৯, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১৮
মোতাহার হোসেন (সৈয়দ, চৌধুরী) ১১১
মনসুর আলী (চৌধুরী) ৩০
মাহবুব-উল আলম (সাহিত্যিক) ১৫৯, ১৭২
মার্মাডিউক পিকথল ২৪৭
মাহমুদ হাসান (ডক্টর) ৯০
মোতাহার হোসেন (সূফী) ১১১
মোহাম্মদ হোসেন (মওলানা ও মোহাদ্দেস) ৩৯
মোক্তার আহমদ চৌধুরী ৪৩
মীর এহায়া ৪৭, ৪৮
মাহমুদা খাতুন (চৌধুরাণি) ৪৯, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬
মাহমুদ হোসেন (ডক্টর) ২৪৬
মহিম দাস ৬৪
মনিরুজ্জামান (ইসলামাবাদী) ৫৩, ৫৫, ৫৮
মীজানুর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত অফিসার) ১৭২
মর্তজা আলী (সৈয়দ) ৫৯, ২১৯
মোহাম্মদ নাজের (মওলানা) ৬০
মোহাম্মদ আলী (মওলানা) ৬৪
মুনীর চৌধুরী ২৩৮, ২৩৯
মেহের আলী (উকিল) ৭০
মুসা সাহেব (খান বাহাদুর) ৭১, ৭২
'মখফী' (ছদ্মনাম) ১২৯
মোহিত মজুমদার (কবি) ৯২
মুহাম্মদ কাসেম (লেখক) ৯৮
মোক্তার আহমদ সিদ্দিকী ১০৮
মমতাজ উদ্দীন আহমদ (ডক্টর) ১০৮
মোহাম্মদ হোসেন (খসরু, গায়ক) ১১৬
'মাসিক সঞ্চয়' ১১৮
মুহাম্মদ ইসহাক ১২১
মতিলাল (নেহরু) ১২৬
মঈনউদ্দীন (খান) ১৬০, ১৬১



www.pathagar.com

মাইকেল ওয়েস্ট (ডক্টর) ১৩৬
মাইকেল মধুসূদন ২৪৯
মোখলেসর রহমান (অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর) ১৩৬
মুহাম্মদ শরিফ ১৩৯
মুসা আহমদ (অফিসার) ১৫৪
মনসুর উদ্দীন (অধ্যাপক) ১২৩
মনোতোষ সরকার ১৫৯
মানকুমারী বসু ১৬৭
মোহসিন ১৬২
মুজাফফর আহমদ (কমরেড) ১৮৮
মোফেস্বল উদ্দীন আহমদ (এম. ইউ. আহমদ) ১৯১
মহীউদ্দীন (রাজনৈতিক কর্মী) ১৯২
'মৃত্যু ক্ষুধা' ১৯২
মিস্ গ্রাহামস্ (ডাক্তার) ১৯২
মিস্ এলেন ১৯২
মিস্ জোন্স ১৯২
মুজিবর রহমান (ছাত্র) ১১৩, ১৯২
মেহের উদ্দীন (মৌলবী) ১৯৩
মোজাম্মেল হক (কবি, শান্তিপুরের) ১৯৩
মাউন্ট বেটেন ২০৮
মোহন মিয়া ২১৩
মমতাজ জাহান (কন্যা) ২১৫
মোয়াজ্জেম হোসেন (ডক্টর) ২২৩
মনোজ বসু ২২৯
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (কবি) ২৩৯
এম. এন. হুদা (ডক্টর) ২৪৬
মতিনউদ্দীন (আবু রুশদ্) ২৪৬

য

যতীন্দ্র মোহন (সেনগুপ্ত) ৬৫
'যুগের আলো' (মাসিক) ২০, ৯৬, ১৩৮, ১৬৬
যোগেশচন্দ্র সিংহ (অধ্যাপক) ২০৬

য়

য়ূসুফ সিরাজ উদ্দীন ১২০
য়ূসুফ আলী (আল্লামা) ২৪৭



www.pathagar.com

## র


'রাঙ্গা প্রভাত' ৭২, ২৩১
রমেশচন্দ্র নন্দী ৩৭
রমিজউন্নেসা (চৌধুরানি) ৪৯
রবীন্দ্রনাথ ৭৫, ৮৬, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬
রমেশ মজুমদার (ডক্টর) ৯০
রেন সাহেব (ইংরেজ অধ্যাপক) ৯০, ১১২
রথীন্দ্রনাথ (ঠাকুর) ৭৫, ৮৬, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬
রেজায় করিম (এ. জেড্.) ১১২
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক) ১২০
রহিমা খানম ১৬০, ১৬১
রাধারানী দেবী ১৬৮, ২২৯
রশিদ আহমদ নদভী ১৮৮
রায়হান শরিফ (অধ্যাপক) ২০৪, ২০৫
রুহুল আমিন নিজামী ২৪৮


## ল


লেঙলি ১০৩, ১০৪
লীলা রায় ১৭৪
'লাঙল' ১৮৮


## শ


শামসুন্নাহার মাহমুদ ৫৬, ২২০, ২৩৩, ২৪০
শহীদুল্লাহ্ (মুহাম্মদ, ডক্টর) ১৪৯
শামসুজ্জামান ৫৮, ২২৮
শিরাজী ৫৫, ৭৪
শঙ্কর (লেখক) ১৫৯, ১৭৪
'শিখা' ৮৯, ১৩৯
শরৎচন্দ্র ১০০
শামসুল হুদা ১১১, ২৩৭
শহীদ উদ্দীন মাহমুদ ১৩২
শাহেদ ও শহীদ (সোহরওয়ার্দী) ১৩৩
শমছা (নুরজাহান) ১৪৪
শঙ্কর ঘোষ ১৫৯
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৮৬




www.pathagar.com

শামসুদ্দীন আহমদ (প্রাক্তন মন্ত্রী) ১৮৮
'শান্তি-কুটির' ১৯২, ১৯৫
শুভাশীষ ২০২
'শ্রীমধুসূদন' ২০৫
শাহবুদ্দীন খালেদ (অধ্যাপক) ২১১
শাহাদৎ হোসেন (কবি) ১২৮
শামসুজ্জামান চৌধুরী (অধ্যক্ষ) ২২৮
শামসুল হুদা (অধ্যাপক) ১১১
শওকত ওসমান ২৩৮
শায়েস্তা একরাতুল্লাহ্ (বেগম) ২৩৮, ২৩৯

## স

'সওগাত' (পত্রিকা) ১১৬
সুলেমান ফুলোয়ারী (মওলানা) ৫৮
শৌকৎ আলী (মওলানা) ৬৪
সাদৎ আলী আখন্দ ৬৬, ১৭২
সুভাষ বোস ৬৬
সুচিত্রা সেন ৭৪
সুশীল কুমার দে (ডক্টর) ৯০
সঞ্জীব চন্দ্র ৯৮
সুফিয়া কামাল ১৩২, ১৫৭
সোলতানুদ্দীন আহমদ (প্রাক্তন গভর্নর) ১১২
'সবুজ পল্লী' (মাসিক) ১১৭
সোহরওয়ার্দী ২৪৩, ২৪৪
সৈয়দ জালালউদ্দীন (হাশেমী) ১৩৩
সাজেদা খাতুন ১৫১
সুরেশচন্দ্র দাশ ১৫১
সিরাজউদ্দীন (খান সাহেব, হেড্ মাস্টার) ১২১
সুধীন দত্ত (কবি) ১৬৩
সৈয়দ আমজাদ আলী ১৭২
সিদ্দিক ১৭৫
সঞ্জয় ভট্টাচার্য ১৮১
সুচরিত চৌধুরী ১৮৪
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডক্টর) ১৯০
সোলেমান নদভী ১৮৭



www.pathagar.com

'স্টেটস্‌ম্যান' (পত্রিকা) ১৩৪
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (লেখক) ১৯৫
'সীমান্ত' (মাসিক) ২০১
সোলতান আহমদ (ব্যারিস্টার) ২১০
সৈয়দ মর্তজা আলী ৫৯, ২১৯
সত্যেন মজুমদার (সাংবাদিক) ৩৩৬
সিরাজুল ইসলাম (অধ্যাপক) ২২৩, ২২৪
সৈয়দ আলী আহসান ২৩৯, ২৪৫
সুব্রত বড়ুয়া (ডাক্তার) ২৪০
সৈয়দ মুজতবা আলী ২৪৩
সৈয়দ মোস্তফা আলী ২৪৩

হ

হায়দর আলী (মৌলবী) ৩৫
হেরম্ব মৈত্র ৫৩
হাবীব উল্লাহ্‌ (বাহার) ৫৬, ১৫১, ১৫৬, ২১৩, ২২০, ২৩১
হাসান আলী (নবাবজাদা) ৮০, ১৮৩
হার্টগ (ডক্টর) ১০৩
হরিপ্রসাদ মল্লিক ৯৩, ১৬৫
হুমায়ূন কবীর ১৩৩
হাফিজ (কবি) ১৩৬
হুইট্‌ম্যান্‌ ১৫৪
হেনা সাহেব (অধ্যক্ষ) ২০৪, ২০৬, ২১৭
হীরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত (অধ্যাপক) ২০৮
হাবীবর রহমান (অধ্যাপক, মরহুম) ২০৯, ২১২
হেদায়েৎ হোসেন (শিল্পপতি) ২১০
হামিদুল হক চৌধুরী (প্রাক্তন মন্ত্রী) ২১৩
হুদা (শামসুল হুদা) ১১১
হাসান সোহরওয়ার্দী (স্যার) ২৪৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com